সংস্কৃতি বিষয়ক

যোগসূত্র

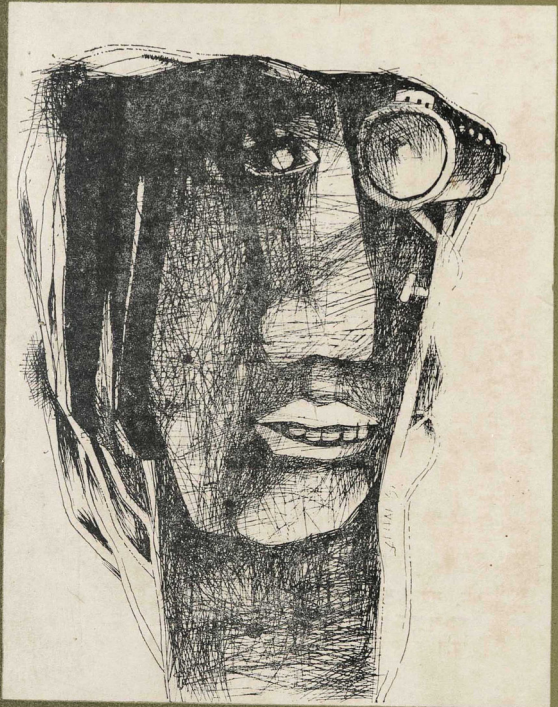

বন্ধু সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের
অকালমৃত্যুতে
আমরা শোকস্তব্ধ।

সংস্কৃতি বিষয়ক

যোগসূত্র

অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯২

সম্পাদক : বিনয় ঘোষ
সহযোগী সম্পাদক : সঞ্জয় চক্রবর্তী
শিল্প নির্দেশক : দেবাশিস দত্ত
প্রচার : মানস বসু
বিজ্ঞাপন : পারমিতা সিন্‌হা
ব্যবস্থাপনা : দিলীপ সেন
প্রচ্ছদ : শেখর রায়
লিপি : নির্মলেন্দু মণ্ডল
যোগাযোগ : টি জি ২/২৯ তেঘরিয়া, হাতিয়ারা, কলকাতা ৭০০০৫৯
ফোন : ৫৯ ৪০৪৮
৯১/১এ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা ৭০০০১৪

নির্মল গুহ রায় / মঞ্চের বিবর্তন ১ ☐ বাদল সরকার / থিয়েটারের খোঁজে ৪৯ ☐ প্রবীর গুহ / নৈঃশব্দের ভাষা ৬৮ ☐ অশোক মুখোপাধ্যায় / নাট্যকারের সন্ধানে ৭৯ ☐ শ্যামল ঘোষ / নেশা আর পেশার দ্বন্দ্ব ৯১ ☐ অসিত বসু / থিয়েটারের মাচায় ৯৮ ☐ খালেদ চৌধুরী / শিল্পের শর্ত ১১২ ☐ উমা গঙ্গোপাধ্যায় / রঙ্গকর্মী সবাই, সজ্ঞকর্মী কোথায় ১২৯ ☐ নির্মল ঘোষ / দাস-সংস্কৃতি ১৪৩ ☐ অসিত মুখোপাধ্যায় / অনুদান অনুযোগ ১৫০ ☐ সলিল সরকার / থিয়েটার-ই, তবে পর্দায় ১৫৩ ☐ অমল রায় / মফস্বলের থিয়েটার ১৭৪ ☐ দেবাশিস মজুমদার / আঁধার পেরিয়ে ১৮৫

ক্রোড়পত্র : রণবীর সমাদ্দার / জঙ্গলমহল ১-৪৯

যার টাকা নেই, ক্ষমতা নেই, তার আর্জিই বা শুনবে কে! সংবেদনশীল হিসাবে খ্যাত শিল্পীরাও কেউ কেউ এরকম ক্ষেত্রে বধির। পত্রিকা চলছে চেষ্টার জোরে। শুধু চেষ্টার জোরে উন্নতমানের লেখা, বিজ্ঞাপন সংগ্রহ প্রায় অসম্ভব। বন্ধুরা অনেকে বলেছেন, 'এটা নেহাতই গোঁয়াতুমি।' ঠিকই বলেছেন, চেষ্টার গোঁয়ার আমরা। থিয়েটার এই সংখ্যার বিষয়। শ্যামবাজারের নয়, অকাদেমি আর কার্জন পার্কের থিয়েটার। নিছক আমোদ-প্রমোদে সে থিয়েটার শেষ হবে না। কোথায় সেই থিয়েটার? জাদু, ভেলকি, নাচা-গানা আর বাইরের জৌলুসই তো এখন সব! অন্য থিয়েটারের ভ্রূণ হত্যা ঘটেছে কি? ভাবা হয়েছিল, সেই খুন বা খুনের প্লটটি থিয়েটারের পোয়েন্দারা উদ্ঘাটন করবেন। একাজে তাঁরা কতখানি আন্তরিক সে বিচার করবেন পাঠক।

২৬. ০৯. ৯২

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় রচিত দ্রুপদী নাটকের বাংলা অনুবাদ

আন্তিগোনে ২০.০০
সোফোক্লেস
অনুবাদ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
তৃতীয় মুদ্রণ

ওথেলো ১৫.০০
উইলিয়ম শেক্সপীঅর
অনুবাদ : সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়
দ্বিতীয় সংস্করণ

ব্যাঙে'র কেত্তন ২০.০০
আরিস্তোফানেস
অনুবাদ : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
দ্বিতীয় মুদ্রণ

তার্ত্যুফ ২০.০০
মলিয়ের
অনুবাদ : লোকনাথ ভট্টাচার্য
দ্বিতীয় মুদ্রণ

ইয়োনা ১০.০০
মারিন সোরেস্কু
অনুবাদ : অমিতা বসু

রসুম ছাঁচের রোবোট ১৫.০০
কারেল চাপেক
অনুবাদ : সোমেশ্বর ভৌমিক

সাহিত্য অকাদেমি
রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজশাহ রোড, নতুন দিল্লী-১
জীবনতারা ভবন, ২৩এ/৪৪ এক্স, ডায়মণ্ড হারবার রোড,
কলিকাতা-৫৩ (দূরভাষ : ৪৯-৭৪০৬)

□

East India Transport Agency

A Unit of E.I.T.A. INDIA LTD.

20-B, ABDUL HAMID STREET
4TH FLOOR
CALCUTTA-700 069
Phone : 28-3203 / 7639 / 8036 / 8037, 20-2653
Telex : 21-7468 EITA IN
Gram : DISCRETION

(Over 325 Branches throughout India)

□

GEM INDUSTRIES

Manufacturers and Suppliers of all types of Conveyors with Components and other kinds of Machinery Equipments.

OFFICE :
6, MISTRY PARA LANE, CALCUTTA-700 014
Phone : 44 4875

FACTORY :
41, M. C. GHOSH LANE,
HOWRAH-1

□

॥ রজত জয়ন্তী বর্ষপূর্তির অভিনন্দন ॥

১৯৬৬-৯২

॥ দুটি নতুন নাটকের প্রস্তুতির কাজ চলছে ॥

থিয়েটার ওয়ার্কশপ

১১, পাল স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৪

দূরভাষ : ৩০-৫৩৭৩

□

Space donated by :

GUJRAL ROADWAYS

□

M/s. Eastern Agencies

Head Office :

80/1, GREY STREET, CALCUTTA-700 006

Phone : 33-5554, 33-6301

City Office :

32A, CHITTARANJAN AVENUE,

CALCUTTA-700 012

Phone : 26-4790, 26-6914

Branch Office :

SILIGURI, PATNA, MUZAFFARPUR, & CUTTACK.

□

M/s. DAS PRINTERS

123/1, ACHARYA P. C. ROAD
CALCUTTA 700 006
Phone : 35 4312 / 36 1543

LEADING HOUSE OF QUALITY LETTERPRESS
& OFF-SET PRINTING

SPACE DONATED BY :

A WELL WISHER

মঞ্চের বিবর্তন

নির্মল গুহ রায়

স্মরণ

ইতিহাস লেখা উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু ইতিহাসের পদচিহ্ন অনুসরণ করে তাকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে, কণ্টকাকীর্ণ—বন্ধুর পথের কথা বুঝে এবং সেই পথে চলার ব্যথা-বেদনা আক্ষেপ-আনন্দ, জয়পরাজয়, উচিত-অনুচিত ও পাওয়া না পাওয়ার সূত্র ধরেই এগিয়ে যাওয়া বাঞ্ছনীয়, একান্ত কর্তব্য, সেখানে অনেক কিছু স্পষ্ট আবার অনেক কিছুই অস্পষ্ট, আলো-আঁধারের সেই পথ ধরেই এগোতে হয় সামনের উজ্জ্বল আলোর সন্ধানে। নইলে সঠিক পথের নিশানা পাওয়া অসম্ভব। সূত্র একটা থাকে বলেই অন্য বৃহৎ সূত্রের অনুসন্ধানেচ্ছাও থাকে। যেখানে কিছু পাওয়া যাচ্ছে না সেখানে যুক্তিতর্ক ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিষয়কে বিচার করে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। এইটাই সর্বকালের সিদ্ধান্ত। তাকে অস্বীকার করার অর্থ পায়ের তলার মাটিকে না জানা। সূত্র আছে বলেই তার বিকাশ ঘটে। মানুষ এই বিকাশ ঘটাতে পারে, পরিপূর্ণ রূপ দিতে পারে। এই কারণেই সে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জীব। নইলে এতদিনে সে বিলীন হয়ে যেত অথবা সেই আদিম আরণ্যক জীবনেই আবদ্ধ থাকত। কিন্তু তা সে থাকেনি, আর সেইজন্যই আজকের পৃথিবী শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ও চেতনায় এত পরিপূর্ণ।

আজ প্রয়োজন বর্তমান মঞ্চের গোড়া পত্তনের মূলে যে সব পথিকৃৎ ছিলেন তাঁদের স্মরণ করা এবং সেই সঙ্গে তাঁদের কর্মকাণ্ডকে বোঝা ও আত্মস্থ করা ; নইলে মঞ্চের ধারা সম্যক উপলব্ধি হবে না। এঁদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে কারণ, এঁদের শুভযাত্রার পথ ধরেই আজকের বিশ্বে মঞ্চ সর্ববিষয়ে বিকশিত।

সূচনা

মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের মিলিত রূপের প্রথম ভিতপ্রস্তর যেখানে স্থাপিত হয়েছিল সেখান থেকেই শুরু হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ তার অতীতের অবস্থার সঙ্গে বর্তমানের কোনও সামঞ্জস্য নেই। তাই রেনেসাঁ থেকেই শুরু।

রেনেসাঁ অর্থাৎ নবজাগরণ। চারিদিকে ভাঙা-গড়া শুরু। একদিক ঠিক করতে গিয়ে অপর দিক বেঠিক হয়ে যাচ্ছে। নানা তার সমস্যা, নানা তার সমাধান। শৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলার যুগলমিলন উৎসব চলছে। কিন্তু এগোচ্ছে, কোথাও দাঁড়িয়ে নেই।

উৎপাদন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন অর্থাৎ পুরাতন ব্যবস্থার উপর বিজ্ঞানসম্মত নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার জয়জয়কার। ফলে সমস্ত কিছুর মূল্যবোধ পালটে যাচ্ছে, উৎপাদনের ক্ষেত্রে, শিল্পে, সাহিত্যে, আর্থসামাজিক অবস্থা এবং রাজনীতির ক্ষেত্রেও। ক্ষয়িষ্ণু মরচেপড়া ব্যবস্থার ভিত ভেঙে সমাজে পত্তন হচ্ছে আধুনিক চিন্তাধারার। আমূল পরিবর্তন এল সমাজচেতনা, কর্মপদ্ধতি, সমাজব্যবস্থায়। মানুষের সঙ্গে মানুষের

সম্পর্কের নতুন বিন্যাস অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্রম পরিবর্তন। অবশ্য এরজন্য বহুদূর বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে তৎকালীন গতানুগতিক উৎপাদন ব্যবস্থার কর্মকর্তাদের সঙ্গে। কিন্তু তাতে কী হবে, অগ্রগতির দ্বার কি কখনও জোর করে রুদ্ধ করা সম্ভব! নতুন গুণে চমকে-চটকে সর্ববিষয়ে তার আধিপত্য বিস্তার করবেই করবে। মঞ্চও পিছিয়ে ছিল না, সেও দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এল।

একটি কথা স্মরণীয় যে মধ্যযুগে সমস্ত খ্রিস্টান জগতে [সমগ্র ইউরোপে] অটুট ছিল এক অপূর্ব সামাজিক বাঁধন,—সে বাঁধন আধ্যাত্মিক। কারণ খ্রিস্টধর্ম প্রচারের মাধ্যম হিসাবে মঞ্চকে মধ্যযুগে অবিরাম প্রয়োগ করা হয়েছে। তাই হয়ত ইতালি-ফ্রান্স-ব্রিটেনের মঞ্চ-প্রকাশের মধ্যে বাহ্যিক অসামঞ্জস্যের মধ্যেও প্রচুর সামঞ্জস্য দেখা যায়। অবশ্য এই সামঞ্জস্যের মধ্যে অমিল হচ্ছে শুধু এইটুকু যে, যে যার নিজের দেশের সংস্কৃতি, জাতীয়সত্তা ও আচার-ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সবাই প্রায় এক। অর্থাৎ উদ্দেশ্য একই লক্ষ্যে পৌঁছনো। তাই দেখা যায় যদিও মঞ্চের নবজাগরণের উন্মেষ ইতালিতে কিন্তু এদের মধ্যে সামগ্রিকভাবে আত্মিক যোগ থাকায় সমগ্র ইউরোপ তাতে প্রচণ্ড সাড়া দিয়েছে। সঙ্গে ছিল নতুনের নেশা। শিল্পে এই নবজাগরণের সূত্রপাত ইতালিতে। তাই সেখানে ফিরে যাওয়া যুক্তিযুক্ত।

প্রথমেই দুজনের নাম এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যাঁরা রেনেসাঁ মঞ্চের প্রথম গোড়াপত্তন করেন। প্রথমত রাফেল [Raphaél] ১৫১৮তে একটি মঞ্চ তৈরি করেন। এই মঞ্চের কোনও নক্সা বা ছবি পাওয়া যায় না, তবে কিছু বইতে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত সারলিও [Serlio] ১৫৪০ সালে একটি মঞ্চ নির্মাণ করেন ভিসেন্স্ রাজপ্রাসাদে। এই মঞ্চের একটি নক্সা পাওয়া গেছে এবং মঞ্চটিকে রেনেসাঁ মঞ্চের গোড়াপত্তন বলা যায়। এটি অস্থায়ী মঞ্চ ছিল যারজন্য এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই রঙ্গালয়ের দর্শকগৃহের আসনগুলি অর্ধবৃত্তাকারে সজ্জিত ছিল। সারিগুলি ছিল সংখ্যায় অনেক। প্রথম সারির মধ্যের আসন রাজার জন্য নির্দিষ্ট। রাজার ডাইনে ও বাঁয়ে রাজঅতিথি বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ। রাজ আসনের পেছনে ছিল উপরের সারিতে যাবার সিঁড়ি। এই সারির সর্বশেষের উচ্চতা ছিল পাঁচ মিটার।

মঞ্চের অবস্থান দুটি অংশে বিভক্ত। প্রসেনিয়ম ও দৃশ্যবেদী। তৎকালীন প্রসেনিয়ম শব্দটি ব্যবহার করা হতো অভিনয়-বেদীকে বোঝাতে। অর্থাৎ যে স্থানটি অভিনেতারা অভিনয়ের জন্য ব্যবহার করতেন। এই স্থানে দৃশ্যের অংশের কিছু থাকত না। পরিমাপের দিক দিয়ে দর্শকগৃহ ও অভিনয়বেদীর পরিমাণ সমান ছিল। দর্শকগৃহ হতে অভিনয়বেদীর উচ্চতা ১'৭০ মিটার। মঞ্চের অভিনয়বেদী ও দৃশ্যবেদীর গঠনগত পার্থক্য ছিল। অভিনয়বেদী ছিল সমান, দৃশ্যবেদী ছিল ঢালু। এই ঢালুর বৈশিষ্ট্য ছিল যে, এর সামনের দিকে নিচু এবং পেছনের দিক ছিল উঁচু। সারলিওর রীতি অনুসারে এই ঢালুর মাপ ছিল, পেছন থেকে সামনের দিকে আসতে প্রত্যেক

মিটারে আট থেকে দশ মিলিমিটার নিচু হবে। এর তাৎপর্য ছিল যে, পারস্পেকটিভ দৃশ্যসজ্জাকে সহায়তা করা। এরজন্য মঞ্চে একটি কথা প্রচলিত ছিল,—আপস্টেজ ও ডাউনস্টেজ। দৃশ্যবেদীতে অভিনয়ের প্রশ্ন না থাকায় এর গঠনরীতি অস্থায়ী ও দুর্বল ছিল। প্রয়োজনমতো এই কাঠামোকে খুলে রাখা যেত। যেহেতু কাঠের তৈরি, তাই স্থানান্তরিত করতে কোনও অসুবিধা হতো না। অভিনয়বেদী থেকে সামনের দিকে দৃশ্যবেদীর উচ্চতা ছিল এক ধাপ সিঁড়ি। আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে এক ধাপ সিঁড়ির উচ্চতার মাপ হওয়া উচিত ছয় বা নয় ইঁঞ্চ। অর্থাৎ প্রায় পনেরো বা তেইশ সেন্টিমিটার। প্রশ্ন উঠতে পারে, অভিনেতারা কোথা দিয়ে যাওয়া-আসা করত? উত্তরে বলা যায় যে, অভিনয়বেদী ও দৃশ্যবেদীর মধ্যের স্থান দিয়ে এবং মঞ্চের ডান ও বাঁদিক থেকে।

সারলিও তৎকালীন মঞ্চসজ্জাকে তিন ভাগে ভাগ করে গেছেন—কমেডি, ট্রাজেডি ও স্যাটায়ার। কমেডি ও ট্রাজেডির দৃশ্যসজ্জার কোনও স্পষ্ট ইঙ্গিত করেননি। শুধু বলেছেন যে কমেডিতে যে সব চরিত্রের সমাবেশ হতো, তাঁরা ছিলেন, বঞ্চিত মানুষ, বুর্জোয়া ও বণিক। ট্রাজেডি সম্পর্কে বলেছেন যে এখানকার পাত্রপাত্রী—রাজা, ডিউক ও প্রজা ইত্যাদি।

ট্রাজেডি এবং কমেডির দৃশ্যসজ্জা যে কী হবে তা তিনি বিশদ বিশ্লেষণ করে যাননি। তবে যদি তাঁর মঞ্চসজ্জা নিয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা করা যায় তবে অনুমান হয় যে তিনি যে বৃহৎ অট্টালিকার বহিরাংশের দুটি দৃশ্য অভিনয়বেদীর প্রায় সংলগ্ন দৃশ্যবেদীর উপর দুদিকে রাখতেন—সেটি হচ্ছে ট্রাজেডির জন্য। কমেডির জন্যে ছিল রাজপথ, অট্টালিকার দ্বারা বেষ্টিত। অবশ্য এ অনুমান যে মিথ্যা নয়, তা বোঝা যায় যখন দেখি তার মন্তব্যশিল্পে অনুপ্রাণিত হয়ে সাবাতিনি দৃশ্য নির্মাণ করেন। সাবাতিনি নিজেও স্বীকার করে গেছেন সারলিওর এই মঞ্চরীতির কথা।

মঞ্চসজ্জার পারস্পেকটিভ সম্বন্ধে বলেছেন যে প্রথম অট্টালিকার যে উচ্চতা তা থেকে দশগুণ ছোট হবে সর্বশেষ অট্টালিকার উচ্চতা। ফলে সর্বশেষ গৃহটি একটি মানুষের উচ্চতা থেকে অনেক ছোট হতো। তাই মঞ্চের পেছন দিক থেকে কোনও অভিনেতার প্রবেশ-প্রস্থানের উপায় ছিল না।

মঞ্চের উভয় দিকে যে গৃহ নির্মাণ করা হতো তার পরিকল্পনা ছিল ইংরাজি সোজা এবং উল্টো 'এল'-এর মতন,—অর্থাৎ বাংলা মঞ্চে যাকে এল-ফ্লাট বলা হয়। এই 'এল'-ফ্লাট প্রথমে কাঠের তৈরি করে স্থায়ীভাবে মঞ্চে লাগান হতো; তারপর কাপড় বা ক্যানভাস লাগিয়ে তার উপর পেন্ট করা হতো। এই সব এল-ফ্লাটের পেছনে মোমবাতি লাগিয়ে আলোর ব্যবস্থা করা যেত। সারলিও স্যাটায়ার মঞ্চসজ্জা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে এই সব মঞ্চে থাকবে গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, লতাগুল্ম, ঝর্ণা ও নদী ইত্যাদি। এগুলি অবশ্যই অঙ্কিতাকারে হবে।

সারলিও মঞ্চে আলোকসম্পাত সম্বন্ধে বলেছেন যে, মঞ্চে যদি কোনও রঙ পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় তবে তিনি আলোর সম্মুখে সেই রঙের ফিলটার দাঁড় করিয়ে দেন। মেঘ

গর্জনের জন্য বিশেষ ধরনের যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। বিদ্যুৎ ও আগুন দেখাতেও কার্পণ্য করেননি। সেই ১৫৪০ সালে তিনি যা করে গেছেন আমরা প্রায় সেইগুলিই অন্য কায়দায় আজও করে চলেছি।

সারলিওর পর আর একটি নাম আমাদের স্মরণের দরজায় ধাক্কা মারতে থাকে,—সে নামটি পালাডিও [Palladio], সে যুগের মঞ্চ নিয়ে যে কেউ আলোচনা করতে চান, তাঁকে এই নামটি স্মরণ করতেই হবে। পালাডিওর সময়কাল ১৫১৮-১৫৮০। ১৫৮০তে ভিসেন্স [Vicence]-এর অলিম্পিক অকাদেমি প্রকাশ করলেন এই নামটি। তাঁর যুগ সৃষ্টিকারী মঞ্চটি আজও বিদ্যমান। এ মঞ্চের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য আজও দুনিয়ার মঞ্চ শিল্পীদের আন্দোলিত করে। হতবাক হয়ে সকলে চেয়ে থাকে এর পরিকল্পনা ও সুকুমার কারুকার্যের দিকে। এ মঞ্চ, মঞ্চজগতের জয়স্তম্ভ ও গর্ব। যুগের চাহিদার সঙ্গে তাল রাখতে হয়ত আজকের থিয়েটারের ভিতর-বাহিরের রূপকে সরলীকরণ করতে হয়েছে। কিন্তু ওই সময়ের পূর্তশিল্পী পারদর্শীদের কথা চিন্তা করলে বেশ পুলকিত হতে হয়। তাঁদের শিল্পরুচি কত সূক্ষ্ম, কত সুন্দর, কত পরিচ্ছন্ন। পালাডিও অবশ্য নিজেকে ভিট্রুভ-এর [Vitruve] ছাত্র হিসাবে পরিচয় দিয়ে গেছেন। এই মঞ্চটির নাম—তিয়াত্রো অলিম্পিকো [Teatro Olimpico]।

মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ দুই এখানে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রেক্ষাগৃহটি সুকুমার কারুকার্যময়। এই শিল্পমন্দিরের শৈল্পিক রূপ তাৎক্ষণিক দর্শকমনকে পরিব্যাপ্ত করে। তাঁরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে শুধু সেই দিকে তাকিয়ে থাকেন এবং নিজেদের মধ্যে গুঞ্জন করেন। প্রেক্ষাগৃহের বসবার আসন চোদ্দটি সারিতে বিভক্ত। সর্বশেষ সারিকে বেষ্টন করে আছে ছত্রিশটি স্তম্ভ। প্রত্যেকটি স্তম্ভের চারিত্রিক গঠন একই প্রকার ; সূক্ষ্ম কারুকার্যে আবৃত। এই স্তম্ভশ্রেণীর মধ্যভাগের দশটি স্তম্ভের পেছনেও বসবার ব্যবস্থা বিদ্যমান। দর্শকদের প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশপথ উভয় দিকে আছে। এই চোদ্দটি সারি ছাড়াও একদম সামনে আরও একটি সারি সাজান হতো। এই সারির মধ্যমণি ছিলেন রাজা বাকি চেয়ার রাজার পার্শ্বচরদের।

এটি একটি অভিনব মঞ্চ। ইতিপূর্বে এই ধরনের মঞ্চের কোনও পরিচয় পাওয়া যায়নি। এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এত মর্মস্পর্শী, এত আনন্দদায়ক, যা অননুকরণীয়! চেষ্টা করেও একে ভোলা যায় না! প্রথমেই চোখে পড়বে অভিনয় মঞ্চ। মঞ্চের উভয় দিকে প্রবেশ-প্রস্থানের পথ। এই অভিনয়বেদীটি প্রসেনিয়ম বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ। অভিনয়বেদী যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে শুরু হয়েছে দৃশ্যমঞ্চ। দৃশ্যমঞ্চের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর প্রথমেই তিনটি পথ। ডানদিকের পথ কোনাকুনিভাবে মঞ্চ-গভীরে ডানদিকে গিয়েছে, এবং বাঁদিকের পথও ঠিক ওইভাবে বাঁদিকে মঞ্চ-গভীরে মিলিয়ে গেছে। এ ভিন্ন মঞ্চের মধ্যস্থলে একটি সুবৃহৎ পথ আছে। এই পথটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থাৎ মধ্যের পথটি অভিনয়বেদী হতে আরম্ভ হবার পর প্রায় দুই মিটার মঞ্চগভীরে গিয়ে আবার তিন ভাগে ভাগ হয়েছে,—ডাইনে, মধ্যে ও বাঁয়ে। প্রত্যেকটি পথ পারস্পেকটিভ

তিয়াত্রো অলিম্পিকো (এলিভেশন)

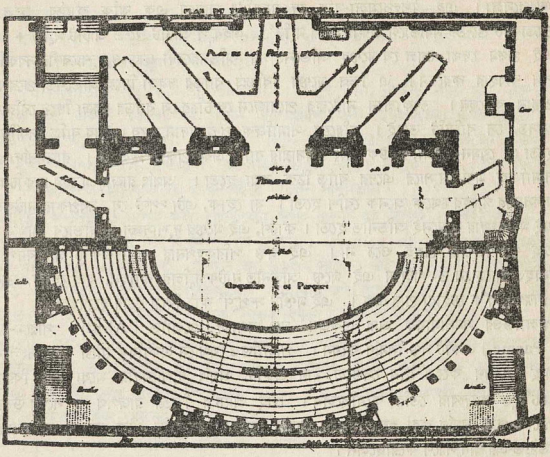

তিয়াত্রো অলিম্পিকো (গ্রাউণ্ড প্ল্যান)

রীতি অনুসারে মঞ্চ-গভীরের দিকে এগিয়ে গেছে। প্রত্যেকটি রাস্তার বৈশিষ্ট্য এই যে, এর দুধারের গৃহগুলি নির্মিত হয়েছে তৎকালীন রাজপ্রাসাদ এবং সম্ভ্রান্তব্যক্তিদের গৃহের অনুকরণে। গৃহ নির্মাণের রীতি ছিল মঞ্চ পায়স্পেকটিভকে অনুসরণ করা। এই মঞ্চের গঠনপ্রকৃতি ছিল ডাইমেনশনাল, অর্থাৎ বাস্তব গৃহের পুরোপুরি রূপ। দর্শক-গৃহ হতে এই দৃশ্যকে মনে হয় যেন কোনও বৃহৎ নগরীর রাজপথ, দুই পার্শ্বে সুবৃহৎ অট্টালিকা। এইবার দর্শকগৃহ হতে সর্বপ্রথম যে অংশ চোখ জুড়িয়ে দেয় অর্থাৎ যে দেওয়াল বা বলা যায় মঞ্চনগরের প্রবেশদ্বার, সেই দেওয়াল হতে মঞ্চভিতরে তিনটি প্রধান পথের সূচনা। মধ্যের পথটি বৃহৎ এবং উপরে আর্চ আছে ; কিন্তু বাকি দুইদিকের প্রধান প্রবেশদ্বারের কোনও আর্চ নেই, আকারেও ছোট। পালাডিও বোধ হয় তাঁর শিল্পরুচির ও চিন্তার যা কিছু তাঁর সবদিকের কিছু কিছু প্রমাণ ও নিদর্শন এই মঞ্চ নির্মাণে রেখে গেছেন। এই দেওয়ালে উপরনিচু নিয়ে মোট দশটি কুলুঙ্গি, উপরের সারিতে ছয়টি এবং নিচের সারিতে চারটি। প্রত্যেক কুলুঙ্গিতে একটি করে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মূর্তি স্থাপন করেন। এ ভিন্ন দেওয়ালে সর্বোপরি খোদিত আছে বিভিন্ন রসের কোনও এক বিশেষ মুহূর্তের অভিব্যক্তি। কার্নিশে নানা প্রকার সুকুমার কারুকার্য—সে এক

শিল্পমেলা। এই শিল্পমেলা-যুক্ত দেওয়ালটির সামনে এক ঝাঁক কাঠের স্তম্ভ। প্রত্যেকটি স্তম্ভের মধ্যভাগে একটি করে মূর্তি। এইরূপ আটটি স্তম্ভে আটটি মূর্তি। এই প্রথম দেখা গেল যে মঞ্চের অভিনেতাগণ অভিনয়বেদী ছাড়াও দৃশ্যবেদীর সবকটি পথ ব্যবহার করছেন। এ ভিন্ন মঞ্চের বিভিন্ন বাড়ির দরজা দিয়ে অভিনেতা প্রবেশ-প্রস্থান করছেন। তৎকালীন নাটকের প্রয়োজনে যে চরিত্র যে বাড়ির দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসত, সে বাড়িটি তারই। চরিত্রের সামাজিক পদমর্যাদানুসারে এইসব বাড়ি নির্বাচিত হতো। যেমন—রাজা, ডিউক এবং ব্যবসায়ীর বাড়ি এক প্রকার ছিল না। রাজমর্যাদা ও সামাজিক মর্যাদানুসারে এদের বাড়ি ঠিক করা হতো। অর্থাৎ রাজার গৃহের চাকচিক্য ব্যবসায়ীর গৃহের থেকে অনেক বেশি হতো। যা হোক, এটা স্পষ্ট যে, সবপ্রকার নাটকই এই মঞ্চসজ্জার সামনেই অভিনীত হতো। কারণ, এই মঞ্চের দৃশ্যসজ্জা স্থায়ীভাবে নির্মিত। তাই পরিবর্তনের প্রশ্নই ওঠে না। এই মঞ্চ পরিকল্পনার মধ্যে একটি গূঢ় ব্যাপার নিহিত আছে যে তৎকালীন এই মঞ্চে অভিনীত নাটকগুলির কাহিনী যাই হোক, তার পারিপার্শ্বিক চেহারা প্রায় এক। এই মঞ্চটি সম্পূর্ণ কাঠ দিয়ে তৈরি হয়েছিল।

পালাডিওর সমসাময়িক আর একজন মঞ্চ-বিশারদ এলোতি [Alotti] পারমে-তে [Parme] একটি মঞ্চ নির্মাণ করেন। পালাডিও যেখানে একাধিক রাস্তা ও তৎসংলগ্ন গৃহ নির্মাণ করেন, ইনি সেস্থলে মাত্র একটি, অর্থাৎ দৃশ্যবেদীর মধ্যে এক বিরাট আর্চযুক্ত রাজদ্বার তৈরি করেছিলেন। সেই আর্চের ভিতর রাজপথ ও পথের উভয় পার্শ্বে গৃহ নির্মাণ করা হয়। এসব কাঠের তৈরি। এলোতি গ্রীক-রোমান আর্কিটেক্ট ভিট্রুভ-এর অনুসরণে করেছিলেন।

এই সময় আর একজন মঞ্চকুশলী, নাম সিয়ারামণ্টি ১৬১৪ সালে *Delle Scene e theatri* নামে একটি বই লেখেন। ছাপানো হয় ১৬৭৫ সালে। এই বইতে তিনি মঞ্চ সজ্জার যে নির্দেশ দেন তাতে বোঝা যায় যে, মঞ্চের উভয় দিকে পারস্পেকটিভ রীতি মেনে দৃশ্যসজ্জা করা বাঞ্ছনীয়। ইনিই প্রথম নির্দেশ দেন যে, মঞ্চের শেষের দিকে অঙ্কিত পর্দা প্রয়োজনে তৈরি হবে এবং তা একাধিক হতে পারে ও দৃশ্যানুসারে তা পরিবর্তিত হবে। এই অঙ্কিত পর্দার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নাট্যদুনিয়া খুঁজে পেল আর এক নতুন পথের সন্ধান। এ যেন আবদ্ধতা ভেঙে গতির বিচরণ শুরু!

সৃষ্টির নেশা চারিদিকে। এ নেশায় মেতেছে সকলে। এ যেন সৃষ্টির নেশার প্রতিযোগিতা। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের বুক থেকে আলোর বর্তিকাকে ছিনিয়ে এনে প্রজ্জ্বলিত করা। চতুর্দিকে মুক্তির জয়গান। কত কুসুম, কত রতন, কত সুকুমার হাত আজ মঞ্চকে নবরূপে সাজাচ্ছে। মঞ্চ উদার দৃষ্টিতে সকলকে জানিয়েছে স্বাগত। কাউকে কখনও বাধা দেয়নি। কিন্তু আশ্চর্য! নানা রূপে নানাভাবে সেজেও তার রূপচর্চার আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। তাই প্রতীক্ষা করতে লাগল তার মনের মানুষের জন্য, তার প্রিয়জনের জন্য। শেষে একদিন আধো আলো, আধো অন্ধকারে মঞ্চাকাশে দেখা গেল এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক,—তার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত

হল সমস্ত আকাশ। এলেন সাবাতিনি, নতুন অকৃপণ কল্পনা নিয়ে এবং বৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতি নিয়ে। তিনি এসে নতুন কল্পনা ও আধুনিক কর্মপদ্ধতির দ্বারা মঞ্চকে নতুন রূপ দিলেন এবং নতুনভাবে সাজালেন।

নিকোলা সাবাতিনি [Nicola Sabbattini]। সাবাতিনি, একটি নাম নয়, একটি দেশের নয়, একটি কালের নয়, তিনি এক আদর্শ, এক মহান সূচনা, এক আধুনিক বিজ্ঞান, এক যুক্তিপূর্ণ চিন্তা, জয়গান। তিনি স্থবির মঞ্চকে করে তুললেন চঞ্চল, বহুমুখী, পরিবর্তনশীল, গতিময়। অচলায়তনের বন্ধ দুয়ার উন্মুক্ত করে উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিমের আলো-বাতাসের প্লাবন বইয়ে দিলেন সাবাতিনি।

সাবাতিনি মঞ্চসজ্জা ও মঞ্চের কলা-কৌশলের উপর একটি বই লেখেন। বইটির নাম—"প্রাতিকা দি ফেব্রিকার সিন এ মেশিন নে তিয়েত্রি [*Pratica di fabricar scene e machine ne' teatri*]।" মুদ্রিত হয় ১৬৩৭ সালে। এই বইতে তিনি মঞ্চের রীতি নীতি ও যান্ত্রিক কৌশল সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান কথা বলে গেছেন। দ্বিতীয়ত এই বইতে তৎকালীন মঞ্চ গঠনরীতি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন তিনি।

মঞ্চবেদী গঠনে তিনি সারলিও-কে অনুসরণ করেছেন। তবে সারলিও মঞ্চস্তরকে দুভাগে ভাগ করেছিলেন, সাবাতিনি তা করেননি। তিনি মঞ্চের স্তর একই রেখে পেছন দিক উঁচু রেখে সামনের দিকে ক্রমশ ঢালু করে এনেছেন। অর্থাৎ মঞ্চের পেছন দিক আপস্টেজ এবং সামনের দিক ডাউনস্টেজ।

দর্শকগৃহ সম্পর্কেও তিনি সারলিওকে অনুসরণ করেন। প্রথমে রাজা বা প্রিন্স-এর আসন দর্শকগৃহের প্রথম সারির মধ্যস্থলে স্থাপিত করে পরে অন্যান্যদের আসনশ্রেণী নির্দিষ্ট করেন।

দৃশ্য পরিকল্পনার রীতি হিসাবে বলেছেন যে মঞ্চের সম্মুখ হতে পরপর তিনটি গৃহ পারস্পেকটিভ রীতি অনুসারে নির্মিত হবে এবং সর্বশেষে একটি পর্দায় আঁকা থাকবে বৃহৎ রাজকীয় আর্চ [Gateway]। উভয় দিকে তিনটি বাড়ির কাঠামো আলাদা আলাদা তৈরি হবে এবং প্রত্যেক দিকের বাড়িগুলির মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে যাতে অভিনেতা যাতায়াত করতে পারে। দৃশ্যটি যখন পূর্ণরূপ নেবে তখন যেন মনে হয় কোনও নগরীর সুবৃহৎ রাজপথ।

দৃশ্য নির্মাণ সম্বন্ধে বলেছেন যে, প্রথমে বাড়িগুলির কাঠামো মঞ্চবেদীতে তৈরি হবে তারপর তাতে কাপড় বা ক্যানভাস লাগিয়ে অঙ্কিত করতে হবে। দরজা-জানালা দর্শকগৃহের দিকে থাকলে তাকে আসল দরজা-জানালার বাস্তব রূপ দিতে হবে।

'সিয়েল' [ciels] অর্থাৎ আমরা যাকে 'স্কাই' বলি। এই স্কাইগুলি মঞ্চে নির্মিত প্রত্যেক গৃহের উপর ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। এদের গঠন প্রকৃতি আর্চের মতো।

এগুলিকে উপর থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে দড়ি ও কপির সাহায্যে। প্রথম ও দ্বিতীয় স্কাইয়ের মধ্যবর্তী স্থানের মধ্য দিয়ে মেঘ নামিয়ে দেওয়া হতো। সাবাতিনি এই

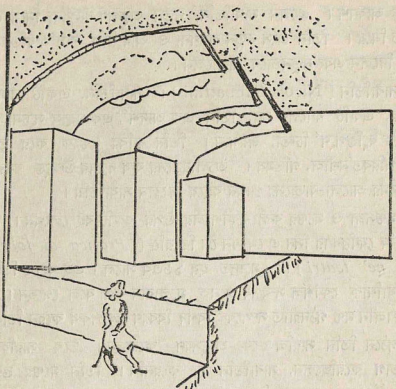

[ছবিতে দেখা যাচ্ছে তিনটি বক্স-সেটের উপর তিনটি আর্চের মতো স্কাই ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং উভয় স্কাই-এর মধ্যে মেঘের কাট-আউট ঝুলছে। স্কাই-এর উপরে পর্দায় তুষারপাতের দৃশ্য আঁকা হয়েছে।]

স্কাইয়ের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, মঞ্চের গৃহগুলি যে আকাশের নিচে বিরাজ করছে, এ তারই রূপক প্রকাশ।

সাবার্তিনির সময় থেকে প্রসেনিয়ম ফ্রেম একটি স্পষ্ট ও স্থায়ী রূপ গ্রহণ করে। সাবার্তিনির পূর্বে এই প্রসেনিয়মকে মঞ্চসজ্জাকরগণ কাঠামোকে পরিবর্তন করে নতুন দৃশ্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নতুনভাবে তৈরি করে নিতেন এবং নতুন রঙে অঙ্কিত করতেন।

সাবার্তিনি বিভিন্ন প্রকার দৃশ্যের উল্লেখ করে গেছেন এবং এই সকল দৃশ্যের অবস্থান কোথায় কী প্রকার হবে তার নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে গেছেন। পূর্বে যে সব দৃশ্যের চরিত্র ও গঠনপ্রকৃতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার ক্রমপরিবর্তন শুরু: অর্থাৎ স্থায়ী দৃশ্যের পরিবর্তে অস্থায়ী দৃশ্যের অবতারণা, যাকে প্রয়োজন মতো স্থানান্তরিত করা সম্ভব। এই প্রথম দেখা গেল দৃশ্য পরিবর্তনের তাগিদ। এই তাগিদ মঞ্চদুনিয়ার সামগ্রিক চিন্তায় বিস্ফোরকের মতো কাজ করল। নাট্যকার, পরিচালক, শিল্পনির্দেশক ও দর্শক সকলেই পুলকিত। ব্যাপারটি কী করে হবে—এই চিন্তায় মশগুল। শুরু হল গবেষণা, আলোচনা, বাকযুদ্ধ, তুমুল আলোড়ন!—তবুও সমস্যার সমাধান নেই। সকলের দৃষ্টি তীরমুখী ওই সাবার্তিনির দিকে! কী হয়, কী করেন! শেষে সকলের চিন্তা ও গবেষণার অবসান ঘটিয়ে তিনি মঞ্চদৃশ্যের পরিবর্তন করলেন। দর্শকদের

বিস্ময়ের আবেশ জড়ানো চোখের সে কী চাহনি !—যেন চোখে দেখেও বিশ্বাস করা যায় না ! শুধু উল্লাস-উচ্ছ্বাস আর পুনঃপুনঃ হাততালি···।

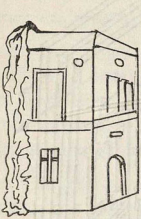

প্রথম অবস্থা।

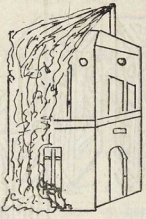

দ্বিতীয় অবস্থা।

তৃতীয় অবস্থায় পর্দা বক্স সেটকে ঢেকে দিয়েছে।

অর্থাৎ নাটকে আছে প্রথম দৃশ্যে একটি নগরপথ, যার উভয় দিকে তিনটি করে গৃহ। দ্বিতীয় দৃশ্য,—একটি বন। তিনি এক অদ্ভুত কৌশলে সমাধান করলেন পটপরিবর্তনের কাজ। একটি লাঠির মাথায় এই বন-অঙ্কিত পর্দার একদিক বাঁধা থাকত এবং অপর দিক বাঁধা থাকত এই এলফ্লাটব্বয়ের প্রথম ফ্লাটে। এখন সময়মতো ওই লাঠিকে ঘুরিয়ে সমস্ত পর্দাকে বিছিয়ে দেওয়া হতো পুরো কাঠামোর উপর। পুনরায় প্রয়োজনে ওই লাঠির সাহায্যেই সরিয়ে ফেলা হতো পর্দাকে। পারস্পেকটিভ রীতিতে বাড়িগুলি যে হেতু সাজানো, সেই হেতু অপসারিত পর্দা দর্শকের দৃষ্টিকোণ থেকে দূরে থাকত।

মানুষ যখন নতুনের নেশায় মেতে ওঠে, তখন তার ব্যাপ্তি ও বিকাশের শেষ থাকে না। চঞ্চল মনে সদাই খুঁজতে থাকে আরও—আরও কিছু। এই অনুসন্ধান যেন সীমাহীন অনন্ত, কিছু পেলেও থামতে চায় না,—চাই—আরও চাই। সাবাতিনির এই চাইবার ও পাবার শেষ নেই। নিত্যনতুন দৃশ্য-পরিকল্পনার চিন্তায় তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি গ্রীক-রোমান আর্কিটেক্ট ভিট্রুভ-এর পেরিঅ্যাক্ট [Periacte] বা প্রিজম-ট্রায়াঙ্গুলার মঞ্চসজ্জার প্রচলন করেন। এ এক নবতর মঞ্চরূপ। এর বিকাশ ও প্রসার ততো না হলেও এর মধ্যে এক মজার ব্যাপার বিদ্যমান। আজকে একে নবপরিকল্পনার মধ্য দিয়ে ফিরিয়ে আনলে অতিরিক্ত দৃশ্যের অবতারণার ক্ষেত্রে অনেক সরলীকরণ করে নাটক উপস্থাপনা করা সম্ভব। সে ক্ষেত্রে যদি এই পেরিঅ্যাক্ট এর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তাতে দৃশ্যসম্ভার হয়ত আরও গুরুত্ব পেতে পারে।

ব্যাপারটা ছবিতে স্পষ্ট। দুটি করে পেরিঅ্যাক্ট মঞ্চের উভয় দিকে বসানো হতো। প্রয়োজন মতো দর্শকের সামনেই বা অগোচরে এগুলিকে ঘুরিয়ে দৃশ্য পরিবর্তনের কাজ সমাপন করা হতো। এই পেরিঅ্যাক্টের তিন দিকে তিন প্রকার দৃশ্য অঙ্কিত থাকত।

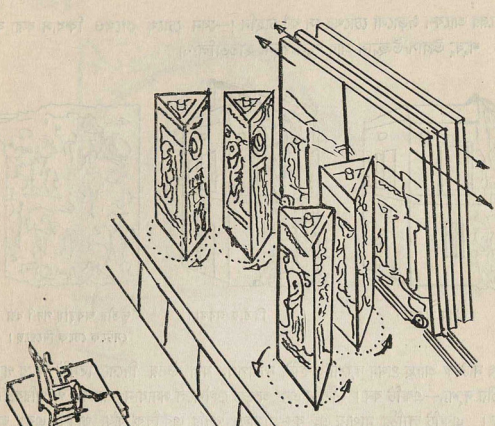

পেরিঅ্যাক্ট

প্রত্যেকটি পেরিঅ্যাক্ট একটি পিভটের উপর লাগানো হয়, যাতে অতি সহজে একে ঘোরানো যায়। পেরিঅ্যাক্টগুলির পেছনে থাকত টানা-সিন ['টানা-সিন' নাম দেবার কারণ, একে দুই দিক থেকে টেনে আনা হতো]। এইরূপ প্রত্যেকটি টানা-সিন দুই অংশে বিভক্ত ছিল একে সহজভাবে ব্যবহার করবার জন্য মঞ্চে কাঠের লাইন বসানো হতো এবং এইসব সিনের ফ্রেমে কাঠের চাকা লাগানো থাকত। যাতে উভয় দিক থেকে ঠেলে সিনকে অনায়াসে মিলিয়ে দেওয়া যায়। যেহেতু পেরিঅ্যাক্টের তিনটি দিক ছিল, তাই টানা-সিনের সংখ্যাও তিন ছিল। পেরিঅ্যাক্টের প্রত্যেক দিকের দৃশ্যের সঙ্গে মিলিয়ে পারস্পেকটিভ রীতি অনুযায়ী ঠেলা-সিনেও দৃশ্য অঙ্কিত হতো। যার ফলে দৃশ্যের পৃথক পৃথক চরিত্র পরিস্ফুটিত হতো।

সাবাতিনি শুধু মঞ্চ বিশারদ ছিলেন না, মঞ্চে নানা প্রকার কলাকৌশলও প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এইসব কলাকৌশল বর্তমানে দেখিয়েও বেশ বাহবা পাওয়া যায়। এরমধ্যে হঠাৎ বাড়ির কিছু অংশ ভেঙে পড়া অর্থাৎ বেশ বোঝা যাচ্ছে তিনি ফ্রেমে কব্জা ব্যবহার করতেন, ভ্যানিশিং ট্র্যাপ্ তৈরি করে অকস্মাৎ আবির্ভাব বা পলায়ন। আকাশ পথে

দেবদেবীর আগমন, পরীর দল উড়ে চলেছে, কখন আবার নদী বয়ে চলেছে কলকল রবে, বর্ষায় সে কী মেঘ গর্জন, ক্যাস্‌কেড থেকে জলের ধারা ঝরে পড়ছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে বাঁকা চোখে ইত্যাদি !

আগুনের খেলা দেখাতে সাবাতিনি যে কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন তা ভাবলে আজও শিহরণ ও বিস্ময় হয়। যে বাড়িতে বা যেখানে আগুন দেখাবার দরকার, সেই অংশে কাপড় লাগিয়ে প্রয়োজনীয় রঙের কাজ করা হতো। এরই আশেপাশের অংশ জলে ভিজিয়ে দেওয়ার পর আগুনের অংশ স্পিরিটে ভিজিয়ে রাখা হতো। পরে সময়মতো সেখানে আগুন লাগিয়ে দিয়ে হাততালি ও বাহবা দুই-ই মিলত।

আলোক সম্পাতের ক্ষেত্রেও সাবাতিনির অবদান অকল্পনীয়। অভিনেতা অভিনয় করে চলেছেন। প্রথম দৃশ্য শেষ হবার পর দ্বিতীয় দৃশ্য এল। দ্বিতীয় দৃশ্যে আছে, ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ বনভূমি, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, চারিদিকে ঝড়ের তাণ্ডব, দেখতে দেখতে দর্শকদের হাততালি, চারিদিকে বাহবা-বাহবা রব ! হারিয়ে গেল নাটক, হারিয়ে গেল অভিনেতা, শুধু প্রশ্ন, কী করে হল ? কেমন করে হল ? নাটকের ট্রাজেডি গেল ঘুচে, মহান হলেন সাবাতিনি, যিনি এগুলি সৃষ্টি করলেন। এখন দেখা যাক কী করে এইসব করলেন।

নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে সাবাতিনি মঞ্চে যে সব গৃহ তৈরি করেছিলেন সেগুলির গঠন প্রকৃতি ছিল—এলফ্লাট। সেই এলফ্লাটের উপর কীভাবে বন-অঙ্কিত পর্দা ছাঁড়িয়ে দিয়ে বনের দৃশ্য তৈরি করেছিলেন। এই এলফ্লাটের যে দিকটি মঞ্চগভীরে এগিয়ে গেছে, সেই ফ্লাটের পেছনে তৈরি করেছিলেন নোমের এবং তেলের বাতির সারি, যার পরবর্তী নাম হয়েছিল স্ট্রিপলাইট। এই আলোর সারি ফ্লাটের গায়ে দাঁড় করানো থাকত। প্রত্যেক গৃহের ফ্লাটের শেষে এইরূপ আলোর সারি তৈরি করা হতো। এ ভিন্ন মঞ্চসম্মুখে এবং প্রসেনিয়মের উভয় দিকে এই সব বাতির সারি সাজানো থাকত। এই সব আলো ছাড়াও মঞ্চের বিভিন্ন স্থানে পৃথক পৃথক আলোর ব্যবস্থা ছিল। আলো-আঁধার নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনি একপ্রকার ওপেক-ঢাকনা নির্মাণ করেন, যার দ্বারা তিনি আলোকে বেশি কম করতে পারতেন। এ ছাড়া সম্পূর্ণ অন্ধকার করবারও উপায় ছিল। ল্যাম্পশেড-এর দ্বারা তিনি আলোকে কেন্দ্রীভূত করতেন বা আলো ঢেকে দিতেন। রিফ্লেক্টর ব্যবহারের কথাও তিনি উল্লেখ করে গেছেন। লোহার পাতকে পিটিয়ে পাতলা করে তার একদিক কেমিকেল বা গ্যালভানাইজ করে রিফ্লেক্টর তৈরি করতেন যাতে সেই দিক উজ্জ্বল ঝকঝক করে ও তার সাহায্যে আলো প্রতিফলিত হয়। যখন বিদ্যুৎ দেখাবার দরকার হতো, তখন সমস্ত আলোকে ঢেকে দিয়ে এক সারি রিফ্লেক্টর যুক্ত আলো হঠাৎ খুলেই বন্ধ করে দিতেন। ফলে এক ঝলক আলো হঠাৎ চমকেই আবার মিলিয়ে যেত, যা সহজেই বিদ্যুৎ বলে মনে হতো। সোর্স অব লাইট বলতে আজ যা করা হয় তা কিন্তু সাবাতিনির দান।

সর্বশেষে বলা যায়, বিশ্বমঞ্চে উড়ুক উদ্ধত জয়পতাকা আর তাতে লেখা থাক : নিকোলা সাবাতিনি।

গণশিল্প

শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরন্তন, সহজাত। সাংস্কৃতিক মানুষের কোনও জাত নেই, নেই ধর্ম বা দেশকাল। যুগে যুগে মানুষ শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। শিল্পকে আয়ত্ত করতে, আত্মস্থ করতে সে ছুটে বেড়িয়েছে দেশ দেশান্তরে। এ প্রচেষ্টার, এ আকাঙ্ক্ষার বিরাম নেই—সে অবিরাম গতিশীল। হয়ত শিল্প সংস্কৃতিকে আঁকাবাঁকা পথে চলতে হয়েছে, আবার কখনও হয়ত আবদ্ধতার জালে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। তবুও নানান রঙে, নানান ঢঙে নিয়ত তার প্রকাশ হয়েছে ; কখনও স্থবির হয়ে পড়েনি, তার অগ্রগতি ও সচলতা ব্যাহত হয়নি। ফলে ফুলে সে সতত বিকশিত, আদান-প্রদানে অকৃপণ। তাই তো মিশর, চীন, ভারত, গ্রীক, রোম, ইতালি ফ্রান্স, জার্মানির শিল্প-সংস্কৃতি মিলেমিশে একাকার ও একাত্ম হয়ে বিশ্বে বিচরণ করছে। এই যাত্রা অন্তহীন ; যতদিন বিশ্বের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন এর গতিশীলতা আরও ব্যাপক ও আরও ঘনিষ্ঠতম হবে।

আরণ্যজীবনেও মানুষ শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট ছিল। রাতে সমবেত হয়ে নাচ-গানের মধ্যে তাদের সাংস্কৃতিক মনের পিপাসা মেটাত। সেখানে কোনও ভেদ ছিল না, ছিল না কোনও ঈর্ষা-বিদ্বেষ। মুক্ত মনের বিকাশ ঘটত সেখানে। তখন শিল্প দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল না। শিল্পের পরিবর্তন যেটা হয় তা আঙ্গিকের এবং বিষয়বস্তুর কিন্তু মনের চাহিদার আকর্ষণ, শিল্পের প্রতি ভালবাসা এবং শ্রদ্ধার মধ্যে কোনও চিড় ধরেনি,—সে সমভাবেই প্রবাহিত। সেইটেই চিরন্তন।

তারপর একদিন আগ্রাসী আক্রমণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সেই আরণ্যক জীবন, বিভক্ত হয়ে গেল তার সামগ্রিক রূপ। সামাজিক অবস্থার গুণগত পরিবর্তন হল। সাম্যের মধ্যে অসাম্য অনুপ্রবেশ করল। ছিনিয়ে নিল তাদের জীবন থেকে সহজ আনন্দমুখর দিন-গুলি। শিল্প-সংস্কৃতি সামাজিক ও লৌকিক আসর ছেড়ে স্থান পেল রাজদ্বারে। সহজ স্বাভাবিক শিল্প-সংস্কৃতি সাময়িকভাবে গণআসর ছেড়ে স্থান পেল রাজপ্রাসাদে। রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় যে শিল্প জন্মলাভ করল, তা শুধু রাজানুগ্রহ, রাজসন্তুষ্টির জন্য রাজাকে কেন্দ্র করে প্রসার লাভ করল। ফলে শিল্পসত্তা পরিবর্তিত হল রাজকীয় অহঙ্কারে ও অলঙ্কারে। সেই সঙ্গে রাজনিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র ও ধর্ম-প্রতিনিধি বোঝা রূপে শিল্পের ঘাড়ে চাপল। শিল্পের নান্দনিক দিক বিসর্জিত হল রাজা ও ধর্মীয় পুরুষদের হস্তক্ষেপে। তাদের অনুকম্পায় যে শিল্প গড়ে উঠল তার আকর্ষণ ক্রমে ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার মধ্যে প্রবহমান হতে লাগল। যদিও রঙে ও ঢঙে বেশ চাকচিক্যময় কিন্তু অন্তঃসারশূন্য। এই সব সংস্কৃতির সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোনও আত্মিক সম্পর্ক ছিল না।

শিল্পের সর্ব শাখায় যখন এইরূপ বিচিত্র অবস্থা, মঞ্চেও এর প্রতিফলন স্পষ্ট। জনগণের সৃষ্ট উৎপাদিত সম্পদ ছিনিয়ে এনে রাজন্যবর্গ তৈরি করেছিলেন নিজ-প্রাসাদে স্ফূর্তির আসর। জনগণের সঙ্গে এর কোনও সম্বন্ধ ছিল না। তারা ছিল এই শিল্পোদ্যোগ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। তারা শুনত এই সব শিল্পের নানান রসাল কাহিনী। ফলে শুরু হতো তাদের মনে প্রতিক্রিয়া,—জেগে উঠত শিল্পসৃষ্টির সুপ্ত কামনা। তাদের মধ্যে দেখা দিত নানা উদ্যোগ ও জল্পনা-কল্পনা।

নবজাগরণের সঙ্গে ইতালিতে মঞ্চশিল্পের অগ্রগতি ছিল অপ্রতিরোধ্য। তৎকালীন ইতালি আজকের ইতালির মতো একই রাজনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ ছিল না। তখনকার ইতালি ছিল বহু অংশে খণ্ডিত। এক-এক অংশের রাজা বা সামন্ত ছিলেন এক-একজন। এদের মধ্যে ছিল রাজনৈতিক বৈষম্য এবং দ্বন্দ্ব। কিন্তু একটি বিষয়ে এদের পরস্পরের মধ্যে ছিল মিল, সে মিল ছিল মঞ্চশিল্পের উন্নতির আন্তরিক প্রতিযোগিতায়। এই শিল্পের বিচারক রাজন্যবর্গ, এই শিল্পের উপস্থাপনায়ও ছিল রাজন্যবর্গ। সাধারণ মানুষ এইসব মঞ্চশিল্প থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত, তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ এখানে ছিল না। কারণ, এই শিল্পের প্রচার ও প্রসার সীমাবদ্ধ ছিল মুষ্টিমেয় রাজপ্রাসাদের দর্শকদের মধ্যে।

যত প্রাচীরাবদ্ধ নাট্যোৎসবের খবর বাইরে আসতে লাগল, ততোই জনমানসের উপর তার প্রতিক্রিয়া তীব্রতর হতে থাকল। মানুষের মন ক্রমে চঞ্চল ও অস্থির হয়ে পড়ল। মানুষের শিল্পের প্রতি আকর্ষণ ও কিছু করবার তাগিদ, তাদের বিরামবিহীন মানসিক যন্ত্রণায় বিড়ম্বিত করত। গণশিল্পীর দল ভেবে পাচ্ছেনা কোন পথে এগোলে এই নতুন ধারার মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার মতো অর্থ ও সঙ্গীত তাদের নেই, আবার ভাবনা-চিন্তার সূত্রও খুঁজে পাচ্ছে না অথচ আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। মনের মধ্যে শুধু আলোড়ন—কিছু করতে হবে। এদিকে সূর্যোদয় থেকে অন্ত অবিরাম পরিশ্রমের মধ্যে সময় কোথায় কিছু ভাবনা চিন্তার! কিন্তু শিল্পীর মন বড় অবাধ্য, এ সংসারের দুঃখ-ব্যথা সমস্যার কথা ততো ভাবে না, যত ভাবে ওই সঙ্গীত-সুর-নৃত্য-নাট্য নিয়ে!

সেদিন শহর ভেনিসে, রৌদ্রদীপ্ত দিন প্রায় সমাপ্ত। বিদায়ী সূর্যের রক্তিম আভা রাঙিয়ে দিয়েছে প্রকৃতি ও মানুষকে। এই সময় মেঘাচ্ছন্ন আকাশ আর বৃষ্টি ঝরা দিনের কথা মানুষ ভাবতেও পারে না! এই আলোয় আলো ভরা দিনে মানুষের প্রাণচাঞ্চল্য উপচে পড়ছে। বিহঙ্গের কোলাহল, যুবক-যুবতীর উচ্ছ্বাস, খুশি ভরা মানুষের আনাগোনা সব মিলিয়ে ভেনিস যেন উৎসবে মেতেছে! আজ যেন সবাই ক্লান্তিহীন স্বতস্ফূর্ত! কোনও দুঃখ নেই, বেদনা নেই, আছে শুধু প্রাণপ্রাচুর্য, যৌবনের উদ্দামতা কিশোরের চাপল্য, জীবনের জয়গান।

সিডনে বোকজ্যা, রাজবাড়ির ফিটন চালক। কী কারণে আজ সকাল-সকাল ছুটি পেয়েছে। দিনের মেজাজ আর ছুটির মেজাজে সে আত্মহারা। স্ফূর্তির পেয়ালা হাতে

নিয়ে প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে,—এসো আমার পেয়ালায় একবার চুম্বন করে যাও। মাঝে মধ্যে পল্লীগীতের সুর দু-চার ছত্র গেয়ে চলেছে। স্ফূর্তিবাজ লোক বলে সে পরিচিত। কেউ কেউ খুশি হয়ে তার পেয়ালা পরশ করে যাচ্ছে। আত্মভোলা সিডনে অজান্তে কাছের একটি উদ্যানে ঢুকে পড়েছে, সে টেরই পায়নি। হঠাৎ দেখতে পেল তার এক চাষী বন্ধু একাকী নীরবে বসে রয়েছে। সে ধীরপদে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বন্ধুটি ভাবাবেগে এত বিভোর যে সে সিডনের আগমন বুঝতেই পারেনি। সিডনে কিছু সময় বিস্ময়ে তার প্রতি তাকিয়ে থেকে শেষে ডাক দিল,—রোমিও? ডাক শুনে রোমিও চমকে উঠে মুখ ফিরিয়ে সিডনেকে দেখে আনন্দে জড়িয়ে ধরল। চকিতে গাছের পাখি দিনের শেষের গান গেয়ে উঠল। উদ্যানের মধ্যে একটি ছোট জলাশয়ে দুটি শ্বেত মরাল হঠাৎ ডেকে উঠে যেন এদের মিলনের মাধুর্যকে আরও কাব্যময় করে তুলল। দূরে এক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা পরস্পরের হাত বেষ্টন করে বোধ হয় ফেলে আসা দিনগুলির স্মৃতি মন্থনে ব্যস্ত। একটি ঝোপের আড়ালে অর্ধ-এলায়িত দেহে পরস্পরকে বেষ্টন করে আছে এক যুবক-যুবতী। এ যেন এক মিলনোৎসব!

এই সময় রাস্তা দিয়ে সুন্দরী রোজালিন একটি সুর গাইতে গাইতে কোন অজানার পথে চলেছে। সে দুনিয়ায় বড় একলা! একদিন তার সব ছিল কিন্তু আজ সব শূন্য। সে সুন্দরী ও সুগায়িকা। শোনা যায় কোনও এক রাজপুরুষ তাকে প্রলোভিত করে তার নারীজীবনের সম্পদকে অসম্মানিত করে আজ রাস্তায় ফেলে দিয়েছে। ফলে রোজালিন কিছুটা অস্বাভাবিক হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় আর গান করে। তার ভবঘুরে জীবনে কোনও নির্দিষ্ট নিবাস নেই। লোকে তাকে আদর করে—'সূর্যমুখী' বলে ডাকে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার হদিশ পাওয়া যায়, কিন্তু রাতের অন্ধকারে সে যে কোথায় হারিয়ে যায় কেউ জানে না! রোমিও তাকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে ডাকে,—

রোমিও। ও সূর্যমুখী, কোথায় যাও? এদিকে এসো না?

রোজা। কেন গো গোঁসাই, ডাকছ কেন?

রোমিও। বলি যাচ্ছ কোথায়?

রোজা। নাগরের খোঁজে…। তোমরা এখানে কী করছ?

সিডনে। ভাবছি…।

রোজা। কী ভাবছ?

রোমিও। দেখছ না, রাজবাড়িতে কেমন হৈ চৈ হচ্ছে! আর আমাদের সাংস্কৃতিক মন শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে!

রোজা। হৈ চৈ করা ওদের ধর্ম। দু দিন আমোদ-প্রমোদের পর যখন ভাল না লাগে, তখন উচ্ছিষ্ট ও ছিবড়ে করে ফেলে দেয়।

সিডনে। আমরা তো আর রাজাগোজা নই যে নিছক হৈ চৈ করব! আমরা বলব জীবনের কথা,—যে জীবনের বাল্যকাল, কিশোর-যৌবন-বার্ধক্য নেই, আছে হাহাকারের হৈ চৈ। দুঃখ বেদনার মধ্যে মানুষের মুখে হাসি ফোটাব।

রোজা। বাঃ, বুকনিতো বেশ শিখেছ! কর কী?

সিডনে। রাজার ফিটন চালাই।

রোজা। তুমি?

রোমিও। চাষ করি। কাজ না থাকলে রাজপ্রাসাদে রাজমিস্ত্রীর জোগারে হই।

রোজা। দুজনেই তাহলে ওদের সম্পদ বাড়াবার কাজে লিপ্ত?

রোমিও। রাজা-প্রজা উভয়েই যে পরস্পরের পরিপূরক। একে অপরকে আশ্রয় করে চলে।

রোজা। বাঃ, কী চমৎকার মিলন! [রোজা গান ধরে] 'রাই মিলিল গো শ্যাম সনে···।'

সিডনে। ভুল বুঝছ, তেলে-জলে কি মিল হয়?

রোজা। ঠিক বুঝেছ। ওদের জলসাঘরের ও সম্পদ বাড়াবার পুঁজিতো আমরা। তাই ওদের আহ্লাদে আমাদের আহ্লাদিত হবার কোনও কারণ নেই···।

সিডনে। তাই বলে আমাদের শিল্পীমনের পিপাসা মেটাব না?

রোজা। নিশ্চয়ই মেটাবে।

সিডনে। কীভাবে?

রোজা। কেন! সেই গ্রীক-রোমান যুগ থেকে যেভাবে হাটে-মাঠে-ঘাটে মানুষকে খুশি করেছে, মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়েছে, সেইভাবে···।

রোমিও। সেই মাইম আর প্যান্টোমাইম! বড় পুরনো,—মানুষ নতুন কিছু চাইছে, বিশেষ করে রাজবাড়ির এই কর্মকাণ্ডের পর···।

রোজা। [গান ধরে] 'প্রমোদে ঢালিয়া দিও—না মন'। ওদের অনুকরণ করতে গেলে তুমি হাস্যাস্পদ হবে। না পারবে ওদের মতো করতে, না পারবে নিজের পথ ঠিক রাখতে।

সিডনে। তাহলে—?

রোজা। কেন!···তোমাদের মাইমের মধ্যে কথা ও কাহিনী, নৃত্য ও সঙ্গীত ঢুকিয়ে দাও, দেখবে কী কাণ্ডই না হবে।

রোমিও। কিন্তু ওদের ওই চাকচিক্যের পাশে আমাদের এ শিল্প বড় ম্রিয়মাণ দেখাবে···

রোজা। আহা, করেই দেখনা···, এত নিরাশ হচ্ছ কেন···

সিডনে। বলছ? ওদের আঙ্গিকের কিছুই নেব না?

রোজা। না নিলেই ভাল। দেখবে তোমাদের নিজস্ব আঙ্গিক জন্ম নেবে। আর যদি নিতেই হয় তবে বুঝে নিজের মতো করে নেবে, যাতে কেউ বুঝতে না পারে।

রোমিও। তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে?

রোজা। নিশ্চয়ই।

সিডনে। তোমার আবার কখন দেখা পাব ?

রোজা। সূর্য উঠলে··· । এখন যাই ?

রোমিও। কোথায় যাবে ?

রোজা। কেন! খবর দিতে, সকলকে জানান দিতে, নতুন দিনের জন্মের খবর—, [রোজা গান ধরে]—'এখন মরা গাঙে বান ডেকেছে, জয়মা বলে ভাসাও তরী—' [প্রস্থান করে]

চলেছে, ছুটে চলেছে সূর্যমুখী। পায়ে তার নূপুর, মুখে তার গান,—'জাগো জাগো নগরবাসী, নিশি অবসান, পূবাকাশে রঙ ধরেছে, হও সবে আগুয়ান।' চারিদিকে উত্তেজনায় সাড়া পড়ে গেল।—এ কী নূপুরের তাল, গানের মূর্ছনা, মনের এ কী উথাল-পাথাল অবস্থা !

১৫১৮ অথবা ১৫১৯ থেকে এই নূপুরের ধ্বনি শুনতে পাওয়া গেলেও সে শব্দ খুবই ক্ষীণ ছিল। পূর্ণ বিকাশ শুরু হয় ১৬৫০ থেকে।

রোমান যুগ থেকে মাইম ও প্যান্টোমাইম-এর মাধ্যমে যে শিল্প অর্থাৎ মঞ্চশিল্প প্রদর্শিত হয়ে আসছিল সেই ধারারই কিছু রূপ পরিবর্তন ঘটিয়ে জন্ম নিল 'কমেডি-ডেল-আর্টে'। এই মাইম ও প্যান্টোমাইম তৎকালীন সমগ্র ইউরোপের সাধারণ মানুষের শিল্পক্ষুধা মেটাত। এ শিল্প ছিল লৌকিক শিল্প, তাই সাধারণ মানুষের সঙ্গে এর ছিল গভীর আত্মীয়তা। প্রকাশভঙ্গি সহজ-সরল, সাবলীল। প্রধান উপজীব্য হাস্যরস। কিন্তু ইতালিতে এই শিল্প যখন নতুন রূপ গ্রহণ করল তখন এর সঙ্গে সংমিশ্রিত হল সংলাপ-সঙ্গীত-নৃত্য-দৃশ্যসজ্জা। যা পূর্বে প্রচলিত মাইম ও প্যান্টোমাইমে আদৌ ছিল না। এই নতুনতর শিল্পের সর্বজনীন আঙ্গিক অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। মাঠে-ময়দানে উড়তে শুরু করল এই শিল্পের জয়পতাকা। চিরকালের পৃষ্ঠপোষক মঞ্চশিল্পের দরদী দর্শক, সাধারণ মানুষ আনন্দে আটখানা হয়ে ফেটে পড়ল। দৃশ্যের আরম্ভ থেকে যবনিকা পর্যন্ত শুধু হাসি, প্রাণখোলা হাসি। বহুদিনের আবদ্ধ শিল্পরস বোধের যে আনন্দ, তার উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ দেখা দিল আপামর জনসাধারণের মধ্যে, যাকে এক কথায় বলা যায় লোকরঞ্জন শিল্প। ইতিহাসের পাতায় এই শিল্পের নামকরণ হল,—'কমেডি-ডেল-আর্টে' নামে।

স্থান : ভেনিসের কোনও ময়দান।

কাল : ১৬০০ শতাব্দীর রৌদ্রস্নাত এক বিকেল।

ময়দানের একদিকে বিশাল এক বৃক্ষ, নতুন পল্লবে শোভিত। নবীন পুষ্পে-পত্রে সজ্জীবিত, যে গাছের ছায়া শান্ত স্নিগ্ধ। এই ছায়া-সুশীতল বৃক্ষের নিচে দর্শকদের সমাবেশ। বৃক্ষের মূলকাণ্ডের নিকটে অস্থায়ী একটি মঞ্চবেদী বাঁধা হয়েছে। এ মঞ্চ জাঁকজমক ও আড়ম্বরহীন, অতি সহজ ও সরল। প্রসেনিয়ম আর্চের দুদিকে কিছু অংশ ঘেরা, উপরে নীলাকাশ। দৃশ্যসজ্জা অতি সামান্য, উইংসের মতো কয়েকটি দাঁড় করানো আছে মঞ্চের উভয় দিকে এবং তারই পেছনে রয়েছে একটি অঙ্কিত পর্দা,

আঁকা আছে বনের দৃশ্য। মঞ্চসম্মুখে কিছু বেঞ্চ পাতা আছে, তাতে দর্শক বসে আছে ঠাসাঠাসি করে। তাদের পেছনে অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে আছে বহু নাট্যরসিক। চোখে মুখে উৎকণ্ঠা কখন শুরু হবে! ধৈর্য মানছে না, তর সইছে না। দর্শকদের মধ্য থেকে ভেসে আসছে নানান উক্তি ও গুঞ্জন, কখনও চিৎকৃত, কখনও শান্তস্বরে। হঠাৎ বেজে উঠল ড্রাম এবং বিউগল। মুখরিত দর্শক মুহূর্তে নীরব হয়ে গেল। তারা উপলব্ধি করল আকাঙ্ক্ষিত ক্ষণটি আসন্ন।

শুরু হল অভিনয়। উচ্ছ্বসিত দর্শক আনন্দে মুহুর্মুহু হাততালি ও আনন্দোচ্ছ্বাসে সবকিছু মাতিয়ে তুলল। কখনও নাচ, কখনও গান, কখনও ভাঁড়ামি সঙ্গে কথা ও মাইম। এ এক পূর্ব-অনাস্বাদিত রসাস্বাদ। কাহিনী তখনও দানা বাঁধেনি; খণ্ডখণ্ড টাবলো আকারে ঘটনা উপস্থাপিত হচ্ছে। দর্শক চমৎকৃত। মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল এ শিল্পের জয়গান।

এইভাবেই অচিন পথে চলা শুরু। জন্ম হল অচলায়তনের বাইরে, উন্মুক্ত অম্বর তলে, ধূসর প্রসারিত রাজপথে বা বনাঞ্চলে নবশিল্প ধারার। এ এক সৃষ্টিশীল সমৃদ্ধ স্রোত। নবজাগরণের উৎসবে অনেক নতুনের সঙ্গে যুক্ত হল আর এক নতুনের, যার জয়োল্লাসের প্রকাশ ও প্রসার দিগন্ত প্রসারিত ও আপামর জনগণের মধ্যে।

'কমেডি-ডেল-আর্ট'-এর আর এক নাম, অল ইমপ্রোভিজো' [All improviso]। 'ইমপ্রোভিজো' শব্দটির অর্থ হচ্ছে এক্সটেম্পো। অর্থাৎ অভিনয়ের সময় মূল কাহিনীকে অক্ষুণ্ণ রেখে, স্থান-কাল বিশেষে কিছু অতিরিক্ত কথা, আচরণ এবং অঙ্গভঙ্গির দ্বারা দর্শকদের মনোরঞ্জন করা। অদ্যাবধি কমেডি ডেল আর্টের কোনও লিখিত নাটক পাওয়া যায়নি, যা পাওয়া গেছে সেগুলি দলের ম্যানেজারের পাণ্ডুলিপি। এতে লিপিবদ্ধ আছে প্রথমে কোন কোন চরিত্র মঞ্চে এসে কী বলবে বা কীরূপ আচরণ করবে এবং প্রবেশ ও প্রস্থানের উল্লেখও দেখা যায়। এ ভিন্ন দৃশ্য পরিবর্তনের ইঙ্গিত এবং বিশেষ কোনও কোনও বস্তু যদি মঞ্চে ব্যবহার করা হতো তারও উল্লেখ আছে। এইরূপ পাণ্ডুলিপি প্রায় আটশত পাওয়া গিয়েছে। কোনও এক দলের ম্যানেজারের পাণ্ডুলিপির নিদর্শন;

'Enter PULCINELLA, from the sea, he speaks of the storm, the shipwreck and loss of his companions. At this enter COVIELLO, from the other side, he speaks of the same things as PULCINELLA, they see one another and make the lazzi of fear. At last, after lazzi of touching one another, they realize that they have been saved and speak of the loss of their comrades and their master.'

প্রত্যেক দলে থাকতেন একজন ম্যানেজার যিনি দলকে পরিচালনা করতেন। থাকতেন একজন কবি, যিনি গল্প লিখে অভিনেতাদের সেই গল্পের বিষয়বস্তু ও ঘটনা বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিতেন। প্রত্যেক দলে আট থেকে দশজন করে অভিনেতা ছিলেন।

এই সকল অভিনেতারা বিশেষ বিশেষ টাইপ চরিত্র অভিনয় করতে পটু ছিলেন। এই সব অভিনেতারা সকলেই ছিলেন পেশাদার। নাট্যকারের বিবৃত কাহিনী এবং ঘটনা অভিনেতারা মন দিয়ে শুনতেন এবং স্থান-কাল বুঝে তারা নিজেরাই সংলাপ তৈরি করে অভিনয় করে যেতেন। তৎকালীন ইতালিতে মঞ্চাভিনয়ের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ রীতি প্রচলিত ছিল অর্থাৎ কোনও চরিত্রের অভিনয়ে সেই বিশেষ রীতি মেনে অভিনয় করবার নিয়ম ছিল। সেই সব বিশেষ রীতি মেনে এবং অনুকরণ করে যে সব অভিনেতা কৃতিত্ব দেখাতে পারতেন, তিনি ততবড় অভিনেতা ছিলেন। প্রথম দিকে মহিলাদের অংশগ্রহণের কোনও প্রশ্নই ছিল না কিন্তু ক্রমে ক্রমে তারা এসে এই সব নাট্যাভিনয়কে সঞ্জীবিত করে তোলেন।

ক্রমশ এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বিভিন্ন রাজপ্রাসাদ থেকে এল সাদর আমন্ত্রণ। এতদিনের অনাদৃত শিল্প আজ আপ্যায়িত হল রাজদ্বারে। কমেডি-ডেল-আর্ট শেষে জাতে উঠল! শুরু হল সংমিশ্রণ! শাসকের শিল্প ও শোষিতদের শিল্পের মিলনের ফলে জন্ম নিল সঙ্কর শিল্প। সূচনা হল আর এক নবদিগন্তের, যা উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত। যে আলোয় রাঙিয়ে ছিলেন শেক্সপীয়র, মলিয়ের এবং আরও অসংখ্য নাট্যকার। শিল্পের জগতে আর এক নবদিগন্তের সূচনা হল কমবেশি এই সংমিশ্রণে ব্যালে ও অপেরার মধ্যে।

এই মিলনের খবর শব্দতরঙ্গে ছুটে চলেছে সুপারসনিক গতিতে দেশ থেকে দেশান্তরে। এই মিলন শত-সহস্র ধারায় প্রবাহিত হল দিকে দিকে, সংযোজিত হল দেশ-বিদেশের নতুন চিন্তা-ভাবনা। জোট বাঁধলেন নাট্যকার, অভিনেতা, মঞ্চ এবং শিল্পনির্দেশক এক-সারিতে। একে একে নাট্যকারের নাটক, মঞ্চের কৌশল, অভিনয়ের দিক নতুন পথ ধরল। প্রতিদিন নবীন চিন্তায় আপ্লুত হয়ে মঞ্চের রূপরেখার পরিবর্তন হতে লাগল। স্থবিরমঞ্চ এখন চলমান, গতিশীল ও পরিবর্তনশীল রূপ নিল। নাট্যকার নতুন ভাবনায় নাটকের খোল-নলচে পাল্টে দিলেন, ভেঙে দিলেন পুরনো আবদ্ধতা। মিলনে উন্মোচিত হল আর এক নতুন দুনিয়া যা ভাবীকালের দিকদর্শন হিসাবে চিহ্নিত হল। যা আজকের সময়োপযোগী মঞ্চের নাটকের অভিনয়ের প্রথম ভিত হিসাবে ইতিহাসের পাতায় স্থান পেল। নাটকে-অভিনয়ে-উপস্থাপনায় একদিকে রাজকীয় চমক, মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, চরিত্র বিকাশের ভাবগম্ভীর রীতি, নাটকের ধ্রুপদী বাঁধুনি, অন্যদিকে কমেডি-ডেল-আর্টের সহজ-সরল, গতিময় উচ্ছল উচ্ছ্বাস, সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কশাঘাত, উপস্থাপনার সরলীকরণ, এই দুই ধারার মিলন ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত হয়ে ভাসিয়ে দিল অনেক পুরনো জমে থাকা, আঁকড়ে থাকা সংস্কার, ভাবনা ও জঞ্জালকে, ঝকঝকে ও পরিষ্কার করে সত্য-শিব-সুন্দরের পসরা মাথায় নিয়ে এগিয়ে চলল নতুন পথের যাত্রী বিশ্বের দিকে দিকে। নতুনের জয়গানে বিশ্বভুবন মুখরিত হল।

নবজাগরণে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তন হল। অতিরিক্ত

উৎপাদিত দ্রব্যের বাণিজ্যিক প্রসার ঘটাতে বণিকের দল দেশ ছেড়ে ছুটে চলল বিপদ-সঙ্কুল পথ ধরে অচিন দেশের উদ্দেশ্যে। বণিক বেশে অন্য দেশে অনুপ্রবেশ করে ক্রমে সে দেশের শাসনভার ছিনিয়ে নিল। ফলে আর্থ-সামাজিক ভারসাম্য বদলে গেল। নিজেদের স্থায়িত্ব বজায় রাখতে তারা শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার শুরু করল। ফলে ইউরোপের এই নবতর নাট্যশিল্পের প্রতিষ্ঠা হল এশিয়া-আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকায়। আজকের দুনিয়া ওই ধারারই ধারক-বাহক, যদিও দেশে দেশে এই ধারা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে আজ এক উন্নততর অবস্থায় আমরা পৌঁছেছি।

যোগসূত্র

ইতালি সহ ইউরোপের অন্য দেশগুলি যখন একটি নতুনতর মঞ্চরীতিতে নাটক উপস্থাপনায় ব্যস্ত তখন সেই একই সময়ে ইংল্যান্ডে ঠিক ভিন্ন প্রকৃতির একটি মঞ্চধারা গড়ে উঠল। এই মঞ্চ রীতিনীতির সঙ্গে রেনেসাঁর নতুন উদ্ভাবিত মঞ্চের কোনও যোগ ছিল না। এ মঞ্চ তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে নিজের কৌলিন্যের পরিচয় দিল। এ মঞ্চের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে এর সঙ্গে সাধারণ মানুষের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। এই মঞ্চে অভিনেতা ও দর্শকের যোগাযোগ ছিল অতি নিকটতম। মঞ্চ প্রাচীরাবদ্ধ হলেও সাধারণ মানুষের এখানে অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। এই যুগটি সর্ব বিষয়ে রেনেসাঁ মঞ্চ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হওয়ায় এর একটি বিশেষ নামকরণ করা হল—এলিজাবেথিয়ান থিয়েটার। অবশ্য তৎকালীন এই মঞ্চধারার পাশে অপর একটি মঞ্চাভিনয় রীতি বিদ্যমান ও প্রচলিত ছিল, যাকে বলা হয়েছে—'কোর্ট থিয়েটার'। এই কোর্ট থিয়েটারের রীতি-নীতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজের। এই থিয়েটারগুলি পরিচালিত হতো তৎকালীন রাজন্যবর্গ ও সামন্তদের দ্বারা, যার জন্য এই সব মঞ্চের রূপ ছিল বিলাস বহুল এবং চাকচিক্যে পরিপূর্ণ।

একটি নাম, একটি সাল, একটি থিয়েটার,—এই তিনটি ইংল্যান্ড তথা এলিজাবেথিয়ান মঞ্চ ইতিহাসে এক বিরাট স্থান জুড়ে বসে আছে। এদের কোনও একটিকে বাদ দিয়ে বা না জেনে তৎকালীন নাট্য-ইতিহাস জানতে গেলে নিষ্ফল পণ্ডশ্রম হবে। নাম—জেমস বুরবাজ [James Burbage], সাল ১৫৭৬, থিয়েটার—দি থিয়েটার। এই তিনটির ফল হল এলিজাবেথিয়ান যুগের সূচনা। জেমস বুরবাজ ছিলেন একজন কাঠমিস্ত্রি। নিজের ব্যবসা ছেড়ে তিনি পরিচিত হলেন একজন অভিনেতা হিসাবে এবং ১৫৭৬ সালে একটি জায়গা লিজ নিয়ে লন্ডনে প্রথম স্থায়ী পেশাদারী মঞ্চ নির্মাণ করেন। এবং নাম দিলেন—দি থিয়েটার। এই সেই প্রথম মঞ্চ যেখানে সাধারণ লোকের প্রবেশাধিকার ছিল অবাধ।

যা হোক, এলিজাবেথিয়ান মঞ্চের ইতিবৃত্ত আলোচিত হবার পূর্বে তার পূর্বাভাসের বিশ্লেষণ কিছু প্রয়োজন।

ষোড়শ শতাব্দীর মঞ্চ একদিক দিয়ে বলা যায় যে মধ্যযুগীয় মিস্ট্রি ও মিরাকল মঞ্চেরই

একটি পরিবর্তিত রূপ অর্থাৎ ওই মঞ্চের পরিপূর্ণ রূপ না রেখে তার সরলীকরণ এবং তাকে যুগোপযোগী করা। এই সরলীকরণের আর একটি কারণ এর অত্যধিক খরচ, ব্যয়বহুল মঞ্চ ইচ্ছানুসারে করা সম্ভব হতো না। অথচ মানুষের মঞ্চশিল্পের প্রতি আকর্ষণ দিন দিন ক্রমবর্ধমান। মধ্যযুগীয় বিশাল মঞ্চস্থাপত্য নিয়ে নিয়মিত অভিনয় অসম্ভব ছিল। তাই অনুসন্ধান চলল নতুন কোনও সহজ সরল মঞ্চের। চেষ্টা চলল মঞ্চকে কী করে সহজ, ছিমছাম করে তোলা যায়। পরে এই প্রচেষ্টারই একটি স্থায়ী রূপ এলিজাবেথিয়ান যুগে প্রকাশ পেল।

এরই মধ্যবর্তী অবস্থায় ইংল্যান্ডে অন্য এক প্রকার মঞ্চ ও নাটকের প্রচলন হল, যা ছিল সহজ ও অনাড়ম্বর। একে বলা হয়েছে ইন্টারলুড। এ গুলিকে ছোট মরালিস্টধর্মী নাটক বলা হয়। হাস্যরসই ছিল এই সব নাটকের প্রধান উপজীব্য। এই ধরনের নাটকের প্রধান সুবিধা ছিল যে অতি অল্প ব্যয়ে এবং অল্প সময়ে মঞ্চস্থ করা সম্ভব ছিল। এমনকী যে কোনও বড় হলঘরেও উপস্থাপিত করা সম্ভব ছিল। এই প্রকার নাটকের মঞ্চাভিনয়ের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠল তৎকালীন স্কুল-কলেজ। দর্শকের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় একদল পেশাদারী অভিনেতা সৃষ্টি হল এবং এই সব অভিনেতা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে নানান স্থানে অভিনয় করতে লাগলেন। চাকচিক্যহীন সাধারণ একটি উচ্চ-বেদীই নাট্যক্রিয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। সময়ের দিক থেকেও এ হল সংক্ষিপ্ত। এক থেকে দেড় ঘণ্টার বেশি এই অনুষ্ঠানে দরকার হতো না। এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট যে উপস্থাপিত নাটক সব সময়ে দর্শকের সহযোগিতা পেয়েছে। দর্শক একাত্ম হয়েছেন নাটকের সঙ্গে। দর্শককে উপেক্ষা করে নাটক তার অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখতে অক্ষম। তাই দেখা যাচ্ছে দর্শকের চেতনা রুচি শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে গিয়ে মঞ্চ ও নাটক তাদের পূর্বরূপ পালটাচ্ছে ; পূর্বের বিলাস পরিত্যাগ করছে। মঞ্চ ও নাটক এগিয়ে গেল স্বাভাবিকতা ও বাস্তবতার দিকে। এই সব দলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজা ও সামন্ত। এ ভিন্ন দলগুলি শহর ও শহরতলিতে অভিনয় করে অর্থ উপার্জন করত।

এই শতাব্দীর মধ্যভাগে আর একটি বিপ্লব ঘটে গেল—গ্রীক-রোমান মঞ্চের রীতিনীতি আবিষ্কারের ফলে সমগ্র ইউরোপের মঞ্চে আরম্ভ হল তার পূর্ণ ব্যবহার। এই রীতি-নীতির সন্ধান পাওয়া গেল আর্কিটেক্ট ভিট্রুভ-এর পুস্তকের মাধ্যমে। আরম্ভ হল ক্ল্যাসিক নীতির পুনরভ্যুত্থান। থ্রি ইউনিটির [ইউনিট অফ টাইম, প্লেস অ্যান্ড অ্যাকশন] মর্যাদা রাখতে মঞ্চ ও নাটক, সজাগ হয়ে উঠল।

ভিট্রুভ-এর মঞ্চের বৈশিষ্ট্য ছিল যে, দুটি কাঠামোকে 'এল'-এর মতো পরস্পর গায়ে লাগিয়ে দাঁড় করিয়ে ক্যানভাসে মুড়ে রঙ করা হতো। এগুলিকে মনে করা হতো রাস্তার উভয় দিকের গৃহ। মঞ্চসম্মুখের ফ্রেমে একটি করে দরজা বানানো হতো। দরজায় তিনদিকে বর্ডার টেনে সুন্দর কারুকার্য অঙ্কিত করা হতো। এ ভিন্ন ফ্রেমের উপরের দিকে অঙ্কনের উৎকর্ষ, সুকুমার কারুকার্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। এই দৃশ্যের সর্বপেছনে একটি অঙ্কিত পর্দা বিরাজ করত তাতে আঁকা থাকত দুটি

রাজকীয় দরজা। দ্বিতীয়ত পেরিঅ্যাক্ট [ট্রায়াঙ্গুলার বা প্রিজম আকার] চারটে করে প্রত্যেক দিকে একটি বিশেষ দূরত্বে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হতো। এই পেরিঅ্যাক্টগুলি মঞ্চের উভয় দিকে অবস্থান করত। পেরিঅ্যাক্টের ছিল তিন দিক। এই তিন দিকের এক একটি দিকে একই প্রকার দৃশ্য অঙ্কিত করার নিয়ম ছিল। এই উপায়ে বাকি দুই দিকে অন্যপ্রকার দুটি দৃশ্য অঙ্কিত থাকত। যার ফলে তিনপ্রকার পূর্ণ পৃথক দৃশ্য পাওয়া যেত। দৃশ্য পরিবর্তনের জন্য ভিট্রুভ এক অদ্ভুত যান্ত্রিক উপায় গ্রহণ করেন। তিনি এই পেরিঅ্যাক্টগুলিকে এক একটি পৃথক পিভটের উপর স্থাপিত করেন। সাবাতিনি পেরিঅ্যাক্টগুলিকে প্রত্যেক দিকে দুটি করে পরপর দাঁড় করিয়েছেন, কিন্তু ভিট্রুভ প্রত্যেক দিকে চারটি করে পারস্পেকটিভ রীতি অনুসারে দাঁড় করান। দৃশ্য পরিবর্তনের প্রয়োজনে এই পেরিঅ্যাক্টের মুখগুলি ঘুরিয়ে দিতেন। মঞ্চ-ইতিহাসে দৃশ্য পরিবর্তনের এ এক বৈপ্লবিক প্রথা।

এ ভিন্ন ভিট্রুভ আরও তিন প্রকার নাটকের জন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তিন প্রকার দৃশ্যসজ্জার নির্দেশ দিয়েছেন। এর মধ্যে ট্রাজেডি সম্বন্ধে বলেছেন যে এই মঞ্চে থাকবে রাজকীয় পিলারের সারি এবং গবাক্ষ। দেওয়ালে থাকবে সুকুমার কারুকার্য এবং বিভিন্ন প্রকার মূর্তি। কমেডি সম্বন্ধে বলেছেন যে এতে থাকবে সাধারণ বাসগৃহ যুক্ত পথ। এই সব বাসগৃহে ব্যালকনি, জানালা ইত্যাদি থাকবে। স্যাটায়ার সম্পর্কে বলেছেন যে এর দৃশ্যসজ্জায় থাকবে গাছপালা, লতাগুল্ম, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি। এই সব দৃশ্য অঙ্কিত হবে পর্দায়।

ভিট্রুভ-এর এলসেট তৎকালীন মঞ্চকে নতুন আলো দিল, কারণ এই মঞ্চদৃশ্য ছিল খুব সহজ এবং সাধারণ। এই মঞ্চ নির্মাণে খরচ কম এবং একে নিয়ে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ানো ছিল অতি সহজ। তাই এর পুরোপুরি ছাপ পড়ল বিশেষ করে ইন্টারলুডের উপর। নতুন কমেডি ও স্যাটায়ার-এর ক্ষেত্রেও ভিট্রুভ-এর পরিকল্পনা বিশেষ কার্যকরী হল।

মধ্যযুগের ডেকর-সিমুলটানে-রও প্রচলন ও প্রচার শুরু হল ফরাসি মঞ্চ থেকেই। প্রথম দিকে এই প্রথায় নাটকের দৃশ্যগুলি একটি পর্দার বিভিন্ন অংশে অঙ্কিত হতো। ফলে ওই একই পর্দার উপর নদ-নদী, পাহাড়, বন, গৃহ ইত্যাদি অঙ্কিত করে টানিয়ে দেওয়া হতো। বিশেষ বিশেষ দৃশ্যাভিনয়ের সময় অভিনেতারা সেই দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়ে অভিনয় করে দৃশ্যের অবস্থান বুঝিয়ে দিতেন। তবে ইন্টারলুডে দেখা গেল ডেকর-সিমুলটানের রীতিতে একই পর্দার উপর অঙ্কন বন্ধ করে একই পথে দৃশ্যগুলির ডাইমেনশনাল রূপ দিতে। যদিও এই পদ্ধতির উন্নত রূপটির খবর আসে ফরাসিমঞ্চ থেকেই। ফরাসি মঞ্চবিশারদগণ এ ব্যাপারে চরম নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তাদের মঞ্চে। পরবর্তী পরিচ্ছেদে সেই প্রসঙ্গ আলোচিত হবে। এই পদ্ধতির ডাইমেনশনাল চরিত্র দেখা দেওয়ার ফলে জোন ভাগ হয়ে বিভিন্ন দৃশ্যের অবস্থান একই মঞ্চে উপস্থাপিত হতে লাগল। মঞ্চদৃশ্যের এও এক চমৎকার প্রচলন। ইতিহাসের পথ ধরে ভবিষ্যৎ যে

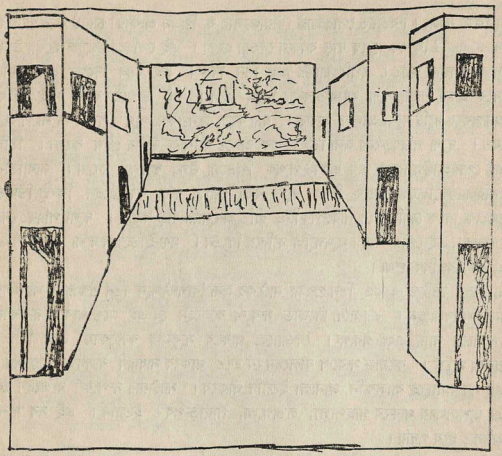

[তৎকালীন এলসেটের নিদর্শন]

গড়ে ওঠে এ তার স্পষ্ট ইঙ্গিত। কারণ আজ অনেকেই এই পথের পথিক। ক্ষেত্র বিশেষে এতে দৃশ্যের ব্যাপকতা ও বাহুল্য অনেক কমে আসে এবং নাটকের গতি-প্রকৃতিও অনেক প্রাণবন্ত হয়।

এই সব মঞ্চসজ্জার বিভিন্ন বৈচিত্র্যের প্রচলন হয়েছিল শুধু কোর্ট থিয়েটারগুলিতে। ইংল্যান্ডের সাধারণ রঙ্গালয়ের রূপ ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এই সব দৃশ্যরীতির সঙ্গে তার কোনও যোগ ছিল না। এগুলি সন্নিবেশিত হয়েছিল পরীক্ষামূলকভাবে কোর্ট ও স্কুল-কলেজের থিয়েটারগুলিতে।

এলিজাবেথিয়ান

যুগসন্ধানের জন্য অধ্যাবসায়, অধ্যয়ন ও নিষ্ঠার আন্তরিক সমন্বয় না ঘটলে সঠিক চিত্র সংগ্রহ করা কখনওই সম্ভব নয়। সেই সঙ্গে তত্ত্ব ও তথ্য না পেলেও প্রতিবেদন উদ্ধারে ব্যাঘাত ঘটে। এই সময়ে সমগ্র ইউরোপে অগ্রগতির জোয়ার বয়ে চলেছে। কখন কোথায় নতুনের বিস্ফোরণ হচ্ছে তার সমসাময়িক খবর পৌঁছাতে কমবেশি দেরি হচ্ছে,

ফলে স্থান-কাল-পাত্রের সঠিক খবর পরিবেশন করা খুবই কঠিন কাজ। তাই যথাযথ সময় ঘটনার উল্লেখের প্রয়োজন থাকলেও অগ্রপশ্চাৎ ঘোরাফেরা করছে। আবার অনেক সময় প্রমাণপত্রের অভাবে শ্রুতির উপর নির্ভর বা যুক্তিপূর্ণ কল্পনার উপর নির্ভর করে মেনে নিতে হয়। এলিজাবেথিয়ান যুগের সম্পর্কে এ কথা গভীরভাবে প্রযোজ্য।

এই যুগের প্রায় প্রথম বিশ বছর ইংল্যান্ডে কোনও প্রকার স্থায়ী মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মঞ্চানুষ্ঠান আবদ্ধ স্কুল-কলেজে, ইন-ইয়ার্ডে, কোর্টে, বড় বড় রাজকর্মচারীদের গৃহে। অথচ তৎকালীন মানুষের নাট্যানুষ্ঠানের চাহিদা ছিল প্রবল। ফলে সৃষ্টি হয়েছিল কিছু শৌখিন দল ও পরে কিছু পেশাদারী দল। কিন্তু নানা প্রকার সমস্যা থাকায় এই দলগুলি স্থায়ী হতো না। শেষে ১৫৭২-এর এক আইনে বলা হল যে, যদি কোনও বিশেষ ব্যক্তিবারা দল পরিচালিত না হয় তবে তাদের অভিনয় করতে দেওয়া হবে না। এর ফলে একদিকে যেমন বেশ কিছু দল উঠে গেল কিন্তু অন্যদিকে কয়েকটি খাঁটি নাটুকে দল তৎকালীন নোবলম্যানদের সাহায্যে পরিচালিত হতে থাকল। ফলে সেই যুগের নাট্য-আন্দোলনের একটি নিশ্চিত দিক চিহ্নিত হল। অবশ্য এই সময়ে লন্ডনে মঞ্চাভিনয় নিয়মিতভাবে করতে যথেষ্ট বাধার সম্মুখীন হতে হয়। যা হোক, সব প্রকার আপত্তি উপেক্ষা করে ১৫৭৬-এ বুরবাজ 'দি থিয়েটার' নামে পেশাদারী এক স্থায়ী সাধারণ রঙ্গালয় নির্মাণ করেন। দেখতে দেখতে কিছুদিনের মধ্যে অনেকগুলি রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫৭৬ থেকে ১৬৪২-এর মধ্যে প্রায় তেরোটি থিয়েটার জন্ম লাভ করে। এই রঙ্গালয়গুলি ছিল : দি থিয়েটার [The Theatre] ১৫৭৬, দি কার্টেন [The Curtain] ১৫৮৪-৮৫, দি রোজ [The Rose], দি সোয়ান [The Swan] ১৫৯৪, দি গ্লোব [The Globe] ১৫৯৯, দি হোপ [The Hope] ১৬১৪, দি ফরচুন [The Fortune] ১৬০০, দি রেড বুল [The Red Bull]। এই সময়ে আরও কতকগুলি প্রাইভেট থিয়েটার তৈরি হয়, তাদের মধ্যে : পল'স সিংগিং স্কুল [Paul's Singing School], দি ফ্যারান্ট অ্যান্ড বুরবাজ ব্ল্যাক ফ্রিয়ার্স [The Farrant and Burbage Black Friars], Salisbury Court Rebuilt White Friars, দি ককপিট অথবা ফনিক্স [Cockpit or Phoenix], দি রেড বুল [The Red Bull], নাইপল [Nigh Paul], প্রথম ও দ্বিতীয় ব্ল্যাক ফ্রিয়ার্স [Black Friars] বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

[সব কয়টি থিয়েটারের বিশদ বিবরণ দেওয়া উদ্দেশ্য নয়, তবে দুটি থিয়েটারের—'দি থিয়েটার' এবং 'দি গ্লোব' সম্পর্কে কিছু লিখতে হবে কারণ এই দুটি রঙ্গালয়ের সঙ্গে এলিজাবেথিয়ান নাট্যানুষ্ঠানের যোগ খুব গভীর।]

দি থিয়েটার : লন্ডনের প্রাচীরের বাইরে শেফ লিওনার্ড ময়দানের দক্ষিণ-পশ্চিমে এই রঙ্গমঞ্চটি স্থাপিত হয়। জেমস বুরবাজ ১৩ এপ্রিল, ১৫৭৬-এ গীলস আলেন [Giles Allen]-এর কাছ থেকে এই জায়গাটি ইজারা নেন। এরপর কিছুদিনের মধ্যেই থিয়েটার তৈরি হয়ে যায়। বাড়িটি ছিল কাঠের এবং সম্ভবত গোলাকার।

গ্যালারির অস্তিত্বের কথাও স্বীকার করা হয়। মঞ্চবেদী স্থায়ী ছিল না। প্রয়োজনে বেদীকে খুলে রাখা হত। কারণ, এখানে অভিনয় ছাড়াও অন্যান্য অনুষ্ঠান, যেমন নাচগান, ফেনসিং ইত্যাদি হতো। ১৫৯৭-তে যখন লিজ ফুরিয়ে যায় তখন জমির মালিকের সঙ্গে জেমসের ছেলেদের গোলমাল লাগল। এই ঝগড়া প্রায় বছর দেড়েক চলে, অবশেষে বুরবাজের ছেলে কুথবার্ট এবং রিচার্ড এই থিয়েটার ভেঙে ফেলেন এবং এই থিয়েটারের মালপত্র নিয়েই গড়ে তোলেন গ্লোব থিয়েটার।

দি গ্লোব ঃ হোপ থিয়েটারের পূর্বদিকে এবং ম্যাডেন লেনের উত্তরে এর অবস্থান ছিল। ১৫৯৯-তে বুরবাজ সম্প্রদায় দি থিয়েটারের জিনিসপত্র দিয়ে এই মঞ্চটি তৈরি করেন। এই থিয়েটারটিও আকারে গোল ছিল। ১৬১৩-তে নতুন নাটক 'All is true' [Shakespeare's Henry VIII]-এর অভিনয় কালে আগুন ধরে এবং থিয়েটারটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। কিন্তু অতি শীঘ্রই পুনর্গঠিত হয়। এই বার এর আকার Octagonal হয়, এবং ভেতরের কারুকার্য আগের থেকে অনেক বেশি জমকালো হল এবার। সিভিল ওয়ারের পূর্ব পর্যন্ত এই একটি মাত্র মঞ্চই খাঁটি নাটক অভিনয় করে গেছে। অবশেষে ১৫ এপ্রিল, ১৬৪৪-তে একে ভেঙে ফেলা হয়।

এলিজাবেথিয়ান মঞ্চের যতগুলি ছবি অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়েছে, তার প্রত্যেকটিতেই কিছু গরমিল আছে। এই ছবিগুলি যাঁরা অঙ্কন করেছেন তাঁরা নির্ভর করেছেন তৎকালীন বিভিন্ন প্রমাণাদি ও খবরাখবরের উপর। অবশ্য শুধু প্রমাণ বা খবরের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করেননি এর সঙ্গে মিশেছে তাঁদের কল্পনা ও চিন্তাধারা।

এলিজাবেথিয়ান মঞ্চের বৈশিষ্টের আলোচনায় গেলে দেখা যাবে যে, একটি বেদী প্রসারিত দর্শকগৃহের মধ্যে ; এবং এর তিন দিক সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। এই অভিনয়-বেদীকে ঘিরে রয়েছে দর্শকগৃহ। দর্শকগৃহের আকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল সম্ভবত গোলাকার। যারজন্য দর্শক তিনদিক থেকে দেখতে পারত। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল যে, এই প্রসারিত বেদীর উপর, পেছন থেকে প্রায় এর অর্ধেক পর্যন্ত একটি ওভারস্টেজ বা ব্যালকনি থাকত। উভয় স্থানেই অভিনয় হত। বিশেষ করে দোতালার ঘর, ব্যালকনির দৃশ্য, নগরপ্রাচীর বা উচ্চবেদী ইত্যাদি দেখাতে ওভারস্টেজ ব্যবহৃত হত। প্রসারিত মঞ্চবেদীর শেষাংশ থেকে শুরু হতো ইনার স্টেজ, যার উপর ওভারস্টেজ থাকত। প্রসারিত মঞ্চ ও মঞ্চ অভ্যন্তর [ইনারস্টেজ]-এর সংযোগ স্থলে একটি পর্দার অস্তিত্বের কথা তৎকালীন প্রায় সব নাটকেই পাওয়া যায়। এ ভিন্ন প্রকাশিত সব ছবিতেই এই পর্দার স্থানের নির্দেশ করা হয়েছে। প্রয়োজনে পর্দা বন্ধ করে নাটকের দরকার মতো আসবাব পত্র ও সামগ্রী রেখে দেওয়া যেত এবং যথা সময়ে পর্দা সরিয়ে একে দর্শক সম্মুখে উন্মোচিত করা হতো। স্থায়ী মঞ্চের দুই দিকে দরজা থাকত যার ভিতর দিয়ে প্রবেশ-প্রস্থান করা হতো। এই প্রবেশ-প্রস্থান দ্বারের কথা নাটকে বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে। তবে মনে হয় যে বিভিন্ন মঞ্চে এই দরজার অবস্থানের মধ্যে পার্থক্য ছিল। এই দরজা দুটির ঠিক উপরে দুটি জানালায় উল্লেখ করা হয়েছে বহু নাটকে।

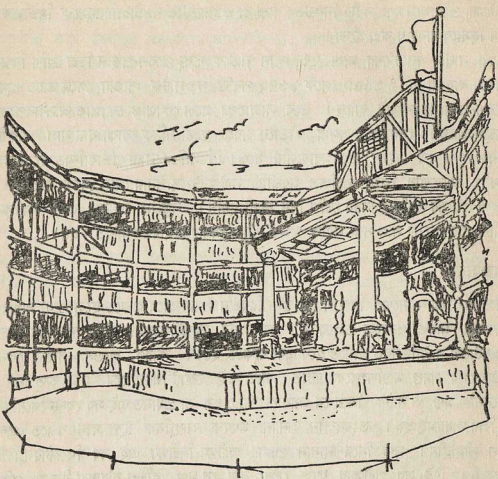

[এলিজাবেথিয়ান থিয়েটার]

তৃতীয়ত হাট [Hut] অর্থাৎ ছোট একটি ঘর ওভারস্টেজের উপর থাকত, এই স্থানেই দেবদেবীগণ আবির্ভূত হতেন। চতুর্থ হচ্ছে ট্র্যাপডোর, প্রসারিত মঞ্চবেদীর বিভিন্ন স্থানে থাকত। এ ভিন্ন ইনারস্টেজ ও ওভারস্টেজে ও এই ট্র্যাপডোরের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। একটি প্রধান পর্দার কথা ছাড়াও অন্যান্য পর্দা ছিল। তৎকালীন নাট্যকারগণ কোনও কোনও নাটকে একাধিক পর্দার উল্লেখ করেছেন। তবে শেক্সপীয়র এবং ফ্লেচার নিজেদের দলের জন্য লিখিত বিভিন্ন নাটকে কখনও পর্দার উল্লেখ করেছেন আবার কখনও করেননি। আবার দেখা যায় একই নাটকে কখনও পর্দার উল্লেখ আছে আবার নেইও। ড্রেসিংরুম সম্বন্ধে খুব অল্পই জানা যায়। তবে এটি নিশ্চয়ই ছিল, তবে কী ছিল বা কীরূপ ছিল ঠিক বোঝা যায় না। মনে হয় টায়ারিং রুমকে ড্রেসিংরুম হিসাবে ব্যবহার করা হতো। এই টায়ারিং রুমের অবস্থান ছিল ইনারস্টেজের দুদিকে।

সর্বশেষ মিউজিকরুম। এটি যে কোথায় ছিল বলা শক্ত। তবে মনে করা হয় যে

নাটকের প্রয়োজনে মঞ্চ বেদীর নিকটতম বক্সে বা ওভারস্টেজে বা টায়ারিংরুমকে মিউজিক-রুম হিসাবে ব্যবহার করা হতো।

মঞ্চের নানান নির্দেশের মধ্যে তৎকালীন নাটকে শুধু প্রবেশ-প্রস্থান ভিন্ন বেশি কিছু পাওয়া যায় না না। ১৫৫০ থেকে ১৬৪২ পর্যন্ত যত নাটক পাওয়া গেছে তাতে শুধু প্রবেশ-প্রস্থানের কথাই আছে। তবে সংলাপের মধ্যে কোথাও কোথাও আসবাবপত্রের উল্লেখ আছে। সেগুলি কোথায় কীভাবে ব্যবহৃত হতো সঠিক বোঝা যায় না। একটি বিষয় স্পষ্ট যে এইসব মঞ্চ মধ্যযুগীয় মঞ্চের রীতিনীতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল, অর্থাৎ মধ্যযুগীয় কিছু প্রচলিত মঞ্চরীতি নাটক উপস্থাপনায় মেনে নেওয়া হয়েছিল। অবশ্য এই সব প্রচলিত নিয়ম বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। নতুনের জোয়ার এবং দর্শকের রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নাটক ও মঞ্চ পরিকল্পনার প্রথারও পরিবর্তন হয়।

রাজদ্বারে

এলিজাবেথিয়ান মঞ্চের বিকাশ ও ক্রমপরিবর্তন সম্যকভাবে বুঝতে হলে শুধু সাধারণ রঙ্গালয়ে আবদ্ধ থাকলে চলবে না, তৎকালীন কোর্টথিয়েটার এবং স্কুল-কলেজের থিয়েটারের নাট্যাভিনয়ও জানতে হবে এবং বুঝতে হবে। কারণ, লন্ডন, লন্ডন কেন, ইউরোপের সমস্ত মঞ্চশিল্পকে উন্নত করতে এই কোর্টথিয়েটারের দান অতুলনীয়। রেনেসাঁর মঞ্চ ও নাটক নিয়ে যে জয়যাত্রা শুরু হয় তা প্রধানত এই সব কোর্টথিয়েটার-গুলির মাধ্যমেই হয়। তৎকালীন অন্যান্য মঞ্চকে আধুনিক রূপ দান করতে এদের দান সীমাহীন। মঞ্চ নিয়ে নানান প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা এই সব থিয়েটারগুলিই করেছে। এই সব পরীক্ষায় ফলে দেখা যায় যে মঞ্চ বিভিন্ন বাঁধাধরা নিয়মের গণ্ডি ভেঙে বিকাশের বহু বিচিত্র পথ ধরেছে। ১৫৪৩-এর পূর্ব পর্যন্ত এইসব কোর্ট-থিয়েটার ব্যস্ত ছিল মাস্ক ও পেজেন্ট অভিনয় নিয়ে। খাঁটি নাটকের আমদানি তখনও হয়নি। কিন্তু এই সময়ই মঞ্চের রূপের পরিবর্তন শুরু হলে নাটকের গঠনেরও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল। খাঁটি নাটকের তাগিদ আসতে আরম্ভ করল। মঞ্চে এল রেনেসাঁর মঞ্চরীতির জোয়ার। ইতালিয়ান মঞ্চের ধারা প্লাবিত করল সমগ্র ইউরোপকে। এল ফ্রান্স মঞ্চের ডেকর সিমুলটানে। ক্রমে জন্মলাভ করল ডেকর—সিমুলটানের একত্রিত দৃশ্যের পৃথক সত্তা অর্থাৎ একটি দৃশ্য—বহুল নাটকের প্রত্যেক দৃশ্যের পৃথক রূপ ও রেখা, পৃথক সত্তা নিয়ে মঞ্চস্থিত হতে লাগল।

প্রথমাবস্থায় কোর্টে আনন্দোৎসবের মাধ্যম ছিল নাচগান। প্রকৃত নাটকের স্থান খুব কম ছিল। নাটক নামে যেগুলিকে মঞ্চস্থ করা হত, সেগুলিকে আসলে নাটক বলা যায় না। কারণ সংলাপের অংশ এতে খুব কম, নাচগানই প্রধান। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে এই ধারার একটি পরিবর্তন দেখা দিল। নৃত্যগীত ও সংলাপের মিলন ঘটল, ফলে জন্ম নিল দুটি পৃথক ধারা,—(১) মাস্ক বা ডিসগাইসিং এবং (২) পেজেন্ট। এই দুই ধারার প্রকাশভঙ্গির মধ্যেও এদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। মাস্কের বৈশিষ্ট্য

ছিল যে, একদল লোক বিভিন্ন রূপসজ্জার হলঘরে ঢুকে নেচে গেয়ে এবং নানান অঙ্গভঙ্গি করে উপস্থিত দর্শকদের আনন্দ দিত। মাঝের মধ্যে নাচ এবং মাইমই প্রধান ছিল। পেজেন্টের বৈশিষ্ট্য ছিল যে, একটি মঞ্চবেদী বিশেষভাবে তৈরি হতো এবং তার উপর সজ্জিত হতো অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় যা কিছু,—যেমন গীর্জার অংশ, রাজপ্রাসাদের অংশ, সূর্য, চন্দ্র আরও কত কী,—সবই রূপকাকারে। দ্বিতীয়ত এই মঞ্চবেদীটির নিচে চাকা লাগিয়ে দেওয়া হতো এবং সময়মত এই চলন্ত মঞ্চটিকে ঠেলে হলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হতো। এই অনুষ্ঠানটি আপাতদৃষ্টিতে রূপকধর্মী এবং বিভিন্ন দৃশ্যে বা পরিবেশে বিভক্ত ; অর্থাৎ বিভিন্ন ঘটনা ছোট ছোট দৃশ্যাকারে উপস্থাপিত হতো। এতে সংলাপের অংশ ছিল অল্প, প্রধান ছিল গান। অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ হরেক রকমের জমকালো পোশাক-পরিচ্ছদ পরে মঞ্চে উপস্থিত হতো।

পৃথকভাবে কি মাস্কে অথবা পেজেন্টের ভেতর উল্লেখযোগ্য কোনও মঞ্চরীতির বা নাট্যরীতির সন্ধান পাওয়া যায় না, কিন্তু অল্পকালের মধ্যে যখন এই দুয়ের মিলন ঘটল তখন জন্ম নিল অন্য নতুন এক প্রকার মঞ্চাভিনয়, যাতে নাচ-গান-বাজনা প্যান্টোমাইম সংলাপ মিলিত হল। মঞ্চসজ্জা জমকালো রূপ নিল। পেজেন্টের আকার আরও বৃহৎ হল এবং একাধিক পেজেন্ট প্রত্যেক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হতে আরম্ভ হল ; অর্থাৎ দৃশ্যের পূর্ণরূপ সহ পৃথক সত্তাকে পৃথক পৃথক পেজেন্টে স্থান দেওয়া হল। দৃশ্যও আরও পরিপূর্ণতার দিকে বেশ এগিয়ে গেল। ১৫৭২-এর পূর্ব পর্যন্ত এই ধারার একটি স্পষ্ট গতি কোর্ট থিয়েটারে বিদ্যমান ছিল। ক্রমে এই ধারার বিলুপ্তি ঘটে।

কিছুদিনের মধ্যেই নতুন এক প্রকার নাট্যধারার জন্ম হয়, এগুলি ইন্টারলুড [Interlude] নামে পরিচিত। এগুলি ছিল মরাল ধর্মী নাটক এবং রস বিচারে ফার্সিকাল [Farcical]। এই নাটক মঞ্চাভিনয়ের রীতি অতি সাধারণ ও সরল। দৃশ্যসজ্জা ও পোশাকের বিলাস নেই। প্রয়োজনের বাইরে কোনও কিছুর স্থান ছিল না। সাধারণ একটি উঁচু বেদী এই অভিনয়ের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। স্বল্প রূপসজ্জায় এবং স্বল্প পরিবেশে এ উপস্থাপনা উতরে যেত। কিন্তু পেজেন্টের চাকচিক্য ও জাঁকজমকের পাশে এই সরলীকরণ তৎকালীন অনেকের পছন্দ হল না, কারণ তাঁরা এর মধ্যে শিল্পসত্তার কোনও ছোঁয়াচ পাননি। তৎকালীন ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত ও নব পরিচিত বুর্জোয়া সভ্যতার এ এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া! উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলে তারা নিজেদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল ফলে সহজ ও স্বাভাবিকতাকে সন্দেহের চোখে দেখেছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এদেরই দলভুক্ত একদল লোক একে সহজভাবে গ্রহণ করে এর পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে এল। এই সময় নিয়মিত নাট্যাভিনয়ের প্রতি দর্শকের আকর্ষণ ছিল প্রবল, তারা এদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল, ফলে কিছুদিনের জন্য এর টিঁকে থাকা সম্ভব হয়েছিল। পেজেন্ট-আকারে নাট্য-উপস্থাপনায় এত খরচ ছিল যে নিয়মিত একে মঞ্চস্থ করা ছিল অসম্ভব ; তাই ইন্টারলুডের যাত্রাপথ সুগম হয়েছিল। যদিও কিছু দিনের মধ্যেই এ পথেরও

পরিবর্তন হয়, কারণ ইতালির জাঁকজমকময় বাস্তবমুখি মঞ্চসজ্জা সব কিছুকে মুছে দিল।

১৫৭২ থেকে ১৫৮৩ পর্যন্ত দেখা যায় কোর্তথিয়েটারের প্রধান অভিনেতা ছিল সব কিশোর বালক। কোর্তথিয়েটারের অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য ছিল নাচ-গান ক্রমে সংযোজিত কাহিনী। এই সব কাহিনী সাধারণত পৌরাণিক বা রূপকধর্মী। নাট্যাকারে যখন এগুলি পরিবেশিত হতো তার প্রধান উপজীব্য ছিল হাল্কা হাস্যরসাত্মক বিষয়। কিন্তু এই নাট্যধারার প্রবাহ বেশিদিন টিঁকে থাকতে পারল না ; কারণ কোর্তথিয়েটারের বাইরে এক প্রচণ্ড শক্তিশালী নাট্যধারার সৃষ্টি হয়েছে। শেক্সপীয়র, মারলো, ফ্লেচার-এর শক্তিশালী নাটক ও তার উপস্থাপনারীতি তৎকালীন লণ্ডনবাসীর মন সম্পূর্ণ জয় করে নিয়েছে। এই ধারা জাঁকিয়ে বসল কোর্তথিয়েটারের মধ্যে। এর শুরু ১৫৮৩ থেকে। এই সব নাট্যকার ও পরিচালকদের পেয়ে কোর্তথিয়েটারগুলি ফলে-ফুলে বিকশিত হল, নবযৌবনে সকলকে আকর্ষিত করল। কোর্তথিয়েটারে দেখা গেল পেশাদারী অভিনেতাদের। ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে নাট্যশিল্পের অগ্রগতি শুরু হল ধাপে ধাপে।

রিয়াঁভেন্স

মঞ্চশিল্পে রেনেসাঁর উৎপত্তি স্থল ইতালি হলেও তার প্রকৃত প্রসার ও গভীরতা দেখা গেল ইউরোপের অন্যান্য স্থানে। প্রথমাবস্থায় না হলেও পরে ফ্রান্সই সকলের মধ্যে নিজের আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

নবজাগরণে সমগ্র ইউরোপ যখন সৃষ্টির আনন্দে প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে চলেছে, ইংল্যান্ড তখন রাজনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত, 'রাজরক্ত চাই'—সকলের মুখে ওই এক কথা। শেষে রাজরক্ত নেওয়া হল। কিন্তু ওই রাজরক্তের জন্যে সমাজের মধ্যে কখন যে বিশৃঙ্খলা তার আসনটি জমাট কঠিন করে নিয়েছে, তা প্রথমে কেউ টের পায়নি। তখন অলিভার ক্রমওয়েলের কঠিন শাসনে সে বিশৃঙ্খলা পশ্চাদাপসরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। সামাজিক শৃঙ্খলা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার চাহিদা আসতে শুরু করল,—সে চাহিদা মননশীলতার, শিল্পের, সাহিত্যের, দর্শনের ইত্যাদি।

ফ্রান্সের অবস্থাও তদ্রূপ। ধর্মযুদ্ধ শেষ হয়েছে। দেশের চারিদিকে হাহাকার, সে হাহাকার ব্যথার। কেন না যুদ্ধের ফল কখনওই ভাল হয় না—তা কি জয়ে, কি পরাজয়ে। সমাজ পঙ্গু, বিশৃঙ্খলায় ভরপুর ; এর সঙ্গে আছে ছোটখাট নোবলদের অত্যাচার। সাধারণ মানুষ সব সময়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে থাকত। এই প্রকার নানারূপ ওঠা-নামার মধ্যে দিয়ে প্রায় ১৬২৪ সাল পর্যন্ত ফ্রান্স এগিয়ে এল। তাই ১৬২৪-এর পূর্ব পর্যন্ত যে পরিবেশ ফ্রান্সে ছিল তা কোনও কিছু সৃষ্টি হবার অনুকূলে নয়। এই সময় রাজা হলেন ত্রয়োদশ লুই। লুই এবং তাঁর মন্ত্রী কার্ডিনাল—রিচলুর শাসনে ফ্রান্সে এল সমাজবন্ধন, এল শান্তি। এল সৃষ্টির অনুপ্রেরণা সর্বদিকে।

নানা বাধা বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও ফ্রান্স একেবারে শিল্প বিমুখ হয়নি। ওর মধ্যে যতটুকু

সম্ভব তার গতিকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছেন। তাই দেখা যায় যুদ্ধের মধ্যেও চতুর্থ হেনরি নাট্যকার ও অভিনেতাদের অনুপ্রেরণা দিয়ে যাচ্ছেন। এই সময় ফ্রান্সের প্রধান নাট্যশালা ছিল হোটেল বুরগোইন [Hotel de Bourgogne]। প্যারির এই নাট্যশালাটিকে প্রথম জাতীয় নাট্যশালা হিসাবে তখন গ্রহণ করা হয়। তবে হার্ডি [১৫৭০-১৬৩১] এই মঞ্চে আসবার পূর্ব পর্যন্ত এর বিশেষ কোনও বৈশিষ্ট্য ছিল না। হার্ডির পূর্বে এখানে যে সব নাট্যাভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায় সেগুলি ছিল স্থূল ফার্স এবং অশ্লীল চরিত্রের। হার্ডি এই মঞ্চ নেবার পর নতুন বিষয়বস্তু ও নতুন উপস্থাপনা রীতি প্রয়োগ করেন।

এই সময়ে ফ্রান্সে অনেকগুলি ভ্রাম্যমান নাটসম্প্রদায় ছিল ; হার্ডি এইরূপ একটি দলের নেতা ছিলেন। এইসব ভ্রাম্যমান দল সাধারণত তিনপ্রকার নাটক করত,—যেমন ট্রাজেডি, কমেডি এবং স্যাটায়ার। দৃশ্যসজ্জার ব্যাপারে তারা সারালিওকে সম্পূর্ণ অনুকরণ করে চলত। এ ভিন্ন মঞ্চের প্রয়োজনীয় অন্যান্য আসবাব পত্র স্থানীয় পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করা হতো।

এই সময় মধ্যযুগীয় ডেকর সিমুলটানে [Décor-Simultanée]-এর পুনর্ব্যবহার হতে দেখা গেল।—দেখা যায় একই পর্দায় অঙ্কিত নানা পরিবেশ,—যেমন একদিকে পথের দৃশ্য, তারই পাশে বহু পিলারযুক্ত অট্টালিকা, আর অন্যদিকে একটি বনের দৃশ্য। এই ধরনের পর্দার সামনে সব রসের নাটক অভিনীত হত। ক্রমে বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্যে অন্যপ্রকার পর্দার প্রচলন আরম্ভ হল। যদিও এদের রীতিনীতি এক,—যেমন একই পর্দায় ড্রয়িংরুমের একাংশ, গ্রাম্য পরিবেশ এবং রাজপ্রাসাদ। এখানে একটি বিষয় লক্ষ করবার যে পূর্বের পর্দাগুলি যদিও ডেকর-সিমুলটানের রীতিতে অঙ্কিত কিন্তু তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ভিট্রুভ-এর বর্ণিত ট্রাজেডি, কমেডি ও স্যাটায়ারের দৃশ্যের প্রতি। এখন এই পরিবর্তনের মধ্যে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে ডেকর-সিমুলটানেকে মেনে নিয়েও দৃশ্যের রূপের তারতম্য ঘটেছে। অর্থাৎ উল্লিখিত ভিট্রুভ-এর তিন প্রকার দৃশ্যের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে নাটকের চাহিদা অনুসারে অন্য প্রকার দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে,—যেমন ড্রয়িংরুম, গ্রাম্যপরিবেশ ইত্যাদি।

এগিয়ে যাবার গতি যখন দুর্বার তখন তাকে রুদ্ধ করা অসম্ভব। তাই ডেকর-সিমুলটানের মধ্যে সংযোজিত হল নতুন বস্তু, অর্থাৎ সবই আঁকা, শুধু আঁকা নেই ড্রয়িংরুমের বা শোবার ঘরের অংশটি। অঙ্কিত অংশের স্থানে এল একটি উঁচু বেদী এবং তার পেছনে দরজাযুক্ত একটি ফ্লাট যা প্রতিষ্ঠিত করল একটি ঘরের অবস্থান। শুরু হল আর এক পরিবর্তনের জয়গান। সংযোজিত হল অঙ্কিত পর্দার সঙ্গে ডাইমেনশনাল ফ্রেমযুক্ত দৃশ্যাংশ।

১৫৯৯। হার্ডি লিজ নিলেন হোটেল দ্য বুরগোইন্,—সমস্ত জিনিসপত্র-সহ মঞ্চ-কুশলীদের। এই মঞ্চকুশলীদের মধ্যে ছিলেন তৎকালীন একজন বিখ্যাত শিল্প-নির্দেশক ম্যালও [Laurent Mahelot] যিনি মঞ্চসজ্জাকে সর্বদিকে আধুনিক

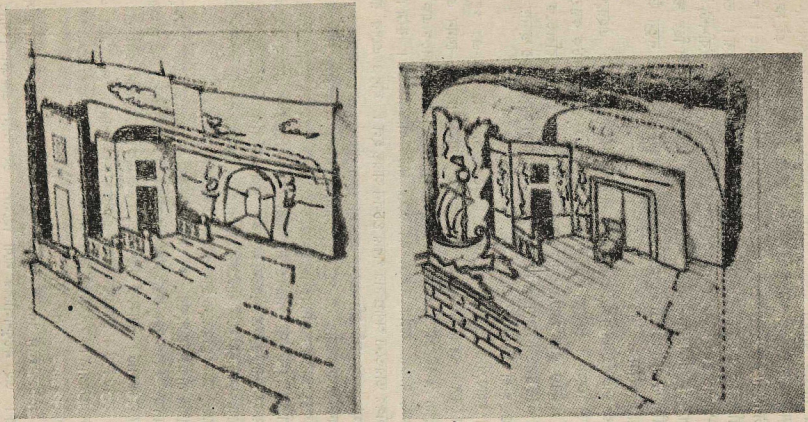

[ডেকর সিমুলটানে ক্রমে অঙ্কিত পর্দা ছেড়ে গঠনপ্রক্রিয়ার মধ্যে ডাইমেনশন পাচ্ছে]

করে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। হার্ডি গণতান্ত্রিক ছিলেন। তাই তৎকালীন বিভিন্ন দলের দলপতি ও অভিনেতারা যখন তাঁকে অনুরোধ জানাল যে তিনি যেন ওই মঞ্চের প্রচলিত রীতিকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন, তখন কিন্তু হার্ডি এইসব অনুরোধকে উপেক্ষা করেননি। তিনি সমসাময়িক দর্শকের চাহিদা জানতেন। তিনি বুঝেছিলেন যে দর্শক চাইছে দৃশ্যের নতুনতর বিকাশ। তাই তিনি পুরাতন ও সমসাময়িক যুগের সমন্বয়ে এক নতুনতর ডেকর-সিমুলটানে তৈরি করালেন। এতে উভয় দিকই রক্ষা পেল। অবশ্য এই সৃষ্টির মূলে প্রথম ও প্রধান হলেন লোরয় ম্যালও। হোটেল দ্য বুরগোইন্-এ ইনি প্রথম ডাইমেনশনাল ডেকর-সিমুলটানে প্রয়োগ করেন। এই প্রচেষ্টার মধ্যে একটি বিষয় স্পষ্ট ছিল যে, পুরাতন বাঁধাধরা গণ্ডি ভেঙে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি নতুন শিল্পরূপ। এই সময় থেকে মঞ্চে দুটি পৃথক ধারা স্পষ্টতর হয়ে উঠল,— [১] ক্ল্যাসিক নাটক উপস্থাপনায় পুরাতন প্রয়োগ রীতির প্রতি অনুকম্পা, [২] দ্বিতীয় ধারায় নতুন নতুন মঞ্চ ও দৃশ্য প্রচলনের আরম্ভ—যার মূলে ছিল ব্যালে ও অপেরা। তবে একটি ব্যাপার খুব স্পষ্ট যে ১৬৪৫-এর পূর্ব পর্যন্ত ইউরোপে মঞ্চ নিয়ন্ত্রণে এক বিরাট সমস্যা দেখা দেয়। ক্ল্যাসিক ইউনিটিকে স্থান দেবে নাকি ডেকর-সিমুলটানেকে মঞ্চে ব্যাপক ব্যবহার করবে? নাকি নতুনতর দৃশ্যের অবতারণা করবে! কোনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছনো গেল না। তখন পরীক্ষা চলল বিভিন্ন ধারায়। এই বিভিন্ন ধারার মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠে সেইসব মঞ্চসজ্জা যেখানে, প্রচলিত আড়ম্বরপূর্ণ পথকে পরিত্যাগ করে, নতুন বাস্তবমুখি যুক্তিপূর্ণ দৃশ্যকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল।

১৬৪৫ থেকে ১৬৫০-এর মধ্যে মঞ্চে বিপ্লবের জোয়ার এল। এর প্রত্যেকটি শাখার পরিবর্তনের মধ্যে ছিল এক নাটকীয় চমক। প্রথমত, পূর্বালোচিত ডেকর-সিমুলটানের একটি চমৎকার উদাহরণ আমাদের সামনে উপস্থিত হয়, যখন আমরা দেখি হার্ডির—'ফোলি দ্য ক্রিডামা'-র মঞ্চসজ্জা। ম্যালও ডেকর-সিমুলটানেকে পর্দায় অঙ্কিত না রেখে এর কিছু কিছু অংশের ডাইমেনশনাল রূপ দিতে আরম্ভ করেন। নাটকে দৃশ্য ছিল—একটি রাজপ্রাসাদ, একটি শয়নকক্ষ ও একটি সমুদ্রতীর। ছবিগুলি দেখলে বোঝা যায় যে তিনি কীভাবে এইসব দৃশ্যের সংমিশ্রণে একটি পূর্ণ দৃশ্যের রূপ এনেছেন! এই দৃশ্যসজ্জা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি মঞ্চের প্রায় পেছনের দিকে মধ্যের স্থানটিতে রাজপ্রাসাদ, মঞ্চসম্মুখের ডানদিকে সমুদ্রতীর এবং বাঁদিকের সম্মুখে শয়নকক্ষ তৈরি করেছেন। মঞ্চসম্মুখের মধ্যভাগটি ছিল সাধারণ অভিনয় ক্ষেত্র। এখানে দেখা যাচ্ছে যে মঞ্চসজ্জা আর সেই তথাকথিত পর্দার মধ্যে আবদ্ধ নেই। পৃথক পৃথক পরিবেশের পৃথক সত্তা তার নিজস্ব রূপ নিতে প্রয়াস পাচ্ছে। ম্যালও এই মঞ্চে রাজপ্রাসাদ নির্মাণে সরাসরি ফ্ল্যাট ব্যবহার করেছেন। সমুদ্রতীর বোঝাবার জন্য একটি জাহাজের মডেল তৈরি করে মঞ্চে বসিয়ে দিয়েছেন এবং তার সম্মুখে রেখেছেন ঢেউয়ের কাট-আউট। শয়নকক্ষ বোঝাবার জন্য তিনি

একটি দরজাযুক্ত ফ্ল্যাট ব্যবহার করেন। এই ফ্ল্যাটের সামনে একটি বেদীর অস্তিত্বের কথা জানতে পারা যায়। যদিও এই দৃশ্যসজ্জার মধ্যে পরিমিতির অভাব পরিলক্ষিত কিন্তু দৃশ্যের পৃথক রূপের ইঙ্গিত আমাদের নিকট সহজে পৌঁছে যায়। ক্রমে আমরা দেখতে পাব যে এইসব একান্বিত দৃশ্য পৃথক হয়ে তার পূর্ণ রূপ নিচ্ছে। এই মঞ্চের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে দৃশ্যের সর্বশেষে একটি অঙ্কিত পর্দা এবং স্কাই। ঠিক সাবাতিনির অনুকরণে ব্যবহার করা হয়েছে :—অর্থাৎ আর্চ-আকার স্কাই যা প্রথমাবস্থায় সাবাতিনি ব্যবহার করেছেন তাঁর নিজের দৃশ্যসজ্জায়। দৃশ্যের পৃথক সত্তা বোঝাবার জন্য অভিনেতাদের প্রবেশ-প্রস্থান একটা ভূমিকা পালন করত। যেমন রাজপ্রাসাদের দরজা দিয়ে যখন কোনও শিল্পী প্রবেশ করত, তখন মনে করা হতো যে এটি রাজ-প্রাসাদের দৃশ্য। এইভাবে দৃশ্যাভিনয়ের পৃথক অস্তিত্ব প্রকাশ পেত। এই প্রথার সুবিধা হল, এখানে দৃশ্য পরিবর্তনের কোনও প্রশ্নই ছিল না। ক্রমে অবশ্য অনেক সময় দেখা যায় যে, প্রয়োজনে কিছু কিছু পরিবর্তন হচ্ছে, তাও আমূল পরিবর্তন নয়, যৎসামান্য। যেমন, দৃশ্যের কোনও ফ্ল্যাটের এক দিকে রয়েছে যে দৃশ্য তার ঠিক উল্টোদিকে রয়েছে অন্য দৃশ্য ;—এই উভয় দিকে দৃশ্যযুক্ত ফ্ল্যাট বা কখনও প্রিজম-আকারের দৃশ্য ব্যবহার করা হতো। দৃশ্য পরিবর্তনের সময় এইগুলি ঘুরিয়ে দিলেই নতুন দৃশ্যের রূপ প্রকাশ পেত। দৃশ্য-পরিবর্তনের সঙ্গে তখন ভ্যানিশিং-ট্র্যাপ-এর ব্যবহার প্রচলিত হয়। এই ট্র্যাপের সাহায্যে অকস্মাৎ আবির্ভাব ও অন্তর্ধান দেখানো সম্ভব হয়।

দৃশ্যের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে হরেকরকম কলাকৌশলের তাগিদ বাড়তে থাকে ; ফলে থিয়েটার হলের গঠন-প্রকৃতির আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিল। এই গঠন-প্রকৃতির পরিবর্তনের প্রধান জায়গাই হল মঞ্চ, অর্থাৎ মঞ্চের উপর এবং নিচে যথেষ্ট স্থানের প্রয়োজন দেখা দিল। পটপরিবর্তনের প্রধান জায়গা মঞ্চের উপর এবং মঞ্চ-বেদীর নিচে। এই সময়ে যতগুলি প্রেক্ষাগৃহ তৈরি হল তাতে রিংগংলফট ও বিলোস্টেজের নির্মাণে বিশেষ জোর দেওয়া হল। রিংগংলফট ও বিলোস্টেজ তৈরি হবার পর দৃশ্যসজ্জার ব্যাপকতা বেড়ে গেল সেই সঙ্গে কলাকৌশলের অসংখ্য চমক উপস্থাপনাকে সমৃদ্ধ করল। মিস্ট্রি-মিরাকল-এর দেবদেবীগণ আগে গির্জার উপরে আবির্ভূত হতেন, এখন তাঁরা সরাসরি মঞ্চের উপর থেকে মঞ্চবেদীতে নেমে এলেন।

এই সময়ের নাট্যকার, পরিচালক ও শিল্প-নির্দেশকগণ এক বিচিত্র সমস্যার মধ্যে বিরাজ করতেন। কোনটি যে ঠিক পথ তা কেউ দৃঢ়ভাবে বলতে পারছেন না! তাদের সামনে রয়েছে বিশ্ববিখ্যাত গ্রীক ট্রাজেডিগুলি, সেনেকার রক্তারক্তি এবং মধ্যযুগীয় মিস্ট্রি-মিরাকল-নাটক। এগুলির হাতছানি এবং সঙ্গে রয়েছে নতুন কিছু সৃষ্টির অনুপ্রেরণা,—সর্বোপরি ব্যালে ও অপেরার অগ্রগতি! এ ভিন্ন তৎকালীন সমাজ, দর্শন ও রাজনীতি তাঁদের আবৃত করে রেখেছে,—টানমাটাল অবস্থা! অথচ এগিয়ে যেতে হবে, নতুনের আহ্বানে তাঁরা প্রায় বেসামাল! এই রকম এক অপরিমিত অবস্থার মধ্যে যখন তাঁরা

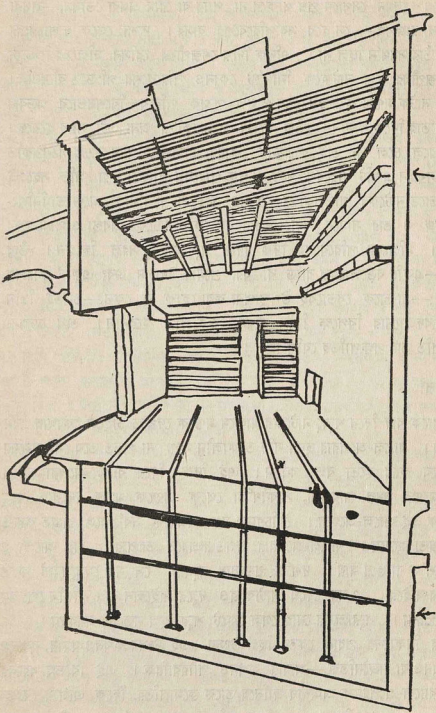

[এই মঞ্চ-পরিকল্পনার প্রধান ভিত ছিল প্রসেনিয়মের উপর দৃশ্য ঝুলিয়ে রাখার জন্য মাচা ও গ্রীড আয়রনের ব্যবস্থা এবং মঞ্চের নিচে উপযুক্ত স্থান রাখা যাতে ট্র্যাপ ও ঠেলা সিন্ অবাধে চলাফেরা করতে পারে।]

বিরাজ করছেন তখন ফরাসি নাট্যকার কয়নেই বললেন, এমন একটি মঞ্চ তৈরি করা হোক যা সর্বপরিবেশের উপযোগী। অর্থাৎ কোনও বিশেষ স্থান বা অবস্থানকে না বুঝিয়ে

সর্বমুখি হোক। যেমন সেখানে প্রশ্ন থাকবে না পারি বা রোম অথবা ভেনিস,—অথবা ক্লিওপেত্রার ঘর বা রাজপথ,— সে হবে সর্বপরিবেশের বাসর। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরের পট পরিবর্তনে তাঁর সমর্থন ছিল না। এদিক দিয়ে শেক্সপীয়র, রেসিন, মলিয়ের কিছুটা বিপরীত। শেক্সপীয়র তাঁর নাটককে নির্দিষ্ট কোনও পরিবেশের গণ্ডিতে বাঁধেননি। তবে তিনি যখন নাটক মঞ্চস্থ করেছেন তখন পৃথক পৃথক পরিবেশ বিশেষভাবে গড়বার চেষ্টা করে পূর্ণতার দিকে যাননি। তাঁর মঞ্চের গঠনপ্রকৃতির জন্য এটা সম্ভব হয়েছে। যতটুকু না করলে চলে না তাই করেছেন। কারণ, এলিজাবেথিয়ন মঞ্চের গঠনপ্রকৃতি এমন ছিল যে সেখানে একটি পরিবেশ থেকে পৃথক পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করা অতি সহজেই সম্ভব ছিল। তাতে নাটকের গতিপ্রকৃতির কোনও তারতম্য ঘটত না। মঞ্চে ভ্যানিশিং-ট্র্যাপ, ইনারস্টেজ ও তার সামনে পর্দা, উপরে ব্যালকনি নাটকের অবস্থা ও পরিবেশের সহায়তা করত। মলিয়ের পরিবেশের দিক দিয়ে খুব সহজ সরল ছিলেন। তাঁর নাটকের দৃশ্য,—একটি বড়লোকের বাড়ি বা ঘর, প্রমোদ-উদ্যানে এবং একটি নগরপথ পেলেই যথেষ্ট ;—তা তাকে যেভাবেই উপস্থাপনা করা হোক না কেন,—তাতেই তিনি সন্তুষ্ট। দৃশ্যবদলানোর বিপক্ষে তিনি কখনও ওকালতি করেননি। তবে ডেকর-সিমুলটানের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব বেশি ছিল।

ব্যালে-অপেরা

ব্যালে ও অপেরাকে বাদ দিয়ে শুধু নাটকের মাধ্যমে মঞ্চকে দেখতে চাইলে কোথায় যেন ভুল থেকে যায়। ব্যালে-অপেরার ছায়া যদি তৎকালীন মঞ্চে না পড়ত তবে সেই সময়ের মঞ্চের মুক্তি যে কবে হতো বলা কঠিন। এই দিক দিয়ে ব্যালে-অপেরা মঞ্চের মুক্তিদাতা। মঞ্চের সমস্ত আবদ্ধতা, সংকীর্ণতা থেকে মঞ্চকে মুক্তি দিয়েছে বহু বিকাশের দিকে এই ব্যালে-অপেরা। বৈচিত্র্যময় মঞ্চ—জগৎকে সর্ব রঙে রঞ্জিত করতে সে সর্বদা সহায়তা করেছে। ব্যালে-অপেরার জগত রঙ্গরসে ভরপুর। তার আলো ও বর্ণের ছটায় দর্শক রাঙিয়ে যায়। দর্শক প্রশংসায় মুখর। সে মঞ্চ মোহসৃষ্টি করত দর্শকের অন্তরে-বাইরে। এ সব দেখে নাট্যকারও দূরে রইলেন না। তিনি পেলেন নতুন সৃষ্টির প্রেরণা। পুরাতনের মোহ গেল কেটে, শুরু হল নতুনের জয়যাত্রা।

ব্যালে-অপেরার বিকাশের প্রধান কেন্দ্র ছিল উৎসব,—এই উৎসব কখনও ধর্মীয়, কখনও সামাজিক, কখনও-বা রাজনৈতিক,—আবার কখনও পারিবারিক। এই বিভিন্ন ধরনের উৎসবের মধ্যে ব্যালে-অপেরাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাকে ক্রমোন্নতির দিকে এগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১৬০০-র প্রথম দিকে দেখা যায় অতি সাধারণ অর্থাৎ তৎকালীন সমাজের নিম্নস্তরের লোক এই দৃশ্যশিল্পের উদ্যোক্তা। তখনকার উন্নততর মঞ্চশিল্প রাজপ্রাচীরে বন্দী থাকায় সাধারণ লোক এর সংস্পর্শে আসতে পারত না। তাই তারা নিজেরাই আনন্দলাভের মাধ্যম হিসাবে সৃষ্টি করল এই ব্যালে-অপেরা। এই মঞ্চশিল্পের প্রকাশের মাধ্যম নৃত্য-সঙ্গীত [কণ্ঠ ও যান্ত্রিক] ও আবৃত্তি, আবার সঙ্গে কোথাও

প্যান্টোমাইম। এর বিষয়বস্তু ছিল রূপকগল্প অথবা ধর্মীয় প্রচার। ব্যালে-অপেরার প্রথমাবস্থায় হাটে-মাঠে-ঘাটে একটি উঁচু বেদী এবং তার তিনদিক একটু ঘেরা হলেই অনুষ্ঠান অতি-সহজে হতে পারত। ক্রমে এর জনপ্রিয়তা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে রাজদ্বারে আমন্ত্রণ পেল। অনুষ্ঠানের চমকে ও আকর্ষণে রাজপ্রাসাদ আন্দোলিত হল। ফলে এই শিল্পের তাগিদে কিছু নতুন মঞ্চ জন্ম লাভ করল।

রাজানুগ্রহ পাবার পর ওই মহাদেশে হল তার প্রচার। বিভিন্ন রাজপ্রাসাদ থেকে আন্তরিক স্বাগত জানান হল। ইতালি থেকে বিভিন্ন সংগঠন গেল সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। অন্যান্য দেশের শিল্প ও রসিক দর্শক পেল নতুনতর শিল্পের সন্ধান। বিস্ময়ে ও আনন্দে তাঁরা নিজেদের দেশে অনুকরণ করলেন এই শিল্পের উৎকর্ষ ও রীতি।

প্রথমাবস্থায় ব্যালে অপেরায় কোনও নাটকীয় কাহিনীর স্থান ছিল না। এর বিশেষ দৃশ্য সংঘটিত হতো বিশেষ কোনও ঘটনাকে কেন্দ্র করে; এমন কি ঘটনাবলির মধ্যে পারম্পর্য বা সম্বন্ধ না থাকাও অসম্ভব ছিল না। এর বড় আকর্ষণ ছিল নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করা,-অর্থাৎ অ্যাকশন এবং ম্যানায়। ম্যানায়ের প্রশ্নে আবার যে যার দেশের প্রচলিত রীতির উপরই নির্ভর করত। এর সঙ্গে মিলিত হতো সঙ্গীত ও নৃত্য। প্রচলিত চরিত্র রূপায়ণে প্রচলিত পোশাকও যথেষ্ট সাহায্য করত। কয়েকটি ঘটনা বা দৃশ্য মিলে একটি পূর্ণ ব্যালে বা অপেরার অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হতো। এই সব অনুষ্ঠানের প্রধান দিক ছিল হাস্যরসে পূর্ণ অথবা মন মাতানো সঙ্গীত ও চোখ ধাধানো দৃশ্যে ভরা। ধীরে ধীরে এতে পূর্ণ কাহিনী সংযোজিত হল।

ব্যালে অপেরার অগ্রগতির সঙ্গে মঞ্চের রূপ এবং মঞ্চ-ব্যবহারের বৈচিত্র দেখা দিল। এই সময়ে যে সব নতুন মঞ্চ তৈরি হল তাতে মঞ্চবেদীকে বাদ দিয়েও মঞ্চের তিনদিকের ব্যাপক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। যান্ত্রিক যোগাযোগ যাতে সহজে হতে পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়েছিল। কারণ, এই সময়ের মঞ্চে যন্ত্রের ব্যবহার চালু হয়। এই সব যন্ত্র দৃশ্যসজ্জা ও চরিত্র বিশেষের আবির্ভাব ও প্রস্থানে বিরাট সাহায্য করত। নিত্যনতুন যন্ত্রের উদ্ভাবন এবং তাকে মঞ্চের প্রয়োজনে ব্যবহার তৎকালীন শিল্প নির্দেশকদের বৈশিষ্ট্য ছিল। এই সময়ে দৃশ্যসজ্জাকরদের স্থান মঞ্চে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এমনকি এও দেখা গেছে যে তারা নতুনতর দৃশ্য সৃষ্টি করবার পর নাট্যকারদের দেখিয়ে বলতেন, এই দৃশ্যানুসারে গল্প লিখতে এবং নাট্যকারগণও এই প্রথাকে অনুসরণ করে চলতেন। একই প্রকার দৃশ্যের পুনরাবৃত্তিকে তখনকার দর্শক ও দৃশ্যসজ্জাকর পছন্দ করতেন না। ফলে নতুন নতুন দৃশ্য উদ্ভাবন করা হতো। এই উদ্ভাবনের জন্যে মঞ্চের চতুর্দিকের ব্যবহার একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। যার ফলে নতুন মঞ্চ-পরিকল্পনায় মঞ্চের সর্বদিক যাতে ব্যবহার করা যায় সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হতো। যেমন মঞ্চবেদীর উপর প্রচুর স্থান রাখবার রীতি, মঞ্চবেদীর নিম্নে, বেদীর ডাইনে-বাঁয়ে ও পেছনে প্রয়োজনীয় স্থান রাখবার রীতি প্রচলিত হয়। পূর্বের মঞ্চে এইসব সুযোগ সুবিধা মোটেই ছিল না, তখন হয়ত এর কোনও প্রয়োজনও হয়নি।

একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে, এই ব্যালে অপেরা অনুপ্রাণিত হয়েছিল কমেডি-ডেল-আর্ট-এর দ্বারা। এর অগ্রগতিকে সাহায্য করে সমসাময়িক সম্প্রদায়, যারা কমেডি-ডেল-আর্ট আন্দোলনে যুক্ত ছিল। এই শিল্প সৃষ্ট হয়েছিল গণশিল্পীয় দ্বারা এবং এর প্রথম লক্ষ্য ছিল অতি সাধারণ মানুষকে আনন্দ দান করা। ব্যাপকতা বেশি থাকার জন্য তৎকালীন মঞ্চের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে একে উপযুক্তভাবে উপস্থাপিত করা যেত না। রাজপ্রাসাদ থেকে ডাক আসবার পর এঁরা কিন্তু থিয়েটার অব দি কিং-এর মঞ্চে তাঁদের শিল্পকে উপস্থাপনা করলেন না। কারণ এ মঞ্চ ছিল আকারে ছোট। তাই তাঁরা বেছে নিলেন রাজার বলরুমকে। যেহেতু এইসব বলরুম আকারে মঞ্চের থেকে বৃহৎ ছিল। বলরুমকে সমান ভাগে ভাগ করে নেওয়া হতো। এর একাংশ দর্শকের এবং অপরাংশ মঞ্চ। দর্শকদের অংশে বসবার চেয়ারের ব্যবস্থা ছিল। দর্শক-আসনের পেছনে একটি উঁচু বেদীতে রাজধানী ও বিশেষ অতিথিবৃন্দ বসত। মঞ্চবেদী বলে কিছু ছিল না বললেই হয়। ঘরের মেঝেই ছিল মঞ্চবেদী। তবে সম্ভব হলে একে একটু ঢালু করা হতো দর্শকের দিকে।

কোর্টের হলঘরে ব্যালে অপেরা। হল ঘরের পেছনের দিকে বিভিন্ন দৃশ্য সম্বলিত একটি পেজেন্ট রয়েছে।

প্রথমাবস্থায় ব্যালে-অপেরার দৃশ্যসজ্জা বলতে ডেকর-সিম্বলটানেকে অনুসরণ করা হতো। পরে অবশ্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এর রূপান্তর হয়। এই রূপান্তরের প্রথম দিকে দেখা যায় যে, কতকগুলি জীবন্ত ছোট ছোট গাছ রাখা হয়েছে,—অর্থাৎ বনের দৃশ্য। আবার কোথাও দেবপুরীর অথবা পাহাড়-পর্বতের কাট-আউট। অভিনেতারা এর ভিতর দিয়ে যাওয়া-আসা করত। মঞ্চের পেছনের দেওয়ালে একটি অঙ্কিত পর্দা থাকত। প্রয়োজনে একটি উঁচু বেদী এর সামনে স্থাপন করা হতো। কখনও উপর থেকে ঝাড়-লণ্ঠন, কখনও বা ওইসব গাছে ফুল লাগিয়ে দৃশ্যের চাকচিক্য বাড়ানো হতো।

নবজাগরণের প্রথম থেকে অনেক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে, অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে, নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে রূপ নেয় আজকের মঞ্চ। এই ইতিহাসের মধ্যে বিরাজ করছে জানা অজানা অনেক চিন্তা-চেতনা, বহুমুখি প্রতিভার সমন্বয়, শিল্পী-নাট্যকার-পরিচালক-শিল্পনির্দেশক ও কলাকুশলীদের সম্মিলিত অকৃত্রিম প্রচেষ্টা, তবেই-তো আজকের মঞ্চ একটা স্থিতিশীল রূপ নিয়েছে।

স্বদেশ : দুষ্টক্লাইভ, বন্ধুক্লাইভ

ক্লাইভের দলবল বুঝেছিল যে, সতত অস্ত্র-আস্ফালনের মধ্য দিয়ে দেশের লোকের হৃদয় জয় করা সম্ভব নয়। একটা আধুনিক সমাজ থেকে এসে অবিরাম অস্ত্রের ঝনঝনানি শুনতে তাদেরও আর ভাল লাগছিল না; সাংস্কৃতিক মনের চাহিদা মেটাতে চাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান,—চাই সঙ্গীত-নৃত্য ও নাট্যানুষ্ঠান। এদেরই কতিপয়ের নেতৃত্বে সংগঠিত হতে শুরু হল নানান ঘরোয়া অনুষ্ঠান, ঘরোয়া অনুষ্ঠান থেকে ক্লাব-অনুষ্ঠান; ক্রমে এই মানসিকতার মধ্য দিয়েই জন্ম নিল চৌরঙ্গি ও সাঁ সুসি থিয়েটার।

এদের এইসব অনুষ্ঠান দেখে বঙ্গসন্তানদের মনেও উদ্দীপনা সৃষ্টি হল। তারা এই উদ্দীপনার ফলে বেশিদিন আর সাক্ষীগোপাল হয়ে থাকতে নারাজ। নিজেরা কিছু করবার তাগিদ অনুভব করল।

পলাশির পর প্রায় সত্তর বছর ধরে চলেছিল এই সার্বিক প্রস্তুতি। তারই আশু ফল দেখা গেল ১৮৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রীপ্রসন্নকুমার ঠাকুরের নারিকেলডাঙার বাগান বাড়িতে। প্রতিষ্ঠিত হল—হিন্দু থিয়েটার। ইংরেজি শিক্ষিত নব্য বাঙালিদের দ্বারা ইউরোপীয় ভাবধারায় নাট্যানুষ্ঠান করবার প্রথম প্রচেষ্টা। ১৮৩১ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর 'সমাচার দর্পণ'-এ দেখতে পাওয়া যায়: 'ঐ নতনশালা ইংগলণ্ডীয়দের রীতানুসারে প্রস্তুত হইবেক এবং তন্মধ্যে যে সকল নাটকের ক্রীড়া হইবে সে সকল ইংগলণ্ডীয় ভাষায়।' ১৮৩১ সালের ২৮ ডিসেম্বর এই মঞ্চের প্রথম অভিনীত নাটক সেক্সপীয়রের "জুলিয়াস সিজার" নাটকের অংশবিশেষ ও উলসন কর্তৃক অনূদিত ভবভূতির "উত্তররাম চরিত"। অভিনয়ের দিনে উপস্থিত ছিলেন—স্যার এডোয়ার্ড রায়ান, কর্নেল

ইয়ং, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ। ক্লাইভের সেতুবন্ধন এখানেই সার্থক হল। প্রথমত, নব্য-শিক্ষিত কৃতী বঙ্গসন্তানগণ ইউরোপীয় মঞ্চের ভাবধারায় ইংরেজি নাটক করলেন; দ্বিতীয়ত, বণিকবেশী ইংরেজগণ এদেশের ভাষা শিখে এদেশের দর্শন, সাহিত্য ও নাটক অনূদিত করে বিশ্বজনের দরবারে উপস্থিত করলেন। এইরকম ইংরেজিতে অনূদিত একটি নাটক 'উত্তররামচরিত' এখানে অভিনীত হল। যদিও হিন্দু থিয়েটারের আকর্ষণ সর্বজনীন ছিল না, কারণ এখানে সর্বসাধারণের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল না এবং সেই সঙ্গে অভিনীত নাটকগুলি দেশীয় ভাষায় না হয়ে ইংরেজিতে হয়েছিল।

সেই কারণে বোধহয় বঙ্গজননীর অভিমান ও আক্ষেপের শেষ ছিল না, তিনি তাঁর সুকন্যাকে পাঠালেন দরবার করতে। সুকন্যা তার অন্তরের অকৃত্রিম ব্যাকুলতা-আবেগ-উদ্দীপনা নিয়ে গেয়ে চলেছে, 'আমার হাত ধরে—তুমি নিয়ে চলো সখা···।' এ সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় আবিষ্ট হয়ে ব্রিটিশকন্যা তার অন্তরের সবটুকু দরদ ঢেলে দিয়ে গাইতে শুরু করল, 'মুক্ত কর, মুক্ত কর, অন্ধকারের এই দ্বার···।' অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে কে যেন মৃদু-কণ্ঠে বলল, 'নিজের করে নে, নিজের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দে, মায়ের কণ্ঠের ভাষায় মেলা'—ভেসে এল সুললিত বীণার ঝঙ্কারে, 'ওরে বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি,··· যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে!··· মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে॥' সচকিত হয়ে উঠল বঙ্গসংস্কৃতির সুসন্তানদল। প্রতিষ্ঠিত হল ১৮৩২-৩৩ সালে শ্যামবাজারের শ্রীনবীনচন্দ্র বসুর উদ্যোগে প্রথম বাংলা নাটকের অভিনয়ের জন্য একটি রঙ্গালয়। এই মঞ্চে যেমন বাঙলায় নাটক অভিনীত হতো সেই সঙ্গে এখানে নাটকের মহিলা চরিত্রে মহিলারা[১] অভিনয় করতেন। ১৯৩৫ সালের ৬ অক্টোবর এই মঞ্চে "বিদ্যাসুন্দর" নাট্যাকারে অভিনীত হয়। তৎকালীন "হিন্দু-পাইয়োনিয়ার" নামে ইংরেজি পাক্ষিক পত্রিকায় সবিস্তারে এই অভিনয়ের প্রতিবেদন পাওয়া যায়। পত্রিকার মন্তব্যানুসারে—যদিও বাংলায় অভিনীত নাটক কিন্তু প্রয়োজনীয় সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য মঞ্চ-প্রথাকে অনুসরণ করা হয়েছে। এই নাটকে যে সব অঙ্কিত দৃশ্য ব্যবহার করা হয়েছে তা মোটেই সর্বাঙ্গসুন্দর হয়নি। পারস্পেকটিভ রীতিতে অঙ্কিত দৃশ্যগুলি ছিল অপরিমিত। চিত্রাঙ্কনের রীতিজ্ঞানের অভাব বেশ সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল।

পলাশির প্রান্তরে যে নয়া-ইতিহাসের পত্তন হয়েছিল, হয়েছিল সাতসমুদ্র তেরোনদীর পেরিয়ে যে সেতুবন্ধন,—এই দুই মঞ্চ সেই বন্ধনের প্রথম ও ঐতিহাসিক রূপরেখা।

এরপর বঙ্গসংস্কৃতি সুকন্যা কত সুরে কত ব্যঞ্জনায় কত সাজে মাতিয়ে তুলল সকলকে। কখনও সে পাশ্চাত্য পোশাকে পিয়ানোর তালে তালে, কখনও সে ঘাঘরা আর সালোয়ার

১. এই রঙ্গালয়ের পূর্বেও মহিলাদের অভিনয় করতে দেখা যায় যাত্রামঞ্চে। ১৮৪৯ সালের মার্চমাসে জোড়াসাঁকো নিবাসী শ্রীরামচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে নন্দবিদায়-যাত্রা অভিনীত হয়। এই যাত্রা-পালায় মেয়েদের প্রথম আসরে নামতে দেখা যায়।

পরে সারেঙ্গির বিলম্বিত লয়ে ঘুঙুরের রুনুঝুনুর মধ্য দিয়ে বা উত্তেজিত জাহানারার দীপ্ত ভাষণে, কখনও বা নিয়তি বা দেবদাসীর কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে, কখনও বা লেডি ম্যাকবেথ হয়ে সমগ্র রঙ্গভূমিকে বিমোহিত করে তুলল। এইভাবে সে ছুটে বেড়াতে লাগল স্থান হতে স্থানান্তরে। স্থায়িত্বলাভ করতে পারছে না। ফলে এই অস্থায়ী ব্যবস্থার মধ্যে সে সম্পূর্ণ বিকশিত হতেও পারছে না।

চৌরঙ্গি ও সাঁ সুসি থিয়েটার থেকে যে আলোর বিচ্ছুরণ হয়েছিল, তাতেই আলোকিত হিন্দু থিয়েটার ও শ্রীনবীনচন্দ্র বসুর থিয়েটার। এই দুটি থিয়েটার যে উৎসাহ ও আবেগ সৃষ্টি করেছিল তারই এক প্রকাশ শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ। এই সময় এই সব উদ্যোগের প্রভাব কলকাতার আশেপাশে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে দুটি অভিনয়-রজনীর খবর পাওয়া যায়, তার প্রথম নাটক "বেণীসংহার" ১৮৫৭ সালের ১১ এপ্রিল মঞ্চস্থ হয় এবং দ্বিতীয় নাটক "বিক্রমোর্বশী" ১৮৫৭ সালের ২৪ নভেম্বর অভিনীত হয়। এই সব অভিনয় যাঁরা দেখতে আসেন "হিন্দুপেট্রিয়ট"-এর [১৮৫৭ সালের ৩ ডিসেম্বর] মতে,—'বুদ্ধি, সুরুচি, বিজ্ঞতা, বিলাস ও সম্ভ্রমে কলিকাতা ও কলিকাতার উপকণ্ঠের দেশীয় সমাজের যাঁহারা প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন, তাঁহারা সকলেই মহার্ঘ শীতবস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অভিনয়স্থলে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু নিমন্ত্রিতের সংখ্যা নাট্যশালার আয়তনের অনুপাতে বেশী হইয়াছিল। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত শুনিলাম, দর্শকের ভিড়ের জন্য চৌরঙ্গীর অভিজাতবর্গের মধ্যে অনেকে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।' পরিশেষে "হিন্দুপেট্রিয়ট" এই বলে তার বক্তব্য শেষ করেছে—'এইরূপ একটি নাট্যশালা চিরস্থায়ী হওয়া উচিৎ।'

"হিন্দুপেট্রিয়ট"-এর বক্তব্যের মধ্যে দুটি ছবি খুব পরিষ্কার বেরিয়েছে। তখনকার দিনে নাটক দেখবার আগ্রহ ও উৎসাহ কলকাতাবাসীদের প্রচুর পরিমানে ছিল এবং সেই সঙ্গে এই উদ্দীপনার জন্য যে স্থায়ী মঞ্চের বিশেষ প্রয়োজন, সেই দিকটিও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

এতদিন ধরে যে সব নাট্যশালার প্রতিষ্ঠার কথা পাওয়া গেল, তাদের স্থায়িত্ব তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। ধনীব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় সেগুলি পরিচালিত হলেও তাকে ধরে রাখা যায়নি। অর্থের টান পড়লেই এই সব প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নিয়েও টানাটানি শুরু হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সর্বজনীন চেহারা না থাকলে একজন বা পরিবারের কতিপয় অতি উৎসাহী যোগ্যলোকের দ্বারা পরিচালিত হলেও তার বৃহৎ খরচখরচা চালিয়ে যাওয়া খুবই কষ্টকর। তাই এদের অবলুপ্তি ঘটেছে নীরবে ও নিভৃতে। এইসব ঘটনা সর্বজন বিদিত তবুও নাট্যক্রীড়াতে এমনই এক অমোঘ আকর্ষণ আছে যা সর্বসময়ে শিক্ষিত-অশিক্ষিত মানুষকে টানে, শত দুঃখ ব্যথার মধ্যেও মানুষ উৎসাহিত হয় এবং এই শিল্পকে উপস্থাপিত করতে আপ্রাণ লড়ে যায়! এ শিল্প চিরন্তন গতিশীল, এর আদি-অন্তের মূল মানুষের মনের গহ্বরে নাড়া দিয়ে মানুষকে আকর্ষিত করে, এগিয়ে নিয়ে

যায় আগ্রহের সঙ্গে। আরও পরিণতির দিকে অগ্রসর হবার প্রেরণা জোগায়। এ শিল্পের নিত্য-নতুন সৃষ্টির আকুতি এবং তার প্রকাশ ও বিকাশ ঘটাতে সতত অকৃপণ প্রচেষ্টা চলেছে বিশ্বময়। অন্যান্য শিল্পে প্রকাশ সহজ হলেও তার ভাষা সৃষ্টি করা খুবই কঠিন। তুলি-রঙ-কাগজ নিয়ে একটি গাছ আঁকা সহজ কিন্তু তাতে শিল্পের ভাষা সৃষ্টি করা কঠিন। আর ভাষা না থাকলে সে তো নিছক একটি গাছের অঙ্কিত অনুরূপ, শিল্পের মর্যাদা কোথায়? তা কাউকেই আকর্ষণ করতে পারে না। কিন্তু যদি দেখা যায় গাছটি হাওয়ায় হিল্লোলিত বা ঝড়ের গতির সঙ্গে প্রবাহিত, তার প্রতিটি শাখায়-প্রশাখায়, পল্লবে ফুটে উঠেছে ঝড়ের ভয়ঙ্কর রূপ তবেই সে সার্থক, তার শৈল্পিক চরিত্র ও ভাষা প্রকাশিত ;—তখন সে শিল্প মর্যাদা পাবে, আলোড়িত করবে শিল্পরসিকের মনকে। সেক্ষেত্রে নাট্যশিল্পের ব্যাপারটা একটু পৃথক, কারণ নাটকে একটা আটপৌরে ভাষা থাকে কিন্তু শিল্প থাকে না। শিল্প সৃষ্টি করতে হয়। সেখানে রঙ-আলো-শব্দ-পোশাক পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, বাহিক ও আঙ্গিক অভিনয়—সব মিলিয়ে শিল্পের সৃষ্টি হয়, শিল্পের ভাষা তৈরি হয়। কোনও কিছুর অপরিমিত ব্যবহারে শিল্পরসের ব্যাঘাত ঘটে, বিচ্যুত হয় ধ্রুপদী শিল্প সত্তা হতে।

পূর্বসূরীদের এই সব নাট্যপ্রচেষ্টা ক্রমে নাট্যশিল্পকে পরিণতির দিকে এগিয়ে দিয়েছে। তাঁদের আত্মত্যাগ, জিগীষা, চিন্তা চেতনার প্রক্রিয়া প্রতি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে গেছে,—তারই একটি প্রকাশ বেলগাছিয়ার নাট্যশালা। এই নাট্যশালা সম্পর্কে মধুসূদন বলেছেন, 'যদি ভারতবর্ষে নাটকের পুনরুত্থান হয়, তবে ভবিষ্যৎ যুগের লোকেরা এই দুইজন উন্নতমনা পুরুষের কথা বিস্মৃত হইবে না,—ইঁহারাই আমাদের উদীয়মান জাতীয় নাট্যশালার প্রথম উৎসাহদাতা।'

মধুসূদনের কথা যে কত সত্য তা "রত্নাবলী" নাটকের নানান প্রতিবেদন থেকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এই নাটকের অভিনয়ের পর উপস্থিত দর্শক সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, কি অভিনয়ে, কি দৃশ্যসজ্জায়, কি গীতবাদ্যে, কি পোশাকে সর্বাঙ্গসুন্দর নাট্যাভিনয় এর আগে দেখা যায়নি। প্রচুর অর্থ ব্যয় করে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ এবং তাঁর ভাই ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের নেতৃত্বে বেলগাছিয়ায় তাঁদের বাগানবাড়িতে এই নাট্যশালাটি প্রতিষ্ঠিত হয়! এই মঞ্চগৃহটির পরিকল্পনায় ছিলেন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে এই মহান মঞ্চের কোনও রূপরেখা (Ground Plan) আমাদের সন্ধানে নেই। যা আছে তা হল তৎকালীন কিছু পত্রিকা ও যশস্বী লোকের নিজস্ব বক্তব্য। এর থেকে কিন্তু পুরো ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উপলব্ধি হয় না। তবে বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, "রত্নাবলী"র উপস্থাপনা পূর্ব উপস্থাপনা থেকে অনেক উন্নত ও যুক্তিযুক্ত ছিল। শুধু তাই নয়, নাটকের সর্বশাখায় সমযত্নবান হওয়ার ফলে নাটকটি সর্বাঙ্গীন পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। নাটকের পোশাক ও দৃশ্যপট যে যথেষ্ট সুন্দর হয়েছিল সে কথা স্বীকার করে নিয়েও বলতে হয়, তার ন্যূনতম নিদর্শন বা বিশদ বর্ণনা আমাদের সামনে নেই। শুরু থেকে এ

পর্যন্ত একটা ব্যাপারে সকলেই নীরব,—তা হল আলো। অর্থাৎ সেই সময় মঞ্চ-আলোকিত করতে কী প্রকার আলোর ব্যবস্থা ছিল। বা, দৃশ্যের ভাবানুসারে তার অবস্থার কোনও পরিবর্তন করা হতো কিনা, তা জানা যায় না। এ ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ অন্ধকারে আছি। তৎকালীন প্রচলিত আলোর ব্যবহার নিশ্চয়ই হয়েছিল, কিন্তু কখন কী অবস্থায় তার ব্যবহার হতো বা একই অবস্থানের মধ্যে পুরো নাটক অভিনীত হতো কি-না তা স্পষ্ট নয়। তবে যুক্তিতর্ক দিয়ে বিশ্লেষণ করলে হয়ত মনে করা যায় যে অবস্থানের কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন না করেই নাটকটি অভিনীত হতো।

শ্রীহর্ষের "রত্নাবলী" অবলম্বনে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন নাটকটি বাংলায় লেখেন। নাটকটির প্রথম অভিনয় রজনী ১৮৫৮ সালের ৩১ জুলাই, শনিবার। রাত সাড়ে আটটায় অভিনয় শুরু হয় এবং শেষ হতে প্রায় ছয়ঘণ্টা সময় লাগে। এই নাটকটি বেলগাছিয়া নাট্যশালায় ছয়-সাত বার অভিনীত হয়।

এই নাটকটির উপস্থাপনায় তৎকালীন বঙ্গসমাজের যাঁরা শিক্ষাবিদ, সমাজসংস্কারক, চিন্তাবিদ, দার্শনিক, পণ্ডিত, সাহিত্যিক-কবি প্রমুখ দিকপাল সকলেই সমবেত হয়েছিলেন। এই কারণে "রত্নাবলী" নাটকটি বঙ্গনাট্য ইতিহাসে একটি বিশেষ দিকচিহ্ন হিসাবে বিরাজ করছে। দর্শকগৃহে উপস্থিত ছিলেন রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পণ্ডিত রামনারায়ণ ন্যায়রত্ন, মধুসূদন দত্ত, গৌরদাস বসাক, বাংলাদেশের গভর্নর স্যার হ্যালিডে, হিউম, ডাক্তার গুডইব চক্রবর্তী এবং আরও অনেকে।

রত্নাবলী নাটক বিদেশিদের বোধগম্যের জন্য মধুসূদন কর্তৃক ইংরেজিতে অনুবাদ করে পূর্বেই বিলি করা হয়েছিল। এই অনুবাদ করা এবং রত্নাবলীর অভিনয় মধুসূদনের জীবনে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এই অনুবাদের মধ্যে যেমন তাঁর কবিমানসের বিকাশ ঘটেছিল সেই সঙ্গে তাঁকে নতুন আঙ্গিকে নাটক লেখার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল—তারই আশুফল "শর্মিষ্ঠা" নাটক। "রত্নাবলী"র অনুপ্রেরণার মধ্য দিয়েই আমরা বাংলা সাহিত্যের এক মহাকবি ও নাট্যকারকে পেয়েছিলাম।

"শর্মিষ্ঠা" নাটকটি বেলগাছিয়া নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হয় ১৮৫৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর। নাটকটি ওই নাট্যগৃহে ছয়বার উপস্থাপিত হয় এবং শেষ অভিনয়ের তারিখ ১৮৫৯ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর।

তৎকালীন বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই নাটক দেখে চমৎকৃত হয়েছিলেন এবং সকলেই একবাক্যে মধুসূদনকে উৎসাহিত করেছিলেন। এ নাটকের অভিনয় দেখে মধুসূদন নিজেই বলেছিলেন, 'things to dream, not to tell.'

বেলগাছিয়া নাট্যশালা সম্বন্ধেও এই কথাটি প্রযোজ্য—'Things to dream, not to tell', কারণ এই সময়ে নাট্যপিপাসু রসিকজনের মনে মঞ্চটি যেভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা 'not to tell'-এর মতো। তখন বাংলাদেশে বিশেষ করে কলকাতায় নাটক-করা নিয়ে এক মহোৎসব শুরু হয়ে যায়। এইসব দেখে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর

মধুসূদনকে লেখেন : 'এক্ষণে দেশে নাট্যশালা ব্যাঙের ছাতার মত গজাইয়া উঠিতেছে। দুঃখের বিষয় এগুলি স্থায়ী হয় না। তবু এগুলি সুলক্ষণ বলিয়াই গণ্য করা উচিৎ ; কারণ, ইহাদের দ্বারা বুঝা যায় যে আমাদের মধ্যে নাটক সম্বন্ধে রুচির প্রসার হইতেছে।' এর থেকে বোঝা যায় যে, স্থায়ী মঞ্চের জন্য মানুষ বেশ উদগ্রীব, উৎসাহী ও আক্ষেপের মধ্যে আছে। এইটেই বোধ হয় বেলগাছিয়া নাট্যশালার সবচেয়ে বড় অবদান এবং স্মরণীয় কীর্তি। ১৮৫৯ সালে ২৭ সেপ্টেম্বর এই মঞ্চগৃহে শেষ অভিনয় হয়।

ইউরোপের কোর্টথিয়েটারের যে চরিত্র ছিল এ দেশেও ওই একই প্রকৃতির নাট্যাভিনয় হতে আরম্ভ করল রাজা ও ধনীগৃহের আবেষ্টনীর মধ্যে। আসলে সামন্তদের মধ্যে এ এক অলিখিত প্রতিযোগিতা,—মর্যাদার লড়াই। নিজেদের 'আমি কি কমতি আছি'—মার্কা গরিমা পরস্পরের মধ্যে দেখাতে না পারলে সমাজে আসন পাওয়া যায় না,—এই চিন্তা থেকেই এ-সকল নাট্যানুষ্ঠানের সূত্রপাত। এতে উদ্যোক্তাদের আর্থিক ক্ষতি নিশ্চয়ই হয়েছে, কিন্তু লাভ হয়েছে মঞ্চশিল্পের, নাটকের, সঙ্গীতের অর্থাৎ নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত সব শাখার। প্রতিটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ঘটেছে নাটক উপস্থাপনার অগ্রগতি। কারণ যাঁরা এই সব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন, তাঁরা সকলেই শিক্ষিত, জ্ঞানী, পণ্ডিত এবং তৎকালীন বঙ্গসমাজের এক-একজন দিকপাল। এঁদের নিকট বঙ্গনাট্যশিল্প সর্বতোভাবে ঋণী ও কৃতজ্ঞ।

এই সময়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে সমাজে বিধবাবিবাহ নিয়ে আন্দোলনের ঢেউ বয়ে চলেছে। এই আন্দোলনের পক্ষে যেমন সমর্থন ছিল আবার বিরোধিতাও ছিল। নাটকের ধর্ম—সে সমসাময়িক ঘটনাকে আশ্রয় করে তার দর্পণের মাধ্যমে চিন্তা চেতনাকে জনমানসে পৌঁছে দেয়। এতদিন নাটকের বিষয়বস্তু ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল, আজ তার পরিবর্তন শুরু হল। লেখা হল বিধবাবিবাহ নিয়ে বেশ কিছু নাটক। এই ধারার সূত্রপাত হয় ১৮৫৬ সাল থেকে। এই ধারা সাবলীল গতিতে প্রবাহিত না হলেও এর বলিষ্ঠ প্রকাশ ঘটে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে।

১৮৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে "শর্মিষ্ঠা" নাটকের শেষ অভিনয়ের পর বেলগাছিয়া নাট্যশালার কর্মকাণ্ড স্তব্ধ হয়ে যায়। এরপর সমাজসংস্কারমূলক বিষয়—বিধবা-বিবাহ নিয়ে কিছু নাটকের অভিনয়ের সংবাদ ছাড়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাট্যাভিনয়ের কথা জানা যায় না। নাট্যানুষ্ঠানের গতির প্রাবল্য অনেক প্রশমিত হয় এবং বেশ কিছু-দিন বন্ধও থাকে। যদিও পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-গোষ্ঠীর আদিবাড়িতে ১৮৫৯ সালে এবং ১৮৬০ সালের ৭ জুলাই "মালবকাগ্নিমিত্র"-নাটকের দুইবার অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়।

পাথুরিয়াঘাটা নাট্যশালার গৌরবজনক অধ্যায় শুরু হয় রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নেতৃত্বে ১৮৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে। "বিদ্যাসুন্দর"-এর অশ্লীল ইঙ্গিত সব বাদ দিয়ে,—"বিদ্যাসুন্দর" ও একটি প্রহসন,—"যেমন কর্ম তেমনি ফল" নাটক দুটির প্রথম

অভিনয় হয়। এই দুটি নাটকের দ্বিতীয় অভিনয় হয় ১৮৬৬ সালের ৬ জানুয়ারি,—মোট অভিনয়ের সংখ্যা আট-নয় বার। এরপর ১৮৬৬ সালের ১৫ ডিসেম্বর "বুঝলে কিনা" নামে একটি প্রহসনের অভিনয় হয়। ১৮৬৯ সালের ১৪ জানুয়ারি রামনারায়ণ তর্করত্নের "মালতীমাধব" নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। এই নাটকটি দশ-এগারো বার অভিনীত হয়। ১৮৭০ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি "মালবিকাগ্নিমিত্র" নাটকের সঙ্গে দুটি প্রহসন,—"চক্ষুদান" ও "উভয় সঙ্কট" অভিনীত হয়। এরপর বেশ কিছুদিন নাট্যানুষ্ঠান বন্ধ থাকে। শেষে ১৮৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি, ১০ ফেব্রুয়ারি ও ৫ মার্চ "রুক্মিণী-হরণ" ও "উভয় সঙ্কট" সর্বসুদ্ধ দশ-এগারো বার অভিনীত হয়। "রুক্মিনীহরণ" ও "উভয় সঙ্কট"-এর শেষ অভিনয় হয় ১৮৭৩ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি।

এই প্রথম দীর্ঘ নয় বছর একটি রঙ্গালয়ের স্থায়িত্বের খবর পাওয়া গেল। যদিও ধারাবাহিক কোনও অনুষ্ঠান এখানে হয়নি তবুও সুযোগমতো নাট্যানুষ্ঠান হয়েছে যা সাংস্কৃতিক আবহাওয়াকে বজায় রেখেছে, করেছে উদ্দীপ্ত ও উৎসাহিত। যা সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রাথমিক সূচনার উন্মেষ হিসাবে কাজ করেছে। পাথুরিয়াঘাটা নাট্যশালা বাংলা স্থায়ী ও পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের প্রচ্ছদপট। এত দীর্ঘদিন কোনও মঞ্চের অস্তিত্ব টিকে থাকেনি, সেইজন্য ইতিহাসে এর একটি বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট আছে।

সাধারণ নাট্যশালার ভিতস্থাপনের মূলে পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়া নাট্যশালা [১৮৫৮-১৮৫৯] এবং যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়িতে—পাথুরিয়াঘাটা নাট্যশালার [১৮৬৫-১৮৭৩] ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দুই মঞ্চ-পরিচালকদের যদি উপস্থাপিত নাট্যক্রীড়ায় উৎসাহ, সহযোগিতা ও একনিষ্ঠ অংশগ্রহণ না থাকত তবে বোধহয় সাধারণ মঞ্চের ইতিহাসের জন্যে আরও বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হতো। সেইজন্য এই দুই মঞ্চের কর্মকাণ্ড সর্বকালে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার যোগ্য।

নাট্যানুষ্ঠান যখন চারিদিকে হইচই সৃষ্টি করেছে তখন শোভাবাজার রাজবাড়ি নিষ্ক্রিয় নিশ্চেষ্ট থাকে কী করে? অচিরেই শুরু হল মহড়া। শেষে ১৮৬৫ সালের ১৮ জুলাই মঞ্চস্থ হল,—"একেই কি বলে সভ্যতা"। নাট্যকার—মধুসূদন দত্ত, স্থান—শোভাবাজার নাট্যশালা। এই নাটকটি মঞ্চস্থ করার মধ্যদিয়ে নাট্য—পরিচালকদের প্রগতিশীল মানসিকতার পরিচয় পাওয়া গেছে। তখনকার নগরসভ্যতার মধ্যে নিজেদের যারা অত্যাধুনিক মনে করে যথেচ্ছ আচার-ব্যবহার করত, তাদের মুখোশ খুলে, নগ্নভাবে তুলে ধরা হয়েছে এ নাটকে…। এইসব 'ইয়ংবেঙ্গল'রা সমাজকে বিকৃতির দিকে নিয়ে যাচ্ছিল; মধুসূদন এদের নির্মমভাবে কশাঘাত করেছেন। এই নাটকিট ১৮৬৫ সালে ২৯ জুলাই দ্বিতীয়বার অভিনীত হয়। এই অভিনয়ের পর অনেকদিন এই মঞ্চে কোনও অভিনয় হয়নি। শেষে ১৮৬৭ সালে ৮ ফেব্রুয়ারি মধুসূদনের "কৃষ্ণকুমারী"—নাটকটি সাড়ম্বরে একবার অভিনীত হয়।

মঞ্চ, অভিনয় ও আনুষঙ্গিক সর্ববিষয়ে যখন অগ্রগতি অব্যাহত তখন নাটকের বিষয়বস্তুও পুরনো চিন্তার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। তারও অগ্রগতি অবশ্যম্ভাবী। পুরনো

চিন্তায় আবদ্ধ না থেকে সমসাময়িক সমস্যা ও ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিদের প্রধান দায়িত্ব। ইংরেজি-শিক্ষা বঙ্গাদিকপালদের এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। এখানেই ক্লাইভ সার্থক ; দুষ্ট ক্লাইভ এখানেই বন্ধু ক্লাইভ-এ পরিণত হল।

১৮৫৬ সাল থেকে বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে বাল্যবিধবাবিবাহ নিয়ে এক আন্দোলন শুরু হয়। এইসব বাল্যবিধবাদের নিয়ে সমাজে যে ট্রাজেডি, নষ্টামি ও সামাজিক চক্রম বিপর্যয় ঘটত,—তা শুধু অশ্রুপাত, ক্রোধ ও ঘৃণায় মনকে ক্ষতবিক্ষত করত। এদের জীবনের মূল্যবোধকে অবজ্ঞায়, অনাদরে, অবহেলায় তুচ্ছজ্ঞান করা হতো, কিন্তু এদের নিয়ে ভোগবিলাসের ও ব্যাভিচারের অন্ত ছিল না। সেই সঙ্গে ছিল ব্রিটিশজমানার সামন্তপ্রভু অর্থাৎ জমিদারশ্রেণীর চরম অত্যাচার। এদের নিষ্ঠুরতম আচার-ব্যবহারে মানুষ অতিষ্ঠ হতো। সমাজের কোনও স্তরই এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেত না। সমাজকে এগিয়ে দেবার পরিবর্তে তাকে পিছটানে অবনমিত করত। ব্রিটিশ প্রভুদের প্রশ্রয়ে এইসব জমিদাররা ছিল বলীয়ান ও প্রবল প্রতিপত্তিশালী। সচেতন ঠাকুরপরিবারের প্রগতিশীল চিন্তাবিদরা এই দুটি সমস্যার দিকে দৃষ্টি দিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন যে, এই দুটি বিষয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করলে সমাজের কল্যাণ সম্ভব নয়। তাঁদের রণকৌশলে সমবেত করলেন তৎকালীন গণমান্য পণ্ডিত সেনাপতিদের। এই দুটি বিষয়ের উপর লোকশিক্ষার অনুকূলে উৎকৃষ্ট বাংলা নাটক না পেয়ে ১৮১৫ সালের ১৫ জুলাই—"ইণ্ডিয়ান মিরার" নামে সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞপ্তি দিলেন :

'ADVERTISEMENTS

The following Prizes are offered by the Committee of the Jorasanko Theatre for the best dramatic Productions on the following Subjects :

No. 1 — Rs. 200

The Hindoo Females,—their Condition and Helplessness. To be handed over to the Committee before the 1st of June, 1866.

No. 2 — Rs. 100

The Village Zemindars.

Period —Before the 1st of February, 1866.

The dramas are to be written in Bengali, and must be dedicated to the Jorasanko Theatre.'

পরে অবশ্য কর্মকর্তারা এই বিজ্ঞপ্তি বাতিল করে নাটক লেখার দায়িত্ব পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের উপর দেন।

এই বিজ্ঞপ্তির বিষয়বস্তু থেকে জোড়াসাঁকো থিয়েটারের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ও চরিত্র পরিষ্কার হয়ে যায়। তাঁরা বঙ্গসমাজের অনাচার-কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তার মূলে কঠোর আঘাত হানবার জন্য উদ্যত হাতিয়ার-সহ অগ্রসর হয়েছিলেন। ক্ষয়িষ্ণু নিষ্ঠুর সামন্ত-

তন্ত্রকে বিনাশ করবার ষড়যন্ত্রে অস্ত্রে শান দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। এইখানেই জোড়াসাঁকো থিয়েটারের নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

অচিরেই পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন "নবনাটক" নামে একটি নাটক লিখে জোড়াসাঁকো থিয়েটারকে উপহার দেন। নাটক পাবার পর থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ বেশ ঘটা করে মহড়া শুরু করলেন। সেইসঙ্গে চলল আনুষঙ্গিক—মঞ্চ-দৃশ্য-আলো-পোশাক ইত্যাদির প্রস্তুতি। এই প্রথম মঞ্চ-দৃশ্য-আলো সম্পর্কে অল্প-বিস্তর খবর পাওয়া গেল। এর পূর্বে—'মনোহর দৃশ্য অঙ্কিত করা হইয়াছে'—এর বেশি খবর পাওয়া যায়নি। এই নাটক সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতিতে দৃশ্যের চরিত্র ধরা পড়ল। তিনি লিখেছেন : 'দোতলার হলের ঘরে ষ্টেজ বাঁধা হইল। তারপর পটুয়ারা আসিয়া সীন্ [Scene] আঁকিতে আরম্ভ করিল। 'ড্রপ-সীনে' রাজস্থানের ভীমসিংহের সরোবরতটস্থ জগমন্দির প্রাসাদ অঙ্কিত হইল।... দৃশ্যগুলিকে বাস্তব করিতে যতদূর সম্ভব, চেষ্টার কোনও ত্রুটি করা হয় নাই। বনদৃশ্যের সীন্খানিকে নানাবিধ তরুলতা এবং তাহাতে জীবন্ত জোনাকী পোকা আটা দিয়া জুড়িয়া, অতি সুন্দর এবং সুশোভন করা হইয়াছিল। দেখিলে ঠিক সত্যিকারের বনের মতই বোধ হইত।'

এই সময়ে নব-নাটকের একটি অভিনয় দেখে তখনকার সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সোমপ্রকাশ' ২৮ জানুয়ারি, ১৮৬৭-তে মঞ্চ ও দৃশ্য সম্পর্কে লিখেছিল : 'নাট্যশালা প্রকৃত রীতিতে নির্মিত ও দ্রষ্টব্যার্থগুলি সুন্দর বিশেষতঃ সূর্যাস্ত ও সন্ধ্যার সময় অতি—মনোহর হইয়াছিল। অধিকতর আহ্লাদের বিষয় এই, এ সমুদায়গুলি এতদ্দেশীয় শিল্পজাত।' এই প্রথম একটি পত্রিকার বিবরণ থেকে স্পষ্ট যে, মঞ্চে আলোর ব্যবস্থা খুব সুসংহত হয়েছিল এবং যে ভাবেই হোক আলো কমবেশি করবার একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছিল, নইলে— 'সূর্য্যাস্ত ও সন্ধ্যার সময়—অতিমনোহর'—কথাটির উল্লেখ করত না। দ্বিতীয়ত, মনে প্রশ্ন জাগে হয়তবা রঙিন কাঁচ ব্যবহার করা হয়েছিল, নইলে সূর্যাস্তের আলোর রঙ ও জ্যোতি এবং সন্ধ্যার আলোআঁধারের আবেশ সৃষ্টি হল কী প্রকারে ?

ঠাকুরবাড়িতে নব-নাটকের প্রথম অভিনয় হয় ১৮৬৭ সালের ৫ জানুয়ারি এবং উপর্যুপরি নয়বার এই নাটকটি অভিনয় হয়। শেষে ওই একই বছরে মঞ্চটির কর্মকাণ্ডের অবসান ঘটে। এই নাটকের দর্শক হিসাবে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন কিন্তু তাঁদের মধ্যে এমন একজনকে পাই, যাঁকে নাট্য দুনিয়ায় আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। তিনি ছিলেন বাংলা সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম সারির যোদ্ধা—শ্রদ্ধেয় অর্দ্ধেন্দু-শেখর মুস্তফী। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠায় আত্মত্যাগ, কঠোর পরিশ্রম, অসীম ধৈর্য, অনাহার, সামাজিক অশ্রদ্ধা এসব মাথায় করে আজকের মঞ্চকে সমৃদ্ধ হতে সাহায্য করে গেছেন এঁরা।

১৮৬৭ সালের পর নানান ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে নাট্যানুষ্ঠানের ক্রমসমৃদ্ধি হতে থাকে। বাঙালি নাট্যপ্রিয় জাত, তাই হাটে-মাঠে-ঘাটে যখনই বাঙালি সুযোগ পেয়েছে তখনই

দু-একটা মঞ্চাভিনয়ের উৎসাহ দেখিয়েছে। লোকে বলে—বাঙালি যেখানেই যায় সেখানে একটি কালীমন্দির ও একটি নাটমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছে। এটা গৌরবের কথা। নাট্যশিল্পকে কত গভীরভাবে ভালবাসলে বা শ্রদ্ধা করলে তবে একটি নাটমন্দির ও অভিনয়ের দল গঠন করা সম্ভব। এই ভাবেই ইতিহাসের গতি বয়ে চলেছিল। কিন্তু ১৮৬৭ সালের ২ নভেম্বর 'কিছু কিছু বুঝি' নামক একটি প্রহসনের অভিনয় হয়। এই অভিনয়ের কথা উল্লেখ না করলে দুজন বিশেষ ব্যক্তির জীবনের প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা জানতে পারা যাবে না, প্রথমজন সর্বজনবিদিত অভিনেতা অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ও দ্বিতীয়জন বিখ্যাত শিল্পনির্দেশক ধর্মদাস সুর। এই নাটকের মধ্য দিয়ে তাঁদের কর্মজীবনের সুরু। এই নাটকে অভিনয়ের জন্য পরিজনদের নিকট থেকে অর্দ্ধেন্দুশেখরকে প্রচুর গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছিল এমনকি তিনি আশ্রয়চ্যুত হয়েছিলেন। 'কিছু কিছু বুঝি' নাটকটি একাধিকবার অভিনীত হয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জোড়াসাঁকো, কয়লাহাটার বাড়িতে। প্রথম অভিনয়ের তারিখ ১৮৬৭ সালের ২০ নভেম্বর।

এইভাবে নাট্যোৎসবের মধ্য দিয়ে বাঙালি সত্তর দশকে পৌঁছে যায়। এই উৎসবে অবশ্য সমগ্র বাংলাদেশ যোগদান করেছিল। ঢাকা, বরিশাল, যশোর, খুলনা, চব্বিশ পরগনা ও অন্যান্য স্থানও এই উৎসবে সমবেত হয়ে বাংলা নাট্যোৎসবকে মুখরিত করেছিল। যেহেতু এগুলি ছিল—কে কত ভাল করতে পারে—তার প্রতিযোগিতামূলক ব্যাপার তাই নাট্যশিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। কারণ দেশ-কাল-সময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে বিভিন্ন চিন্তা-চেতনার মিশ্রণের মধ্যে তার বিকাশ ঘটেছিল।

বাংলা নাটক করবার উদ্দীপনা ও উৎসাহের মূলে যিনি, প্রথম বাংলা নাটকের অভিনয় করিয়েছিলেন যিনি, সেই নবীনচন্দ্র বসুকে শ্রদ্ধার সঙ্গে জয়মাল্য না পরিয়ে উপায় নেই। ১৮৩৫ সালের ৬ অক্টোবর তিনি বাগবাজার 'বিদ্যাসুন্দর'কে নাট্যাকারে অভিনয় করান। যদিও গোড়াতে সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ নিয়ে শোভাযাত্রা শুরু হয়েছিল, কিন্তু প্রকৃত বাংলা নাটকের ভিতপ্রস্তর স্থাপন করেন মধুসূদন তাঁর 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'একেই কি বলে সভ্যতা, ; পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের নব-নাটক ; দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী', 'নীলদর্পন' এবং আরও অনেক নাট্যকারেরা, এই ধরনের সমাজ-সংস্কারমূলক নাটকের মধ্য দিয়ে। সমাজের অন্যায়, অবিচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে কুঠারাঘাত করে মানুষকে সজাগ করে তুলেছিলেন তাঁরা। তাঁদের তৈরি পতাকা হাতে করে বাংলা নাট্যশিল্পীর দল এগিয়ে চলেছে বিভিন্ন ধারায় আরও উন্নততর শিল্পের সন্ধানে।[১]□

১. বন্ধু ক্লাইভের হাত ধরে শুরু হলেও বাংলা নাটক এর পরে অনেকেই বদলেছে। সেই বদলের ও নানা টানা পোড়েনের ইতিহাস এখানে অনুচ্চারিত রইল। সাধারণ রঙ্গালয়, মঞ্চ-কলাকৌশল, আলো প্রভৃতি সম্পর্কেও অনেক কথাই বলার আছে। কখনও সুযোগ হলে সে সব নিয়ে সবিস্তারে বলা যাবে। যোগসূত্রের নাটক বিষয়ক সংখ্যায় এই রচনাটির উদ্দেশ্য মঞ্চ সংক্রান্ত ইতিহাসের একটি অধ্যায় তুলে ধরা মাত্র।—লেখক

থিয়েটারের খোঁজে

বাদল সরকার

এক নয় বহু, সমগ্র নয় খণ্ড। একের মধ্যে কী করে এই 'বহু'-কে ধরা যায়। এলোমেলো, বিক্ষিপ্ত আপাত বিচ্ছিন্ন সব অভিজ্ঞতার পারম্পর্য রক্ষাও প্রায় অসম্ভবেরই নামান্তর। সহজ, স্বাভাবিক পথে এ ধরনের সুসংগতি অর্জন করা যাবে না। তখন ভাবতে বাধ্য হই—কী দরকার আরোপিত সংগতির? বরং থাক না ভাঙাচোরা ছবি, টুকরো-টাকরা, ফাঁক-ফোকর। যা সহজ, স্বাভাবিক।

আর এই লেখকমশাই, আমি নিজেই কি সম্পূর্ণ! সমগ্র নই, সম্পূর্ণ নই। কত কী মিশে আছে আমার মধ্যে, কত-শত উপাদানে গড়া এই আমি। সেই শত-উপাদানের ধর্মও এক নয়। রীতিমতো লড়াই আছে পরস্পরের সঙ্গে। যুদ্ধ চলছে অবিরত। আমি যেখানে আছি সেই পৃথিবী-ও তো এক, অখণ্ড নয়। টুকরো-টুকরো। খণ্ডিত পৃথিবী। চতুর্দিকে দ্বন্দ্ব। কোলাহল মুখর।

এমন এক উদ্ভট দুনিয়ায় সংগতির খোঁজ করাটাই প্যাগলামি।

জন্মেছি, বেড়ে উঠেছি শহর কলকাতায়। বিদেশি শাসকের হাতে গড়া, তাদের স্বার্থ-পূরণে ব্যবহৃত এক শহর। আজও এ শহর বেঁচে আছে তার বিশাল পশ্চাদভূমি গ্রামাঞ্চল শুষে। ভারতে এরকম বড়-বড় শহর আরও আছে। কিন্তু এখানে ভারত কোথায়? অথচ গোটা দেশটাকে, ভারতকে শাসন করছে এই গুটিকয় শহর। আশ্চর্য উলটপুরাণ।

এই যেমন আমরা বিশ্বাস করি মানুষের মৌলিক অধিকারে। কতরকম অধিকার! স্বাধীনতার-কাজের-আহার্যের-বস্ত্রের-বাসস্থানের-স্বাস্থ্যের এমনকি সংস্কৃতিরও। একই সঙ্গে এই আমরাই আবার বিশ্বাস করি দুর্লঙ্ঘ্য, সম্পত্তির মানবিক অধিকারেও। শেষের এই অধিকারটির এক আঁচড়েই দেশের আশিভাগ মানুষের সমস্ত অধিকার নস্যাৎ হয়ে যায়। নারী-পুরুষের সমতায় আমরা বিশ্বাস করি, অথচ স্ত্রী কর্মরতা হলেও ঘর-গেরস্থালিসহ স্বামী-পুত্র-কন্যার সমস্ত ঝক্কি তাকেই সামলাতে হবে। আরও আছে, যেমন সমস্ত মানুষ সমান একথা বিশ্বাস করা সত্ত্বেও আমাদের ঘরের মেয়ে ভিন্ন ধর্মের, মতের কাউকে বিয়ে করতে চাইলে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই যে এতসব বিরোধ, কই আমাদের নজরে তো কিছুই পড়ে না। একরকম ভুলেই থাকি।

চাঁদে মানুষের পা পড়লে গভীরভাবে মুগ্ধ হই। মানুষের সৃষ্ট যন্ত্র সৌরজগতের প্রায় শেষ প্রান্ত থেকে ছবি পাঠালে উল্লসিত হই। এবার অন্য একটি চিত্র : প্রতি চার সেকেন্ডে এই গ্রহে অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা—১। মানুষ এতটাই নির্বোধ যে অনাহারজনিত এই মৃত্যুকে সে ঠেকাতে পারছে না। এই সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা সে অর্জন করেনি। মানুষের এহেন নির্বুদ্ধিতাকে আমরা প্রশ্ন করি না। যুদ্ধের বিভীষিকার কথা আমরা জানি। যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও আমাদের বড় কম নয়। অথচ প্রতিবার যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠা মাত্র আমরা উত্তেজিত হই। যুদ্ধের বিরুদ্ধে যে কোনও কণ্ঠস্বর উঠলে, যে কেউ এই নিয়ে প্রশ্ন তুললে আমরা তাকে বিশ্বাসঘাতক, দেশের শত্রু বলে ছাপ মেরে দিই। কই, এসব বৈপরীত্যের কথা আমরা তো ভেবেও দেখি না।

শিল্পের সৌন্দর্য ও তার পবিত্রতা নিয়ে কত কিছু লিখি, কত কথা বলে চলি। যদিও শিল্প নিয়ে আমাদের যাবতীয় কারবার পণ্যের যুক্তিতেই সারি। জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন খাবার-পোশাক-আশ্রয়-শিক্ষা ইত্যাদির মতোই শিল্পকেও বাজারে এনে ফেলা হয় বেচাকেনার জন্য।

আসলে ধরেই নিয়েছি এইসব বিদঘুটে সমস্যার কোনও সমাধান আমরা করতে পারব না। এদের নিয়েই আমাদের চলতে হবে। বাঁচতে শিখেছি সেভাবেই। আশ্চর্যের ব্যাপার হল আমাদের মধ্যেই কেউ যদি এ জাতীয় কোনও একটি সমস্যার সমাধানের জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেন তখন আমরাই তাঁকে 'পাগল' আখ্যা দিই। প্রাণান্তকর চেষ্টা, তাঁর সততা, আন্তরিকতা আমাদের আসামির কাঠগোড়ায় তুলতে পারে। তাঁকে চেষ্টা করতে দেখলেই নিজেদের অপরাধী মনে হয়। তখন আর আমরা নিরীহ নিষ্ক্রিয় থাকি না। নিন্দা-মন্দ-কুৎসা তো আছেই, শেষে একেবারে হিংস্র হয়ে উঠি। যেন পারলে তাকে খুন করি।

কথাগুলো হয়ত এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আসলে এখন আমি এরকম এক সমাধান প্রয়াসের কথাই বলতে চাই। যা শুরু হয়েছিল বছর কুড়ি আগে, সত্তরের গোড়ায়। গুটিকয়েক মানুষ দৃঢ় চিত্তে শুরু করেছিল এক অভিযান। সঙ্কল্প একটাই, অন্তত একটি ক্ষেত্রে যদি দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ হওয়া যায়। অর্থাৎ সেই গুটিকয়েক মানুষ হয়ে পড়লেন উন্মাদদের ছোট্ট একটি দল। যে ব্যবস্থায় মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস শুধু টাকার বিনিময়েই পাওয়া সম্ভব সেখানে তারা চেষ্টা করল থিয়েটারের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি শিল্প-মাধ্যমকে সর্বসাধারণের জন্য অবাধ উন্মুক্ত করে দিতে। ঘটনাচক্রে আমি সেই তাদেরই একজন এবং আজও তাই আছি।

এই কি সব? ঠিক এভাবেই কি শুরু হয়েছিল সেই অভিযান? যেন হাতে ধরা আছে একটি সুবিন্যস্ত মানচিত্র, লক্ষ্য 'মুক্ত থিয়েটার'-এর বন্দর। না, ঠিক এরকমটা ছিল না। এই অভিযানটির আগে ছিল আরও-আরও অভিযান। নিছক ভুল পথে যাত্রারম্ভ নয়, আমাদের থিয়েটারের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হল অভিযানের পর অভিযান। আমাদের জীবনেও এজাতীয় অভিযানের গুরুত্ব অপরিসীম।

থিয়েটার আর জীবন—এদের কি পৃথক করা সম্ভব? শুরুতে হয়ত তাই ছিল কিন্তু পরে? এখন?

১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাস। মাত্র ১১ ফুট চওড়া মঞ্চ কিন্তু সেই প্রেক্ষাগৃহে ৬০০ জনের বসার ব্যবস্থা আছে। ঠিক এক বছর আগে 'শতাব্দী' নামে একটি নাটকের দলের জন্ম হয়েছে। তাঁরা কাজ করতে চাইছেন বেশ বড় মাপেই। নতুন এক অভিযানের সূচনা। শুরুতে ধরা হল একটা কমেডি। তারপর দুটি ছোট নাটক। মোটামুটি সাড়া মিলল। দলে নানান সমস্যা। ব্যাস-'শতাব্দী' খতম। থিয়েটারও শেষ, অন্তত আমার দিক থেকে। শেষ হল এই যাত্রাটিও।

ফিরে যাওয়া যাক ১৯৪১ সালের বেশ কিছু আগে। দুটো চৌকি জুড়ে মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। ১৬ ফুট বাই ১১ ফুট একটি বৈঠকখানার দুই- তৃতীয়াংশ জায়গা জুড়ে। বিছানার চাদর, শাড়ি, ধুতি দিয়ে পর্দা-ব্যাক ড্রপ, উইংস তৈরি হল। বাবা-কাকা-মামা—দাদু-দিদিমা এঁদের নিয়ে ১৫ জনের এক দর্শকমণ্ডলী। ভাইবোন, মাসতুতো, খুড়তুতো ভাইবোন আর কিছু বন্ধু-বান্ধব নাটকের পাত্র-পাত্রী। ১৫ বছর ৭ মাস বয়সের এক কিশোরের থিয়েটার অভিযান শুরু হয়েছিল এইভাবে নির্দেশক, নাট্যকার এবং প্রধান অভিনেতা হিসাবে। একটি ইংরেজি নাটক অবলম্বনে নাটকটি রচিত হয়েছিল। সেই একই যাত্রার পুনরাবৃত্তি ঘটল ২ বছর পরে ১৯৪৩-এ। সেই একই ঘর, দর্শক এবং পাত্র-পাত্রীও এক। এবার অবশ্য নাটকটি রচিত হয়েছিল একটি বাংলা ছোট গল্প অনুসরণে। তারপর বহু বছর নানা পথ পরিক্রমা। থিয়েটারের সঙ্গে তার কোনওই সম্পর্ক নেই। না, খুব ঠিক কথা বলা হল না। প্রবল উৎসাহে নাটক পড়ছি—ছাত্রদের করা নাটক দেখছি—কাজেই সেও নাটকেরই দীর্ঘ যাত্রার অন্তর্গত। শুদ্ধু থিয়েটার করার কোনও চেষ্টা ছিল না! থিয়েটার করার প্রতি আমার যে একটা নাড়ির টান আছে সে কথা কখনও ভাবিনি। তা ছাড়া আর পাঁচটা কাজের দাবি মেটাতেই ফুরিয়ে যেত আমার সমস্ত অবসর। সেই বছরগুলো ছিল: পড়াশুনো, স্বাধীনতা-সংগ্রাম, পরীক্ষা, রাজনৈতিক অভ্যুত্থান, ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, স্বাধীনতা, দেশভাগ, বি. এ. পাশ করা, উদ্বাস্তু-শিবির, দিনের বেলায় চাকরি, সন্ধেবেলায় কলেজে ক্লাস, বিয়ে, বাবা হওয়া। কত মহান স্বপ্নই না দেখেছি তখন। তারপরই চূড়ান্ত স্বপ্নভঙ্গ আর হতাশা। এই শতকের চারটি দশক শেষ হল—শুরু হল পঞ্চম দশক। দিগন্তপ্লাবী এক শূন্যতা দূর করতে গোপনে হামাগুড়ি দিয়ে তখন এগিয়ে আসছে থিয়েটার।

১৯৬৮ সালের মাঝামাঝি। 'শতাব্দী'-র একদল তরুণ সদস্য দলের মৃত্যু মেনে নিতে রাজি নয়। আমি থিয়েটার ছেড়ে দিই তাও তারা চায় না। শুরু হল থিয়েটার সংক্রান্ত এক পাঠচক্র। দফায়-দফায় বসলাম আমরা। বেশ কয়েকবার রিহার্সাল দিলাম একটি নাটকের। যদিও মাথায় স্পষ্টভাবেই গাঁথা ছিল যে এই নাটকটিকে কখনওই মঞ্চস্থ করা যাবে না। ১৫ বছর আগের কথা ১৯৫৩ সাল। মাইথনে দামোদর ভ্যালি

কর্পোরেশনের কনস্ট্রাকশন ক্যাম্পে আছি। একদল তরুণ ইঞ্জিনিয়ার আর তাদের বউরা একটি কোয়ার্টারে রোজ জড়ো হতো। নানা নাটকের মহড়া দিত তারা। কাকে কোন ভূমিকায় মানাচ্ছে—কার কেমন যোগ্যতা এসব বিচার না করে এলোমেলো-ভাবে চরিত্র বেছে নিত। এ ব্যাপারে তাদের একটিমাত্র নিয়মের সংবিধান ছিল। সেটাই যা বাঁচোয়া। ওই নিয়মে বলা হয়েছিল : এটা একটা রিহার্সাল ক্লাব এবং আমরা কখনওই কোনও নাটক মঞ্চস্থ করব না।

কিন্তু শেষপর্যন্ত সংবিধান লঙ্ঘন করে মাইথনে ১৯৫৩ সালে একটি নাটক মঞ্চস্থ করা হল। ঠিক যেমন ১৯৬৯ সালে 'শতাব্দী' করেছিল। মাইথনে ১৯৫৩ সালে নাটকটি মঞ্চস্থ করার পর ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এই প্রথম নারী চরিত্রে অভিনয় করল মেয়েরাই। অভিনেতারা ঘড়ির কাঁটা মেনে কাজ শুরু করল। ফলে, অনেকেই পুরো নাটকের বেশ খানিকটাই দেখতে পায়নি অভিনেতারা প্রত্যেকে-মনোযোগ দিয়ে তাদের পার্ট মুখস্থ করায় প্রম্পটিং-এর কোনও দরকার হয়নি। বহু সন্ধ্যার মহড়ার ফলেই এটা সম্ভব হয়। ১৯৬৯ সালে 'শতাব্দী'-র নাটক কিন্তু কলকাতাকে কাঁপাতে পারেনি। সাড়া ফেলতে পারেনি কলকাতার কোনও পাড়াতেও। তবে এক নতুন যাত্রা অবশ্যই শুরু হয়েছিল। 'শতাব্দী'-র পুনর্জন্ম হল।

'শতাব্দী' "মিছিল" নাটকটি করছে আসানসোলের এক খোলা মাঠে। নাগরিক অধিকার রক্ষা সমিতির সমাবেশে। এই নাটকে এক যুবক প্রতিদিন নিহত হয় এবং কেউ তার দিকে তাকিয়েও দেখে না। অধিকারহীন মানুষের এই দেশে নাগরিক অধিকারের জন্য সংগ্রামরত উন্মাদ মানুষজনের সঙ্গে ওই যুবকের কিছু সম্পর্ক আছে, তারা তাকে দেখে। নাটকের শেষে আমরা শব্দহীন একটি গান গাই—দর্শকদের বলি আমাদের সঙ্গে হাত মেলাতে। অধিকাংশ দর্শকই এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এল। এ ছিল "মিছিল"-এর ১৯৯-তম অভিনয়—ছেদহীন এক যাত্রা যা শুরু হয়েছিল ১৯৭৪ সালের ১৩ এপ্রিল রামচন্দ্রপুর গ্রামে। তদাবধি মুক্ত থিয়েটার হয়ে ওঠে এক নিশ্চয়তা। সে আর নিছক সম্ভাবনা নয়। কিন্তু ১৯৬৯ সালে পুনর্জন্মের পর 'শতাব্দী' যখন যাত্রা শুরু করল তখন মুক্ত থিয়েটারের কথা আমাদের প্রায় কল্পনাতেও ছিল না। আমাদের মতোই আর যাঁরা থিয়েটারের কাজ করছিলেন সেই তাঁদের মতোই আমরাও বিশ্বাস করতাম না মুক্ত থিয়েটার বলে কিছু সম্ভব। শহুরে থিয়েটারকেই মেনে নিয়েছিলাম—প্রসেনিয়াম স্টেজ, আর প্রেক্ষাগৃহ, থিয়েটারের সেট, স্পটলাইট ইত্যাদি। সংক্ষেপে, একশতকেরও আগে ব্রিটেন থেকে আমদানি করা থিয়েটার। প্রকারান্তরে আমরা এটাও মেনে নিয়েছিলাম যে থিয়েটার করতে টাকা লাগে। তবে পাগলের মতো চেষ্টা করেছি প্রোডাকশনের খরচ কমাতে। এ ব্যাপারে আমরা একটা নীতি নির্ধারণ করি, সেট-প্রপ এবং কস্টিউম সব মিলিয়ে প্রোডাকশনের খরচ কিছুতেই একশ টাকার বেশি করব না। একবার সেট হিসাবে যে সব জিনিস ব্যবহার করেছি সেগুলোকে ফেলে দিতাম না। বরং চেষ্টা করতাম পরবর্তী নাটকেও কাজে লাগাতে "বল্লভপুরের

রূপকথা" নাটকটির সেট বাবদ খরচ হয়েছিল মাত্র ৬৫ টাকা। সিংহাসন, স্তম্ভ ইত্যাদি-সহ একটি জীর্ণ প্রাসাদের সভাঘর তৈরি ওই টাকাতেই। "আবুহোসেন" নাটকের ক্ষেত্রে সেট হিসাবে দরকার ছিল সভাঘর, বাগান, রাস্তা ইত্যাদি। এই সবে লাগে একশ টাকারও কম। আসলে আমরা শিখে ফেলেছিলাম আমাদের এবং দর্শকের কল্পনাকে কাজে লাগানো যায়। কিন্তু মুক্ত থিয়েটারের কথা ভেবে যে এসব করেছি তা কিন্তু নয়। থিয়েটারের দল হিসাবে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য বাধ্য হয়েই এসব করতে হয়েছিল।

সত্যি টিকে থাকা যে কী কঠিন! শুনেছি বৃহত্তর কলকাতায় নাকি পাঁচ থেকে ছ-হাজার থিয়েটারের দল আছে—আমি কিন্তু একথা অবিশ্বাস করার কোনও কারণ খুঁজে পাই না। শিশু মৃত্যুর হার খুব চড়া কিন্তু জন্মহারও সেইরকম বেশি। প্রতিমুহূর্তে টিকে থাকার জন্য কত গ্রুপই না সংগ্রাম করে চলেছে। থিয়েটার-হল ভাড়া করো, হিসাব করে কাগজে নামমাত্র বিজ্ঞাপন দাও, পোস্টার বা ইশতেহার দিয়ে বিজ্ঞাপন করো—এর উপর আছে সেট, প্রপ, কস্টিউম এবং লাইট বাবদ খরচ। আর হাড়েহাড়ে জানি কলকাতায় নাটক করে এই খরচ আদৌ তোলা যাবে না। তখন শুরু হয় এক অপেক্ষা কখন সংবাদপত্র ও পত্রিকায় একটু প্রশংসামূলক সমালোচনা বের হয়। যাতে 'কল-শো' জোটানো সহজ হবে। 'কল-শো' বলতে কলকাতার থিয়েটারের লোকেরা বোঝায় আমন্ত্রিত অভিনয়। শহরে নাটক মঞ্চস্থ করে গ্রুপের যে আর্থিক ক্ষতি হল, আমন্ত্রিত অভিনয় থেকে তা পুষিয়ে নেওয়ার এক চেষ্টা, যাতে তারা পরবর্তী নাটক করতে পারে। আর 'কল-শো' না পেলে? তখন কাজ করে শিশু মৃত্যুর সূত্র। যদি কিছু আমন্ত্রণ পাওয়া যায় তাহলে শিশুটি বড় জোর একটু ডাগর হয়ে উঠতে পারে।

দলের কাজ কলকাতা লুফে নিলে, কলকাতায় স্বীকৃতি পেলেই শুধু বোঝা যাবে—হ্যাঁ, দলটি এখন সাফল্য অর্জন করেছে। 'কল-শো' থেকে পাওয়া টাকাটা উদ্বৃত্ত অর্থ। যাইহোক আমাদের থিয়েটার গ্রুপ 'শতাব্দী' শুরু থেকে ৭টি পূর্ণাঙ্গ ও ২টি ছোট নাটক নিয়ে কাজ করেছে। প্রয়োজনার খরচ কমিয়েছি উত্তরোত্তর। নাটকের প্রস্তুতিপর্বে হৃদ্দমদ্দ খেটেছি। টিকিট কেনার জন্য বন্ধুদের ঝোলাঝুলি করেছি। এইরকম চলেছে যতদিন পর্যন্ত না সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছেছি অর্থাৎ শহরে নাটক করাটা আর্থিক-ভাবে স্বনির্ভর হয়েছে। এই অবস্থায় আমরা পৌঁছই শেষ তিনটি নাটকের উপস্থাপনার সময়—"সাগিনা মাহাতো", "বল্লভপুরের রূপকথা" এবং "আবুহোসেন" বিশেষকরে শেষেরটিতে। দেদার টাকা হয়ে গেল। আমাদের সম্পত্তির পরিমাণ সহস্রের অঙ্কে চলে এল।

কিন্তু সহস্রের অঙ্কে কোনওমতে পৌঁছলেই টিকে থাকার গ্যারান্টি মেলে না। তো, একদিকে টিকে থাকার এই পাঁচ বছরের সংগ্রাম আর তার আগের প্রায় পনেরো বছর যাবত থিয়েটার নিয়ে বিচ্ছিন্ন বহু অভিজ্ঞতা—ইত্যাদি থেকে আমার মনে বেশ কটি প্রশ্নের উদয় হল। তারমধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি ছিল: থিয়েটারে না গিয়ে

লোকে কেন ফিল্ম দেখতে যেতে চায়? সৌভাগ্যের কথা তখন ভারতবর্ষে টিভি ছিল না। তবে থাকলেও তাতে এই প্রশ্নের হেরফের হতো না।
এর আশু ও সহজ উত্তর হল থিয়েটারের থেকে ফিল্ম অনেক বেশি কিছু দেখাতে পারে। আর দর্শকেরও টিকিটের দাম অনেক বেশি উশুল হয়। তবে এটা নিশ্চয়ই সব প্রশ্নের উত্তর নয়, সত্যিকারের তো নয়ই। থিয়েটার কী করে আড়াই হাজার বছর টিকে আছে? আর কেনই বা টেলিভিশন ফিল্মকে খতম করে আনলেও থিয়েটারকে আজও শেষ করতে পারেনি। তার মানে একটি বিশিষ্ট শিল্প-মাধ্যম হিসাবে থিয়েটারের নিশ্চয়ই কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। ফিল্ম বা টেলিভিশনের তা নেই এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলি নকল করাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।
এই মৌলিক বৈশিষ্ট্য সমূহের মধ্যে সর্বপ্রধানটি অতীব স্পষ্ট। যদিও শহুরে থিয়েটারের লোকজনের হয় তা নজরেই পড়ে না কিংবা জেনেশুনেই তাকে অগ্রাহ্য করে। থিয়েটার এক জীবন্ত শিল্প, যেখানে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ আছে। থিয়েটার বলতে বোঝায়—'এখন', 'এখানে' এমন একটা পরিস্থিতি যেখানে দু-দল মানুষ একই দিনে, একই সময় একই স্থানে উপস্থিত। থিয়েটার নামক ঘটনাটি তা ছাড়া ঘটবেই না।
তবে এসব গপপো এখন পুরনো হয়ে গেছে, এ নিয়ে আমি আগে অনেক লিখেছি, বলেওছি। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির এই সরাসরি সংযোগকে আরও গভীর করতে দু-দল মানুষের ব্যবধান কী করে কমানো যায় তা নিয়ে বেশ কিছু থিয়েটার-দল কাজ করে চলেছে। থিয়েটারের এই মূল শক্তিকে তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। অভিনেতা আর দর্শক এই দুয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় পাঁচিল আলো আর আঁধার (প্রসেনিয়াম থিয়েটারের ক্ষেত্রে)। এখানে অভিনেতা দর্শককে অন্ধকারে ডুবিয়ে যেন তার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করছে। বিশদে যাওয়ার দরকার নেই। প্রসেনিয়াম স্টেজ থেকে নেমে এসে দর্শকের সঙ্গে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেওয়া থিয়েটার-স্থান সম্পর্কে কথা বলা যাক। এ এমন এক থিয়েটার-পরিস্থিতি যেখানে দর্শককে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়নি তাকে এক অলস গ্রাহকে পরিণত করা হয়নি। থিয়েটারের অভিজ্ঞতা এখানে দু-দল মানুষ সমানভাবে ভাগ করে নিচ্ছে এবং তারা তাতে রীতিমতো অংশ নিচ্ছে।
ন্যাচারালিস্ট থিয়েটারের দাবি, 'বাস্তবের মোহ' সৃষ্টি করতে হবে। মঞ্চ থেকে নেমে আসার পর আমরা উপলব্ধি করলাম এর কোনও প্রয়োজন নেই। কার্যত আমরা যখন প্রসেনিয়াম স্টেজে কাজ করেছি কিংবা স্টেজ মাথায় রেখে লিখেছি তখনও ন্যাচারালিস্ট থিয়েটার আমাদের তেমন উপকারে আসেনি। স্থানকালের বিচারে, থিয়েটারের সমগ্রতার বিচারে ন্যাচারালিস্ট থিয়েটার নেহাতই সামান্য একটা অংশ। তার বয়সই বা কত? দু-শতকেরও কম। সারা বিশ্বের থিয়েটারের মানচিত্রে জনসাধারণের খুব সামান্যতম একটা অংশই এই থিয়েটার দেখেন বা চর্চা করেন। নিজেদের দেশের পরিস্থিতির কথা ভাবা যাক। আমাদের ঐতিহ্যবাহী ও লোকনাট্যের একটিও ওই ঘরানার নয়, অর্থাৎ ন্যাচারালিস্ট নয়। একবার ভাবুন তো কত অসংখ্য লোক ঐতিহ্যবাহী এইসব নাটক এবং লোকনাটক দেখে।

অন্যদিকে আমরা যদি থিয়েটারের ওই সামান্য (যদিও গুরুত্বপূর্ণ) অংশ বাদ দিই তাহলে শুধু যে সরাসরি সংযোগের শক্তিকে ব্যবহার করতে পারব তাই নয়, যে জিনিসটাকে আমরা অন্তত মহান মনে করি তার ভিতও গড়ে তুলতে পারব : তা হল 'ফ্রি থিয়েটার'। ইংরেজি 'ফ্রি' শব্দটির দুটি অর্থ আছে, যার একটি হল মাগনা মানে যা বিনে পয়সায় পাচ্ছি। দ্বিতীয় মানেটি অনেক বেশি ব্যাপক, এর দ্বারা বোঝায়, কোথাও কোনও বন্ধন নেই, নির্ভরতা নেই।

আমাদের থিয়েটারের ক্ষেত্রে 'ফ্রি' শব্দটি এই দুটি অর্থই বহন করে। একটি থেকেই আরেকটায় পৌঁছে যাই। জীবন্ত বলেই থিয়েটারের সম্ভাবনা আছে 'মানবিকক্রিয়া' হয়ে ওঠার। দু-দল মানুষ একত্র হলে তাদের মধ্যে কিছু একটা ঘটে—সেটাই মানবিক ক্রিয়া। দুটি দলকে মানবিক স্তরে মিশতে হয় সেই উদ্দেশ্যেই মানবিক ভিত্তিতে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। আমাদের সমাজের পক্ষে ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক হয়ত জরুরি কিন্তু তাকে নিশ্চিতভাবেই মানবিক সম্পর্ক আখ্যা দেওয়া যায় না। এখানে যে সম্পর্কের কথা বলছি তা হল প্রেমিকের, জননী ও শিশুর, ঘনিষ্ঠ বন্ধুর। অথবা এমনও হতে পারে সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষজন কোনও এক মুহূর্তে পরস্পরের গাঢ় অভিজ্ঞতার ভাগীদার হচ্ছে। শেষোক্ত ধরনটির একটা দৃষ্টান্ত আমি দিতে পারি। আমার প্রজন্মের কলকাতাবাসীর ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল। যখন হঠাৎ প্রায় যাদুস্পর্শে বছর পুরনো হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা সম্পূর্ণ উবে গেল তখন একই উদ্দেশ্যে হিন্দু চাইছে মুসলিমকে আলিঙ্গন করতে।

অর্থাৎ যেমনটি বলছিলাম, নতুন থিয়েটারের ক্ষেত্রে আমরা অনুভব করেছি 'ফ্রি' শব্দটির দুটি অর্থই পরস্পর বিজড়িত হয়ে আছে। আমরা এই জিনিসটা অনুভব করেছি, চেষ্টা করেছি, চর্চা করেছি এবং থিয়েটারে এভাবেই আমাদের যাত্রা শুরু। এখানে আমি সেই অভিযানের কথাই বলতে চাইছি—শুকনো যুক্তি আর তত্ত্বের কথা নয়।

ভাবতে বেশ মজা লাগছে, শুরুতেই গেয়ে রেখেছিলাম অসঙ্গতি বা পারম্পর্যহীনতার কথা। এই অসঙ্গতি বা বে-খেয়ালই বর্তমান রচনাটির ক্ষেত্রে আমি মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছি। আপাতত তার সুযোগে অনেকটা সময় উজিয়ে যাওয়া যাক। ১৯৮৬ সালের ২৯ মার্চ। আমাদের 'গ্রাম পরিক্রমা'র দ্বিতীয় দিন। থিয়েটার এবং গণসঙ্গীতের বিভিন্ন দলের সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নানা গ্রামে ঘুরে ঘুরে থিয়েটার আর গান করাকেই আমরা 'গ্রাম পরিক্রমা' নাম দিয়েছিলাম। এই পরিক্রমার ষষ্ঠ গ্রামটি ছিল সুটিয়া। ভয়ঙ্কর দারিদ্রপীড়িত এক প্রত্যন্ত গ্রাম। মাঝরাতে এখানে আমাদের থিয়েটার আর গানের বৈকালিক অধিবেশন শেষ হয়। সেবারের পরিক্রমায় দলে ছিলাম ৭০ জনেরও বেশি, ৭টি গ্রুপে বিভক্ত। রাতে জনৈক বৃদ্ধ আমাদের কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চললেন। আমাদের যেখানে থাকা-খাওয়ার কথা চলেছি সেই দিকে। বৃদ্ধ সঙ্গ ছাড়লেন না। চলে এলেন আমাদের সেই রাতের আশ্রয় পর্যন্ত। যদিও তাঁর বাড়িটি ছিল সম্পূর্ণ উল্টোদিকে। 'বৃদ্ধ' বললাম—তাই না? সত্যি তখন তাঁকে দেখে

মনে হচ্ছিল যেন ষাটের ওপর বয়স। কিন্তু পরে আমরা আবিষ্কার করি তাঁর বয়স মাত্র ৪৫। ভগ্ন স্বাস্থ্যের দরুন ওইরকম দেখাচ্ছিল। তিনি ছিলেন ভূমিহীন খেত-মজুর। ভগ্নস্বাস্থের জন্য তাঁর কাজও জুটছিল না। প্রায় কাঙালের মতো অবস্থা। পরের দিন সকালে আমরা রওনা হলাম ১০ কিলোমিটার দূরের গ্রামের দিকে! চৈত্রের প্রখর তাপ। চলেছি ছায়াহীন ধানখেতের রাস্তা ধরে। দেখি সেই ব্যক্তিও আমাদের সঙ্গে চলেছেন। ভাবলাম এখানে আমাদের অনুষ্ঠান শেষ হলে তিনি হয়ত ফিরে যাবেন। কিন্তু সেসবের ধার ধারলেন না, আমাদের সঙ্গেই চললেন তারও পরের গ্রামের দিকে। এভাবে কেবলই নিজের বাড়ি থেকে আরও-আরও দূরে চলে যেতে থাকলেন। একবারের জন্যও ভাবলেন না সন্ধ্যার মধ্যে কীভাবে বাড়ি ফিরবেন। বিশেষ করে নিজেই বলেছিলেন রাতে কিছু দেখতে পান না। এমনকি রাতে বাড়ি ফিরে আসা সম্ভব হবে না জেনেও কী খাবেন, রাতে কোথায় থাকবেন এসবও ভাবেননি। একসময় তাঁকে জিজ্ঞেস করি, কেন আমাদের সঙ্গে আসছেন, জবাবে তিনি বললেন, 'জানিনা, কেমন যেন নেশা লেগে গেল।'

আমাদের প্রথম পরিক্রমার কথা বললাম। প্রথমবারের অভিজ্ঞতায় আমাদেরও সকলেরই 'নেশা' লেগে গিয়েছিল। আমরা বিভিন্ন শ্রেণীর লোক। তবু এই অভিজ্ঞতায় সমান-ভাবে ভাগ বসাতে কারও কোনও অসুবিধা হয়নি। 'মানবিক'—এই ছিল ভিত্তি। এই ভিত্তি কতখানি গভীর হতে পারে তার দৃষ্টান্তও প্রথম পরিক্রমাতেই দেখেছি। থিয়েটারের পর দর্শকমণ্ডলীর কাছে গামছা পাতা হয়। স্বেচ্ছাদান সংগ্রহ। তো সেখানে নিতান্ত দরিদ্র মলিন বেশে এক বৃদ্ধা ছিলেন। কেউ তাঁর কাছে গামছা এগিয়ে দেয়নি। অথচ বৃদ্ধা তাঁর পুঁটলি হাতড়ে একটি পাঁচ পয়সা স্বেচ্ছায় দান করেন।

এ কি দর্শকের অংশগ্রহণ নয়? এ কি মানবিক ক্রিয়া নয়? যেভাবে খুশি আপনারা এই ঘটনাটির বিচার করে দেখুন। আমাদের কাছে অবশ্য সেদিন এই ঘটনা উচ্চস্বরে দর্শকের অংশগ্রহণের বার্তাই বয়ে এনেছিল।

থিয়েটারের খোঁজে অভিযান। নতুন থিয়েটারের এই যাত্রায় একেবারে প্রথমদিকে আমি "স্পার্টাকুস" নাটকটি লিখি। প্রসেনিয়ামের বাইরের থিয়েটার-স্থান মাথায় রেখে আমি প্রথম এই নাটকটি রচনা করি। হাওয়ার্ড ফাস্ট তাঁর মহাকাব্যোচিত উপন্যাসে যে বিশাল প্রেক্ষাপট রচনা করছেন, সেই বিরাট কাজটিকে থিয়েটারে নিয়ে আসার সাহস হল যখন থিয়েটারের এই নবতম স্থানের কথা ভাবতে পারলাম। উপন্যাসটির কথা আগেও ভেবেছি। কিন্তু বারবারই তার নাট্যরূপ দিতে গিয়ে পিছিয়ে এসেছি। প্রসেনিয়াম থিয়েটারে এ সম্ভব নয়। সাহস হয়নি।

নাটক লেখা শেষ হল। বেজায় বড় হয়ে গেল "স্পার্টাকুস"। দেখলাম অভিনয়ে কম করে চার ঘণ্টা সময় লাগবে। যদিও গুরুত্বপূর্ণ অনেক উপাখ্যান, চরিত্র বাদসাদ দিয়েই করেছি। ইহুদি গ্লাডিয়েটর ডেভিডের চরিত্র পর্যন্ত বাদ দেওয়ার কথা ভাবতে হল। এত কষ্ট হল কী বলব! রীতিমতো কান্না পেয়ে গেল। তবে সম্পাদনা, অর্থাৎ কিছুটা সার-

সংক্ষেপ করার পথে কেন গেলাম না এই প্রশ্ন উঠতে পারে। তাহলে তো সহজেই নাটকটির দৈর্ঘ্য নিজেদের সুবিধামতো মাপে নিয়ে আসা যেত। এর উত্তরে দুটো কথা বলা যায়। এক, হয়ত মনে হয়েছে আমার সে যোগ্যতা নেই। দুই, দলের উপর আমার আস্থা ছিল। যাইহোক নাটকটি নিয়ে মহড়া শুরু হল।

এবার 'মহড়া' শব্দটি কেটে দিতে চাই। কারণ আমরা সেই প্রথম এমন একভাবে কাজ শুরু করি যাকে 'মহড়া' শব্দে আদৌ বোঝানো যাবে না। বরং ইংরেজি 'ওয়ার্কশপ' শব্দটিই এখানে অনেক বেশি লাগসই। নাটকের প্রস্তুতির ব্যাপারটা এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হল। এইভাবে সকলে মিলে চেষ্টা করে নতুন একটা পদ্ধতি বেরিয়ে এল। ওয়ার্কশপ-প্রক্রিয়া। এভাবে যাঁরা কাজ করেননি, ওয়ার্কশপ প্রক্রিয়ায় অংশ নেননি, তাঁদের কাছে এ শুধু একটা পরিভাষাই হয়ে থাকবে। সরাসরি অভিজ্ঞতা ছাড়া এ জিনিসটা বোঝা, বোঝানো সম্ভব নয়। ভাষায় 'ওয়ার্কশপ-প্রক্রিয়া' মূর্ত করে তোলা কঠিন। প্রায় অসম্ভব। পশ্চিমের কিছু ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেই এই ধরনের প্রক্রিয়ার কথা প্রথম জানতে পারি। এইসব ব্যক্তিরা হয় থিয়েটার না হলে নাচের দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। খুব দ্রুত প্রক্রিয়াটিতে নানা বদল ঘটতে থাকে। প্রয়োগের মধ্য দিয়ে বিস্তৃত হয়। প্রথমে আমাদের নিজেদের দলে, পরে থিয়েটার ও তার বাইরের লোকজন নিয়ে ওয়ার্কশপ করার মধ্য দিয়ে প্রক্রিয়াটি পুষ্ট হয়ে ওঠে।

সেই পাঁচের দশকেই পশ্চিমী রীতির 'প্রোডাকশন নোটস'-এর প্রতি আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। মহড়া শুরু করার আগে নোটস, নক্সা আর মডেলের সাহায্যে কোরিওগ্রাফির পুরো কাজটাই সেরে নিতাম। মঞ্চে তিন-পা পিছিয়ে যাওয়া, ঘোরা, পাঠ বলা, সামনে এগিয়ে গিয়ে তিন নম্বর চেয়ারে বসে পড়া—এই জাতীয় জিনিস আর কি। অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও এতে মোটের উপর খুশিই হতেন। কেননা তাঁদের আর এ নিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছে না।

আগে থেকে ছকে দেওয়া এই পরিকল্পনা সম্পর্কে একমাত্র তখনই ভাবা হতো যদি কোনও সমস্যা দেখা দিত। যে সমস্যার কথা আগে ভাবিনি। তবে তারও সমাধানের ভার ন্যস্ত হতো আমারই উপর।

কিন্তু "স্পার্টাকুস" নাটকটির প্রস্তুতিপর্বে নির্দেশক হিসাবে আমার ভূমিকা দাঁড়াল একেবারে উল্টোটা। নোটস, নক্সা ডায়গ্রামে আগে থেকে কিছুই ছকে ফেলা হয়নি। মহড়ার সময়ে কোনও একটি দৃশ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও কোরিওগ্রাফির পরামর্শ যখন দিয়েছি তখনও তা পূর্ব পরিকল্পিত নয়। সকলের মতামতের জন্য অপেক্ষা করা হতো, নানা ধরনের অদল-বদলের পরামর্শ, বা অন্য কোনও কোরিওগ্রাফির প্রস্তাবও উঠত। শেষপর্যন্ত কোনটা রাখা হবে তা আর নির্দেশকের উপর নির্ভর করত না। দল যেটা ঠিক করত সেটাই আমরা বেছে নিতাম। নির্দেশকের হস্তক্ষেপ সেইসব অতি-বিরল ক্ষেত্রেই ঘটত যেখানে দলের সবাই কোনওভাবেই একমত হতে পারছে না।

এই পদ্ধতিতে যে কাজ হল তার একমাত্র কারণ, প্রাথমিক অনুশীলন এবং ওয়ার্কশপ

এ-দুটো জিনিস আমরা সবাই নিষ্ঠার সঙ্গে মেনেছিলাম। নাটকটির প্রস্তুতিপর্ব এই প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল।

থিয়েটারে ভাব প্রকাশের অনুশীলন ক্ষেত্রে সবচেয়ে মারাত্মক বাধা হল জড়তা। প্রাথমিক অনুশীলন এই বাধা দূর করে। তা ছাড়া আরও অনেক সুফল তো আছেই। আমরা এভাবে নিজেদের শরীরটাকেও জানতে পারি। শরীরের সুপ্ত শক্তি ও সম্ভাবনা আবিষ্কার করি। পারস্পরিক আস্থার বিকাশ ঘটে। এই আস্থা দেহ ও মন উভয়েরই। থিয়েটার-স্থান বা 'স্পেস' এবং অন্যান্য অভিনেতা তথা মানুষের সঙ্গে সম্পর্কটা ধরতে পারি। ব্যক্তিগতভাবে এবং গোষ্ঠীগতভাবে শব্দ, অঙ্গসঞ্চালন (movement) ও ছন্দের অনুশীলন হয়, প্রত্যেকে নিজেদের সৃজন শক্তি সম্পর্কে সচেতন হন এতে। এ প্রায় এক আবিষ্কার তাঁদের কাছে। ওয়ার্কশপ প্রক্রিয়া তাঁদের সেই সৃজনী ক্ষমতার উন্মেষ ঘটায়। তাকে রূপ দিতে সাহায্য করে। যৌথতার এক জোরালো বোধ গড়ে ওঠে। এগুলিকে বলা যায় প্রাথমিক স্তরের ওয়ার্কশপ অনুশীলন, এবং এই অনুশীলন চলে বিভিন্ন খেলার মাধ্যমে। পরবর্তী পর্যায়ে গৃহীত হয় 'থিম' বা বিষয়বস্তু। এইবার মনের ভূমিকা। বা অন্যভাবে বললে দেহ-মন সম্পর্ক স্থাপন। এখানেই থিয়েটার স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল, সার্কাসের সঙ্গে তার ধর্মের তফাত। ঠিক এইখানটিতে এসে ওয়ার্কশপ-অনুশীলন হয়ে পড়ে 'অন্তর্গত'। এবং এই প্রক্রিয়াতেই বিষয়ের সঙ্গে ব্যক্তি অভিনেতা নিজের অনুভবের সংযোগ ঘটাতে পারে। শরীরে তা বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। শরীর সঞ্চালন, ধ্বনি, ছন্দ, শক্তি (power) এবং উচ্চারণের মাধ্যমে।

নাটকের বিষয়বস্তু নিয়ে যৌথভাবে অভ্যন্তরীণ চর্চার মধ্য দিয়েই যে কোরিওগ্রাফিও সৃষ্টি হয়ে যায় এমন নয়। কিন্তু এতে নাটকের সারবস্তু রক্তে মিশে যেত। শক্তির উন্মেষ ঘটাত। তার গাঢ়তা, মেজাজ, নাট্যকর্মী ও প্রযোজনার মধ্যকার অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের জরুরি ধাঁচ ধরতে সাহায্য করতো। আর তখনই গ্রুপের পক্ষে সম্ভব হত কোরিওগ্রাফিকে চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা। এটা মোটেই ওপর থেকে বা বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া নয়, দলের এক সামগ্রিক অবদান আছে। সেখান থেকেই উঠে আসছে।

আমি জানি একথাগুলো অস্পষ্ট এবং তাত্ত্বিক শোনাচ্ছে কিন্তু উপায় নেই। এর চেয়ে ভালভাবে আমি বলতে পারব না। এর বেশির ভাগ প্রক্রিয়াই প্রয়োগসঞ্জাত। অর্থাৎ আমরা চর্চার মধ্য দিয়ে দেখেছি প্রক্রিয়াটি কাজ করছে। তবে আমরা হয়ত সঠিকভাবে কিংবা সামগ্রিকভাবে জানিনা কেন ও কীভাবে কাজ করছে।

"স্পার্টাকুস"-এর প্রস্তুতিপর্বে যেমনটি ঘটেছিল : নাটকটির একের পর এক পৃষ্ঠা রূপান্তরিত হচ্ছিল, প্রকাশিত হচ্ছিল ধ্বনি, অঙ্গসঞ্চালন, আর শক্তিতে। দলের কাজের পর রোজ সন্ধেয় আমি নাটকের স্ক্রিপ্টটা নিয়ে বসতাম এবং প্রায়শই দেখতাম নাটকটির ভাববস্তুর বিন্দুমাত্র ক্ষতি না করে বেশ খানিকটা কেটে দেওয়া যায়। এইভাবে স্ক্রিপ্টের আয়তন অনেকটাই ছোট হয়ে গেল।

শহুরে মানুষ হয়ত "স্পার্টাকুস" নাটকটির কাঠামোকে জটিল ও চর্চিত সাহিত্যের অঙ্গ বলবেন।

সেভাবে কোনও ঘটনা পরম্পরা নেই। ঘটনাস্থলও দ্রুত বদলে যায় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়, সময়ের আগুপিছু, এমনকি একই দৃশ্যে স্থানকালের বিভিন্নতা আছে। স্পার্টাকুস ব্যক্তিনায়ক নন, তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দাসদের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। এই নাটকের প্রযোজনায় আমরা কোনও সেট ব্যবহার করিনি। আমাদের অভিনীত নাটকটিতে সারবস্তু অন্তর্লীন হয়েছিল দাসদের রক্ত ও ঘামে, তাদের বিদ্রোহে। ভারবাহী জন্তুর মতো শৃঙ্খলাবদ্ধ ক্রীতদাসরা মরুর উপর দিয়ে বোঝা টেনে চলেছে। আমাদের দলের অভিনেতারা চর্চার মধ্য দিয়ে এটাকে মূর্ত করে তুলেছিল। যেন প্রকৃতই তারা বহন করে চলেছে দুঃসহ বোঝা। নাটকটির প্রস্তুতিতে আমাদের প্রায় একবছর কেটে যায়।

এভাবে খুঁটিয়ে কাজ করার ফলও পেয়েছিলাম হাতেহাতে। নাটকটি নিয়ে প্রথমবার গ্রামে গিয়েই যা সাড়া পেয়েছিলাম তার তুলনা নেই। বেশ বুঝতে পারলাম এ নাটক সমস্ত গ্রামে সমাদৃত হবে। গ্রামের মানুষ যাত্রা আঙ্গিকটির সঙ্গে সুপরিচিত। নটের উচ্চগ্রামের ভাষণে তাঁরা উচ্ছ্বাসে হাততালি দিতে অভ্যস্থ। আমাদের নাটক "স্পার্টাকুস"-এ দাস বিদ্রোহের মুহূর্তগুলিতে ভাষণের কোনও ব্যাপারই নেই, শুধু শব্দ আর অঙ্গসঞ্চালনেই শেখানে শক্তির এক বিস্ফোরণ ঘটে। কিন্তু গ্রামবাসীদের চিনতে ভুল হয়নি। তাঁরা ঠিক ওই জায়গাটিতেই হাততালি দিয়ে ওঠেন। গ্রামে "স্পার্টাকুস"-এর প্রতিটি অভিনয়েই এটা ঘটেছে ব্যতিক্রমহীনভাবে। এই হাততালি মধ্যবিত্ত প্রধান শহরের অভিনয়ে কিন্তু একবারও ঘটেনি। এথেকে একটা জিনিসই বোঝা যায় দাসদের কষ্ট আর বেদনা (সহ্যের) সীমা লঙ্ঘন করেছে। গ্রামবাসীরা একান্তভাবে চাইছে দাসরা বিদ্রোহ করুক এখনই, এই মুহূর্তে।

আমার নাটক সম্পর্কে কিছুটা ওয়াকিবহাল শহুরে লোকরা প্রায়ই জিজ্ঞেস করে, 'হ্যাঁ মশাই সাধারণ লোক আপনার নাটক বোঝে' ? প্রথম-প্রথম আমি উত্তরটা এভাবে এড়িয়ে যেতাম : 'কই, ওঁরা তো উঠে চলে যান না। সেইটেই আমার কাছে যথেষ্ট।'

শুধু "স্পার্টাকুস" নয় অন্যান্য অনেক নাটকের ক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি শহুরে শিক্ষিত লোকজনের থেকে নিরক্ষর মানুষজন নাটকের ভাববস্তু অনেক ভাল বুঝতে পারেন। শহুরে, শিক্ষিত লোকজন নাটকের আঙ্গিকের প্রশংসা করেন। উপস্থাপনার কায়দা-কানুন ইত্যাদি প্রসঙ্গে উচ্ছ্বসিত হন। কিন্তু নাটকের বিষয়বস্তুর (কনটেন্ট) কথা উল্লেখও করেন না। আমাদের ক্ষেত্রে যদিও কনটেন্টই শুরুর পয়েন্ট। সেখান থেকেই যাত্রা শুরু। সে প্রসঙ্গ আলাদা।

আমাদের এই নতুন থিয়েটার-স্থান, যাকে আমরা 'অঙ্গনমঞ্চ' বলে থাকি সেখানে স্পার্টাকুসই প্রথম প্রযোজনা নয়। যদিও অঙ্গনমঞ্চ মাথায় রেখেই "স্পার্টাকুস" নাটকটি লেখা হয়। এর আগে "সাগিনা মাহাতো", "এবং ইন্দ্রজিৎ" এই দুটি নাটক আমরা অঙ্গনমঞ্চে করেছি। ইফলে মাত্র একবারই আমরা মঞ্চে "এবং ইন্দ্রজিৎ" করেছিলাম।

ফলে তুলনা করতেও খুব সুবিধে হয়েছিল। অঙ্গনমঞ্চের ক্ষেত্রে লেখক দর্শকদের মধ্য থেকে চরিত্রদের ডেকে নেন, অভিনেতারা বসে থাকেন দর্শকদের মধ্যেই। ফলে লেখকের চোখ যখন দর্শকদের মধ্যে চরিত্রদের খোঁজে দর্শকরা চেষ্টা করেন লেখকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে। যদিও তাঁরা জানেন অভিনেতারা দর্শকদের মধ্যেই মিশে আছেন। "এবং ইন্দ্রজিৎ" নাটক মঞ্চে অভিনয় করে এই এফেক্ট পাওয়া যায়নি, সেখানে দেরি করে আসা দর্শককে ডেকে নেওয়া ছাড়া অন্য কোনও পন্থা নেই। দর্শক ও অভিনেতার মাঝখানের পাঁচিল ভেঙে ফেলার ফলেই অঙ্গনমঞ্চে এই অধিকতর কার্যকর পন্থা কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছিল।

দুই ॥

মুক্ত থিয়েটারের শক্তি ও সম্ভাবনা যতই উপলব্ধি করতে থাকলাম আমাদের কাজের ধরনও ততই বদলে যেতে থাকল। থিয়েটারকে জনসাধারণের কাছে নিয়ে যেতে হবে ; যেখানে জনসাধারণ সেখানেই এই থিয়েটার—এই দৃঢ় বিশ্বাস গড়ে উঠল। দলের দার্শনিক ভিত্তি হয়ে উঠল অনেক সুস্পষ্ট। কনটেন্ট বা বিষয়বস্তুই আমাদের নাটকের গোড়ার কথা। কীভাবে এই বিষয়বস্তুকে সবচেয়ে কার্যকরীভাবে, সবচেয়ে গভীরভাবে প্রকাশ করা যায় সেই আঙ্গিকের জন্য মাথা ঘামাতে লাগলাম।

অগ্রাধিকারের ব্যাপারটা এরকম হলেও ফর্ম কখনও কখনও বিষয়বস্তুকে প্রভাবিত করতে পারে। কনটেন্ট যে তখন ফর্মের বশীভূত ঠিক একথা বলছি না। তবে ফর্মের প্রভাবে কনটেন্ট হয়ত আরও সুসঙ্গত, ভিন্ন এক গঠন পেল, প্রকৃত নাটক হয়ে উঠল। একটি নাটকের ক্ষেত্রে ঠিক এমনটিই ঘটেছিল। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে আমি নাটকটি লিখি। ওই বছরই নভেম্বর মাসে এক গ্রামে নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়। ১৯৯২ সালের ৬ মার্চ সেই নাটকটির দুশোতম অভিনয় হয়ে গেল কলকাতার কাছাকাছি এক গঞ্জে।

কলকাতার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা বরাবরই ভালবাসার এবং ঘৃণার। সাতের দশকের শুরুতে কলকাতার উপর কোলাজের ফর্মে একখানা নাটক করার কথা ভেবেছিলাম। কলকাতাকে সবাই মিছিলের শহর বলেই জানেন। তাই মনে হল মিছিল নামটাই যথাযোগ্য হবে। তাছাড়া, শুধু নাম নয়, কলকাতাকে মূর্ত করে তোলার পক্ষে এই মিছিলের পথ-ই মানায়। সাতের দশকের সেই বছরগুলিতে অজস্র যুবক-কিশোর পুলিশের হাতে খুন হল। নৃশংসভাবে তাদের হত্যা করা হল প্রকাশ্যে, গোপনে। একটাই স্থায়ী চিত্রকল্প তখন আমি দেখতে পেতাম, রোজই একজন খুন হচ্ছেন। এবং আরেকটি চিত্রকল্প হল ভাঁড় গোছের এক বৃদ্ধ। অন্তত আমার মনে এরকমই একটা অস্পষ্ট ছবি গেঁথে যায়। সম্ভবত নিজেকেই আমি ওই চরিত্রে দেখতে পেতাম। শিথিল কিছু নোট রেখেছিলাম, অসংলগ্ন কিছু দৃশ্যের নোটও। কিন্তু তখনও পর্যন্ত নির্দিষ্ট আকার গড়ে উঠেনি, কোনও দিকদিশাও ছিল না।

আকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর তিন তলায় তখন আমাদের অঙ্গনমঞ্চটি ছিল

অর্থাৎ একটি ঘর নিজেদের গুটিকয় বেঞ্চ, টুল ইত্যাদি। এক বিকেলে আমি সেই ঘরে একা আছি। হঠাৎ বেঞ্চগুলো নানাভাবে সাজাতে শুরু করি। এলোমেলো করে রাখি। এভাবে গোলকধাঁধার মতো একটা পথ তৈরি হয়ে যায়। বেজায় খাটনিতে ক্লান্ত, কিন্তু নানারকম দৃশ্য দেখতে লাগলাম। জটিল রাস্তার নক্সা দেখতে দেখতে মনে হল বিচিত্র পথ, কাল্পনিক মিছিল এঁকে-বেঁকে ছুটে যেতে চাইছে ওইসব রাস্তা ধরে। আর দুপাশে রয়েছে কাল্পনিক দর্শককুল। যুবকটি খুন হয়ে চলেছে। আর বৃদ্ধ এই রাস্তার জটিলতায় পথ হারিয়ে ফেলেছে। বস তথা গুরু এবং কোটাল ধীরে ধীরে অবয়ব নিতে থাকে। আগেকার নোট ও রচিত দৃশ্যগুলোতে মিছিলের কোরাস ছিলই। বেঞ্চের পর বেঞ্চ সাজিয়ে গড়ে তোলা গোলকধাঁধাঁ রাস্তা নিজের চোখে দেখা মাত্র নাটকটির পরিণত রূপ আমার কাছে ছবির মতো স্পষ্ট হয়ে যায়।

সাঁওতাল গ্রাম কাপাসটিকুরি গ্রামোন্নয়ন সংস্থার সম্মেলন উপলক্ষে নাটক করার ডাক পেয়েছি। আমরা "মিছিল" নাটকটাই করব। অভিনয়ের জন্য নির্দিষ্ট জায়গাটুকুকে ঘিরে গোল হয়ে বসে আছেন প্রায় তিনশো মানুষ। এঁদের মধ্যে আড়াইশোই সাঁওতাল। খালি গা, খালি পা। সাঁওতালরা বাংলা জানেন এই যা।

আমরা একটু ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। এই নাটকে গল্প বলে কিছু নেই। চরিত্র নেই। শহরের নানা চিত্রকল্পে ঠাসা নাটক। হঠাৎই মনে হল, কিন্তু এঁরা বুঝতে পারবেন না, এই নাটকে এমন কিছু তো নেই। বরং উল্টোটাই সত্যি, এরাই অনায়াসে বুঝে যাবেন। প্রতিদিন এক যুবকের নিহত হওয়ার ঘটনা এঁদের জীবনে তো এক মূর্ত অভিজ্ঞতা। বৃদ্ধ তাঁর পুরনো ঘরে ফিরতে চান না, পুরনো বাড়ি যে এক্ষেত্রে বর্তমান সমাজ সে কথা এঁদের বলে দিতে হবে না। এবং নতুন ঘরের খোঁজ যে আসলে অন্যায়, অবিচার, অনাহারের শেষ, নতুন ঘর মানে যে ন্যায়বিচার—একথা এঁরা সহজেই বুঝবেন। নাটক শুরুর আগে আমি মিনিট তিনেক সময় নিয়ে একথাগুলো বলি।

এরপর নিশ্ছিদ্র নীরবতা। একঘণ্টার নাটক। এই একঘণ্টা সবাই একাগ্রচিত্তে নাটক দেখেছেন। নাটকের শেষে আমরা হাত ধরাধরি করে একটা সুরে গেয়ে উঠি কিন্তু সেই গানে একটিও কথা থাকে না। দর্শকদের আমন্ত্রণ জানাই আমাদের সঙ্গে এসে হাত মেলাতে। এক বৃদ্ধ সাঁওতাল অশ্রুসজল চোখে এগিয়ে এনেন, একজন অভিনেতাকে জড়িয়ে ধরলেন।

এই বৃদ্ধ সাঁওতাল, পথের সঙ্গী সুটিয়া গ্রামের সেই 'বৃদ্ধা', পাঁচ পয়সা দান করেছিলেন যে ভিখারিনী, রাঙাবেলিয়া গ্রামে মাটি খোঁড়া সেই মজুর—এঁদের কথাই আমরা মনে করি যখন হতাশা আর ক্লান্তি আমাদের আচ্ছন্ন করতে চায়।

রাঙাবেলিয়া গ্রামের সেই মজুরটি পুকুর কেটে চলেছেন। বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য। সুন্দরবন অঞ্চলের নদীর জল বড়ই নোনা। নোনা জল চাষে লাগে না। সুন্দরবনে জঙ্গল হাসিল করে বসত গড়েছিলেন যে আদিবাসী মানুষজন এই দিন-মজুরটি তাঁদের বংশধর। বাঘ, সাপ, কুমিরের সঙ্গে লড়ে নোনা জলে তে'তুল মিশিয়ে

খেয়ে যে জমি তাঁরা হাসিল করেছেন, পরে দেখেছেন সেই জমি তাঁদের নয়। শহুরে মানুষের। কী একটা কাগজের জোরে জমির মালিক শহুরেবাবু। মাটি কাটা দিন মজুরিটি এই বঞ্চিত আদিবাসী 'ভোমা'র বংশধর।

সকালবেলা। সুন্দরবন এলাকায় পুকুর কাটার কাজে ব্যস্ত দিনমজুরদের কাছে গেলাম আমরা। আগের দিন সন্ধেয় এখানে "ভোমা" নাটকটা করেছি। মজুররা সব কাজ থামিয়ে আমাদের ঘিরে দাঁড়াল। কাজ থামানোর অর্থ রোজগার বন্ধ। কারণ এঁদের ফুরনের কাজ। কাজ করলে তবেই পয়সা। স্থানীয় এক সমাজকর্মী জানতে চায় গতকালের নাটকটা তারা বুঝেছে কি না।

নাটকে গল্প নেই, সাজ-পোশাক নেই, গান নেই, ভাল লাগে এমন কিছু নেই। এইসব বলে তিনি খোঁচাতে লাগলেন। কিন্তু সে দিনমজুরটি এক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন, তারপর খুব শান্তভাবে বললেন, 'এই নাটকে এমন একটা কথা নেই যা আমাদের মতো গরিব মানুষের বুঝতে কষ্ট হয়, তবে হ্যাঁ বড়লোকরা না-ই বুঝতে পারে।'

ঠিক এইরকমই অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল অনেক পরে এক গ্রামে যেখানে এক বৃদ্ধ মুসলমান দর্শক ভোমা নাটকটি আমাকেই বোঝাতে শুরু করেন! "ভোমা" নাটকটি বহু স্বতন্ত্র দৃশ্যের সমাহার। দৃশ্যগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন। আমার লিখতে সময় লেগেছিল প্রায় তিনবছর। কোনও ঘটনা, অভিজ্ঞতা তা সে বাস্তব জীবনের হোক কিংবা বই, সংবাদপত্র, বা আলোচনাতেই ঘটে থাকুক—যেটাই আমাকে খুব নাড়া দিয়েছে তা থেকেই এ নাটকের বিচ্ছিন্ন দৃশ্যগুলি গড়ে ওঠে। বলতে গেলে কোনও সংলাপই নেই নাটকটিতে। যা আছে তাকে বক্তব্য, ভাষণ বলা যেতে পারে। এই বক্তব্য বা ভাষণের প্রত্যক্ষ শ্রোতা হলেন দর্শক। দৃশ্যগুলি রচনার সময় আমার একবারের জন্যও মনে হয়নি নাটক লিখছি। বরং আমি যেন একটা দিনলিপি বা ডায়েরি লিখে যাচ্ছিলাম। ১৯৭৫ সালের গোড়ার দিক, আমরা তখন নতুন নাটক খুঁজছি। সেইসময় একদিন গ্রুপে এই দৃশ্যগুলি পড়ে শোনালাম। গ্রুপের সবাইকে বলা হল এ সম্পর্কে তাঁদের অনুভূতি, প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি লিখতে। আমি যে দৃশ্যগুলো রচনা করেছিলাম সবাই মিলে তার উপর কাজ শুরু করল। অনেকের অবদানে ক্রমে গড়ে উঠল "ভোমা" নাটকটি।

আদতে নাটকটিতে ভোমা প্রসঙ্গ ছিল একটিমাত্র দৃশ্যে। রাঙাবেলিয়া স্কুলের হেডমাস্টারের মুখে আমি গল্পটা শুনি। ওঁর সঙ্গে ভোমার দেখা হয়েছিল। তখন ভোমার বয়স ৭২ বছর। একবার বাঘের সঙ্গে লড়তে হয়েছিল ভোমাকে। সেই জীবন-মরণ লড়াইয়ে ভোমা একটি চোখ এবং ডান গালের এক খাবলা মাংস হারায়। নাটকটিতে ভোমা রুমশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এমনকি নাটকটি তার নামে নামাঙ্কিত হয়ে যায়। যদিও নাটকে কখনওই সে সশরীরে একটি চরিত্র হিসাবে উপস্থিত নয়। আবার এই নাটক ভোমার জীবনকাহিনীও নয়। ভোমা নয়, নাটকটি ভোমাদের কথা বলে। অর্থাৎ তা হয়ে ওঠে সমাজ বাস্তবতা। কী না এসেছে সেখানে, ভূগর্ভের

জলসমস্যা, পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষার বিপদ, কলকাতার পাতাল রেল প্রকল্প, ডলার সাহায্য ইত্যাদি, ইত্যাদি। এইসব বিক্ষিপ্ত ও বিচিত্র সমস্যার মধ্যে সূত্র একটাই : একজন শহুরে মানুষ ভোমাকে খুঁজে চলেছেন। কারণ ভোমাই একমাত্র ব্যক্তি যে বিষাক্ত জঙ্গল হাসিল করে আবাদ বানাতে পারে। বর্তমান সমাজই সেই বিষগাছের ঝাড়। ভোমাই পারে তা নির্মূল করে মানুষের বাসযোগ্য করে তুলতে।

নাটকটির উপস্থাপনায় আমরা মাত্র ছ-জন অভিনেতাকে কাজে লাগাই। চার-পাঁচ জনের একটা বসে-থাকা কোরাস শব্দ ও সুরে সাহায্য করে। ভোমা আমাদের দলের সেই গুটিকয় নাটকের একটি যাতে শুরু থেকেই অভিনেতারা টান টান থাকেন, একাত্ম হয়ে পড়েন। ফলে প্রতিবারের অভিনয়েই তাঁদের মনে হতো, এই যেন প্রথমবার নাটকটি করছেন। নাটকটি তৈরি করতে আমাদের একবছর সময় লেগেছিল। ওয়ার্কশপ প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে নাটকটি গড়ে তোলা হয়। রাঙাবেলিয়াতেই নাটকটি প্রথম অভিনয় করি একথা ভাবলে বেশ গর্ব হয়। কারণ সেটাই ভোমার গ্রাম। এ পর্যন্ত ১০৪ বার আমরা "ভোমা" করেছি।

"ভাঙা মানুষ" নাটকটির ক্ষেত্রেই আমরা সব থেকে বেশি একাত্ম হয়ে যাই। এতখানি সম্পৃক্তির অভিজ্ঞতা আগে হয়নি। ১৯৭৭ সালের ঘটনা। তখন অনাহার, অর্থ, বন্দিত্ব, পীড়ন সম্পর্কিত বিষয়ে ওয়ার্কশপ করে চলেছি। প্রপস হিসেবে ব্যবহার করছি দড়ি, মুদ্রা, বাসি রুটি ইত্যাদি। ওয়ার্কশপের মাধ্যমে এমন একটি এনার্জি সঞ্চারিত হল যে আমরা ভাবলাম আর এক ধাপ এগিয়ে কাজ করব, চেষ্টা করব ওয়ার্কশপকেই সরাসরি থিয়েটারে নিয়ে আসতে। অনেক আলোচনা, বিতর্ক এবং বহু ওয়ার্কশপের পর আমরা সাহসে ভর করে এগোলাম। কিন্তু নাটকটির উপস্থাপনার সময় আমরা মধ্যে-মধ্যে নিরাপত্তার অভাব বোধ করতাম, কোনও দর্শকের ঠোঁটে সিনিক-হাসি দেখলে অত্যন্ত আঘাত পেতাম। ৯ বার অনুষ্ঠানের পর এই নাটকটা আমরা আর করতেই পারলাম না। ভাঙা মানুষের পুরো বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব, তাই এটুকু বলেই থামতে হচ্ছে। এর চার বছর পরে এই একই বিষয়ে অপেক্ষাকৃত সুগঠিত কাঠামোয় আমরা "মানুষে মানুষে" করি। "ভাঙা মানুষ" করে যে গভীর অভিজ্ঞতা হয়েছিল এক্ষেত্রে তার ধারে-কাছে পৌঁছতে পারিনি। তবে আমাদের থিয়েটারে "মানুষে মানুষে"-ই একমাত্র প্রযোজনা যেখানে কথার ব্যবহার বলতে গেলে নেই। বাংলার বাইরে তাই এর প্রযোজনা সহজে করা গেছে। আকাডেমির ঘর ছেড়ে দিলাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে। শুধু মাঠে-ঘাটেই চলতে থাকল আমাদের অভিনয়। কিন্তু এমার্জেন্সির সময় মাঠের অভিনয় পুলিশ বন্ধ করে দিল। তখন ঘর খুঁজতে বাধ্য হলাম, প্রায় আন্ডারগ্রাউন্ড অভিনয় চালিয়ে যাওয়ার জন্য। এইসময় কলেজ স্কোয়ারে থিয়োসফিকাল সোসাইটির ঘরে প্রতি শুক্রবার অভিনয় চালু হল। এমার্জেন্সি উঠে গেলে আবার কার্জনপার্কে আমরা অভিনয় শুরু করি।

এবার "গন্ডী"র কথায় আসি। ব্রেখটের "ককেশিয়ান চক সার্কল" অবলম্বনে গন্ডী

নাটকটি গড়ে ওঠে। আমরা যে বিশেষভাবে ব্রেখটেরই একটা নাটক করতে চাইছিলাম তা নয়। মনে হয়েছিল ব্রেখটের এই নাটকটি খুবই ভারতীয় এবং সাম্প্রতিক। সে-জন্যই এই নাটকটি বেছে নিই। ব্রেখটের প্রোলগ অংশ পুরোটা বাদ দিলাম একই কারণে। যে-যে অংশ মনে হয়েছে অ-ভারতীয়, ব্রেখট থেকে নির্দ্বিধায় সেসব অংশ বাদ দেওয়া হল। নাটকটির উপস্থাপনা সংক্রান্ত ব্রেখটের যে নির্দেশ আছে আমরা সেসব আদৌ মানিনি। কেননা তাহলে ভারতীয় মেজাজ সৃষ্টি করা যাবে না। একদল লোক বসে গাইছে—এ জিনিসটা আমরা রাখিনি। এমনকি গানই রাখিনি। গানের কথাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুর খারাপ হলে লোকে শুনবে না। সুর ভাল হলে গানের কথার দিকে মন যাবে না। তাই আমরা ঝুঁকি নইনি। মোট ৮৫ বার নাটকটি আমরা করি। একবারও মনে হয়নি পরিবর্তন সংক্রান্ত আমাদের সিদ্ধান্তগুলি ভুল হয়েছে।

নাটকে শিশুটিকে কীভাবে দেখাবো এ নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা ছিল না। তবে একটা ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত ছিলাম—শিশুটির জায়গায় পুতুল ব্যবহার করব না। জীর্ণ সেতুটি কীভাবে তৈরি করা হবে, পার্বত্য-পথে সফরের ব্যাপারটা কীভাবে দেখাব কিংবা মাত্র ষোলো জন সদস্য নিয়ে নাটকটা করব কী করে—এসব সমস্যাকে আমরা পাত্তা দিইনি। সদস্যসংখ্যার কথাটা উঠেছে এইজন্য যে আমাদের নাটকে দলের সদস্যরাই নিজেদের শরীর দিয়ে গড়ে তুলবে মঞ্চসজ্জা। আসলে দলের উপর, ওয়ার্কশপ প্রক্রিয়ার উপর আমার গভীর আস্থা ছিল। ইতিপূর্বে "হট্টমেলার ওপারে" তে মানব-দেহের সাহায্যে আমরা সেট তৈরি করেছি, সেই অভিজ্ঞতার পুঁজিও ছিল।

দর্শকের কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে শূন্য শিশুর জামাটি ব্যবহার করি। অভিজ্ঞতা বলে দিল, দর্শকরা যে নিজেদের কল্পনাশক্তি কাজে লাগাতে উন্মুখ এবং সেই সুযোগ পেয়ে তাঁরা বেজায় খুশি। সেটের সমস্ত কাজ মানবদেহ দিয়ে সম্পন্ন করেছি এমনকি সেই জীর্ণ সেতুটিও গড়ে ওঠে শরীর বিন্যাসে। জীর্ণ সেতুটি পার হওয়া কঠিন। নাটকে এমনভাবেই সেতুটি গড়ে তুলি যে চরিত্রটিকে তা পার হতে সত্যিকারের বেগ পেতে হয়েছিল। অভিনেত্রীর পার হওয়ার সময় সেতুটি রীতিমতো দুলে ওঠে। এবার মহিলা সেতুর রেলিং ধরে সোজা রাখতে চায় নিজেকে কিন্তু লম্বঝর সেতুটির রেলিং হিসাবে দাঁড়িয়ে থাকা অভিনেতারাও দুলে ওঠেন, যেন যে কোনও মুহূর্তে সেতুটি ভেঙে পড়বে। সেতু পেরনোর সময় অভিনেত্রীকে অত্যন্ত সতর্কভাবে প্রতিটি পা ফেলতে হচ্ছে যাতে কারও চোট না লাগে। আর তাতেই এমন একটা এফেক্ট তৈরি হয়ে যায় যেন সে সত্যিই একটা পাটাতনের পর ফাঁক পেরিয়ে আরেকটা পাটাতনে পা ফেলছে। খুব সহজ সরল ব্যাপার। কিন্তু এতেই দারুণ কাজ হয়েছিল। এই অভিনেতারাই অবস্থান ও ভঙ্গি বদলে রচনা করেন পার্বত্যপথ। এই পরিবর্তন ঘটাতে কঠোর মেহনত করাতে হয়েছে। গভীর মনোযোগ ও শ্রমেই পরপর এইভাবে সেই বদলে ফেলার কাজটা অভিনেতারা রপ্ত করে নিতে পেরেছিলেন। এবং এমনভাবে বদলটা ঘটানো হতো যেন কোথাও সামান্য

খিঁচ না থাকে। সংখ্যাগত যে সমস্যা ছিল সেটা মেটাতে আমাদের একেকজনকে অনেক ভূমিকায় নামতে হয়েছে। এমনকি একজনকে হয়ত বারো-চোদ্দটি ভূমিকা নিতে হয়েছে। আমরা পোশাকের বদলে পোশাকের আভাস ব্যবহার করেছি, এমনভাবে যাতে চটপট খোলা ও পরা যায়। এই বদলে দর্শকও দ্রুত বুঝে যাবেন সেই মুহূর্তে অভিনেতা অভিনেত্রী কোন ভূমিকাটি করছেন।

দর্শকের প্রতিক্রিয়ার নিরিখে "গণ্ডী" আমাদের সবচেয়ে সফল নাটকগুলির অন্যতম। "স্পার্টাকুস" ও "মিছিল" এর সমপর্যায় ভুক্ত। থিওসফিকাল সোসাইটি হলে "গণ্ডী"-র প্রতিটি প্রদর্শনী অগ্নিগম হাউসফুল হয়ে যেত। গ্রামেও এই নাটক প্রবল সাড়া ফেলেছিল। বিশেষ করে রাঙাবেলিয়ায়। গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের কাছে নাটকটির বার্তাও সহজেই পৌঁছে গিয়েছিল :

যে মা ভালবাসে তার কাছে যাবে ছেলে
যে গাড়োয়ান গাড়ি চালায় তার কাছে যাবে গাড়ি
যে চাষি চাষ করে তার কাছে যাবে জমি।

নাটকটি ভারতীয় এবং সাম্প্রতিক—আমার এই ধারণা সত্য প্রমাণিত হল। যদি আমরা নাটকটা করে যেতে পারতাম তাহলে "মিছিল"-এর মতো দুশো বারের বেশিও অভিনীত হতো এই নাটক। "স্পার্টাকুস" সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। যদিও ৮৮ বার প্রদর্শনীর পর আমরা আর "স্পার্টাকুস" করতে পারিনি। অন্যদল অবশ্য এখন "স্পার্টাকুস" করে যাচ্ছে।

তিন ॥

অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, মঞ্চের জন্য লেখা সমস্ত নাটকই কি অঙ্গনমঞ্চে করা যায়। এ ব্যাপারে আমার জবাব : হ্যাঁ, করা যায়। যদি না নাটকটি করতে হাজারো মঞ্চসজ্জা আর ম্যাজিক অপরিহার্য হয়। যে কোনও নাটক অঙ্গনমঞ্চে করা সম্ভব এই কথা প্রমাণ করতে আমাদের দল ব্যস্ত হয়ে পড়েনি। আসলে এই নতুন থিয়েটার তো আমাদের কাছে নিছক **ফর্মের** ব্যাপার নয়। এ একটা **দর্শন**। যেজন্য আমাদের যাত্রা শুরু হতো বিষয়বস্তু থেকে। কীভাবে বলতে চাই তা নয়। আমাদের কাছে প্রশ্নটা ছিল এইরকম : আমাদের কী বলার আছে। এখান থেকেই আমরা শুরু করতাম।

নতুন বিষয়বস্তুর সন্ধানে আমরা সাহিত্যের দিকে হাত বাড়ালাম। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাসের প্রতি বিশেষ টান অনুভব করলাম। এত ভাল উপন্যাস আমি খুব কমই পড়েছি। "পদ্মানদীর মাঝি" এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু আমাদের কাজের ধরনের সঙ্গেও খাপ খেয়ে যায়। এখানে গ্রামের শ্রেণীবিন্যাস যেরকম সূক্ষ্ম ও শৈল্পিকভাবে করা হয়েছে তা প্রায় নজিরবিহীন। কিন্তু আমি উপন্যাসটির নাট্যরূপ দিতে চাইনি। চাইছিলাম উপন্যাসটিকেই সরাসরি থিয়েটারে উপস্থিত করতে। সেজন্যই চরিত্রদের মুখের কথা শুধু নয়, লেখকের বর্ণনা, মন্তব্য—সবই থাকবে। স্ক্রিপ্ট তৈরি

করলাম সেভাবে। কাজ শুরু হল। একবার নয় পরপর দুবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু দুবারই তা ভেস্তে গেল বাহ্য কারণে। এরপর একই ধরনের একটা স্ক্রিপ্ট তৈরি করলাম। এবারের লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাসটির নাম "নাগিণী কন্যার কাহিনী"। আমরা অবশ্য শুধু "নাগিণীকন্যা" নাম দিলাম। এই উপন্যাসে পুরাণ কথা আর বাস্তবের এক চমৎকার মিশ্রণ ঘটেছে। সাপুড়ে সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, সংস্কার, প্রথা ও আবেগের সঙ্গে মনসা এবং চাঁদ সওদাগরের কাহিনীকে লেখক অতি নিপুণভাবে জুড়ে দিতে পেরেছিলেন। আবার সভ্যতার সংস্পর্শে এসে সাপুড়ে জীবনে যে ভাঙন ও সংঘর্ষ দেখা দিচ্ছে অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে লেখক সেই চিত্রটিও তুলে ধরেছেন। গল্পের প্রধান দাবি পরিবেশ হিসাবে 'হিজল বিল'-এর উপস্থিতি। গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত একটা জলাভূমি। এই জলায় উপজাতির লোকজন মরশুমে এসে বসত গড়েন। গল্পের আর সব দাবির মধ্যে আছে চিতা, শিকার, নৌকায় এবং পায়ে হেঁটে দীর্ঘ যাত্রা। অর্থাৎ আমাদের বিস্তর জায়গা দরকার। অথচ আমাদের এতখানি জায়গা নেই। দর্শকদের পিছনে দু-পাশে লম্বা ফালি জায়গা মধ্যবর্তী 'এরেনা'-র সঙ্গে যুক্ত করে আমরা স্থান সমস্যার সমাধান করলাম।

কিছু অভিনেতা দর্শকের পিছনে থেকে হিজল বিলের পরিবেশ সৃষ্টি করবে ঠিক হল। দীর্ঘ যাত্রা এবং শিকারের দৃশ্যেও গলি দুটিকে কাজে লাগানো হল। তথাকথিত আলোক সম্পাতের মধ্যে না গিয়েও বা আলোর বিশেষ কারিগরি ব্যবহার না করে শুধু একেকবার একেক জায়গায় আলো ফেলে উপযুক্ত 'জেনাল এফেক্ট' তৈরি করা গিয়েছিল। এর একটাই সীমাবদ্ধতা ছিল, অঙ্গনমঞ্চ ছাড়া নাটকটি করা যাচ্ছে না। অর্থাৎ শ খানেক দর্শকের মধ্যে আটকে থাকতে হচ্ছে। আরও বেশি সংখ্যক দর্শকের জন্য খোলা মাঠে যাতে নাটকটি করা যায় সেজন্য আমরা ভিন্ন এক কোরিওগ্রাফির কথাও ভাবছিলাম। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। এমন কিছু সমস্যা দেখা দিল যে বার পনেরো করার পর নাটকটা বন্ধ করে দিতে হল।

১৯৯০ সালের মাঝামাঝি, অর্থাৎ "নাগিণী কন্যা"-র প্রায় সাত-আট বছর পরে আমরা "পদ্মানদীর মাঝি" নিয়ে ফের পড়লাম। এই নিয়ে তিনবার চেষ্টা হল। তবে তৃতীয়বারের চেষ্টায় নাটকটা করা গেল। "নাগিণীকন্যা"-র মতো একইভাবে এই নাটকের স্ক্রিপ্ট লেখা হলেও, এর উপস্থাপনা ছিল একেবারেই আলাদা। এ একেবারে নতুন যাত্রা। নাগিণীকন্যায় অনেকেই দুটো চরিত্রে অভিনয় করেছে তথাপি এক-একটি ভূমিকায় একেকজনই ছিলেন। কিন্তু "পদ্মানদীর মাঝি"তে প্রতিটি চরিত্রের দায়িত্ব পালাক্রমে সকলকে নিতে হয়েছে। সেদিক থেকে এ শুধু উপন্যাসের নাট্যরূপ নয়, বরং উপন্যাসটির থিয়েটারি উপস্থাপনা। "পদ্মা নদীর মাঝি" যখন যেখানে খুশি অভিনয় করা সম্ভব ছিল। খোলা মাঠে কিংবা বদ্ধ ঘরে। দুঃখের কথা, মাত্র তিনবার করার পরই নাটকটি বন্ধ করে দিতে হল। আর তার কারণ, যেমনটি বলা হয়ে থাকে 'অনিবার্য কারণে'। তবে আমাদের বিশ্বাস, দল বেঁচে থাকলে এই নাটকটা আমরা

আবার করব।

উপন্যাস থেকে কবিতার প্রসঙ্গে এসে এলোমেলো এই লেখাটির আপাতত সমাপ্তি টানা যেতে পারে। উপন্যাস ও ছোটগল্পের থিয়েটারি উপস্থাপনা থেকে কবিতার মন্তাজ। কবিতা-মন্তাজ বস্তুটি যে কী আমাদের মধ্যে কেউই শুরুতে তা জানতাম না। কারণ এমন তো নয় যে প্রথমে আমরা একটি কবিতা উপস্থাপনার কথা ভাবি ও তারপর এর সঙ্গে খাপ খায় এমন কবিতার কথা ভেবেছি। কিছু কবিতা পড়ে আমরা আলোড়িত হই। তীব্র ইচ্ছে হয় সেইসব কবিতার থিয়েটারি উপস্থাপনার। এখন কবিতা-মন্তাজ এই টার্মটা আমাদের বেশ লাগসই মনে হয়েছিল। সত্যিসত্যি এর মানে কী হতে পারে না পারে সেসব নিয়ে আমরা বিশেষ মাথা ঘামাইনি। যে কবিতাগুলি আমাদের আলোড়িত করেছিল তার রচয়িতা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মণিভূষণ ভট্টাচার্য। এক্ষেত্রে কবিতার চূড়ান্ত নির্বাচন এবং পরম্পরা নিয়ে আমরা গোড়ায় মাথা ঘামাইনি। কবিতা আমাদের রক্তে, ধমণীতে যে আলোড়ন সৃষ্টি করছে তারই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটাতে চেয়েছিলাম। সেইভাবেই ওয়ার্কশপ করা হয়। ধ্বনি ও শরীরের ভাষায় যাতে সেই স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি মূর্ত হয়ে ওঠে সেই কাজে আমরা মগ্ন হয়ে পড়ি। থিয়েটারের খোঁজে আরও বহু যাত্রার কথাই বলা হল না, সময় সুযোগ এলে পরে চেষ্টা করা যাবে। □

নৈঃশব্দের ভাষা

প্রবীর গুহ

শরীরের ভাষার ব্যবহারেই গড়ে ওঠে আমাদের থিয়েটার। এ জন্য একে বলা হয় 'ফিজিক্যাল থিয়েটার'—অনেকেই যাকে নেহাত ফর্মের এক 'বিদেশি চমক' বলে মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটাই থিয়েটারের আদি ফর্ম। গুহামানবের দল যখন অনুকরণ আর আদিম নৃত্যের মাধ্যমে বন্য প্রাণীদের সঙ্গে তাদের লড়াইকে বোঝাতে চাইত, থিয়েটারের সূচনা হয়েছে সেই পর্বেই। গোষ্ঠীজীবনের বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপ যেমন শিকার, মাছ-ধরা, খাদ্য-সংগ্রহ, অভিষেক ও যুদ্ধ—ইত্যাদিকে ব্যক্ত করতে ব্যবহৃত হয়েছে এই থিয়েটার। পরবর্তীকালে বিভিন্ন লোকাচারের অনুষ্ঠানে এমনকি যাত্রাতেও এই ফিজিক্যাল ফর্মের নানা রূপ খুঁজে পাওয়া যাবে। এ কালেও যে কোনও রাজ্যের লোক-সংস্কৃতিতে ব্যাপকভাবে ফিজিক্যাল ফর্মের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। গ্রামের মানুষের কাছে ফিজিক্যালিটিই বিশ্বাসের মূল ভিত্তি গড়ে তোলে। লোক-সংস্কৃতিতে ফিজিক্যালিটির ব্যবহার কিন্তু এক-আধ দিনের চিন্তার ফল নয়, এর পেছনে রয়েছে কয়েক হাজার বছরের অনুশীলনের ইতিহাস।

শারীরিক কসরত নয়

এই ফিজিক্যাল থিয়েটার প্রকৃতপক্ষে কী? সেগুলো কি সত্যই কিছু শারীরিক কসরত দেখানো মাত্র? আসলে তা নয়! দর্শকের কাছে নিবেদন করার জন্য যখন আমাদের কাছে শরীর ছাড়া আর কিছুই থাকে না, সে ক্ষেত্রে শরীরের নানা বিভঙ্গ দিয়ে কখনও একক বা কখনও দলগতভাবে একটা শরীর-ভাষা তৈরি করে আমরা বক্তব্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করি, সংযোগ স্থাপন করতে চাই। এখন প্রশ্ন হল এই শরীর-ভাষা বলতে কী বোঝায় এবং কীভাবেই বা তার প্রকাশ ঘটে? সে ভাষাকে কি আমি নিজেই নিয়ন্ত্রণ করি? সহজভাবে বলতে গেলে পৃথিবীর সব দেশের মানুষই সাধারণত একইভাবে কাঁদে, হাসে, অভিমান করে, দুঃখ পায় বা রাগ করে। এ ধরনের আবেগের বহিঃপ্রকাশ সকলের ক্ষেত্রেই প্রায় এক রকম সুতরাং এগুলোকে কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কিন্তু কিছু অন্যধরনের বৈশিষ্ট্যও আছে যা সাধারণভাবে দৃষ্টিগোচর নয়। যেমন ক্ষুধার অভিব্যক্তি আমাদের চোখে-মুখে খুব কমই ফুটে ওঠে। কিন্তু খিদে পেলে এক-একজনের ক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়া হবে এক-এক রকমের। এখন অভিনয়ে 'খিদে' ব্যাপারটা আনতে গেলে আমরা কোনও সাধারণ রূপ খুঁজে পাব না,

আমাদের তখন ফিজিক্যালিটিতে বিশ্বাস করতে হয়। ক্ষুব্ধিত ব্যক্তির ভিতরে যা ঘটছে, তার ফিজিক্যাল রূপটা অভিনয়ের মধ্যে আনতে হয়। শরীরবিদ্যার ব্যাপারটা এখানে চলে আসে, অর্থাৎ মোটর নার্ভ, সেনসরি নার্ভ ইত্যাদি।

আমাদের বেশিরভাগ কাজ বা অভিব্যক্তির জন্য দায়ী স্নায়ুতন্ত্র বা নার্ভাস সিস্টেম। এখন এই নার্ভগুলোর উপরে যদি আমার এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ জন্মায়, অর্থাৎ কোনও নার্ভকে দিয়ে কোন সময়ে কতটুকু কাজ কীভাবে করাব—তা যদি আমার আয়ত্তাধীনে হয় তবেই আমি শারীরিক থিয়েটারের ভিত্তি খুঁজে পাব। পুরনো দিনের লোকশিল্পী বা বড় বড় শিল্পীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় তাঁরা কোনও-কোনও ক্ষেত্রে নিজেদের অজ্ঞাতসারে, অসচেতনভাবেই এই ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন। আমরা সেই ঐতিহ্যের জগতে সন্ধান করে দেখতে চেষ্টা করি, আবিষ্কার করতে চাই সেই পদ্ধতি বা প্রক্রিয়াগুলো যার মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে পেশী এবং স্নায়ুতন্ত্রের উপর সচেতনভাবে খানিকটা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যাবে। জেনেবুঝে তাকে থিয়েটারের [শরীর-নির্ভর] কাজে লাগাতে পারব। [শারীরিক] থিয়েটারের এটাই পদ্ধতি। কিন্তু এই অবস্থাটা এখনও আমারা তৈরি করতে পারিনি, তাকে খোঁজার চেষ্টা করছি মাত্র।

ভাষা-সন্ধান

'কী বলব' এবং 'কীভাবে বলব' এই দুটিই থিয়েটারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। অর্থাৎ সাবজেকট ম্যাটার আর ফর্মের বিচার। 'কী বলব'-র ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই তাদের চিন্তা অনুযায়ী স্বাধীনভাবে বিষয়কে বেছে নেবে। আমি এখানে 'কীভাবে বলব' বিষয়ে কয়েকটি কথা বলতে চাই। একটা উদাহরণ দিয়ে শুরু করা যাক। মনে করুন আপনি ভিড় বাসে জনৈক সহযাত্রীর পা মাড়িয়ে দিয়েছেন। এবারে একজন প্রাচ্যের অধিবাসী হিসাবে আপনি নিশ্চয়ই ক্ষমাপ্রার্থী হবেন। প্রথমেই আপনি ঠিক করে নিলেন 'কী বলব'। ধরা যাক, আপনি বলবেন, 'সরি, কিছু মনে করবেন না, দেখতে পাইনি'। এবারে প্রশ্ন, 'কী ভাবে বলবেন'। আপনার লজ্জিত অবস্থাকে প্রকাশ করতে প্রয়োজন হবে গলায় অতি বিনম্র সুর এবং বিনয়ীভাবের দ্যোতক দেহের অঙ্গভঙ্গি। এ দুয়ের মিশ্রণে উচ্চারিত হতে হবে আপনার বাক্যটিকে। তা না করে আপনি যদি বেশ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বিরক্তিতে মুখ কুঁচকে বলেন, 'লেগে গেছে, ক্ষমা করবেন', বা ওই ধরনের কিছু, ভদ্রলোক কি তাহলে সত্যিই আপনাকে ক্ষমা করবেন?

এবার থিয়েটার থেকে দুয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাক। বিখ্যাত 'কল্লোল' নাটকের কথা যখনই মনে পড়ে, তখনই চোখের সামনে ভেসে ওঠে 'খাইবার' জাহাজ, জল কেটে এগিয়ে চলেছে। বয়লারে কয়লা ঠেলছে নাবিকের দল। সগর্জনে কামানগুলো গোলাবর্ষণ করে যাচ্ছে। অথবা মনে পড়ে 'অঙ্গার' নাটকের শেষ দৃশ্য, যেখানে কয়লার খনিতে জল ঢুকছে। ভারতীয় থিয়েটারের পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত দুটি নাটকই ছিল অত্যন্ত

বলিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ প্রযোজনা। অথচ নাটকের মূলে বক্তব্য কোথায় যেন হারিয়ে গেল বৈজ্ঞানিক আলোর মারপ্যাঁচে। 'অঙ্গার'-এর শেষ দৃশ্যের খাদে জল ঢোকাটা মনে পড়ে অথচ সেই মুহূর্তের শ্রমিকের আর্ত চিৎকারটা আমাকে বই দেখে পড়ে নিতে হয়। যেমনটি হয় 'কল্লোল'-এ শার্দুল সিং-এর 'নো সারেণ্ডার' কথাটা মনে করতে গিয়ে।

সেই থেকে শুরু হয়েছে খোঁজার পালা—কী ভাবে বলা উচিত। বারবার মনে হয়েছে আমাদের সততা ও আন্তরিকতায় কোনও ফাঁকি নেই, শুধু জানি না কীভাবে কমিউনিকেট করতে হয়। যে গতানুগতিক ধারায় আমরা কাজ করছিলাম, তার আবিষ্কর্তা আমরা নই, আমাদের এক ফোঁটা অন্বেষণের পরিশ্রম নেই এর মধ্যে, দুশো বছরের সাদা চামড়ার প্রভুদের থেকে তা আমরা দেখে শিখেছি মাত্র। এ সময়টা অবধি আমার ধারণা ছিল নাটক করতে গেলে প্রয়োজন হয় তিনটি জিনিসের, প্রথমত, ভাল অভিনয়-ক্ষমতা, দ্বিতীয়ত, অসম্ভব ভাল কোরিওগ্রাফির জ্ঞান আর তৃতীয়ত, সাংগঠনিক ক্ষমতা। কিন্তু কাজের মধ্যে অনুকরণের ঝোঁক কীভাবে কাটিয়ে তুলব তা আমাদের জানা ছিল না। 'অনুকরণ মাত্রই দোষণীয়' না হলেও অনুকরণবৃত্তির সঙ্গে সৃষ্টিশীলতার কোনও সম্পর্ক নেই।

চোখ কান খোলা রেখে আরও সজাগ হলাম, চারপাশে আরও সচেতন দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে শুরু করলাম। দেখলাম আমাদের চারপাশে সর্বত্রই রয়েছে থিয়েটারের এক মহা আয়োজন, পারিপার্শ্বিক জগতের মধ্যেই লুকিয়ে আছে থিয়েটারের এক আশ্চর্য জগত। একটা অভিজ্ঞতার গল্প বলি। আটাত্তর সালের মে মাসের একদিন বিকেলবেলায় গিয়ে পড়লাম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের দামোদরের পাশে ছোট্ট এক গ্রাম বীরভানপুরে। নদীর ওপারে রুখু বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষের দিকচক্রবাল। বালির চড়ায় প্রায় পঞ্চাশ ফিট উঁচু এক ঢড়কের কাঠ, তার ওপরে আড়াআড়িভাবে আরেকটা লম্বা কাঠ চরকির মতো করে বসানো। আড়াআড়ি কাঠটার একপ্রান্তে ঝোলানো রয়েছে লম্বা একটি দড়ি, অন্যপ্রান্তে দড়িতে বাঁধা আছে বঁড়শির মতো বাঁকানো ভারি একটা লোহার হুক। আশেপাশে নানান গ্রাম থেকে আসা মানুষের ভিড়। এবার ভক্ত এলেন। খালি গা, নতুন একটা ধুতি মালকোচা দিয়ে পরা, একটা গামছাকে পাকিয়ে শক্ত দড়ির মতো করে বুকে বাঁধা। সবার দিকে ঘুরে ঘুরে দেখে হাতজোড় করে নমস্কার করলেন। বীর শহিদের মতো ঋজু, বিনম্র তার চলাফেরা। চড়ক কাঠে প্রণাম করে আবার সবার দিকে তাকালেন। এবার আমার সঙ্গে চোখাচোখি হল, সেই এক নিষ্পলক মুহূর্তে তিনি যেন অনেক কথাই বললেন। হয়ত যার সঙ্গেই চোখাচোখি হল, এইভাবে কথা বলে চললেন। চক্রাকারে ঘুরে এসে শান্ত হয়ে দাঁড়ালেন হুক বাঁধা দড়িটির নিচে, সহযোগীরা এগিয়ে এসে লোহার সুতীক্ষ্ণ হুকটা বঁড়শিতে মাছ গাঁথার মতো ফুটিয়ে আটকে দিলেন তার পিঠে। টপটপ করে রক্ত ঝরতে থাকল তার গাঢ় বাদামি রঙের চামড়া বেয়ে। দু-এক ফোঁটা ঝরে পড়ল সাহারার মতো তপ্ত মাটিতে, তিনি কিন্তু নির্বিকার। অপাঙ্গে একবার রক্তের ফোঁটার দিকে তাকিয়ে মাথা উঁচু করে চড়ক

কাঠের শীর্ষে একবার তাকালেন। ওই অবস্থায় ওকে টেনে তোলা হল মাটি থেকে প্রায় চল্লিশ ফুট ওপরে। ক্রেনের হুকে আটকানো ভারি বস্তার মতো তাঁর দেহ নিরালম্ব হয়ে ঝুলছে। সহযোগীরা আড়কাঠির অপরপ্রান্তের দড়ি হাতে নিলেন এবং ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে ঘোরাতে শুরু করলেন প্রথমে আস্তে, তারপর জোরে, আরও জোরে। ঘোরার সঙ্গে একটা তাল, ছন্দ যুক্ত হল। ঘূর্ণনের নিয়ম অনুযায়ী তিনি তখন আড়কাঠের প্রায় সমন্তরাল রেখায়, ওই অবস্থায় কোঁচড় থেকে খুলে নিলেন ফুল আর বাতাসা। এক হাতে মুখ চাপড়ে প্রাণপণে 'আ-ও-য়া, আ-ও-য়া' আওয়াজ তুললেন, অন্য হাতে ছুঁড়তে থাকলেন আমাদের দিকে সেই ফুল আর বাতাসা। এবারে ঠায় রোদে প্রায় এক ঠোঙা বকের মতো দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো পাগলের মতো কুড়োতে শুরু করল সেগুলো। হঠাৎ আমি আবিষ্কার করলাম, আমি নিজে সেই ধুলোর মধ্যে হাতে এক খাবলা মাটির মধ্যে ভাঙা এক টুকরো বাতাসা ধরে আছি। জনতা এবারে শান্ত হল। ভক্তকে এবার নামানো হচ্ছে, মাটিতে তার পা ঠেকল, কোনও সাহায্যের দরকার হল না নিজের পায়ে দাঁড়াতে। হুক খুলে নেওয়া হল তার পিঠ থেকে। সবার দিকে জোড়হাত করে আবার তাকালেন, মুখে তার এক অনির্বচনীয় আনন্দ ক্লান্তির কোনও ছাপ নেই। নেই কোনও কষ্টের বা ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার ছাপ। এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার স্বাদ নিয়ে শুরু করলাম ফেরার পালা। সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত এই মহান থিয়েটারের অভিজ্ঞতা মুহূর্তে আমার সকল রক্ত কোষকে হিটারের মতো উত্তপ্ত করে তোলে, আমার মস্তিষ্কের নার্ভগুলোকে ইলেকট্রিক শক দেয়। অথচ এখনও পর্যন্ত 'ঈশ্বরের' ওপর আমার এতটুকু আস্থা নেই, তার অস্তিত্বকেই আমি প্রবলভাবে অস্বীকার করি। তা হলে কী হয়েছিল? কেনই বা একে মহান থিয়েটারের আখ্যা দিলাম? ব্যাখ্যাটি আমার কাছে এরকম: ওই ভক্ত আসলে একজন বড় অভিনেতা। অভিনেতা বলতেই মনে কোনও ধন্দ আনবেন না। ভেবে নেবেন না লোকগুলো খালি 'হয়' কে 'নয়' করে আর 'নয়' কে 'হয়' করে। আসলে খাঁটি অভিনেতারা 'হয়' কে 'হয়ই' করেন আর 'নয়' কে 'নয়ই' করেন। তিনি ছিলেন তেমনই শক্তিমান একজন অভিনেতা। শক্তিমান কেন? কারণ প্রথমত, তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেছেন, তিনি অ্যাকশন করেছেন। ভারবালি ও নন-ভারবালি কমিউনিকেট দ্বিতীয়ত, ভাষা দিয়ে কিংবা ভাষা ছাড়াই কমিউনিকেট করেছেন। বিষয় যাইহোক না কেন।

এবার এই তিনটে বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। তিনি নিজেকে কী ভাবে প্রস্তুত করলেন? একমাস কঠিন সংযমের মধ্যে শরীর এবং মনকে গড়েছেন এই বিশেষ দিনের অভিনয়ের জন্য। ধর্মীয় দিক থেকে তিনি বিশ্বাস করেন যে সংযমে এতটুকু অবহেলা হলে তিনি সফল হবেন না। তাই তাঁর এই একমাসের অনুশীলনে কঠিন সংযমের ভিতর দিয়ে, পূর্ণবিশ্বাসে তাঁর আরাধ্য দেবতাকে নিত্য নতুনভাবে নানা উদ্ভাবনী পদ্ধতিতে পুজো করে নিজে আবরণ মুক্ত হতে চেয়েছেন। এবার অভিনয়ের দিনে সমবেত জনতার সামনে হাজির হয়ে করজোড়ে অভিবাদন জানানোটা হল তাঁর

দেবতার কাছে আত্মসমর্পণ। জনতার মধ্যে তিনি তাঁর দেবতাকে দেখতে পান কারণ তাঁর বিশ্বাস 'জীবের মধ্যে শিব' বর্তমান। পিঠে হুক ফুটিয়ে তার 'সেলফ-পেনিট্রেশন' পর্ব চূড়ান্ত হল। এর মধ্যে সবার দিকে তাকিয়ে 'নন-ভারবাল কমিউনিকেশন' করার চেষ্টা করেছেন। তাঁকে হুকবিদ্ধ অবস্থায় তোলা হল শূন্যে, শুরু হল ঘূর্ণন, অর্থাৎ 'অ্যাকশন' পর্বের সূচনা হল। তারপরে চিৎকার আর ফুল-বাতাসা ছোঁড়ার পর্যায়টিকে বলা যেতে পারে: অ্যাকশন উইথ প্রপার্টিজ উইথ ভারবাল কমিউনিকেশন। সমবেত জনতা কমিউনিকেটেড হয়ে ফুল আর বাতাসা কুড়োতে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তিনি অহঙ্কার-বর্জিত এক শিশুর মতো নেমে এলেন।

তত্ত্বের ভাষায় উপরের ঘটনাটিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে: 'if you want to communicate, you have to sanctify yourself, and then through self-penetration you have to prepare to sacrifice yourself to the audience. That is how one learns to overcome one's ego, and discovers a child-like quality in oneself, and can demand the affection that a child calls forth so naturaly. If an actor can hold on to this child-like quality throughout his presentation, he will be able to communicate in both verbal and non-verbal ways with a audience all through'.

লোকশিল্প এবং লোকাচারের ঐতিহ্যের মধ্যে অনেক উপাদান আছে যা 'কমিউনিকেটিভ ফ্যাকটর' হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে শুরু করলাম অতীত-সন্ধান—'লুক-ব্যাক'। চোখে পড়ল সিংভূমে, পুরুলিয়ায় রুখু-শুখু পাথুরে মাটির ওপর ঘামের ফোঁটা; শাল-পিয়াল-মহুয়ার বনে শুনলাম ধামসার বুক কাঁপানো শব্দ আর সুবর্ণরেখার কান্না-ভেজা তারসানাইয়ে 'ঝুমুর'-এর সুর। দেখলাম অনবদ্য ছো-নাচ, প্রায় দশ কেজি ওজনের মুখোশ পরে আদুর গায়ে ধামসা আর ঢোলের তালে পাথরে পা ফাটিয়ে চলেছে যুদ্ধ—কখনও অসুরের সঙ্গে দুর্গার, কখনও অভিমন্যুর সঙ্গে সপ্তরথীর কিংবা কিরাতের সঙ্গে অর্জুনের। সে যুদ্ধ যেমন তাদের নাচে, তেমনি তাদের জীবনেও।

মাটির দেওয়ালে খড়ের চাল, চাঁদের আলোর উঁকিঝুঁকি ঘরের ভিতরে। পোড়া দেশে খরা দুর্ভিক্ষের সঙ্গে যত সাক্ষাৎকার তার একাংশও হয় না মেঘ-বৃষ্টির সঙ্গে। রক্ত ঝরিয়ে মাটি নরম করে পাহাড়ের ওপর ফলায় কয়েক আঁটি ধান আর জোয়ার, মাত্র কয়েক মাসের অন্ন সংস্থান হয় তাতে। বাকি সময় জঙ্গলের শাক-পাতা কচু খুঁটে খাওয়া অথবা শহুরে ইট-ভাটায় মজদুরি, নয়তো বাবুদের বাগানে জল তোলা। এ হেন মানুষেরা নাচে। সে নাচের দাপটে অযোধ্যার মতো পাহাড় কাঁপে, চান্দিলের মতো ডুংরি থরথরায়। দলমার ওপারে থমকে দাঁড়ায় হাতির পাল, জামসেদজী টাটার বয়লার চোখ লাল করে আকাশের দিকে তাকায়। নাচ এদের রক্তে, পূর্বপুরুষেরা ছিল যোদ্ধা, যুদ্ধ এখন পরিবর্তিত হয়েছে নাচে। শিব যদি সন্তুষ্ট হন, জমিতে ফসল ফলবে, তাঁকে

সন্তুষ্ট করতে রাতের পর রাত চলে রাত-জাগা নাচ 'ছো'। কোনও নৃতাত্ত্বিক আলোচনার খাতিরে এত কথা বলা নয়। যে মানুষগুলো বেঁচে থাকে দারিদ্রসীমার অনেক নিচে তারা কয়েক মাস ধরে রাতের পর রাত নাচে কীভাবে? পুরুলিয়া, আনাইবাদ, জামডি নিমডি, ইছাডি, পটমদা, চোড়দা ইত্যাদি জায়গায় ঘুরে ঘুরে দেখলাম প্রকৃতির এমনই এক বিচিত্র কান্ডকারখানা। সর্বত্রই সেই বীরভানপুরের অভিজ্ঞতা—সেই প্রস্তুতি, সমর্পণ, আত্ম-নিপীড়ন ও নিরহংকার কমিউনিকেশন। উপবাসী শরীরগুলোই শক্তির উৎস হয়ে উঠছে। নাচের বিভিন্ন মুদ্রায় তারা দেহকে অচেতনে, অজান্তে এমনভাবে ব্যবহার করে যাতে শরীর 'ফ্লুয়িড অব এনার্জি'তে ভরপুর হয়ে যায়। গোটা শরীরটা 'চার্জড' হয়ে যায়। এইভাবে [সেলফ-পেনিট্রেশন' এর ফলে] শরীরের একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটে যায় এবং শরীর তখন কমিউনিকেট করতে শুরু করে। এই অবস্থায় শরীর এত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে যে শূন্যে লাফ দিয়ে ঘুরে হাঁটু গেড়ে সটান মাটিতে পড়েই আবার উল্টে কোনওরকম ভর না দিয়ে একটা ডিগবাজি খায়। এইভাবে একটা-দুটো নয়, পরপর চব্বিশটা লাফ মারতে দেখেছি ওই না খেতে পাওয়া 'সিং', 'কুমার' নাচিয়েদের।

পৃথিবীর নানা প্রান্তের নানা ধরনের নাচ দেখলাম। কোনারক শিল্পভাস্কর্যের ওড়িশি; দক্ষিণের কালারি, কথাকলি, ভারতনাটাম, বাংলার রায়বেশে; মণিপুরের রাস, কাবুই-নাগা, থাংতা; মেক্সিকান ভুডু; জাপানি কাবুকি, নো; 'সাগর জলে সিনান করি সজল এলো চুলে'র দেশ বালি দ্বীপের তোপেং লেগং আরও কত। সব নাচেরই আদত ভঙ্গিনাগুলোর মধ্যে অদ্ভুত কতগুলো সাদৃশ্য আছে। পরে প্রকাশভঙ্গির বিভিন্নতায় অন্যরকম হয়ে যায়। কোথাও পেলব, কোথাও ঋজু, কোথাও শান্ত, কোথাও রুদ্র, কোথাও অন্তর্লীন, কোথাও বা বহির্মুখি—কিন্তু শক্তির উৎস ও তার ব্যবহারে প্রতিটি নাচের মধ্যেই যেন কোনও না কোনও মিল লক্ষ করা যায়। এইসব নৃত্যশিল্পীদের শ্বাস-প্রশ্বাসের পদ্ধতিটিও শিক্ষণীয় বিষয়। শরীরে অক্সিজেন সরবরাহের উপর নির্ভর করে আমাদের প্রাণশক্তি। স্নায়ুতন্ত্র সতেজ হয়ে ওঠে। বিভিন্ন প্রকার হরমোনের যথাযথ ক্ষরণের ফলে মন হয়ে ওঠে সহজ, প্রাণবন্ত ও স্বাভাবিক যে কারণে অতি সহজেই তখন ফিরে পাওয়া সম্ভব শিশুসুলভ মেজাজ, ধর্ম।

নৃত্যশিল্পীকে লক্ষ করুন। কী অসাধারণ সারল্য তাঁর মুখে, কী বিনীত তাঁর ব্যবহার! তাঁর বেশির ভাগ কথাই তাঁর ভঙ্গিমায়, তাঁর নাচে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ সবটাই তার নন-ভারবাল কমিউনিকেশন। শব্দের যেমন তরঙ্গ আছে, তেমনি নৈঃশব্দেরও একটা তরঙ্গ আছে। নৈঃশব্দ শূন্যতা নয়, কমিউনিকেশনের বা কিছু বলতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে সে ধারণ করে আছে। শব্দের মতো চিন্তাও তরঙ্গের সৃষ্টি করে: 'Thought vibrations last longer, travel faster, remain longer. In other words, 'the voice of mind' is far superior in power to the voice of mouth.' কাউকে ভালবাসা বা শ্রদ্ধা

জানাতে চিৎকৃত ঘোষণায় বলার দরকার হয় না, 'আমি আপনাকে ভালবাসি, আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি।' আমার এই কথাটা জানাবার আকাঙ্ক্ষা চোখের ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে, শুধুমাত্র শরীরের একটি ছোট্ট ভঙ্গিতে আরও বেশি প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারে যা বুঝতে এক মুহূর্তও সময় লাগবে না। স্টেশনে বা এয়ারপোর্টে কেউ বিদায় জানাতে এলে তার চোখের দৃষ্টি আর দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিমায় আপনি যেভাবে নীরবতার ভাষা পড়ে নিতে পারেন, অনুভব করেন কেমন স্বচ্ছ হয়ে এল তার সঙ্গে আপনার সম্পর্কের গভীরতা।

নির্মাণ পর্ব

গতানুগতিকতার বাইরে যে থিয়েটারকে অন্বেষণ করা শুরু হল, সেখানে শরীরই কথা বলে। কিন্তু দেখা গেল যে শরীর যে শব্দ, যে চিন্তা ও মনন নিয়ে থিয়েটার করতে আসা তার সবটাই সমাজব্যবস্থা থেকে উত্তরসূরী হিসাবে পাওয়া কতকগুলো ধারণার দাসত্ব করে চলেছে। যেভাবেই শরীর দিয়ে বোঝাতে চাই না কেন, কোথাও না কোথাও তা কতগুলো বদ্ধমূল ধারণার দ্বারা প্রভাবিত বা কণ্ডিশনড হয়ে পড়েছে। ফলে শরীরযন্ত্রকে ব্যবহার করেও নতুন কথাগুলো আর বলা হয়ে উঠছে না। তখনই ধারণার দাসত্ব থেকে মুক্তির প্রয়োজন দেখা দিল অর্থাৎ কণ্ডিশনকে ভেঙে ডিকণ্ডিশনিং করার উপায় খুঁজতে হল। কিন্তু এই ডিকণ্ডিশনিং করার পদ্ধতি কী হবে? শুরু হল শিকড়ের সন্ধান—লোকসংস্কৃতির সুবিশাল ঐতিহ্যের মধ্যে যে উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে তার দিকে ফিরে তাকানোর পালা। দীর্ঘসূত্রতার পথ ধরে, নানা অনুশীলনের পর্যায়ক্রমে লোকসংস্কৃতিতে এক একটা ঐতিহ্যের আকার গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন পরম্পরায় পুরনো দিনের মানুষেরা একটা যোগাযোগের ভাষা গড়ে তুলেছিলেন, লোকাচারে, লোক-অনুষ্ঠানে বিমূর্ত ভাবনায় কতগুলো কথাকে তাঁরা ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন। বোঝানোর এই ধরন আজকের দিনে হয়ত ব্যাতিল বলে গণ্য করা হবে কিন্তু মনে হয় প্রকৃত অনুসন্ধানের ফলে তার মধ্যে কমিউনিকেশনের এমন কিছু জীবন্ত উপাদান খুঁজে পাওয়া যাবে যেগুলো আধুনিক যোগাযোগের ক্ষেত্রেও নতুনভাবে ব্যবহার করা সম্ভব। সামান্য পরিবর্তন সাপেক্ষে তার থেকে একটা নতুন ফর্ম তৈরি করা যায়। কাজ শুরু করা গেল। দলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমরা কয়েকদিন ছো-নাচের প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে ছো-নাচ ব্যাপারটা কী তা বোঝার চেষ্টা করি এবং সেটা ভালভাবে অভ্যাস করতে থাকি। এই প্রশিক্ষণের এক একটা পর্যায়ে ছো প্রশিক্ষক গুরুর কাছে তালিম নিয়ে আবার নিজেরা অনুশীলন করি। তারপরে ছেলেমেয়েদের বলি আপাতত ছো-নাচের ব্যাপারটা ভুলে যেতে। এই সময় আমরা অন্যান্য কাজ যেমন অন্যান্য নাচ শিখতে চেষ্টা করি। কিছুদিন পরে, দলের সবাইকে যখন আবার ছো-নাচ নাচতে বলা হল, অভিনেতারা একটু অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে পড়লেন। পুরো ছো-নাচটা তারা কিছুতেই মনে করতে পারছিলেন না। কিন্তু তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করলে

ওই অবস্থাতেই তারা নাচটা শুরু করেন এবং যে জায়গাগুলো মনে করতে পারছিলেন না, সেখানে নিজেরাই এমন কতগুলো ভঙ্গি দিয়ে ভরাট করতে থাকেন, যার সঙ্গে আসল ফর্মের একটা সাযুজ্য থেকে যায়। এইভাবে আমরা ছোট ছোট করে ইমপ্রোভাইজ করতে আরম্ভ করি। কতগুলো বিষয়বস্তু বেছে নিয়ে তার ওপর কাজ করতে থাকি। দেখা গেল, খুব আস্তে আস্তে মনের অজান্তেই অভিনেতাদের মাথায় প্রথমে যে ফর্ম বা নাচটা ছিল, সেটা তাদের শরীরের মধ্যে চলে এসেছে। শরীর তখন নিজেই পরোক্ষভাবে কোনও কোনও কাজের মধ্যে সেই ফর্ম-এর বিকাশ ঘটিয়ে চলেছে এবং তার ফলে শরীর অন্যভাবে এক শক্তি তরঙ্গে ভরপুর হয়ে একটা নতুন ফর্মকে ফুটিয়ে তুলছে যাকে আর ছো-নাচ হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। একে শুধুমাত্র সেই অভিনেতার নিজস্ব ফর্ম বলা যেতে পারে যা কখনওই যৌথ নয় কারণ ব্যক্তি হিসাবে প্রত্যেক অভিনেতার দেহের গঠন, মন, চিন্তাধারা, অনুভূতি ও অংশগ্রহণের মনোবৃত্তি এ সবই আলাদা রকমের হয়ে থাকে। প্রত্যেকেই নিজের মতো করে কাজটা তৈরি করে একটা নিজস্ব ফর্ম সৃষ্টি করতে থাকেন। শরীরের মধ্যে যখন কেউ এই ধর্মকে খুঁজে পায় তখনই তিনি সম্পূর্ণ অভিনেতা হয়ে ওঠার দিকে এগিয়ে যান। পরবর্তী জীবনে এই অভিনেতারাই আমাদের নাটকে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করেন।

থিয়েটারে আমরা চরিত্র চিত্রণ করি না। সুতরাং, ব্যক্তি অভিনেতার গুরুত্ব আমাদের থিয়েটারে কম, বরং যৌথ অভিনয়ের উপর অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি। কোনোও ব্যক্তি অভিনেতার চেহারা, কণ্ঠস্বর বা অভিনয়ের থেকে দলগত অভিনয়ের প্রভাব বা গুরুত্বই আমাদের থিয়েটারে বেশি। নাটকের স্ক্রিপ্টও তৈরি হয় যৌথভাবে, নাটক তৈরির সময়ে সকলের ভাবনা ও মতামতকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। একনায়কত্ব ব্যাপারটা আমাদের নাটকে একেবারেই নেই। তবে একটা নিয়ন্ত্রণ না থাকলে কাজও করা যায় না। কারণ আমি যেভাবে ব্যাপরটা ভাবতে চাইছি যদিও সবাইকে ব্যাপারটা ভাবাচ্ছি, তবুও তার মধ্যে দিয়ে যতক্ষণ না আমার ইমেজটাতে স্যাটিসফ্যাকশন পাচ্ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত থামতে পারি না। আমি বলি, আমার ভূমিকাটা হচ্ছে একজন মালাকারের মতো, আমার অভিনেতারা ফুল কুড়িয়ে নিয়ে আসে। তারা যেমন ফুল আসবে, আমি তেমন মালা বানাতে পারি। আমার মালাটা নির্ভর করে আমার অভিনেতার ওপরে। তারা যদি বাসি পচা ফুল নিয়ে আসে তবে সেরকম মালা হবে, আর টাটকা, সতেজ, সুগন্ধি ফুল নিয়ে এলে সুন্দর, মালা হবে। 'অহল্যা'-র ক্ষেত্রে বোধহয় সেরকম ব্যাপারটা ঘটেছিল, খুব ভাল ফুল সংগ্রহ করা গিয়েছিল। আবার যেসব নাটকে আমি ব্যর্থ হই, তাও আমার একার দোষ নয়, আমার অভিনেতারা আমাকে সেরকম ভাল ফুল দিতে পারে না। আমি শুধু কাজটা করার নির্দেশ দিই—এই ফুলটা এখানে রাখ, ওই ফুলটা ওখানে রাখ, এখানটা একটু মোটা কর, ওখানটা একটু সরু কর ইত্যাদি, এর বেশি আমার ক্ষমতা নেই। এবং এই কাজটি, অর্থাৎ এই পরামর্শ বা নির্দেশ যাই বলুন না কেন সেখানে আমি ভুল করলে গ্রুপের সদস্যরা সংশোধন করে

দেন। এই থিয়েটার কেবল নির্দেশকের নয়, কেবল অভিনেতার নয়। এ হল যথার্থ যৌথ শিল্প।

গল্পের গণ্ডি পেরিয়ে

আমাদের গোড়ার দিকের থিয়েটারগুলোর সঙ্গে আজকের থিয়েটারের অনেকটা ফারাক হয়ে গেছে। আগেকার নাটকের মধ্যে যে গল্প-নির্ভরতা ছিল, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আমরা তার থেকে অনেকটা বেরিয়ে এসেছি। আধুনিক সাহিত্যেও এখনও টানা, মসৃণ গল্প বলা বর্জন করেছেন লেখকরা। অথচ থিয়েটারের কাঁধ থেকে সে ভূত আজও নামল না। মনে হয়, যোগাযোগের মূল জায়গাটা হল অ্যাবস্ট্রাকশন বা বিমূর্তিকরণ। বিমূর্ততার স্তরে আঘাত না করলে আমরা কিছুতেই সফল হব না। প্রশ্ন হল : এই বিমূর্ততার স্তরটা কী ? এর ব্যাকরণগত ব্যাখ্যা অনেক থাকতে পারে কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে বোঝাবার জন্য যেভাবে আমরা ব্যাখ্যা করি সেভাবেই বলা যাক। একটা গোলাপ ফুল কাউকে দেখানো হলে সে পাপড়ির রঙ, গন্ধ, রূপ, ফুলটা টাটকা না বাসি তা বিচার করতে বসে, কিন্তু একটা গোলাপের বাগানের সামনে তাকে নিয়ে গেলে আলাদা-ভাবে রঙ-রূপ-গন্ধের বিচার সে করতে পারে না, তার মুখ দিয়ে শুধু বেরিয়ে আসে : 'বাঃ'। একেই বলব সৌন্দর্যের বিমূর্তিকরণ। একটা গোলাপ দেখে যে খুঁটিয়ে বিচার তা প্রসেনিয়াসের ক্ষেত্রেই সম্ভব, আমাদের থিয়েটারের ক্ষেত্রে তা একেবারেই সম্ভব নয়। বিমূর্তিকরণের এই জায়গাতেই আমরা আসতে চাই।

প্রাচীনকালে মুনিঋষিরা হিন্দুধর্মে পরমব্রহ্ম বা পরমাত্মা লাভের কথা বলে গিয়েছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন যে সাধারণ মানুষ সরাসরি এই পরমজ্ঞান বা পরমাত্মা লাভ করতে পারবে না, বা বিমূর্ততার স্তরে পৌঁছতে পারবে না। সুতরাং সাধারণ মানুষের হাতে কিছু উপকরণ যেমন—একটা কালী, একটা কৃষ্ণ বা দুর্গা ইত্যাদি তুলে দেওয়া হল। এই মাধ্যমগুলোর সাহায্যেই চলল পরমাত্মার সাধনা। কিন্তু কালের গতিতে পরমব্রহ্ম থেকে মানুষ সরে এসেছে, রয়ে গেছে শুধু উপকরণগুলো। ধর্মের মূল থেকে সরে এসে একটা কালীঘাট, একটা দক্ষিণেশ্বর অথবা একটা শনিমন্দিরে আমরা মাথা ঠুকে চলেছি, পরমব্রহ্মকে আর পাওয়া হল না। ইসলাম অবশ্য এ ব্যাপারে হিন্দু ধর্মের থেকে খানিকটা এগিয়ে রয়েছে। এই ধর্মে প্রথমদিকে আল্লা, ওজ্জা, বিভিন্ন দেবদেবীরা ছিলেন। কিন্তু হজরত মহম্মদ মূল ব্যাপারটা অনুভব করতে পেরে সমস্ত মূর্তি বর্জন করতে বললেন। আল্লার সাধনা নিরাকারের সাধনা, অর্থাৎ হিন্দুধর্মের পরমব্রহ্মের মতোই এক পরম প্রাপ্তি। মসজিদে ঢুকলে আমরা কোনও মূর্তি বা ছবি—এমন কি হজরত মহম্মদের ছবি বা মূর্তিও দেখতে পাব না। মুসলিমদের ধর্ম-ভাবনার কেন্দ্রে ওই একটিই শব্দ—'আল্লাহ'। বলা যেতে পারে যে তারা কিছুটা বিমূর্ত স্তরে পৌঁছতে পেরেছে। থিয়েটারের দুঃখ, বেদনা, যন্ত্রণা, আশা, আকাঙ্ক্ষা এ সবই বিমূর্ত বিষয়। বিমূর্ততার স্তরে পৌঁছনোর চাহিদা মেটাতেই

আমদানি করা হয়েছিল নানা উপকরণ—আলো, মেক-আপ, মঞ্চসজ্জা, সাজপোশাক, সংলাপ, গল্প ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমানে থিয়াটারে বিমূর্ততার বিলুপ্তি ঘটেছে, থিয়েটারে মূল বক্তব্যকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি। 'কল্লোল' বা 'অংগার' নাটকে বার্তা কী—আমার মনে পড়ে না। কিন্তু 'অংগার' বললেই চোখের সামনে রাতে খনিকে জল ঢোকার ছবি ভেসে ওঠে বা 'কল্লোল' বললেই জাহাজটা দেখতে পাই। অর্থাৎ আমরা কালীঘাট বা দক্ষিণেশ্বরেই রয়ে গেলাম, মূল জায়গাটায় পৌঁছতে পারলাম না। আলোর সাহায্যে আমরা যত সুন্দরভাবেই স্টেজে আগুন তৈরি করি না কেন, বা মেক-আপ এর সাহায্যে বৃদ্ধ সাজাইনা কেন, দর্শক কিন্তু একবারও তাকে সত্যি আগুন বা বৃদ্ধ হিসাবে বিশ্বাস করে না, অর্থাৎ দর্শককে ঠকানো গেল না। এইভাবে উপকরণ-নির্ভরতা থিয়েটারে বিমূর্ত স্তরে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। থিয়েটারের বার্তা নিয়ে বিমূর্ততার স্তরে সংযোগ স্থাপন করার তাগিদেই উপকরণগুলোকে ভাঙার প্রয়োজন দেখা দিল। প্রসেনিয়াম মঞ্চ, আলো, সাজপোশাক, মঞ্চসজ্জা ইত্যাদি বর্জন করতে আরম্ভ করলাম। এই বর্জনের পথে চলা শুরু করেও যে জায়গায় এসে অসুবিধেয় পড়তে হয় তা হল থিয়াটারের প্রচলিত গল্প গোলানো পদ্ধতি বা একটি গল্পের বিন্যাসের মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাওয়ার রীতি। এই সমাজ ব্যবস্থায় যে থিয়েটারগুলো তৈরি হচ্ছে তার অধিকাংশেই সিনমো বা টেলিভিশনকে অনুকরণ করার করার এক ধরনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এ কথা বলা যেতে পারে যে তারা সিনেমা বা টেলিভিশনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে চাইছে। বা অন্যভাবে বলা যায় ফিল্ম যখন বাস্তবকে হুবহু বাস্তব হিসাবে তুলে ধরছে তখন মঞ্চের ওই বাক্সবন্দী থিয়েটারের তো প্রয়োজনই ফুরিয়ে যায়। তার এই প্রতিযোগিতা তাই মৃত্যুর পথেই এগিয়ে চলা। মাধ্যম হিসাবে সিনেমা বা টেলিভিশনের ক্ষমতা সুদূরবিস্তৃত সীমিত ক্ষমতা নিয়ে থিয়েটার তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। যে ভাবে সিনেমার দৃশ্যে আগুন দেখানো হয় থিয়েটারে কিন্তু তা সম্ভব নয়। এই সীমাবদ্ধতা বুঝেই আমাদের থিয়েটারের কাজ করতে হবে। এই যে আমরা গল্পের চৌহদ্দি পেরোতে পারছি না বা গল্পের চেহারাকে ভাঙতে পারছি না তার মূলেও রয়েছে চলতি সিনেমার প্রভাব। অথচ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পরিচালকদের আধুনিক ছবিগুলোয় দেখা যাবে যে তাঁরা বিমূর্ততার গভীর স্তরে কাজ করেছেন—সে সব ছবির গপপো কাউকে শোনানো যায় না কিন্তু ছবি দেখার পর মনের মধ্যে এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটতে থাকে যা কাউকে বলা যায় না, বোঝানো যায় না। বিমূর্ততার দিকে যাত্রার পথে বাধা সৃষ্টি করছে এই গল্প। তাই গল্পকে ভাঙার চেষ্টা শুরু হয়ে গেছে। "অহল্যা" নাটকে সরাসরিভাবে কোনো গল্প না থাকলেও কোনও-কোনও সময়ে নাটকটা গল্পের বৃত্তের মধ্যে ঢুকে পড়তে চেয়েছে। কিন্তু 'কালো বস্তি'তে সম্পূর্ণভাবে গল্পকে বর্জন করতে আমরা সফল হয়েছি। কবিতা নিয়ে কাজ করার ফলে গল্পের রাস্তা আপনা থেকেই আবছা হয়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রে কবিতার বিষয় বস্তু নয়, তার ইমেজটাই থিয়েটারে প্রাধান্য পেয়েছে। কবিতার মধ্যে একাধিক ইমেজ লুকোনো

থাকতে পারে। সেগুলো নিয়ে কীভাবে কাজ করা যায় তা দেখতে হবে। বলা যেতে পারে যে কবিতা থেকে কবিতা-কবিতা ভাবটা সরিয়ে দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাই আমাদের থিয়েটারের উপকরণ হতে পারে। শেষপর্যন্ত কবিতা আর রইল না, সম্পূর্ণ একটা থিয়েটার তৈরি হল। যেমন "কালো বিস্ত" নাটকে আমি "কালো বিস্তর পাঁচালী" কবিতাটা একেবারেই ব্যবহার করিনি। বার বার কবিতাটা পড়ে মনে মনে চিন্তা করার পর আমার ভিতরে যে কতগুলো ছবি তৈরি হয়েছিল, অভিনেতাদের সাহায্যে তারই পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। অর্থাৎ ইমেজগুলোই নাটক হয়ে উঠেছে। "কালো বিস্ত"-র অভিনয়ের পর বহু সাধারণ, নিচু তলার মানুষের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। নাটক বুঝেছেন কিনা জানতে চাইলে তাঁরা উত্তর দিয়েছেন : 'কী জানি কিছু বুঝতে পেরেছি কিনা, কিন্তু যখন দেখছিলাম, ভিতর থেকে শুধু কান্না ঠেলে ঠেলে আসছিল, মনে হচ্ছিল এতো আমাদেরই কথা, আমাদের দুঃখ-কষ্টের কথা'।

থিয়েটার কতগুলো এলিমেন্ট এর উপরে নির্ভরশীল হতে পারে, তার থেকে সাহায্যও পেতে পারে কিন্তু থিয়েটার বলতে সেই এলিমেন্টগুলোকে বোঝায় না। থিয়েটারের স্থান আরও উপরে। বাউলের পোশাক, কণ্ঠী, বৈষ্ণবী আর গাঁজায় নয়, ভাব লুকিয়ে আছে তার গানের মর্মকথায় 'ওরে মন রে'। কৃষ্ণ নয়, কালী নয়, শিব নয়, শুধু 'মন', আমার 'অধরা মন', আমার ভিতরের মন। আমার 'আমি'। এ সাধনায় যোগ দিতে চাই এক্ষুণি, কারণ 'বারে বারে আর আসা হবে না'। 'Celebration, Theatre is a Celebration, even if it is sorrow. And Theatre is Life and Life is Theatre, the Living Theatre, the name of search, a Continuous search'. সীমাবদ্ধতা ভেঙে থিয়েটারের নতুন সংজ্ঞা খুঁজতে চাইছি, কিন্তু সে সংজ্ঞাও প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। আজ যেভাবে থিয়েটারকে বুঝছি, কাল সেভাবে না বুঝে অন্যভাবে বুঝতে পারি। আমার যদি মনে হয় এই ফর্মটা ঠিক হচ্ছে না, তাহলে আমি হয়ত তা পাল্টে ফেলব। এ এক খোঁজার শুরুমাত্র। ফর্ম-সংক্রান্ত প্রশ্নে আমরা নিজেরাই নিজেদের সমালোচক, প্রতিমুহূর্তে নিজেদের চ্যালেঞ্জ করি। থিয়েটারের মধ্যে থেকে প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে প্রত্যেকে নিজেকে আবিষ্কার করতে থাকি। এই আবিষ্কারের মধ্যেই মহৎ থিয়েটারের অর্থ খুঁজে পাই আমরা। □

নাট্যকারের সন্ধানে

অশোক মুখোপাধ্যায়

পট-কথা

বহুদিন ধরে নাটকের কাজের সঙ্গে নানাভাবে জড়িয়ে আছি। নাটক লেখা থেকে শুরু করে সেই নাটকের পরিচালনা, তাতে অভিনয় এবং তার প্রযোজনা ও সংগঠনের সমস্ত খুঁটিনাটি পর্যন্ত সামলাতে হয়েছে। এখনও হয়। এইরকম আমি একা নই। আমার মতো অনেক নাট্যকর্মী নানা থিয়েটারের দলে এমনি জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ করে চলেছেন। এই করতে করতে আমাদের হাল আমলের বাংলা নাটকের শক্তি এবং দুর্বলতা দুই বিষয়েই এক রকমের একটা ধারণা মনের মধ্যে তৈরি হয়ে উঠেছে। তার সবটাই সঠিক না হতেও পারে। না হবারই কথা। তবে নিশ্চয়ই সবটাই ভুল হতে পারে না। এই ভরসায় দু-চার কথা।

আমাদের এখনকার নাটকের দলগুলি যে-সব সমস্যায় জর্জরিত তাকে মূলত দু'ভাগে ভাগ করা যায়: বাইরের সমস্যা এবং ভিতরের সমস্যা। বাইরের সমস্যা বলতে আমি বোঝাতে চাইছি—টাকা-পয়সার সমস্যা, প্রেক্ষাগৃহ পাবার সমস্যা, রিহার্সালের জায়গা পাবার সমস্যা, প্রচারের সমস্যা, দর্শক পাওয়া-না-পাওয়ার সমস্যা, সংগঠনকে সক্রিয় ও সজীব রাখার সমস্যা ইত্যাদি। অন্যদিকে ভিতরের সমস্যা বলতে প্রধানত তিনরকম সমস্যার কথা আমার গোড়াতেই মনে আসে—নাটক করার নীতি ও উদ্দেশ্য সংক্রান্ত সমস্যা, নাট্যপ্রয়োগের নানা শিল্পগত সমস্যা এবং ভাল নাটক রচনার সমস্যা।

বহিরঙ্গের সমস্যাগুলি নিয়ে এই লেখায় কোনও আলোচনায় ঢুকছি না। এমনিতেও মনে হয়, যাঁরা আমাদের মতো দলগুলির নাটক দেখেন বা এই রকম নাটক করার সমস্যা বিষয়ে একটু খোঁজখবর রাখেন তাঁরা ওইসব বাইরের সমস্যাগুলির কথাও অল্পবিস্তর জানেন। ভিতরের সমস্যার মধ্যে নীতি ও আদর্শসংক্রান্ত প্রথম প্রশ্নটিও এই আলোচনার পরিধির বাইরে রাখতে চাই। সমস্যাটি জটিল ও স্পর্শকাতর এবং পরিবেশ-পরিস্থিতির চাপে নিয়ত পরিবর্তমান। তা ছাড়া আমি ঠিক এই কাজ করার যোগ্য লোকও নই। যেহেতু আমি কাজটার একেবারে মাঝখানে আছি, এবং একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছি, সুতরাং আমার নীতি ও আদর্শ কখন কীভাবে পাল্টে যাচ্ছে, কোন দিকে চলছি আমি, এর সবটা আমার পক্ষে বোঝা সম্ভবও নয়। যাঁরা একটু দূর থেকে আমাকে বা আমার মতো নাট্যকর্মীদের দেখছেন, তাঁরাই এটা বেশি বুঝবেন। আমাদের নীতি ও

আদর্শ বিষয়ে আমরাই কিছু বলতে থাকলে সেটা অনেকটাই সাফাই গাওয়ার মতো শোনাতে বাধ্য। তাই সে-কাজে আমার রুচি নেই।

দ্বিতীয় সমস্যাটির আলোচনা ও বিশ্লেষণ খুবই গোলমেলে কাজ। নাটকের মঞ্চরূপ নির্মাণে প্রয়োগের নানা সমস্যা দেখা দেয়। মূলত শৈল্পিক সেই সব সমস্যার সঙ্গে আর্থিক এবং সাংগঠনিক প্রশ্নও দিব্যি জড়িয়ে আছে। অর্থাৎ কোনও নাটকের মঞ্চ-স্থাপত্য এমন হতে পারবে না যার জন্য খরচ পড়বে দলের ক্ষমতার বাইরে। এমনই পোশাক-আশাক, আলো, সঙ্গীত ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই অবস্থা বুঝেই ব্যবস্থা। তার মানে কল্পনার এবং সৃজনশীলতার সঙ্গে বাস্তব সামর্থের একটা আপোস ও সামঞ্জস্য করেই গোটা কাজটা হয়। অভিনয়ের ক্ষেত্রে আবার অন্য ধরনের সীমাবদ্ধতা। দলে যে-সব অভিনেতা-অভিনেত্রী আছেন তাঁদের দিয়েই তো করতে হবে নাটক, তা সে যে-নাটকই হোক না কেন। তার মানে নাটক বাছার সময়েও দলীয় অভিনয়-ক্ষমতার সীমা ও সম্ভাবনার কথা ভাবতেই হচ্ছে প্রযোজককে। অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রেই শিল্পসৃষ্টির সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা একটা বাস্তব ও সম্ভাব্য সীমারেখার মধ্যেই করতে হচ্ছে। এই ঘর্ষণ থেকে সৃজন হচ্ছে ঠিক কীভাবে, তার আকর্ষণীয় আলোচনাও আমার এ-লেখার বাইরে।

নাটকের ঐতিহ্য

ভিতরের সমস্যাগুলির মধ্যে যেটি তৃতীয়, অর্থাৎ ভাল নাটক রচনার সমস্যা, তাই নিয়ে দুচারটে কথা তুলতে চাই। খুবই পুরনো সমস্যা। আমাদের এই আধুনিক বাংলা নাটক যতদিনের সমস্যাটাও ততদিনের। বাংলা থিয়াটারের আধুনিক পর্ব শুরু হয় প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে। ১৯৪৪-এর ক্রান্তিকারী প্রযোজনা "নবান্ন"-কে নতুন থিয়েটারের সূচনার দিকচিহ্ন বলে রায় দেন অনেকে। তার আগেও যদিও দুচারটি মূল্যবান প্রযোজনা হয়েছে, তবে সে-ও '৪২-'৪৩-এ। এই গত পঞ্চাশ বছরে থিয়েটার যে-রকম এগিয়েছে নাট্যসাহিত্য মোটেই তেমন নয়, এ-কথা অনেকের মুখে হামেশাই শোনা যায়। প্রযোজনার পারিপাট্যে, অভিনয়ের শক্তিতে, আঙ্গিকের চমকে দুর্বল নাটকও উতরে যাচ্ছে এ-কালের শক্তিশালী প্রযোজক-দের হাতে, কিন্তু ভাল নাটকের অভাব তাতে চাপা পড়ছে না, দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মিশিয়ে এই খেদোক্তি উচ্চারণ করেন বহু সুধীজন।

অভিযোগটি মূলত সত্য। ব্যবসায়িক থিয়েটারের গড্ডল-প্রবাহের বাইরে অন্য যে থিয়েটার গড়ে উঠেছে তার একটি প্রধান দারিদ্র ভাল নাটকের অভাব। কিন্তু এ-কথা বলার সময় মনে রাখা হয় কি যে, ভাল নাটক বাংলায় কোনও দিনই ভুরি-ভুরি লেখা হয়নি? যাঁরা একালের থিয়েটারের এই অভাব বিষয়ে প্রায়ই অনুশোচনা করেন তাঁরা ভুলে যান না তো যে, ১৯৪৪-এর আগে সত্তর বছরের যে পেশাদারী মঞ্চের ইতিহাস, সেখানেও ভাল নাটকের ও নাট্যকারের সংখ্যা নিতান্তই অঙ্গুলিমেয়? আমার কিরকম মনে হয় যে

এইরকম একটা ভুল-বোঝা, অনেকের মধ্যে দানা বেঁধে আছে। যে দুর্দান্ত সব লোকেরা দুরন্ত সব নাটক লিখেছিলেন ১৮৭২ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত, হঠাৎ ১৯৪৪ থেকে কিছু খারাপ লোকজন থিয়েটারে ঢুকে পড়ে ভাল নাটক লেখার প্রবল স্রোতের উৎসমুখে পাথর-চাপা দিয়ে দিয়েছেন। এঁরা পারলে অন্নদাশঙ্করের সেই বিখ্যাত ছড়ার সঙ্গে দু-লাইন যোগ করে দিলে বড় খুশি হন : নাটকের কেন হয়নি সৃষ্টি ? / তলে তলে কেডা ? কমিউনিস্টি।

আধুনিক থিয়েটারে নাটকের অভাব বিষয়ে কোনও কথা বলতে গেলে দিশি নাটকের এই দুর্বল ঐতিহ্যের কথা মনে রাখা জরুরি। দেশপ্রেমের তাগিদে অনেক শিক্ষিত বঙ্গসন্তান এ কথা মানতে রাজি হন না। অনেকে মনে-মনে মেনেও মুখ বন্ধ করে থাকেন। কিন্তু তাতে সত্য পাল্টায় না। প্রাক—১৯৪৪ বাংলা নাটকের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনও নাট্যকারের নাম করা মুশকিল যিনি থিয়েটারের ছাত্রের গভীর অভিনিবেশ ও শ্রদ্ধা দাবি করতে পারেন। হঠাৎ শুনলে কথাটা দুর্বিনীত ঠেকতে পারে, কিন্তু গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অপরেশচন্দ্র ইত্যাদি নাট্যকারদের রচনার কোনও তন্নিষ্ঠ পাঠ এবং প্রযোজনার প্রয়াস চলছে কি এযুগে ? এঁদের কিছু-কিছু বিক্ষিপ্ত রচনার সাফল্য সত্ত্বেও সামগ্রিক বিচারে নিজস্ব বক্তব্য, ব্যক্তিগত শৈলী এবং ক্রমান্বিত প্রগতির লক্ষণে চিহ্নিত কি এঁরা কেউ ? এঁদের কাউকে নিয়ে ঘণ্টা-দুয়েক সিরিয়াস আলোচনা করতে পারেন কি পাঁচজন শিক্ষিত নাট্যপ্রেমী বাঙালি ? বস্তুত এই সময়পর্বে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এমন কেউ নেই যাঁর কোনও স্বতন্ত্র বোধ ছিল থিয়েটার বিষয়ে, নাট্যরচনা ও প্রযোজনা বিষয়ে ভাবনাচিন্তা এযুগের নাটকের ছাত্রেরও অবশ্য অনুধাবনযোগ্য।

এবং এমন যে রবীন্দ্রনাথ, মনে রাখতে হবে, বাংলা থিয়েটারের শতাব্দীর ইতিহাসে তিনিই সত্যিকারের আউটসাইডার। ঐতিহ্যবিরোধী তিনি, আধুনিক। ভাবনার জগতকে থিয়েটারে হাজির করার পথ খুঁজেছিলেন তিনি, শুধু ঘটনার জগতকে নয়। তাঁর কাব্যপ্রতিভা তাঁর নাট্যশরীরের শিরায়-উপশিরায় উপস্থিত। সর্বোপরি, তাঁর সময়কার ইংরেজি-নবীশ থিয়েটারের চালচলন পছন্দ হয়নি। ভারতীয় থিয়েটারের নিজস্ব রূপ বিষয়ে তাঁর ছিল প্রখর অন্বেষা। নিজের নাটক পেশাদারি থিয়েটারে অভিনয় হলে, আপত্তি যেমন করেননি, আগ্রহও দেখাননি তেমন। নিজের নাটক কেমনভাবে মঞ্চায়িত হলে তার অন্তরীণ বৈশিষ্ট্যটুকু সবচেয়ে ভাল প্রকাশ পাবে, এ নিয়ে তাঁর ভাবনাকে হাতেকলমে রূপায়ণেও অনলস ছিলেন। জোড়াসাঁকো থেকে শান্তিনিকেতন পর্যন্ত সারাজীবন বহুবার নাট্য প্রযোজনা করেছেন তিনি। পেশাদারি থিয়েটারের পাশাপাশি আধুনিক বুদ্ধিদীপ্ত থিয়েটারের ঐতিহ্যসৃষ্টিতে সক্রিয় ছিলেন বরাবর। আশ্চর্য কী যে, তাঁর সমকাল তাঁর থিয়েটারকে বুঝতে পারেনি এবং বুঝতে চায়নি। ওভারকোটের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কটিও ক্লোকরুমে জমা দিয়ে প্রেক্ষাগৃহে ঢোকার ইংরেজি অভ্যাসটি ততদিনে বাবু বাঙালি ভালই শিখে ফেলেছিলেন।

তার থেকেও বড় দুঃখ এই যে, আমাদের গত অর্ধশতাব্দীর আধুনিক বাংলা থিয়েটারও তাঁকে আত্মস্থ করতে পারল না। এই আধুনিক থিয়েটারের যেটা শক্তি, রবীন্দ্রনাথের মোকাবিলায় সেটাই তার প্রধান দুর্বলতা হয়ে দাঁড়াল। মূলত ইংরেজি জানা এই নাট্যকর্মীরা পাশ্চাত্য থিয়েটারের প্রধান ধারাগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে-হতে দেখলেন, এদের কোনটির সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথকে মেলানো যায় না। তিনি সম্পূর্ণভাবেই স্বদেশী এবং গভীর অর্থে মৌলিক। নতুন থিয়েটারের কর্মীরা বর্ণসঙ্কর। দেশি-বিদেশি টানাপোড়েনে জেরবার এই নাট্যকর্মীরা তাই আজও আত্মপরিচয় খুঁজে পাননি। তাই গভীর অপরিচয়ের সেতুর এপারে-ওপারে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা থিয়েটার। শম্ভু মিত্র ও বহুরূপীর দীপ্ত সাফল্য সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথের প্রতি কোনও আন্তরিক তাগিদই তৈরি হতে পারল না এযুগের শক্তিশালী প্রযোজক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে।

আমাদের আধুনিক নাট্যআন্দোলনের পটভূমিতে নিহিত রয়েছে ইতিহাসের এই আয়রনি, একথা মনে রাখতে হবে। স্বদেশী নাটকের দুর্বল ঐতিহ্যের মধ্যে একমাত্র যে স্বদেশী নাট্যকার মুক্তির নির্দেশ বহন করেছিলেন, যাঁর নাট্যসৃষ্টি সাহিত্য হিসাবেও উঁচুদরের আবার থিয়েটার হিসাবেও প্রচণ্ড চ্যালেঞ্জিং, তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন আধুনিক নাট্যকর্মীর বোধের দিগন্তের বাইরে। তাঁর নাট্যরচনা ও প্রযোজনার কোথাও তিনি তাঁর উত্তরাধিকারের শ্রেষ্ঠ অংশটুকুকে, রবীন্দ্রনাথকে, ব্যবহার করতে পারলেন না।

থিয়েটারের নতুন ঘরানা

চারের দশকের গোড়ায় যে নবনাট্য জন্ম নিয়েছিল, আজ নয়ের দশকের প্রারম্ভে পৌঁছে যে থিয়েটার বাঙালির গর্ব, সে তার আগের যুগের থিয়েটারের থেকে কোথায় আলাদা? কেন সে সূচনা করতে পারল এক নতুন ঐতিহ্যের? আধুনিক থিয়েটারের স্বতন্ত্র চরিত্রকে খানিকটা বুঝতে পারলে, এই থিয়েটারের নাটক ও নাট্যকারকে বুঝতে অনেকটা সাহায্য হতে পারে।

নবনাট্যের প্রথম স্বাতন্ত্র এর সামাজিক অবস্থানে। ১৮৭২-এর নীলদর্পণ-এর টিকিট-বিক্রি-করা অভিনয় থেকে গিরিশচন্দ্র-অর্ধেন্দুশেখর-অমৃতলাল থেকে, শিশির-অহীন্দ্র-নরেশ পর্যন্ত বাংলা থিয়েটার পেশাদারি মঞ্চের সীমানায় লালিত হয়েছে। অপেশাদারি থিয়েটার বলতে তখন বোঝাত শৌখিন থিয়েটার। বাবু-বাড়ির অনিয়মিত শখ-মেটাবার থিয়েটার। একে কেউ সিরিয়াসলি নিত না। এই দুই বড় ও ছোট গণ্ডির বাইরে রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার চলেছিল আপনপথে, বাঙালির থিয়েটারের মূল স্রোতের থেকে দূরে। চার দশকের গোড়ায় নতুন থিয়েটার এসে হাজির হল বিদ্রোহের মতো। ক্লান্ত বয়স্ক পেশাদার থিয়েটারকে নানা দিক থেকে আক্রমণ করল এই বিকল্প থিয়েটার। সেই আক্রমণ যতটাই আদর্শের দিক থেকে, বিষয়ের দিক থেকে, ততটাই আবার রূপের বা প্রকরণের দিক থেকেও।

জবানবন্দী, আগুন, নবান্ন, ল্যাবরেটরি ইত্যাদি গণনাট্য সঙ্ঘের গোড়ার দিকের প্রযোজনাগুলির নতুনত্ব কি এই যে তারা গরিব লোকের কথা বলল ? গরিব লোক তো বাংলা নাটকের জন্মলগ্নেই বড়-সড় জায়গা পেয়েছিল। তারপরেও শুধু রাজারাজড়ার গল্প তো বলেনি বাংলা থিয়েটার। সাধারণ মানুষ এমনকি শোষিত মানুষের কথাও বলেছে। ইংরেজের অত্যাচারের কথা বলেছে। দেশি ভূস্বামীকেও রেহাই দেয়নি। সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে মুখর হয়েছে। কিন্তু গণনাট্যের নাটকে সমস্ত সামাজিক ও ব্যক্তিক সমস্যাগুলিকে এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার আন্তরিক প্রবণতা লক্ষ করা গেল। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্বের অপরিহার্য উপস্থিতিকে আবিষ্কার করল এই নতুন নাটকগুলি। সমস্ত সমস্যাকে এই শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করতে চাইল। অর্থাৎ এক কথায় 'ঘোরতর 'কমিউনিস্ট'। সঙ্গে-সঙ্গে এই নাটকের প্রযোজনার ভঙ্গিতেও এল বৈপ্লবিক পরিবর্তন। মঞ্চনির্মাণে, আলোর ব্যবহারে, রূপসজ্জায়, অভিনয়ে এল নতুন যত্ন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা। থিয়েটারের নতুন ভাষা আবিষ্কারের জন্য শুরু হল যথেবদ্ধ প্রয়াস। থিয়েটার আর শুধু প্রমোদের বাহন রইল না। সামাজিক দায়িত্ব মেনে নিয়ে, বুদ্ধির ভূমিকাকে মেনে নিয়ে, থিয়েটারকে একটি 'সিরিয়াস আর্ট ফর্ম'' করে তোলার কাজ শুরু করলেন নতুন নাট্যকর্মীরা।

এই নাট্যকর্মীরা এঁদের সামাজিক অবস্থান এবং বুদ্ধিগত ঝোঁক দিয়ে বহুপরিমাণে প্রভাবিত করলেন নতুন থিয়েটারের চরিত্রকে। মূলত নিম্নমধ্যবিত্ত এবং কদাচিৎ মধ্যবিত্ত স্তর থেকে উঠে আসা এই থিয়েটারকর্মীরা পয়সা পাবেন না জেনেই থিয়েটারে এসেছিলেন। থিয়েটারকে শ্রেষ্ঠ ভালবাসা অর্পণ করেছিলেন। এঁদেরই বেহিসেবি পাগলামিকে পুঁজি করে গত পঞ্চাশ বছরে বাংলা থিয়েটার ধনী হয়েছে। গণনাট্য-নবনাট্য-গ্রুপ থিয়েটার—নানা স্তর ও ধাপে-ধাপে গড়ে উঠেছে, আধুনিক বাংলা নাট্যের ইমারত এঁদেরই হাতে। এঁদের মধ্যে প্রথিতযশা অনেকেই পরে নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভুলেছেন, একথা ঠিক। অনেকে ক্লান্ত হয়ে চলা থামিয়েছেন। অনেকে পেশাদারি জগতের প্রবল হাতছানির কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। অনেকের আবার দু-নৌকাতে পা। তবু এখনও এমন অনেকে আছেন যাঁরা হাল ছাড়েননি। শুধু কলকাতা বা পশ্চিমবাংলাতেই নয়, বাংলার বাইরেও যেখানেই বাঙালি সেখানেই এই অন্য থিয়েটারের বীজ হাওয়ায় উড়ে গিয়ে পড়েছে। ফসল ফলাচ্ছে। অফিস ক্লাবের নাটকেও এখন দায়িত্বের ছোঁয়াচ লাগছে। যাত্রা, টি.ভি. আর পেশাদারি থিয়েটারের প্রচণ্ড হই-হল্লার মধ্যেও বাঙালি তার আদরের এই নতুন থিয়েটারকে পঞ্চাশ বছর বাঁচিয়ে রেখেছে, রাখছে, এ এক দারুণ ব্যাপার। অন্য থিয়েটারের এই ব্যাপক ভূমিকা এবং দীর্ঘ পরমায়ু পৃথিবীতে কোথাও দেখা যায়নি।

তারপরেও, এত কিছুর পরেও, হঠাৎ এক-একটা অবুঝ গলা অন্ধকারে ফিসফিস করে, নাটক কই ? নাটক নেই কেন ? ভাল নাটক নেই, সেখানে ভাল থিয়েটার কি সম্ভব ? এইসব কথাকে আত্মতৃপ্তির ধোঁয়ায় উড়িয়ে দেওয়া মুশকিল। কারণ নাটকের অভাবের

কথা যাঁরা তুলছেন তাঁদের মধ্যে শুধু দর্শক সমালোচকরাই নেই, আছেন নাটকের কর্মী এবং কারিগররাও। কেন নাটকের অভাব এবং এই অভাব কতটা ব্যাপক, তা জানার জন্য এইবার আধুনিক নাটকের দিকে তাকানো যাক।

বাংলা নাটক রচনার সমস্যা

নাটক একদম নেই—একেবারেই লেখা হচ্ছে না—একথা অবশ্য সত্য নয়। নাটক লেখা হচ্ছে প্রচুর—তবে যত নাটক লেখা হচ্ছে তত ভাল নাটক লেখা হচ্ছে না, একথা নিশ্চয়ই সত্য। তাতে এমনিতে ভয় পাওয়ার কিছু ছিল না। সব দেশেই শিল্পের সমস্ত মাধ্যমেই প্রচুর সাধারণ কাজের সঙ্গে অল্প কিছু ভাল জিনিস তৈরি হয়। কিন্তু নাটক লেখাটা যেখানে একটা নিজস্ব চরিত্র খুঁজে পেয়ে গেছে, সেখানে ভাল-খারাপের একটা মানদণ্ড, একটা বোধও গড়ে উঠেছে নাট্যকর্মী ও দর্শকদের মধ্যে। আমাদের এখানে নাটক সাহিত্য হিসাবে সেই পরিণতি পায়নি বলেই (যেমন পেয়েছে কবিতা বা গল্প বা উপন্যাস) ভিড়ের মধ্যে মুড়ি-মিছরির একদর হয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। শক্তিমান প্রযোজক এবং সক্ষম নাট্যদলগুলির হাতে সাধারণ নাটকও আকর্ষণীয় চেহারা পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাতে ভেতরের নিঃস্বতা সব সময়ে ঢেকে রাখা যাচ্ছে না। সত্যিকারের নাট্যপ্রেমীদের আশঙ্কার বীজও এখানেই নিহিত।

এখন মুশকিলটা হচ্ছে, ভাল নাটকের অভাবে থিয়েটার থেমে থাকবে না। ক্ষুধার সময় পুষ্টিকর সুখাদ্য না পেলে ভক্ষণীয় যা হাতের কাছে পাওয়া যাবে তাই দিয়েই ক্ষুন্নিবৃত্তি করবে শরীর-স্বাস্থ্যের হাল তাতে যাই হোক না কেন! এই নিয়মেই মঞ্চের গড়ুরের ক্ষুধা মেটাতে নাট্যকর্মীদেরই এগিয়ে আসতে হয়েছে এবং হচ্ছে। নিজেদের নাটক তারা নিজেরাই তৈরি করে নিতে বাধ্য হচ্ছে। এইভাবে দলগুলির নিজেদের নাটক লেখার লোক তৈরি হচ্ছে। প্রয়োজনের চাপে লেখা এইসব নাটক দলের অবস্থা ও সামর্থের কথা ভেবে সতর্ক কায়দায় 'নির্মিত' হয়। কৌশল স্বভাবতই এগুলির মূল শক্তি। শিল্পসৃষ্টির ভিতরের তাগিদ এখানে নানা বাইরের শর্তের দ্বারা খর্বিত।

মূলত এই প্রয়োজনের ধাক্কাতেই অনুবাদিত রূপান্তরিত নাটকের এত সংখ্যাধিক্য গত চল্লিশ বছর ধরে। অনুবাদ-রূপান্তর এমনিতে ভালই। যে-কোনও থিয়েটারকে এবং তার নাটকের ভাণ্ডারকে ধনী করে এই প্রক্রিয়া। আন্তর্জাতিক নাটকের ঐতিহ্য ও আবহাওয়ার সঙ্গে দেশি থিয়েটারের যোগাযোগ ঘটে। ঈসকাইলাস থেকে অলবি পর্যন্ত আড়াই হাজার বছরের ইয়োরোপীয় এবং মার্কিন নাটকারদের সঙ্গে বাংলা থিয়েটারের পরিচয় গত চল্লিশ বছরে এই নাট্যদলগুলির জন্যই সম্ভব হয়েছে। এই সংযোগ নিশ্চয়ই আমাদের থিয়েটারকে পরিণতি ও প্রাপ্তমনস্কতা অর্জনে সাহায্য করেছে। অনেকেই অসামান্য শক্তির পরিচয়ও দেখিয়েছেন কখনও-কখনও এই কাজে। বিশেষ করে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা তো এক্ষেত্রে বলতেই হয়। চেখভ, পিরানদেল্লো, ব্রেখট বা তলস্তয়ের

নাটককে নিছক রূপান্তর নয় পুনর্সৃষ্টির কাজে লাগিয়েছেন তিনি। মৌলিক নাট্যকারের সম্পূর্ণ স্বীকৃতি যদি তাঁর অনায়ত্বও থেকে যায় তবু বাংলা নাটক ও নাট্যের দিগন্তকে প্রসারিত করে দিয়েছে তাঁর নাট্যসৃজন একথা কে অস্বীকার করবে? দলের প্রয়োজনে নাটক লিখেও অনুবাদ, রূপান্তর এমনকি মৌলিক রচনার ক্ষেত্রেও দীর্ঘদিন ধরে বিশেষ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন এমন কয়েকজন যাঁদের নামোল্লেখ নিতান্তই প্রয়োজন। এঁদের মধ্যে আছেন শম্ভু মিত্র, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, জোছন দস্তিদার, অরুণ মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, অসিত বসু, উমানাথ ভট্টাচার্য, পার্থপ্রতিম চৌধুরী প্রমুখ (কেউ কেউ বর্তমান প্রতিবেদককেও হয়ত এই তালিকাভুক্ত হবার সম্মান দিতে পারেন)। কোনও গোষ্ঠীভুক্ত নন অথচ বিক্ষিপ্তভাবে দু-একটি ভাল নাটক লিখেছেন তুলসী লাহিড়ী, বীরু মুখোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, অজিত গঙ্গোপাধ্যায়, নিরুপে মিত্র প্রমুখ। কিন্তু এঁদের সকলের মিলিত সৃষ্টিতেও বাংলা নাটকের মৌলিক ধারা গড়ে ওঠেনি। বিদেশি নাটকের প্রভাবে ভাল যেমন হয়েছে তেমনি খারাপও হয়েছে। বুদ্ধিজীবী দর্শকের আদরের বস্তু হলেও এ নাটক সাধারণ বাঙালি দর্শকের হৃদয়-মনের খোরাক হয়ে উঠতে পারেনি।

ভাল নাটক রচিত হবার আরেকটি প্রাথমিক শর্ত আমাদের থিয়েটারে মর্মান্তিকভাবে অপূরিত থেকে যাচ্ছে। তা হল, শক্তিমান কথাসাহিত্যিকদের সঙ্গে মঞ্চের যোগাযোগের অভাব। এ নিয়ে আমাদের মতো নাট্যকর্মীদের অভিযোগ বহুদিনের। এক সময়ে যখন থিয়েটার সম্যক পরিণতি পায়নি তখন বরঞ্চ সাহিত্যিকদের সঙ্গে মঞ্চের যোগাযোগ ছিল অনেক বেশি। শরৎচন্দ্র থেকে তারাশঙ্কর অনেকেই নাটকের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছেন। কিন্তু থিয়েটার যখন সিরিয়াস নাট্যগোষ্ঠীদের চর্চায় সুধীজনের মনোযোগ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করল তখন থেকেই তার সঙ্গে সমকালীন কথাসাহিত্যিকদের ভাসুর-ভাদ্রবৌ সম্পর্ক স্থায়ী হয়ে গেল। কেন? পেশাদারি মঞ্চও যদি এঁদের শিল্পীসত্তাকে আকর্ষণ করতে না-ও পেরে থাকে, অন্য থিয়েটারের জন্য তো এঁরা লিখতে পারতেন। পারেন। বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিকের সঙ্গেই তো বহু ক্ষমতাবান নাট্যপ্রযোজকের বন্ধুত্বও আছে। সাহিত্যিকরা অনেকেই নতুন নাটকের ভাল দর্শকও। তবুও এঁরা কেউ নাটক লেখার তাগিদ কেন অনুভব করলেন না, এর উত্তর আমার জানা নেই। তাই একমাত্র বুদ্ধদেব বসুর একক, যদিচ ব্যর্থ প্রয়াস ছাড়া কারও কোনও নাম উল্লেখ করা যায় না। মঞ্চের সঙ্গে গভীর অপরিচয়ের জন্য বুদ্ধদেব বসুর নাটকগুলিও অবশ্য কাগজের ফুলল হয়েই থাকল।

কাব্যনাটকের ক্ষেত্রেও যে-ব্যর্থতা কবিদের অভিজ্ঞতা তার মূলেও মঞ্চকে না জানা এই মৌল অসুবিধা কাজ করেছে। নইলে মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু বা দিলীপ রায়ের হাতে কাব্যনাটকের যে-রকম সম্ভাবনাময় সূত্রপাত হয়েছিল, থিয়েটারের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটলে, এপথে বাংলা নাটকের মুক্তির অন্যতর মাত্রার সন্ধান পাওয়া যেত হয়ত। তাই বিসর্জন বা কর্ণকুন্তীসংবাদ-এর মতো মহৎ প্রাক-দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও আধুনিক

বাংলা কাব্যনাটকের ভ্রূণাবস্থায় বিনাশ ঘটল।

প্রধান পঞ্চজন

তবে কি গত অর্ধশতাব্দীর নাট্যআন্দোলন কোনও নাট্যকারের জন্ম দেয়নি? কোনও নাম করা যায় না যা নাট্যকারের পূর্ণাঙ্গ উপাধিতে ভূষিত হতে পারে? সৌভাগ্যবশত এর উত্তর নেতিবাচক নয়। নাট্যকার হিসাবে যাঁদের উপস্থিতি গত পঞ্চাশ বছরে আমাদের থিয়েটারে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ তাঁদের মধ্যে পাঁচ জনের নাম আমার সবচেয়ে আগে মনে আসে। তার মানে এই নয় যে, আর কেউ ভাল নাটক লেখেননি এই সময়-পর্বে। কিন্তু এঁদের মধ্যে বিষয় ও রূপের যে বিবর্তন লক্ষ করা যায়, নাটকের অর্থ ও ব্যবহার প্রসঙ্গে যে অনুসন্ধানী মনোভাব এঁদেরকে চালিত করে এবং নাটক ও থিয়েটারের সংগ্রাম ও সঙ্গম বিষয়ে এঁদের যে অবাহিতি, সব মিলিয়ে এঁদের একটা লাগাতার চরিত্র গড়ে উঠেছে, যা অন্যদের বিক্ষিপ্ত ভাল কাজের মধ্যে পাওয়া যায় না। এঁরা হলেন বিজন ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত, বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায় এবং মনোজ মিত্র। কী নাটক লিখব, কেন নাটক লিখব, কাদের জন্য লিখব এবং কীরকমভাবে লিখব—এইসব মৌলিক প্রশ্নের উত্তরে এঁরা কেউ এক কথা বলবেন না, তা আমি জানি, আপনারাও জানেন। এঁদের একমাত্র সাধারণ চরিত্র হচ্ছে, পাঠক লক্ষ করবেন এঁরা প্রত্যেকেই আধুনিক বাংলা থিয়েটারের সঙ্গে প্রবল ঘনিষ্ঠতায় জড়িত। বিজন ভট্টাচার্য, বাদল সরকার, উৎপল দত্ত বা মনোজ মিত্র প্রত্যেকেই শক্তিশালী প্রযোজক—অভিনেতা। মোহিত চট্টোপাধ্যায় তা না হয়েও হয়ে উঠেছেন থিয়েটারের এক প্রতিষ্ঠান। কোনও দলের না হয়েও কলকাতার থিয়েটারের নাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন মোহিত। আমার ধারণা, আধুনিক বাংলা নাটকের যে-কোনও ছাত্রের কাছে নাট্যকার হিসাবে এঁরাই সবচেয়ে বেশি অভিনিবেশ দাবি করতে পারেন।

এঁদের মধ্যে প্রবীণতম বিজন ভট্টাচার্য ঐতিহাসিক অর্থে আধুনিক বাংলা থিয়েটারের অন্যতম স্রষ্টা। গণনাট্য সঙ্ঘের প্রথম দিককার স্মরণীয় প্রযোজনাগুলির মধ্যে জবানবন্দী এবং নবান্ন-র তিনিই নাট্যকার-পরিচালক, যদিও নবান্ন-তে তাঁর সঙ্গে যৌথ-নির্দেশক ছিলেন শম্ভু মিত্র। নবান্ন নাটক হিসাবে আজ আর খুব শক্তিশালী ঠেকে না হয়ত। কিন্তু পাঁচের দশকে লেখা তাঁর মরা চাঁদ, কৃষ্ণপক্ষ, গোত্রান্তর বা ছয়পথ যাঁরা পড়েছেন, বা ছয়ের দশকের দেবী গর্জন ও গর্ভবতী জননী, এবং সাতের দশকের চলো সাগরে, হাঁসখালির হাঁস বা লাশ ঘুইর‍্যা যাউক, তাঁরা নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের প্রচণ্ড ক্ষমতার কথা তর্কহীনভাবেই মেনে নেবেন মনে হয়। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ক্ষমতাবানের লোভ ও অত্যাচার এবং দুর্বলের অসহায় যন্ত্রণা ও প্রতিরোধের স্পৃহা এবং প্রয়াস, এক কথায় এই যদিও তাঁর নাট্যবিষয়, তবু অনায়াসে তিনি রহস্যময় আদিম জীবনের সীমানায় নিয়ে যান পাঠককে। মানুষের যন্ত্রণার কাব্যরূপ নির্মিত হয় তাঁর নাটকে, যদিও সে কবিতা মেহনতি মানুষের ঘাম ও রক্তে ভেজা সংলাপের সঙ্গে অনায়াসে সহাবস্থান করে।

উৎপল দত্ত, বাদল সরকার বা মোহিত চট্টোপাধ্যায় যেখানে বুদ্ধিদীপ্ত নাগরিক চেতনার থিয়েটার তৈরি করেন, বিজন ভট্টাচার্য সেখানে যাত্রা শুরুই করেন দেশজ জীবনের মর্মমূল থেকে। তাঁর নাটকের কাঠামোতেও তাই সারল্য, বলিষ্ঠতা ও কবিতা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এসে যায়। তাঁর উত্তরসূরী মনোজ মিত্রের নাট্যকার-স্বভাবের আলোচনায় এ-প্রসঙ্গ ফিরে আসবে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে তাঁর প্রতিভা ধনী কিন্তু গৃহিনী নয়। ক্ষমতার সম্পূর্ণ ব্যবহার তিনি করেননি। তবু গত অর্ধশতাব্দীর বাংলা নাটকে তাঁর নিজস্ব কণ্ঠস্বর স্পষ্ট ও জোরালো।

কম লেখার অভিযোগ উৎপল দত্তের বিরুদ্ধে করা যায় না একেবারেই। চল্লিশ বছর ধরে নাটকের দলচালানোর ঝক্কি বহন করছেন। এর মধ্যে একবার প্রায় একদশক জুড়ে একটি মঞ্চে নিয়মিত অভিনয় করেছেন তাঁর দলকে নিয়ে। যাত্রাজগতে নাট্যকার-নির্দেশকের কাজ করেছেন। হিন্দি ও বাংলা চলচ্চিত্রে অভিনেতা হিসাবেও তিনি খুবই ব্যস্ত। এরই সঙ্গে একটি নাট্যপত্রিকা চালাচ্ছেন দীর্ঘদিন। তাঁর নাটকে তিনি ক্লান্তিহীন ভাবে প্রচারধর্মী। সারা পৃথিবীর সাহিত্য ইতিহাস ও নাটক ঘেঁটে তিনি অনবরত মানুষের সংগ্রামের কাহিনী জোগার করে আনছেন তাঁর নাটকে। শেকসপীয়ার এবং গোর্কির অনুবাদ-নাট্যরূপে তাঁর যেমন সিদ্ধি, তেমনি অ্যাজিট-প্রপ নাটকের অস্ত্রকে ধারালো করে তুলতে তিনি নিরন্তর যত্নবান। উইট বা ঝাঁঝালো হাসারস তাঁর বিশেষ লক্ষণ। তাঁর নাটকের কোনও সামগ্রিক মূল্যায়ন এখানে ঈপ্সিত নয়, সম্ভবও নয়। তবে মানুষের অধিকারের মতো ডকুমেন্টারি নাটক বা টিনের তলোয়ার-এর মতো হাস্যোজ্জ্বল বর্ণময় অথচ বিষণ্ণ নাটক যিনি লিখেছেন, তাঁর নাট্যকর্মের মনোযোগী বিশ্লেষণ নিশ্চয়ই প্রয়োজন। পুনরুচ্চারণ এবং সরলীকরণে দুষ্ট তাঁর বহু নাটকই। সাদা ও কালোর মাঝখানে কোনও রঙ থাকে না। রাজনৈতিক প্রচারের স্বার্থে তিনি হামেশাই পরিহার করেন জীবনের মনোগ্রাহী জটিলতা। আবেগের গভীরতর স্তরকে ছুঁতে তিনি প্রায়শই ব্যর্থ বা অনিচ্ছুক। এ সব অভিযোগ যদিও সত্য হয়, তবু এ-ও তো সত্য যে নাট্যগ্রহী বাঙালির মনের ওপর তাঁর দখলও বিশাল। তাঁর সেই উত্তুঙ্গ জনপ্রিয়তার অনেকটাই অভিনেতা-প্রযোজক উৎপল দত্তের পাওনা হলেও, নাট্যকার উৎপল দত্তের ভাগও সেখানে নগণ্য নয়। তাঁর এই জনপ্রিয়তার কারণ বিশ্লেষণ করলেই তাঁর শক্তিরও পরিচয় পাওয়া যাবে।

বাদল সরকারের নাট্যকার-জীবনকে তিনটি পর্বে ভেঙে দেখা যায়। বিদেশ যাবার আগের বাদল সরকার যিনি বড় পিসিমা বা সলিউশন একস-এর মতো মজার নাটক লিখেছেন ; আফ্রিকা-ইয়োরোপ ফেরত যে বাদল সরকার এবং ইন্দ্রজিৎ, বাকি ইতিহাস, পাগলা ঘোড়া-র মতো নাটকে আধুনিক জীবনের শূন্যতা, রক্তহীনতা ও পাপবোধের দলিল রচনা করেছেন ; এবং তৃতীয় এক বাদল সরকার যিনি অঙ্গনমঞ্চের প্রবক্তা, যিনি স্পার্টাকুস, মিছিল, ভোমা, সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস ইত্যাদির মতো কমিটেড, বিদ্রোহী নাটক রচনা ও প্রযোজনায় নতুন পথের সন্ধানী। আমি প্রথম পর্বের কমেডি-রচয়িতা বাদল

সরকারের ভক্ত। তাঁর তৃতীয় পর্বের নাটকগুলিও সরাসরি কথাবলার ঋজুতায় চরিত্রবান। প্রায় প্রবন্ধ-রচনার মতোই আপাত-শিল্পহীন তাঁর ভঙ্গি, অথচ অমোঘ তাঁর লক্ষ্যভেদ। আক্রমণাত্মক তিনি, কিন্তু কখনওই সহজ উত্তেজনার শিকার নন নিজে। অন্যকেও নিছক উত্তেজনায় ভোলাতে চান না। বরঞ্চ মধ্যবর্তী পর্বের জীবন-বিতৃষ্ণ দার্শনিক বাদল সরকারকে আমার পছন্দ নয়, যদিও মধ্যপর্বের নাটকগুলির জন্যই তাঁর ভারতজোড়া খ্যাতি। এই পর্বে বরং আমার ভাল লাগে তীব্র সূচীমুখ ডকুমেণ্টারি ত্রিংশ শতাব্দী এবং মনোরম হুল্লোড়ের কমেডি বল্লভপুরের রূপকথা। দুঃখের বিষয়, নাট্যকার হিসাবে তাঁর বিবর্তন ও পর্বান্তরের রূপরেখা রচিত হয়নি আজও।

ছয়ের দশকের গোড়ায় কণ্ঠনালীতে সূর্য, শবাধারে জ্যোৎস্না বা গন্ধরাজের হাততালির-মতো অদ্ভুত নামওয়ালা কাব্যগন্ধী আপাত-দুর্বোধ্য কিছু নাটক নিয়ে থিয়েটারের জগতে এসেছিলেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। কবিতার ক্ষেত্রে তখন তিনি প্রতিষ্ঠিত তরুণ। তবু নাটকের প্রকরণেই কথা বলতে চাইলেন তিনি। মেলাতে চাইলেন কবিতা ও নাটকের দিগন্তকে। প্রতীকের আবরণে বলতে চাইলেন কিছু অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসের কথা যা নিতান্ত ব্যক্তিগতই নয় শুধু। চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড এবং মৃত্যুসংবাদ-এ তিনি খুঁজে পেলেন নিজস্ব ভঙ্গি এবং পেলেন একজন সমর্থ প্রয়োজক শ্যামল ঘোষ। সাতের দশকের একেবারে গোড়ায় ক্যাপটেন হুররা ও রাজরক্ত অন্যতর এক মোহিত-কে উন্মোচিত করল। শ্যামল ঘোষ ও বিভাস চক্রবর্তীর প্রবল প্রযোজনায় এই দুটি নাটকে রাজনীতির ভাবনা অবয়ব পেল, কবিতা পেল স্পষ্টতা। এরপর নানাস্বাদ ও ভঙ্গিতে নাটক লিখেছেন মোহিত। বাঘবন্দী, স্বদেশী নকসা, তোতারাম, আলিবাবা বা সোক্রাতেস-এর মতো নানারকম নাটক। অতিসম্প্রতি তাঁর সুন্দর এবং তখন বিকেল মেলে ধরেছে আর এক মোহিতকে—যাঁর মধ্যে সৌন্দর্যতৃষ্ণা, হাস্যবোধ, বিষণ্ণতা মিলে-মিশে এক নতুন শিল্পীসত্তা। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের আগামী নাট্যকর্মের ওপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে আছে বাংলা নাটকের ভবিষ্যত।

গত তিন দশকে যে নাট্যকার সবচেয়ে সহজ অথচ জোরালো ভঙ্গিতে বিকশিত হয়েছেন, আজ যাঁর নাট্যরচনাপ্রতিভা তুঙ্গবিন্দুতে, সেই মনোজ মিত্র একজন জনপ্রিয় অথচ অতীব ক্ষমতাশালী নাটকরচয়িতা। নানাধরনের নাটক তিনি লিখেছেন। শিবের অসাধ্য, নরক গুলজার, রাজদর্শন, সাজানো বাগান, মেষ ও রাক্ষস, নৈশভোজ, কেনারাম-বেচারাম এবং পরবাস-এর মতো নানা স্বাদের বিচিত্র কমেডির সম্ভার তাঁর সৃষ্টি। রঙ্গ-ব্যঙ্গ-বেদনা-কাব্যের মিশেলে এগুলি অনবদ্য। তেমনি নেকড়ে, চাকভাঙা মধু, অশ্বত্থামা, অলকানন্দার পুত্রকন্যা বা শোভাযাত্রা-য় রয়েছে জীবনের গভীরতর সত্যের অন্বেষণ, সম্পর্কের উন্মোচন, সমাজ-সত্য ও ব্যক্তি-সত্যকে পাশাপাশি রেখে দেখার ক্ষমতা। এরই সঙ্গে যদি টাপুর টুপুর, তক্ষক, কাল-বিহঙ্গ থেকে শুরু করে পাখি, প্রভাত-ফেরী বা আঁখি-পল্লব-এর মতো অসংখ্য স্মরণীয় একাঙ্কের কথা ভাবি, তাহলে বোঝা যাবে কত বিচিত্রগামী ও বিস্তৃত তাঁর সৃজনক্ষেত্র। প্রকাশিত কিন্তু এখনও অপ্রযোজিত দর্পণে

শরৎশর্মী নাটকে বিগত শতাব্দীর এক আশ্চর্য গল্পকে তুলে ধরেছেন মনোজ। প্রতিটি নাটকেই তিনি নব নিরীক্ষায় মাতছেন। ছাড়িয়ে যাচ্ছেন নিজেকে প্রতিটি নাটকেই। শ্রেষ্ঠ হাসি থাকে চোখের জলের কাছাকাছি। সেই হাসি-কান্নার ছোঁয়ায় অপরূপ তাঁর নাটকে রয়েছে সহজ কবিতা। গ্রাম ও শহর একই সঙ্গে ধরা পড়ে তাঁর লেখায়। চরিত্রগুলি স্বচ্ছন্দময় তাই সত্যপ্রতিম হয়ে ওঠে। অভিনেতা-প্রযোজক মনোজের খ্যাতির সঙ্গে সমান্তরাল নাট্যকার মনোজের দুর্ণিবার জনপ্রিয়তা। মোহিতের মতোই মনোজ আর এক আলোক-বর্তিকা আধুনিক বাংলা নাটকে।

শেষ নাহি যে

প্রধান পাঁচ বাঙালি নাট্যকারের নাট্যকর্মের সামগ্রিক কোনও মূল্যায়ন বা ব্যাপক কোনও আলোচনা আমি এ-লেখায় করতে চাইছি না। আমার সে ক্ষমতাও হয়ত নেই। আমি শুধু বলতে চেয়েছি, এঁদের রচনায় আধুনিক বাংলা নাটকের শ্রেষ্ঠ সীমানাগুলিকে পাওয়া যাবে। এঁদের মধ্যে ধরা পড়েছে যুগ ও সময়ের প্রধান ঝোঁকগুলি। তেমনি থিয়েটারের নানা প্রয়োগগত নবীনতাও অনেক সময় এঁদের নাটকের প্রয়োজনার স্বার্থেই সৃষ্টি হয়েছে। খুবই দুঃখের কথা যে এঁদের নাটকের তন্বিষ্ঠ বিশ্লেষণ হল না আজও। অথচ বাংলা নাটকের রচনাগত সমস্যা ও সাফল্য বুঝতে হলে এই পাঁচজনের নাটকই তো পড়তে হবে সুগভীর অথচ নিরপেক্ষ মনোযোগ নিয়ে।

এঁদের পরে তরুণতর কিন্তু সম্ভাবনায় দীপ্ত আরও অন্তত দুজন নাট্যকারের কথা না বললে আমার এ-লেখা অসমাপ্ত থেকে যায়। এঁরা হলেন দেবাশিস মজুমদার ও চন্দন সেন। প্রেমচন্দ-এর গল্প অবলম্বনে রচিত দানসাগর-এ যে প্রতিশ্রুতি দেবাশিস দেখিয়েছিলেন, তারই সার্থক পরিণতিতে অমিতাক্ষর বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল। পরবর্তী সময়ে স্বপ্নসন্ততি-তেও রয়েছে নিজস্ব ক্ষমতার দ্যুতি। দেবাশিসের ভাবনা ও রচনায় একটি বলিষ্ঠভাব আবিষ্কার করা যায়। অথচ তিনি নাগরিক জীবনের দমবন্ধকরা ক্লিন্নতাকেও চেনেন। স্বীকার করেন তার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকেও। গল্পবলা ও চরিত্রায়নে আরেকটু মনুশিয়ানা আয়ত্ব হলেই তিনি হয়ে উঠবেন প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ স্রষ্টা। বিদেশি নাটকের ছায়ায় গড়ে-ওঠা জ্ঞানবৃক্ষের ফল চন্দন সেনকে এনে দেয় ব্যাপক পরিচিতি। অতি-সম্প্রতি তাঁর রচিত দায়বদ্ধ-র তুমুল সাফল্য তাঁকে জনপ্রিয়ও করে তুলেছে। অন্তর্লীন আবেগের জোরালো উন্মোচনে বিশিষ্ট তাঁর ভঙ্গি। জীবনের অভিজ্ঞতাও তাঁর ব্যাপক। এর সঙ্গে রয়েছে সামাজিক সচেতনতার অঙ্গীকার। চন্দন সেনের আগামী নাট্যকৃতির দিকেও তাই বাঙালি নাট্যমোদী তাকিয়ে আছে।

উপসংহার

আধুনিক বাংলা নাটক বিষয়ে এই প্রতিবেদনটি শেষ করার আগে দুটি কথা। এক নানা

অসম্পূর্ণতায় ভরপুর এই লেখায় প্রকাশিত মতামতে আমি ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষতা দেখাতে পারিনি। নাট্যকর্মী হিসাবে নাটকের কাজ করতে-করতে যেমন দেখেছি ও বুঝেছি, তাই লিখেছি। দুই, নিরপেক্ষ এবং সংবেদনশীল এবং সশ্রদ্ধ এবং পরিশ্রমী সেই গবেষক-সমালোচক কোথায় যাঁরা এ-কাজ ঠিকমত করবেন? পরিপূর্ণতর বিস্তৃততর কাঠামোয় রেখে বিচার করবেন বাংলা নাটকের? আধুনিক বাংলা থিয়েটার কি এইটুকুও দাবি করতে পারে না? সৃষ্টি করবেন যাঁরা, সমালোচনাও তাঁদেরই করতে হবে? একি বিড়ম্বনা! □

নেশা আর পেশার দ্বন্দ্ব

শ্যামল ঘোষ

১ : কেন থিয়েটার

আদিম মানুষ কিসের টানে গুহাচিত্র আঁকতো, লতাপাতার পোশাক পরে, গায়ে মুখে অসংখ্য আঁকিবুকি টেনে নিজেকে বিচিত্র করতো, হাড়ের নলে ফুটো করে নানান ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি করতো যেমন জানি না, তেমনি শৈশবে কোন চাঁদের টান আমার বুকে অভিনয়ের জোয়ার এনেছিল ঠিকঠাক বলতে পারব না। শুধু মনে আছে বড়দের সামনে অন্যদের অনুকরণ করে বেশ বাহবা পেতাম। পাঠ্য কবিতা বেশ ভাব দিয়ে জোরে-জোরে আবৃত্তি করে আনন্দ পেতাম। কোনোও গান দু-একবার শুনেই মোটামুটি গেয়ে দিতে পারতাম—এমনি সবকিছুর যোগফলই হয়ত অভিনয়ের প্রতি আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। হয়ত নিজেকে অন্যরূপে প্রকাশ করার আনন্দেই আমি থিয়েটার ভালবেসে ছিলাম। এসেছিলাম।

২ : গ্রুপ থিয়েটার

গ্রুপ থিয়েটার প্রসঙ্গে কিছু বলতে যাবার আগে একবার নিজের অতীতটাকে হাতড়ে দেখা দরকার। কিশোর বেলায় থিয়েটার ভাললাগার তাগিদে শ্যামবাজারের পেশাদার মঞ্চে সুযোগ পেলেই নাটক দেখতে আসতাম। অনেক দেখেছি। শিল্পমান বোঝার বয়স বা বুদ্ধি কিছুই ছিল না তখন—কেউ বুঝিয়ে দেবেন এমন লোকেরও সন্ধান পাইনি—তবু চোখ আর কানের তৃপ্তি খুঁজতে ছুটে যেতাম। তখন যা দেখেছি ওই-সব মঞ্চে তাকেই চূড়ান্ত বলে মেনে নিয়েছি মনে মনে। বিরোধ বাধলো যেদিন পাড়ায় ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের আমন্ত্রিত অভিনয় দেখলাম প্রথম। মমতাজ আহমেদের নির্দেশনায় দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাস্তুভিটা"। হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম সেই প্রযোজনা দেখে। এ কেমন থিয়েটার! পেশাদার মঞ্চের মতো কোনও চটক নেই, জেল্লা নেই— এ যেন রাস্তায় হামেশা দেখতে পাওয়া কিছু নারীপুরুষ। কী সহজ তাদের বাচনভঙ্গি, কী অনায়াস তাদের আচরণ—সেই অর্থে হয়ত কোনও বিশিষ্টতায় চিহ্নিত করা যায় না তবু কী জীবন্ত, কী নিদারুণ বিশ্বাস্য। আমার এতকালের ধারণা যেন তাকে অভিনয় বলেই মেনে নিতে দ্বিধাগ্রস্ত তবু কী বাস্তবানুগ! কেমন যেন ঘোর লেগে গেল। অনেক ঘুরে-ঘুরে শেষে গণনাট্য সঙ্ঘে যোগ দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হলাম। সময়টা ১৯৪৯ সালের শেষের দিক।

এখানে গিয়েই প্রথম আবিষ্কার করলাম থিয়েটার করতে গেলে সময়ানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ প্রাথমিক শর্ত। থিয়েটার করার পিছনে যে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে,

আদর্শবোধ থাকে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকে, পেশাদারি দক্ষতা অর্জন করতে হয়, অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, একটু-একটু করে এইসব অজানা তথ্য জানা হতে লাগল। এমনিভাবেই একদিন প্রচলিত থিয়েটারের ছায়া মন থেকে সরে যেতে-যেতে কবে যেন নতুন এক থিয়েটারের মোহে জড়িয়ে পড়লাম।

১৯৫৬ সালে কিছু বন্ধু মিলে 'গন্ধর্ব' নামে একটি দল গড়েছিলাম। সে-ই আমার গ্রুপ থিয়েটারে প্রথম পদক্ষেপ। তখন চোখের সামনে 'বহুরূপী' আর 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' আদর্শ গ্রুপ থিয়েটার হিসাবে পথিকৃত। ১৯৬৪তে গন্ধর্ব ছেড়ে 'নক্ষত্র'। গন্ধর্ব গড়ার কালে 'গ্রুপ থিয়েটার' নামটির প্রচলন হয়নি। কিন্তু শৌখিন আর পেশাদার থেকে ব্যতিক্রমী এক থিয়েটার। সমাজ সচেতনতা ও প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন এক থিয়েটার। যাদের নাট্য রচনা ও প্রযোজনার মধ্যে আছে মৌলিকতার অন্বেষণ। সমকালীন থেকে ধ্রুপদী বিষয় নিয়েও সৃষ্টিশীল নাট্যপ্রয়াস। স্বদেশ ও বিদেশের নাট্যসাহিত্যের মেলবন্ধন। অর্থাৎ সব মিলিয়ে এক স্বাধীন চিন্তাবৃত্তি এক ধরনের নবত্ব সৃষ্টি করেছিল সেই থিয়েটারে যা তখন 'নবনাট্য' নামে পরিচিতি পায়।

গণনাট্য সঙ্ঘ শেষের দিকে যত 'অ্যাজিট প্রপ'-র দিকে ঝুঁকলেন, নবনাট্য ততই নিত্যনতুন বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকে অনেক বেশি প্রসারিত করল নিজেকে। সোফোক্লেস, শেকসপীয়র, শূদ্রক, রবীন্দ্রনাথ, ম্যাকসিম গর্কি, বিজন ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে আধুনিক কালের অনেক নবীন নাট্যকারকে টেনে আনল তাদের আসরে। এই নবনাট্য পথ চলতে-চলতে কখন যে গ্রুপ থিয়েটার হয়ে গেল মনে নেই। এই থিয়েটার তাদের নিজস্ব ভাবনা ও বিষয়বস্তু নিয়ে একদিন পেশাদার মঞ্চও দখল করে ব্যাপ্তি ও পরিচিতি বাড়িয়ে তুললো। দর্শকমহলে যার মধ্যে 'এল.টি.জি' ও পরবর্তীকালে 'নান্দীকার'-এর নাম সবিশেষ উল্লেখ্য। গ্রুপ থিয়েটারের বৃহত্তর বৃত্তে এসে ধীরে-ধীরে স্বদেশী নাটোর পাশাপাশি বিশ্বনাট্যের দরজাও যেন একটু-একটু করে প্রসারিত হতে লাগল আমার চোখের সামনে। ক্ষণে-ক্ষণে এক বর্ণাঢ্য বিস্ময়ে যেন অভিভূত হতে থাকলাম। শিখলাম শুদ্ধমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয়কে চরিত্র ও সংলাপের মাধ্যমে উপস্থাপনই নয়, তাকে শিল্পমানে উন্নীত করতে হবে, বস্তুনিষ্ঠ, জীবনমুখি ও সর্বোপরি রসোত্তীর্ণ করে তুলতে হবে। জানলাম নাটকে সাহিত্যগুণ থাকা অত্যন্ত জরুরি। বাস্তবমুখিনতার সঙ্গে-সঙ্গে পরাবাস্তবকেও অস্বীকার করা যায় না। মনোবিশ্লেষণের দক্ষতা আয়ত্ব করতে হবে অভিনেতাকে। পুরনোকে বাতিল না করে সেই প্রাচীন সোপান বেয়েই আমাদের যাত্রা করতে হবে নবীনতীর্থের সন্ধানে। তার জন্য বিপুল শ্রম চাই। ত্যাগ স্বীকারের মন চাই। বোধকে উন্নীত করা চাই। মনকে সঠিক পথে চালিত করার অভিনিবেশ চাই। আর তার জন্য চাই কঠোর অনুশীলন। সেই চেষ্টা চলল। কিছু হল কিছু হল না তবু প্রয়াস থামল না।

গ্রুপ থিয়েটারে কাজ করতে-করতে এমনি কত কিছুই শিখলাম, জানলাম। থিয়েটারের নতুন ভাষা খোঁজবার চেষ্টা চলতে লাগল। কত বৈচিত্র কত দিকে। এক সৃজনশীল জগতে সাধ্যমত সামর্থ নিয়ে কিছু পরিশ্রমী উদ্যমী ছেলেমেয়ে উঠে পড়ে কাজ করতে লাগল।

তাতে ভালমন্দ দুই-ই ছিল—কিন্তু মুখ্য ছিল কাজ করার আগ্রহ। মধ্যবিত্ত-নিম্ন মধ্যবিত্তশ্রেণীর দর্শকের পৃষ্ঠপোষকতায় এই থিয়েটার নিত্যনতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লাগল। দর্শকের মধ্যেও তখন নতুন স্বাদ পাওয়ার অভীপ্সা। নিউ এম্পায়ার থেকে শুরু করে ভাঙাচোরা মুক্ত অঙ্গনের মতো মঞ্চেও তখন কত না বর্ণাঢ্য প্রযোজনা। বিরোধ তখন কিছু অনুভব করা যায়নি, করা গেল অনেক পরে। সে কথা পরেই আলোচ্য।

৩ : দল

নাটক ভালভাবে করতে গেলে পরিচ্ছন্ন ও শক্তিশালী দল তো অবশ্যই চাই। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে আমাদের দেশের আর্থসামাজিক ব্যবস্থা শৈশব থেকেই আমাদের শিখিয়ে দেয়, যেপথে অর্থাগম হয় না সে পথ অবশ্য পরিত্যাজ্য। তাই উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এমনকি কেরানি তৈরি করার জন্যও আমাদের অভিভাবকেরা যত পরিশ্রম করেন, ততটাই বা তারচেয়েও বেশি নিরুৎসাহিত করেন তাঁদের সন্তানদের কোনও শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হতে। বিশেষত অভিনয়শিল্প। এ সব যে নিতান্ত বালখিল্যতা শিশুকাল থেকেই আমাদের ঘরের ছেলেমেয়েরা তা বুঝে ফেলে বড়দের দৌলতে। তাই থিয়েটার শিল্পের মতো একটা কঠিন বিদ্যা আয়ত্ত করার জন্য যে শ্রমদান প্রয়োজন তা উপলব্ধিই করতে পারে না, আগ্রহও থাকে না। তবু তারই মধ্যে আলটপকা কিছু বেপরোয়া ছেলেমেয়ে শিল্পকে ভালবেসে থিয়েটারে এসে পড়ে। তাদের সঠিক পথে চালনা করতে পারলে দল শক্তিশালী হয়—ভাল নাটক প্রযোজনার পথ সুগম হয়, কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধে কে? যিনি পারেন, যাঁরা পারেন তাঁরা ফুল ফোটান। অন্যথায় সেই থোড় বড়ি খাড়া।

৪ : পেশা, পেশা

ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের পরে আমি মোটামুটি ভাবে 'গন্ধর্ব' আর 'নক্ষত্র'-র সঙ্গে কাজ করেছি। গন্ধর্বে স্কটিশচার্চ কলেজের ছেলেমেয়েরাই ছিল। সকলেরই প্রায় কাঁচা বয়স। তারুণ্যে টগবগ করছে। নতুন কিছু করার আনন্দে, গড়ার আনন্দে উন্মাদের মতো খেটেছে। একটানা ছ-মাস মহলা চলেছিল ঋত্বিক ঘটকের "দলিল" নাটকের। একদিনও ছুটি ছিল না, কেউ একদিনও গরহাজির হয়নি। কম ক্ষমতাকে বিপুল শ্রম দিয়ে পুষিয়ে দেবার চেষ্টা ছিল। এর আটবছর পরে যখন নক্ষত্র গড়া হল তখন অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ও মনস্ক তরুণ-তরুণীদের পাওয়া গিয়েছিল। গন্ধর্ব গড়ার সময়ে গণনাট্য সঙ্ঘের সামান্য অভিজ্ঞতা ও প্রভাব নিয়ে শুরু করেছিলাম গ্রুপ থিয়েটারের কাজ। প্রতিমুহূর্তে হাতড়ে-হাতড়ে চলেছি, চলতে-চলতে শিখেছি—নক্ষত্রের বেলায় সেই ক'বছরের জমানো অভিজ্ঞতা পুঁজির মতো ব্যবহার করে কাজে নামলাম। যে আবেগ গন্ধর্বের বেলায় প্রায় অনির্দেশ্য ছিল, নক্ষত্রে তা বেশ

সংহত রূপ নিতে লাগলো। ৫৬ থেকে ৬৪-র মধ্যে মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির বেশ তফাৎ ঘটে গিয়েছিল। ১৯৭৫ পর্যন্ত একটানা নানান রীতি ও বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার পর প্রায় এক যুগ বিরতি।

১৯৮৮-তে ঘরে ফিরলাম। ফিরে দেখি থিয়েটারের হালচালটাই কেমন বদলে গেছে। ততদিনে ঘরে ঘরে টি.ভি. জাঁকিয়ে বসেছে, সঙ্গে ভি.সি.আর., ভি.সি.পি.। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার এসেছে। মানুষ অনেক সমাজসচেতন ও হিসেবি হয়েছে। দ্রুত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মানুষের মূল্যবোধ কমে যাচ্ছে। অনেকের মধ্যেই তখন কেমন একটা 'কেৎনা দিয়া কেৎনা লিয়া' গোছের ভাব। থিয়েটারে বৈচিত্র এসেছে, নিপুণতা এসেছে তার সঙ্গে কোথাও-কোথাও কালচার আর শিল্পের নাম দিয়ে অনেক আকিঞ্চিৎকর বস্তু মনোরঞ্জক মোড়কে মুড়ে বাজার মাত করার প্রবণতাও এসেছে। অনেক নতুনদের মধ্যেই লক্ষ করা গেল শ্রমবিমুখতা, অন্যমনস্কতা এবং দ্রুত প্রাপ্তির অন্বেষা। কত কম সময়ের মধ্যে নিজেকে কত বেশি তুলে ধরা যায় তার যেন একটা প্রতিযোগিতা চলছে। অবশ্যই এর ব্যতিক্রমও আছে। জান লড়িয়ে থিয়েটার করার মানুষ এখনও ঢের আছে কিন্তু কৌশল আর ভঙ্গির বদল ঘটেছে তাঁদের মধ্যেও। ভালবাসায় যার জন্ম, বুকের ভিতরের সেই টান হারিয়ে গেলে শুধুমাত্র সংবিধানের দড়িদড়া দিয়ে তাকে কি আর বেঁধে রাখা যাবে? অল্প আয়াসে বড় প্রাপ্তির আশায় যারা ছুটবে, পেশাদারিত্বের কথা বলে, অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার দোহাই দিয়ে যাঁরা সজ্ঞানে, কৌশলে গ্রুপ থিয়েটারের মধ্যে বাণিজ্যিক থিয়েটারি হাওয়া বইয়ে দেবে সংগঠনের কোন প্রক্রিয়ায় তাদের প্রতিরোধ করা যাবে? তা সত্ত্বেও ভাল থিয়েটার হচ্ছে, হবে। গাছের দু-একটা ডাল শুকিয়ে গেলেও পুরো গাছটা যে মরে না সে বিশ্বাস আমার আছে।

৫ : থিয়েটারের সর্বক্ষণের কর্মী

সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে থিয়েটার করতে পারলে তার চেয়ে সুখের আর কী হতে পারে? সারাদিন থিয়েটার নিয়ে ভাববে, পড়বে, জানবে, অনুশীলন করবে, ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষকে দেখবে, চিনবে, পরখ করবে, কল্পনা আর অনুভবের ব্যাপ্তি বাড়িয়ে তুলবে। জীবনকে সঠিকভাবে বোঝার জন্য নিজেকে সমৃদ্ধ করবে। কবিতা কি সঙ্গীত, স্থাপত্য কি নৃত্যকলা, রঙ আর আলোর ব্যবহার বোঝবার জন্য গ্রন্থ আর গুণীমানুষের সাহচর্য খুঁজবে—তেমন সুখ আর ক'জনের ভাগ্যে জোটে? তাই আমাদের দেশের গ্রুপ থিয়েটারে সর্বক্ষণের কর্মী হবার কল্পনা প্রায় আকাশকুসুম। হবেই বা কি করে? যারা আগে থিয়েটার করত তাদের বেশির ভাগই তো মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়ে এবং সাংসারিক আয় সীমাবদ্ধ, তাদের মধ্যে কিছু ছাত্র, কিছু বেকার, কিছু সদ্য চাকরি পাওয়া যুবক-যুবতী। দিনযাপন আর প্রাণধারণের হিসেব-নিকেশ করতে করতেই দিন চলে যায় যাদের, (গ্রুপ থিয়েটারের কাজে তো কোনও অর্থাগম হয় না, নেহাতই বনের মোষ তাড়ানো) সে কাজ করার বাড়তি সময় তারা পাবে কোথায়? মোটামুটি বেঁচে থাকার

রসদই বা তাদের জোগাবে কে ?

তবু ধরা যাক কেউ সর্বক্ষণের কর্মী হবার জন্য শক্ত করে কোমর বাঁধল—কিন্তু সারাটা দিন কী কাজ করবে ? পড়াশুনো, লেখালেখি, ব্যক্তিগতচর্চা এই তো ? কিন্তু থিয়েটার যেহেতু যৌথশিল্প—সবারই থাকবে সারাদিন ভিন্ন ভিন্ন পেশায় জড়িয়ে, তাহলে কাদের সঙ্গে কাজ করবে সে ? অন্যদেশে হয়ত বিধি অন্যরকম আছে কিন্তু আমাদের দেশে আমার মনে হয় এ প্রায় অসম্ভবের কল্পনা। তবে অভিনয়কে যিনি পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছেন তাঁর কথা স্বতন্ত্র। তিনি হয়ত সারাদিন অভিনয়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকছেন ঠিকই—কিন্তু পেশা বাঁচাতে গিয়ে কতটা তাঁর নিজস্ব থিয়েটারের প্রতি মনোযোগী হতে পারছেন বলা মুশকিল। তবে এর মধ্যেও ব্যতিক্রম আছে। কেউ-কেউ ভাবে সত্যিই পারছেন, কিন্তু ব্যতিক্রমকে তো আর স্বতঃসিদ্ধ বলে মানা যায় না।

এ প্রসঙ্গে একটা পুরনো গল্প মনে পড়ছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব একবার "চৈতন্যলীলা" দেখতে এসেছিলেন গিরিশচন্দ্রের থিয়েটারে। ঠাকুরের ইচ্ছে হল তিনি টিকিট কিনেই থিয়েটার দেখবেন। তখন এক ভক্ত আট আনা দিয়ে (তখন ওই দামে পাওয়া যেত) টিকিট কিনতে গেলে রামকৃষ্ণদেব বললেন—ওরে না না, একটা টাকাই দে। গিরিশ যে আমাদের ষোলো আনা দেয়, ওকে কি আট আনা দেওয়া যায় ?

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কী ভেবে বলেছিলেন জানি না কিন্তু আমরাও যদি আট আনা বা চার আনা দিয়ে দর্শকদের কাছে ষোলো আনা আশা করি সেটা কি অন্যায় আবদার হবে না ?

৬ : কৃষ্ণযাত্রা

শহর ও শহরতলিতে গ্রুপ থিয়েটার সমাদৃত খুবই কিন্তু গ্রামাঞ্চলে তেমন হতে পারল না কেন কে জানে ? তবে মফস্বলের দলগুলি তো মাঝে-মাঝে গ্রামে যায়, কিছু জনপ্রিয়তা তো আছে নিশ্চয়ই। নইলে যাবেই বা কেন ? গণনাট্য সঙ্ঘ একদা গ্রামে বেশ ভাল কাজ করেছে—রাজনৈতিক সচেতনতা এনে দিয়েছে। সরলতার অভাবই জনপ্রিয়তা না পাবার অন্যতম কারণ কিনা জানি না। একদা কবিগান, তরজা, কৃষ্ণযাত্রা যে গ্রামের মানুষের নাড়িতে টান দিয়েছিল তার পিছনে হয়ত বিষয় ও বাকভঙ্গির সরলতাই সবিশেষ আকর্ষণ ছিল। ইদানীং অবশ্য অসংখ্য ভিডিও পার্লারের দাপটে গ্রামের মানুষ তাদের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলছে। জটিলতা বাড়ছে ক্রমশ। গ্রুপ থিয়েটার কিসের সঙ্গে পাল্লা দেবে ?

৭ : দল, ভাঙ্গন ইত্যাদি

দল বদল, নতুন দল গঠন এসব নতুন কিছু নয়—বরাবরই তা হয়ে আসছে। এর পিছনে কোথাও-কোথাও ব্যক্তিস্বার্থ কাজ করলেও মূলত আদর্শগত বিরোধই অন্যতম কারণ বলে মনে হয়। রাজনৈতিক মতাদর্শের কথা ছাড়াও দলীয় অব্যবস্থা, অবিচার,

অন্যায় আচরণ, দলের মধ্যে প্রেম ইত্যাদি বহু ছোটখাট নৈতিক কারণও অনেক দলকে ভাঙনের মুখে ঠেলে দেয়। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির না থাকলে যেমন সমুদ্রে নাবিক দিগভ্রান্ত হয়, কূলে পৌঁছানো দুরূহ হয়ে ওঠে তেমনি নাট্যদলের মত ও পথ সুনির্দিষ্ট না হলে এ ধরনের ঝড়-ঝাপটা তাকে সইতে হবেই। আমাদের গোড়ার যুগে দেখেছি একদলের অভিনেতা অন্যদলে অভিনয় করতেন না। ইদানীং অবশ্য একাধিক দলে আমন্ত্রিত হয়ে অনেকে অভিনয় করে থাকেন—সেটা 'মুক্ত চিন্তার' প্রভাব কিনা ঠিক বলতে পারব না। এর ফলে একদিকে থিয়েটার যেমন পুষ্ট হচ্ছে তেমনি দলীয় দায়দায়িত্বের ঝক্কি এড়িয়ে কেউ-কেউ ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ও জনপ্রিয় করে তোলার সুযোগও পাচ্ছেন। আবার এমন দলও দু-চারটে দেখা যাচ্ছে যেখানে দলের প্রধান ছাড়া বলতে গেলে আর প্রায় কোনও অভিনেতা-অভিনেত্রীই নেই, অথচ এদল সেদল থেকে সংগ্রহ করে বেশ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সে সব প্রযোজনাও খেটেখুটে তৈরি করলে মন্দ হয় না। সংগঠন ভাল হলে, তেমন-তেমন প্রচার করতে পারলে জনপ্রিয়ও হয় কিন্তু সদর্থে কোনও বৈশিষ্ট্য তৈরি হয় কিনা সে প্রশ্ন থেকেই যায়। আবার কিছু গ্রুপ থিয়েটার একত্রিত হয়েও নির্বাচিত শিল্পী-সমন্বয়ে এক-আধটি নাটক প্রযোজনা করেছেন, বলাবাহুল্য সেগুলি খুবই সমর্থ এবং শিল্পমণ্ডিত। এ ধরনের প্রয়াস অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য যদি তাঁরা শেষপর্যন্ত গ্রুপ থিয়েটারের আদর্শে অবিচল থাকেন। আদর্শ দলের ক্ষেত্রে আদর্শের প্রশ্নটি জরুরি। শুধুমাত্র নিজেকে তুলে ধরার জন্য দল গড়লে তাতে হয়ত আত্মতুষ্টি আসতে পারে কিন্তু পূর্ণতা পায় না এবং সামান্য কারণেই ধস নামার সম্ভাবনা থাকে। তবু বলব এটাই কিন্তু সর্বাঙ্গীন চিত্র নয় গ্রুপ থিয়েটারের। আদর্শ ও স্বপ্ন বুকে নিয়ে থিয়েটারের কাজ করে চলেছেন অসংখ্য দল, অজস্র ছেলেমেয়ে তাঁরাই থিয়েটারকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন আগামীকালের দিকে। ভাল-মন্দর বিচার থাকুক না হয় মহাকালের হাতে।

৮ : জীবিকার টান

যাত্রায় গিয়েছিলাম মূলত জীবিকার প্রয়োজনে। অবশ্য অভিনয়ের অন্য একটি মাধ্যম বুঝে নেবার আগ্রহ যে ছিল না তা জোর করে বলা যাবে না। ওখানে গিয়ে অনেক কিছু দেখেছি, শিখেছি সে সব বারান্তরে আলোচনা করা যাবে। তবে খোলা মঞ্চে বহু দর্শকের সামনে দিনের পর দিন অভিনয় করতে-করতে শুধু আনন্দ নয়, মনোবল ও আত্মবিশ্বাস যে বাড়তে থাকে অভিনেতার, সেটা উপলব্ধি করেছি। যাই হোক ভাল-মন্দ মিলিয়ে আমার সঞ্চয়ের ঝুলি বেশ ভরে উঠেছিল।

৯ : রিপ ভ্যান উইঙ্কল

আবার থিয়েটারে ফিরে এসে নিজেকে 'রিপ ভ্যান্ উইঙ্কল' মনে হচ্ছিল। সব কিছু কেমন যেন অচেনা। পুরনো হালচাল বদলে গেছে। পুরনো আদর্শ, মূল্যবোধ

বাতিল হয়েছে। নতুন যুগের আবহাওয়ায় নিজেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করছি। পারব কিনা জানি না। তবু চেষ্টা।

১০ : জাত কি ছেলের হাতের মোয়া

গ্রুপ থিয়েটার থাকবে। যদিও ইদানীং বাণিজ্যিক থিয়েটারি ভাবনার হাওয়া লেগেছে তার গায়ে, পেশাদারি জগতের হাতছানি অনেককেই টানছে। টানুক। পেশাদার হলেই যে জাত যাবে এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। বরং পেশাদার থেকেও কেউ যদি তার শিল্প-ভাবনার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারে, যে কাজ করবে বলে অন্য থিয়েটার গড়ে তুলেছিল তার প্রতি একনিষ্ঠ থাকতে পারে তবে তার চেয়ে স্বস্তির আর কি হতে পারে। অন্ততপক্ষে বিশ্বাসভঙ্গের দায় তো তার উপর বর্তাবে না। অবশ্য সম্প্রতি যেভাবে থিয়েটার করার ব্যয় বাড়ছে তাতে এখনই কোনও বিকল্প ভাবনায় গ্রুপ থিয়েটার না এলে তার অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। □

থিয়েটারের মাচায়

অসিত বসু

বাংলা থিয়েটার এবং তার প্রযোজনা সংক্রান্ত সুবিধে-অসুবিধে-অবস্থিতি—এইসব প্রসঙ্গে আমার অভিজ্ঞতার নিরিখ জানতে চেয়ে আপনারা আমায় কিছু লিখতে বলেছেন। সত্যিকথা বলতে কি—এ হেন সম্মান আমা হেন একজন অতি নগণ্য নাট্যকর্মীর উপযুক্ত কিনা সে সম্বন্ধে আমারই ঘোর সন্দেহ আছে। কারণ কোনও সরকারি-বেসরকারি খেতাব-পুরস্কার-অনুদান স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কৃতী পুরুষ আমি নই। তবুও আপনারা আমার অভিজ্ঞতার কথায় আপনাদের মূল্যবান পত্রিকার পাতা ভরাতে একান্ত বদ্ধ-পরিকর এই দুর্মূল্যের বাজারেও। অনেক কৌশলেও তা এড়াতে অক্ষম হয়েছি। তাই এই লেখা লিখতে গিয়ে বেশ সঙ্কোচ এবং বলতে কি ভয়ও পাচ্ছি মনে-মনে। কারণ এ ধরনের লেখা আমাকে কোনও দিন লিখতে হতে পারে ভেবে—সেই ছয়ের দশকের গোড়া থেকেই প্রায় কলেজ থেকেই থিয়েটার আন্দোলনে সব ছেড়ে ঝাঁপ দিইনি। নিতান্তই একটা বুক মোচড়ানো-টানের অনুভূতিই আমাকে এনে দিয়েছে থিয়েটারের 'মাচা'য়। এটা না করলে থাকতে পারব না—দম বন্ধ হয়ে যায়—তাই থিয়েটারকে আঁকড়ে ধরেছিলাম। অনেক বাধা-বিপত্তি প্রতিকূলতা স্বীকার করে নিয়েই। থিয়েটার আমার বুক ভরে নিঃশ্বাস নেবার খোলা আকাশ। আজ যখন এই লেখা লিখছি—আমার সে-আকাশ প্রায় কেড়ে নিয়েছে আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশ। আমার সেই নির্মল নীল আকাশ বড্ড ঘোলাটে। হয়ত বা বয়সের এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতার ধোঁয়াশায় আমারই দৃষ্টিভ্রম! থিয়েটার প্রযোজনা—বিশেষত আমি যে ধরনের থিয়েটার অর্থাৎ গ্রুপ থিয়েটার করেছি, তার প্রযোজনা সংক্রান্ত আলোচনায় [১] দল, অর্থাৎ গ্রুপ এবং তার সাংগঠনিক রূপ, [২] নাটক, [৩] অভিনয়-অভিনতা, [৪] প্রয়োগগত কলাকৌশল আর কুশলীবৃন্দ এবং সর্বোপরি [৫] আদর্শ-নান্দনিক দার্শনিক তথা রাজনৈতিক—এসব প্রসঙ্গ এসে পড়বেই। পড়েই। অবধারিত। যেহেতু স্বভাবগতভাবে আমি ঠিক 'গোছানে' নই—তাই আমার এই আলোচনা সাল তারিখের নিরিখ নিয়ে মাথা ঘামাব না কিংবা বিষয় ধরে-ধরে পাণ্ডিত্য-পূর্ণ আর্য-আলোচনায় নিমগ্ন হব না! আমার নিজের কাজের গণ্ডিতে থেকে দেখা, অনুভব করা নানা গল্পেসল্পে যতটা পারি এগোবার চেষ্টা করব।

নিজের থিয়েটার-টা শুরু করেছিলাম সেই ১৯৭১ সালে সি পি এ টি (ক্যালকাটা পিপলস আর্ট থিয়েটারে) গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা থেকে। শুরুরও একটা শুরু থাকে—

যেটা একটু না বললে শুরুর কথাটা বুঝতে অসুবিধে হয়, তাই একটু পূর্ব-কথনে যাই।

বড় থিয়েটার—নিয়মিত থিয়েটারে নিজেকে সঁপে দেওয়ার শুরু সেই ১৯৬৬-র সেপ্টেম্বর-অক্টোবর নাগাদ। তার আগে কলেজে এবং সমরুচির বন্ধুদের গড়া নাটকের দলে অভিনয় তারপর 'চতুর্মুখ'-গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় শ্রদ্ধানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়ের 'মুকুর' গোষ্ঠীতে নাট্যচর্চা ইত্যাদি চলছে সেই '৬২/'৬৩ থেকেই। যে কথা হচ্ছিল—সেই '৬৬-র শেষের দিকে কলেজ থেকে বন্ধুবর শৈবাল মিত্র আমায় ধরে নিয়ে যান এল টি জি-তে। তখন "কল্লোল" "অজেয় ভিয়েৎনাম"-এর দিক কাঁপানো স্বর্ণযুগ। নিনার্ভা থিয়েটার তখন আমার মতো তরুণদের দিশারী—সমাজ-রাজনীতি সচেতন থিয়েটারের মূর্ত প্রতীক এল টি জি, উৎপল দত্ত তখন আমাদের মহানায়ক!—সেসময়ের সমাজ-রাজনীতির পটভূমিও উত্তাল উদ্বেল—'৬৬-র খাদ্য আন্দোলনের সামনে ৬৭-র নির্বাচন;—বাম শিবিরও সদ্য বিভাজিত মতাদর্শের যুদ্ধে। আই পি টি এ তখন সেভাবে সক্রিয় নয়। উৎপল দত্ত, জোছন দস্তিদার, চিত্ত পাল, বিদ্যুৎ বসুদের নেতৃত্বে পি এ এফ (পিপলস আর্টিস্টস ফেডারেশন) গণশিল্পী সংস্থা মিনার্ভাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। পি এ এফ কেন্দ্রীয় স্কোয়াডের পোস্টার নাটক "দিন বদলের পালায়" আমাকে পাঠানো হল এল টি জি থেকে—নাটকে পোশাকের অভিনয় এবং যুগ্ম মণ্ডাধ্যমা হিসাবে। হঠাৎ যে কেন উৎপলদা তথা অভিজ্ঞ কমরেডদের স্নেহের চোখে পড়ে গেলাম জানি না। তখন একটা অন্য মেজাজ আমার! তাপস সেন, নির্মল গুহরায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, শক্তি নাগ, শম্ভু ভট্টাচার্য প্রমুখ আমার স্বপ্নের মানুষদের সঙ্গে কাজ করছি। আমায় আর পায় কে, জীবনের প্রথম এবং একমাত্র চাকরি ছেড়ে দিলাম থিয়েটারের সর্বক্ষণের কর্মী হব বলে। আসলে তখন ২৩/২৪ বছরের উদ্দাম যৌবন লাভক্ষতির অঙ্ক জানেনি, মানেনি। কীভাবে চলবে, ভবিষ্যত কী? এসব চিন্তা মাথাতে আসেনি। জোয়ার এসেছে—পাল তুলে দাও—ব্যাস! এটা শুধু আমার নয় সে সময়ের অনেক যৌবনই উত্তাল জোয়ারে—রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং থিয়েটারের প্রতি আকুল প্রীতির ষাঁড়াষাড়ির বানে সব তুচ্ছ করে নিজেদের ভাসিয়ে দিয়েছিলেন কোনও কিছুর তোয়াক্কা না করে, পিছুটান না রেখে। একমাত্র লক্ষ্য ছিল—নিজেদের আদর্শ অথবা স্বপ্নের কূলে পৌঁছনো। কতজন হারিয়ে গেছেন, কেউ বা বিক্ষুব্ধ তরঙ্গাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পৌঁছেছেন—কেউ-কেউ বা ক্লান্ত শরীরটা কূলে পৌঁছে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। আজ পেছন ফিরে যখন ভাবি, তখন মনে হয়, ওই দুর্দম জেদটুকুই সমস্ত সামাজিক-রাজনৈতিক অব্যবস্থার প্রতি পবিত্র নিষ্কলুষ ক্রোধ এবং ঘৃণার আগুনটুকুই ছিল সেই সময়ের যৌবনের প্রাণ। তখনও সেই উষ্ণ প্রাণের উত্তাপ কম্পিউটারাইজড নির্ভুল লাভ-অলাভের শীতল অঙ্কের নৈর্ব্যক্তিক চেতনায় জমে বরফ হয়ে যায়নি। আজকের অনেকে হয়ত কথাগুলো পড়ে বিরক্ত হবেন, হওয়া উচিতও, তবু আমি অসহায়, আমার ওই মতটাকে নাকচ করতে পারছি না। পারলে সবচেয়ে

সুখী হতাম। যাইহোক ঘটনায় ফিরি, "দিন বদলের পালা" হল। আর ক্রমশ দিন বদলাতে-বদলাতে একেবারে আমূল বদলে গেল। সেই বদলের রক্তাক্ত অগ্নিগর্ভ নাটকে কত মুখ—কত মানুষ—কত ঘটনার ঘনঘটা। যুক্তফ্রন্ট, নকশালবাড়ি, শ্রীকাকুলাম—জরুরি অবস্থা, ক্রমাগত মুদ্রাস্ফীতি, ডিভ্যালুয়েশন, রাজনৈতিক রি-ভ্যালুয়েশন, এ পক্ষ থেকে ও পক্ষে তাঁতের মাকুর মতো সতত সঞ্চরমান নেতা এবং দাদার দল—কাঁটাতারে ঘেরা কলকাতায় কোমিং অপারেশন—বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ—যেন একটা বিশাল কেলাইডোস্কোপ অনির্বার গতিতে ঘুরেই চলছে আর প্রতিমুহূর্তে জটিল থেকে জটিলতর নক্সা ফুটিয়ে তুলছে। আমারও চোখ একটু-একটু করে ফুটছে-ফুটছে-ফুটছে—আর মনের পরতে-পরতে অভিজ্ঞতার চর জাগছে—জেগেই চলছে। এত কথা এল শুধু শুরুতে পৌঁছতে। যে কথাটা বলতে চেয়েছি সেটা হচ্ছে, কোন সময়ে কোন মানসিক বৃত্ত থেকে আমার যাত্রা শুরু। উৎপলদার কাছে, উৎপলদার থিয়েটারে নিজেকে তিল-তিল করে—ওয়ার্ডরোব বয় থেকে শুরু করে থিয়েটারের সবরকম কাজ নিজের হাতে করে নিজেকে গড়েছি। আর কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি আমার প্রতি উৎপলদার স্নেহ এবং অক্লান্ত শিক্ষা! এটা না পেলে আমি শূন্যে মিলিয়ে যেতাম। তবুও মতাদর্শ এবং নাট্যদর্শগতভাবে আমার মনে একটা স্বতন্ত্র থিয়েটার-বোধ ও অভিব্যক্তি গড়ে উঠছিল—যার ফলে আমি এল টি জি থেকে বিবেক-যাত্রাসমাজ হয়ে পি এল টি পর্যন্ত অনুসৃত পথ ছেড়ে সি পি এ টি-তে এসে পৌঁছই। সি পি এ টি শুরু হয় চেকভের সীগাল নাটকের অজিত গঙ্গোপাধ্যায় কৃত বাংলা অনুবাদ "আকাশ বিহঙ্গী" দিয়ে, তারপর জ্যোতিঠাকুরের "অলীকবাবু", মোহিত চট্টোপাধ্যায় কৃত ক্লীমেন্সডেন অনুসরণে "শেকসপীয়র" এবং তাঁরই লেখা "বাঘবন্দী" নাটক। এই সমস্ত নাটকেই কর্মের নানারকম মজার খেলা ছিল। যেহেতু দীর্ঘদিন উৎপলদার ছত্রছায়ায় কাজ করেছি, তার অপ্রতিহত প্রভাব কাটাতে প্রায় ইচ্ছে করেই এই ধরনের প্রযোজনাগুলিতে মকশো করতে হয়েছে নিজের সিগনেচার ঠিক করতে। অলীকবাবুর পাপেট থিয়েটারের ভঙ্গি আকাশ বিহঙ্গীর প্রয়োগে আংশিক ন্যাচারালিস্টিক ঢঙ, শেকসপীয়রে খানিকটা এক্সপ্রেসনিস্ট ঠাট—কিংবা বাঘবন্দীর বায়োমেকানিজমের ঠমক—কখনও দর্শক সমালোচকদের ভালবাসা পেয়েছে, কখনও তিরস্কার। কিন্তু আমরা থেমে থাকিনি। বা কোনও একটা সাফল্যে মজে যাইনি। আমরা যে সমমনস্ক বন্ধুরা এই থিয়েটারটা করতাম, আমাদের লক্ষ্যই ছিল—নিত্যনতুন ফর্ম এবং কনটেন্ট নিয়ে গবেষণাগারের কর্মীদের মতো নতুন থিয়েটারের ভাষা খোঁজা। '৭১-'৭২ এই চলতে থাকল। তখন সংগঠন এবং প্রয়োজনা বিভাগ একাত্ম হয়ে কাজ করছে। আমাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার চেয়ে সি পি এ টি তথা আমাদের থিয়েটারটাকে প্রতিষ্ঠা করার তাগিদই ছিল বেশি। কেউ সবে চাকরিতে ঢুকেছে, কেউ সবে পড়াচ্ছে কলেজে, কারুরই অর্থনৈতিক অবস্থাটা স্থায়ী চেহারা তখনও নেয়নি। তার ওপর আমরা দু একজন থিয়েটার ছাড়া কিছুই কীনি না! বড়জোর কোনও প্রযোজনার জন্য সেট

করে দিই। যৎসামান্য হাত খরচ পাই। কিন্তু দলের ডিসিপ্লিন ছিল যাকে বলে স্পার্টান ডিসিপ্লিন। সাড়ে ছটায় রিহার্সাল থাকলে ছটা একত্রিশে কেউ ঢুকছে ভাবতে পারা যেত না! এমনও হয়েছে, অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে, রাস্তায় কোমর সমান জল, আমরা দু-একজন যারা আগে এসেছি ভাবছি আজ বোধহয় আর কেউ আসবে না। কিন্তু অবাক কাণ্ড ছটা ত্রিশের মধ্যে কাকভিজে হয়ে সবাই উপস্থিত। তখনও কলকাতায় ট্রাফিক জ্যাম হতো, মিছিল-মিটিং থাকত—হয়ত এখনকার চেয়ে বেশিই। জ্বরজারিও হতো, কিন্তু গ্রুপের রিহার্সালে দেরিতে আসা কি না আসা, তৎসংক্রান্ত কোনও অজুহাত—পাইনি। ছিল না। এখন মাঝে-মাঝে ভাবি, সে সর্বদম গেল কোথায়! কেন থিয়েটারের ছেলে-মেয়েদের মন থেকে সেই নিবেদন, সেই একাগ্রতা হারিয়ে গেল? হয়ত কারণ আছে, বিশেষজ্ঞরা নিশ্চয়ই বলতে পারবেন, কিন্তু পরিস্থিতির এই তফাতটা অস্বীকার করার পথ নেই। ইদানীং গ্রুপথিয়েটারের কাজ করতে গিয়ে পদে-পদে হোঁচট খাই মহলার রুটিন ঠিক করতে। কারুর ব্যক্তিগত, কারুর সামাজিক, কারুর বা সাংস্কৃতিক, নানান কাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সদস্যদের উপস্থিতির কথা ভেবে, জটিল গাণিতিক হিসাব মাথায় রেখে, মহলার নির্ঘণ্ট রচনা করা পাকা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট-এরও সাধ্য নয়। আমাদের সময়কার যাঁরা এখনও থিয়েটার করে যাচ্ছেন তাঁদের কাছে এই সমস্যার কথা বলতে গিয়ে জানলাম, এটাই নাকি সাম্প্রতিক কেতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবাই ভুগছেন এহেন ভাইরাসের আক্রমণে। হলে কী হবে, এ-কেতায় নিজেকে দুরন্ত করে উঠতে পারছি না। ফলে মানসিক আঘাত সইতে হচ্ছে। একটা গ্রুপ থিয়েটার করছি, কোনও আদর্শে (সে রাজনৈতিক এবং শিল্পের আদর্শ যাই হোক না কেন) উদ্বুদ্ধ হয়ে, নিজেদের বিশ্বাসের আদর্শ থিয়েটারকে তান্নিষ্ঠ চর্চায় সুষ্ঠ প্রকাশনার জন্যে সেখানে মহলায় আমার পার্টের অংশটুকু ছাড়া আমি উপস্থিত নেই। অবাক কাণ্ড! আমি যে কর্মকাণ্ডের সমগ্রের অংশমাত্র, সেই সমগ্রের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ সম্পর্ক নেই, কেবল আমার আংশিক সংযোগে তাকে পূর্ণ করব, এটা একটা যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানসিকতা ছাড়া কিছুই নয়। সকলে সব সময় থিয়েটারি কর্মকাণ্ডটির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে না থেকে, সেই প্রার্থিত প্রযোজনাটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে যদি জড়িয়ে না থেকে তাকে আগলাই বা তার ভাল-মন্দ না ভাবি, তাহলে প্রযোজনাটির সঙ্গে আমার মনের আঁট বাঁধে কেমন করে! কাঠবেড়ালির নুড়িটি যত ছোটই থেকে যাক, সেটি বিহনে রামচন্দ্রের সেতুবন্ধন অসম্পূর্ণই থাকত! অতএব সকলের ওই ঐকান্তিক সম্মিলিত ঘাম ঝরানো বিনে প্রযোজনার সার্থকরূপ পাওয়া সম্ভব না। না রূপে, না ভাবে। সে সময় আমরা সকলে থিয়েটারের হোলটাইমার হতে না পারলেও থিয়েটারের জন্য ডেডিকেশন এবং প্রচেষ্টার গভীরতা বা ভাবনার এককেন্দ্রিকতায় পার্টটাইমার ছিলাম না। ইদানীং রেওয়াজ দেখি এক অভিনেতার বহুদলে অভিনয়। এর মধ্যে নিশ্চয় ভাল বা লাভজনক কোনও দিক আছে নচেৎ এই অ্যাটিটিউডের প্রকোপ দেখা যাবে কেন? ব্যক্তিগতভাবে আমি

এটাকে মন্দ বলেই ভাবি। সম্পূর্ণ পেশাদার অভিনেতারা পেশাগতভাবে বিভিন্ন পেশাদার অভিনয়-মাধ্যমে একই সঙ্গে কাজ করছেন, এটা মানতে কোনও অসুবিধা নেই। একজন শিল্পী পেশাগত কারণে বিভিন্ন পেশাদার স্থানে তাঁর দক্ষতা বেচতে পারেন বা ভাড়া খাটাতে পারেন সহজেই, কারণ সেই ব্যবসায়িক শিল্পকীর্তিগুলি যার-যার মতো আদর্শভিত্তিক। সেখানে তাঁর কাজ ভাড়াটে সৈনিকের। ভাবগত দিক থেকে বোধ হয় মানসিকভাবে ততটা ইনভলভড হবার সুযোগ কম। কিন্তু গ্রুপ থিয়েটারগুলির তো কিছু আদর্শের ভিত্তি আছে। প্রত্যেকেই নিজের প্রকাশভঙ্গি এবং চেতনায় অনন্য। তা না হলে এত দল এত গোষ্ঠী কেন? সেই হিসাবে তাদের নিজেদের থিয়েটার ভঙ্গিতে সবদলই নিবেদিত প্রাণ। আদর্শ-উদ্বুদ্ধ। এক কথায় বলা যায় এক ধরনের পার্টিজান। সে ক্ষেত্রে এক দলের অভিনেতা বা পরিচালক অন্য দলে গিয়ে তাঁর এবং দলের শৈল্পিক বা দার্শনিক সাযুজ্য সংগতভাবে রক্ষা করতে পারবেন কী করে? সম্ভব? যদি তা সম্ভব হয় তাহলে বুঝতে হবে সেই ব্যক্তি-শিল্পীর নিজস্ব দল এবং যে দলে কাজ করলেন এ-দুটির আদর্শ এবং প্রকাশভঙ্গি অভিন্ন। কিংবা নাম মাত্র ভিন্নতা আছে। সেক্ষেত্রে এ-দুটি দল এক হয়ে গিয়ে বলিষ্ঠতর, সমৃদ্ধতর নাট্য সংগঠন হওয়া উচিত। এখানে তা কিন্তু হয় না! আসলে হুজুগে মেতে, কতকগুলি বিরোধী আদর্শের জটলায় বাজার গরম রাখার ঝোঁক বোধহয় আমাদের থিয়েটারে এসেছে। হুজুগ না হলে ক্যালকাটা রেপার্টরির মতন সংগঠন (নামটা ঠিক লিখলাম কিনা জানি না। যাঁরা জার্মানি থেকে ফ্রিৎজ বেনেডিৎজকে আনিয়ে ব্রেখটের গ্যালিলিও নাটকের প্রযোজনা করে তুলকালাম করেছিলেন) অভিজ্ঞ, বিজ্ঞ নাট্যরথীদের উপস্থিতিতেও হাওয়ায় মিলিয়ে গেল কেন? এটা ভাববার কথা। আমরা কতটা আমাদের থিয়েটারের জন্য আর কতটা আমাদের নিজেদের আখেরের জন্য নিবেদিত প্রাণ? প্রসঙ্গে ফিরে আসি: এই যে দলে দলে ঘুরে-ঘুরে নাট্যচর্চার খেলা, এটাতে দলগুলিরই ক্ষতি হয় বেশি। যেহেতু একটু দক্ষ শিল্পীদেরই দল এভাবে বাইরে থেকে আনে, ফলে সেই শিল্পীর আর-আর সমস্ত কমিটমেন্টকে রক্ষা করেই দলকে নিজের রুটিন ঠিক করতে হয়। এর ফলে দলের অস্তিত্বের মূলে শেকড়ে চিড় ধরে। দলের মধ্যে দু-চারটি ডেডিকেটেড কর্মী থাকেন, হতে পারে তাঁদের হয়ত ক্ষমতা কম (আবার ক্ষমতাসম্পন্ন নট বা নাট্যকর্মী হয়েই তো সবাই আসেন না প্রথমটায়। পর্বে-পর্বে ক্ষমতার উন্মোচন হয়), বাইরের কারুর সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে দলের নিয়মানুবর্তিতার শৈথিল্য তাঁরা ব্যক্তিগত অসম্মান হিসাবে নেন—এটাই পার্টিজান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। অসন্তোষ জমতে থাকে, অনেক অশান্তি সৃষ্টি হয়। মাঝের থেকে কাজটা গোল্লায় যায়। এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন আমাকে হতে হয়েছে দীর্ঘকাল পরে যাত্রা থেকে ফিরে, অন্যদলের হয়ে নাট্য প্রযোজনা করতে গিয়ে। এই মানসিক অশান্তির ফলে আমায় "চরণদাস এম এল এ" এবং "নৌটঙ্কীলাল" নাটক সার্থক রূপায়ণ সত্ত্বেও তুলে নিতে হয়। কারণ সেই দলের পছন্দ আমার সঙ্গে মেলেনি। অথবা উল্টোটা। এর জন্যেই আমি শুরুর থেকেই আমার নিজের দলের

ছেলেরা, যত কমই ক্ষমতা থাক, তাদের নিয়েই কাজ করেছি। ব্যর্থ বা হতাশ যে খুব একটা হতে হয়েছে তা নয়। যেহেতু আমাদের এখানে নাট্যাভিনয়ের বিষয়ে সুষ্ঠু কিংবা কাজ চালানো গোছের শিক্ষিত শিল্পীদল পাওয়া যায়নি, পাইনি। তখন যাদের পেয়েছি, তাদের নিয়ে কাজ করতে-করতেই নিজেকে তৈরি করার পর্বে যা-যা শিক্ষা পেয়েছি, বা চর্চা করে উপকৃত হয়েছি, তাই দিয়েই তাদের স্বর-প্রক্ষেপণ, উচ্চারণ, অঙ্গ-সঞ্চালন, নাট্যতত্ত্ব এবং তথ্য, নাট্যপাঠ এই সবের শিক্ষায় যতটা পারি শিখিয়ে তৈরি করেছি। তবে মাস্টারমশাইয়ের মতো ছড়ি হাতে ক্লাস করে না। হাল্কা মেজাজে, মহলার মধ্য দিয়ে। এইভাবে নাটক শেখাতে অনন্যসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী এক-জনকেই জানি, তিনি আমার শিক্ষক—উৎপলদা! কাজেই তাঁরই শিক্ষাদান পদ্ধতিটা আমি আমার মতো করে ভেঁজে নিয়ে ব্যবহার করেছি। সার্থকতাও পেয়েছি। নাট্যচর্চার সব ছাত্ররাই যদি তাদের শিক্ষকের গুণাবলি নিজেদের মধ্যে অর্থাৎ চেষ্টা করত—যান্ত্রিক-ভাবে নয়, সজ্ঞান সপ্রতিভায়, তাহলে আমাদের নাট্যআন্দোলনের বড় উপকার হতো! মুশকিল হচ্ছে সেই পুরনো কথা : 'গুরু মিলে লাখে লাখ—চেলা নেহি মিলে এক।' সবাই জানুক বা না জানুক, বলতে উদগ্রীব, শুনতে চাওয়া বা শোনার ধৈর্য একেবারেই নেই। এটা বোধহয় সমকালীন অস্থির সামাজিক-রাজনৈতিক যুগের অবদান। সবাই বড় অসহিষ্ণু হয়ে উঠছি। কেউ কারুর কথা শুনতে চাইছি না, পরস্পরকে বুঝতে বা জানতে চাইছি না। সেই সাতের দশকের গোড়ার দিকে আমাদের সমকালীন থিয়েটার কর্মীদের মধ্যে দল-মত-বয়স নির্বিশেষে থিয়েটারকে মাঝখানে রেখে সহজভাবে মত বিনিময়ের সেই গভীর আড্ডাগুলি শ্যামবাজার কফিহাউস বা পবিত্রপাঞ্জাব কিংবা কফিহাউস ঘিরে গড়ে উঠেছিল। পারস্পরিক আত্মীয়তাবোধ এবং অভিজ্ঞতার লেন-দেনের একটা সত্যিকারের প্রাণের উত্তাপ ছিল। সেটা বোধহয় ইদানীং হারিয়ে গেছে। থিয়েটার কর্মী এবং সচেতন থিয়েটার-বোদ্ধাদের ওই আড্ডাগুলি আমাকে অনেক কিছুই দিয়েছে। যা নিয়ে, যা সম্বল করে, অনেকদূর পর্যন্ত হাঁটবার রসদ পেয়েছি। শ্রদ্ধেয় মোহিত চট্টোপাধ্যায়, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র, বিভাস চক্রবর্তী, অলোক মুখার্জি, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, মমতা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বহু থিয়েটারকর্মী আজ এখনও আমার কথাগুলির পক্ষে সাক্ষ্যদান করতে পারেন। এখন কোথাও এমন আড্ডা খুঁজে পাই না। পুরনো মানুষরা হয়ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন নানা কাজে, আরও গুরুতর দায়িত্ব পালনে। কিন্তু নতুনরা কোথায়? যাঁরা এ থিয়েটারকে ভবিষ্যতে বয়ে নিয়ে যাবেন তাঁদের সেই পরস্পরকে জানা-বোঝার সম্মেলক আড্ডা দেখি না কেন? ভাববার কথা! এই রকম আড্ডায় মনের যন্ত্রণা প্রকাশের ছটফটানিতে রচিত হয়েছিল, "কলকাতার হ্যামলেট", সাতের দশকের সূচনার দামাল দিনগুলির নৃশংস থাবায় নিহত হলেন সত্যেনদা। সত্যেন মিত্র। থিয়েটার ওয়ার্কশপের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, এক আদর্শনিষ্ঠ থিয়েটার কর্মীর প্রতিবাদহীন হত্যায়, প্ররোচিত হয়েছিলাম ওই নাটক লিখে প্রযোজনা করতে! ওই প্রযোজনাই সি পি এ টি-কে সাবালকত্বে প্রতিষ্ঠিত করে। তারপর একের পর এক

রজত ঘোষের "নরমেধ", আমার লেখা "১৭৯৯" (এ নাটক আগে মিনার্ভা কর্মীসংসদ প্রযোজনা করেছেন আমাকে দিয়ে—১৯৭২, ৭ ডিসেম্বর বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবর্ষ পূর্তিযাপনের জন্য), নর্ম্যান বেথুনের জীবনী অবলম্বনে এক ডকুমেন্টারি থিয়েটার প্রয়াস "মৃত্যুহীন প্রাণ" প্রভৃতি ! এরপর ব্রেখটের "ককেশিয়ান চক সার্কল" (খড়িমাটির গণ্ডি) নাটকের সুদীর্ঘ মহলার পর—মঞ্চায়নের একদিন আগে থিয়েটারি দলীয় রাজনীতির বলিতে প্রযোজনাটির মৃত্যু ঘটে। আমিও সিপিএটি ত্যাগ করি। ১৯৭৫ সালে। এ প্রসঙ্গে পরে আসছি। ঘটনাটিতে নিহিত আছে আমাদের গ্রুপথিয়েটার আন্দোলনের সাংগঠনিক ভয়াবহতার একটি গভীর দিক।

"কলকাতার হ্যামলেট" থেকে আমি মোটামুটিভাবে নিজের মঞ্চ এবং নাট্যভঙ্গির একটি ভাষা, বা প্রকরণগত আঙ্গিক খুঁজে পেতে শুরু করি। ওই ভাষাতেই ঘুরে-ফিরে নানান ছন্দে লয়ে এতাবৎ আমার থিয়েটার করে গেছি, বা এখনও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ওই প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্যকে আরও এগিয়ে নিতে গিয়ে কখনও হোঁচট খেয়েছি, কখনও সামান্য সার্থকতা পেয়েছি। এর সূচনা কিন্তু চোয়াড়বিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত "১৭৯৯" নাটকের মিনার্ভা-প্রযোজনা থেকে। নাটক হিসাবে এটি অনেক কাঁচা, কাব্যিক কিন্তু এর অন্তর্নিহিত তাজা ভাব এবং বক্তব্যের সুষ্ঠ প্রকাশের আবেগতাড়িত আকুলতা একে অন্য মাত্রা দিয়েছিল। এর মধ্যে নাচ-গান-যুদ্ধ-আচার-সুর ইত্যাদির সংমিশ্রণ এবং নির্মল গুহরায়ের মঞ্চ গঠন, হেমাঙ্গদার সুর সব মিলে একটা অন্য ধরনের থিয়েটারের মাদকতা দর্শকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। অন্তত সর্বভারতীয় নাট্যসমালোচকদের লেখা এবং দর্শকদের প্রতিক্রিয়া থেকে এটা আমার মনে হয়েছে। এই নাটকে কোনও নামজাদা বা অর্ধ-নামজাদা পেশাদার শিল্পী ছিলেন না। বিভিন্ন গ্রুপের (স্বল্পখ্যাত বা তখন অখ্যাত) অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়েই এই নাটক প্রযোজিত হয়েছিল। নাটকটির বহু অখ্যাত শিল্পীই পরবর্তীকালে গ্রুপথিয়েটার আন্দোলনের প্রতিষ্ঠিত নাম হয়ে দাঁড়ান। আসলে আমাদের সেই পুরনো স্পার্টান ডিসিপ্লিনকে সবাই শেকল ভাবেনি। নিজের কর্তব্য বিধায় মন প্রাণ ঢেলে কাজ করেছিলেন। প্রায় পঞ্চাশ জনের বেশি শিল্পী এবং মিনার্ভার অনতিক্রম্য অভিজ্ঞ নেপথ্য মঞ্চকুশলীরা। যাঁরা যে কোনও দেশের মঞ্চের গর্ব বিবেচিত হতে পারতেন। কিন্তু এই পোড়া দেশে অনাহারে-অর্ধাহারে, অবহেলিত হয়ে যাঁরা একে-একে চলে গেছেন, যাচ্ছেন—মৃত্যুর দেশে ! অশ্বিনী সর্দার, তিনকড়িদা, সুধাদা, বড় কালীদা, কালাচাঁদ, রঙ্গু (বিখ্যাত মঞ্চ-সূত্রধর রঙ্গলাল শর্মা), শ্রীপতি দাস (ধ্বনি প্রক্ষেপক)—এঁদের মতন স্টেজ টেকনিশিয়ানরা জানি না এদেশে আর তৈরি হবে কি না। এঁদের অনেকেই আজ আর নেই। যতদিন থিয়েটারের সঙ্গে এতটুকু যোগ থাকবে, এঁদের স্মৃতি আমার পাথেয় হয়ে থাকবে। প্রেরণা জোগাবে।

"কলকাতার হ্যামলেট" থেকে আমার প্রযোজনার যে নবযাত্রা শুরু হয় সেই যাত্রায় কটি জিনিস আমি মঞ্চে চেষ্টা করে গেছি এবং যাচ্ছি। যেহেতু আধুনিককালে পারফর্মিং

আর্ট হিসাবে সিনেমা এবং অধুনা টেলিভিশন ক্যামেরার চোখ দিয়ে অদ্ভুত গতিতে দৃশ্যাবলি এবং ঘটনাবলিকে উপস্থাপিত করে সমকালের জীবনের গতির দ্রুতির পরিপূরক হয়ে উঠেছে এবং দর্শক সাধারণ ওই গতিময়তায় অভ্যস্ত হচ্ছেন, হয়েছেন, কাজেই থিয়েটারের আকর্ষণে ওদের বাঁধতে গেলে ওই গতিময়তায় থিয়েটারকেও আনতে হবে। যেহেতু থিয়েটার জীবন নয়, জীবনের অনুকৃতি—রসাশ্রিত ভাবানুকৃতি, তাই ন্যাচারালিস্টিক বস্তুনিষ্ঠ সজ্জায় থিয়েটারের বাঁধা পড়া চলবে না! আভাসে, রঙ-মাত্রা-ছন্দে দৃশ্যকে ছায়ায়-আলোয় মায়াময় করে, মঞ্চে ঘটমান দৃশ্যের অন্তরের ভাবটিকে প্রকাশিত করে, নিমেষে ঘটনান্তর এবং দৃশ্যান্তরে চলে যাওয়া। সেই হিসাবে আলোর ভূমিকা এখানে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অবশ্যই এটা আমার প্রযোজনা-ভাবনার কথা বলছি। প্রায় চলচ্চিত্রের গতিতে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে চলে যাওয়া। আমার এই ভাবনাগুলি কখনও মঞ্চে ঘটতে দেখতাম না, যদি প্রবাদপ্রতিম-অগ্রজতুল্য তাপস সেন আমা-হেন অর্বাচীনকেও তাঁর ব্যক্তিগত স্নেহ-সহানুভূতি এবং সক্রিয় সহযোগিতা না করতেন। তাপসদা শুরু থেকেই আমার ডাকে এসেছেন এবং যথার্থ আলো নাকি ছায়ার-মায়ায় আমার প্রযোজনাগুলিকে অর্থবহ করে তুলেছেন। এত দুর্যোগ দুর্দিন পার হয়ে এসে আজও যাঁরা আমাকে বা আমার থিয়েটার ভাবনাকে অম্লান বদনে আশকারা জুগিয়েছেন বা জোগাচ্ছেন, তাপসদা তাঁদের অগ্রণী। ওঁর ঋণ শোধ করা আমার কেন, আধুনিক বাংলা নাট্য আন্দোলনের কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। একটা অসামান্য আলোক-মুহূর্তের কথা বলি : "কলকাতার হ্যামলেট"-এর প্রেলুডে যখন মরণ থেকে জেগে ওঠা রক্তাক্ত অভী তার অতীতের কথায় ফিরে যাচ্ছে এবং ধীরে-ধীরে একটা 'Chime'-এর তালে-তালে তাদের মহলাদানরত সহকর্মীদের নিয়ে মহলা ঘরটা ভেসে উঠেছে—অভী এবং দ্বিতীয় মাতাল মঞ্চের এক্সট্রিম ডাউন লেফটে, আলো ওদের মুখে ধরা, বাকি মঞ্চের গাঢ় অন্ধকারে রাধা এবং অন্যান্যরা আপ সেন্টার রাইটে পজিশন নেয়। অভীর কথার সঙ্গে-সঙ্গে তাদের ওপর আলো নিভে আসে এবং একই সঙ্গে মহলার সঙ্গে রাধাকে সেন্টার করে মঞ্চের ওই অংশ আলোকিত হয়। এটা অনেকবার অনেক সিচুয়েশন, অনেক নাটকে দেখেছি। মিনাভায় হচ্ছে রিহার্সাল। নিটোল অপারেশন। তবুও তাপসদা হঠাৎ 'দাঁড়া দাঁড়া' বলে ছুটে এলেন! কী ব্যাপার? উনি একটা প্লাইউডের টুকরো নিয়ে একনম্বর লাইটপার্চে গিয়ে বললেন, 'ওই জায়গাটা আবার কর।' করা হল। একই অপারেশন। কেবল রাধাদের জোনের আলোটা আগেই অন করে প্লাইউডে ঢাকা। 'Chime'-টার তালের লয় ধরে ওই শুকনো কাঠের টুকরোটা উনি একটা সার্কুলার মুভমেন্টে নিচ থেকে ওপরে তুললেন। সেই একই আলো! কিন্তু ছায়াটাকে পর্দার মতন সরিয়ে যেন ময়ূরের পেখম ছড়ানোর মতো আলোটা ধীরে ছড়িয়ে পড়ে। মনে হল মৃত্যুর অন্ধকার থেকে অভীর জীবন-নাট্যের ওপর পর্দাটা খুলে গেল, ঈশ্বরের জাদুকরী ছোঁয়ায়! অপূর্ব। শুধু এইটুকু মোচড়। একটা শুকনো কাঠে শিল্পীর ছোঁয়ায় ছায়ার মায়া। দৃশ্যটার শব্দ-অর্থ-রঙ-রূপ

মুহূর্তে চলে যায় অন্য স্তরে। এমন অসংখ্য অভিজ্ঞতা ছড়িয়ে আছে পরতে-পরতে। এই হলেন তাপস সেন। তাপসদার আলোকসম্পাত-সৃজন দেখা যে কোনও মঞ্চ-শিক্ষার্থীর জীবনের অমূল্য সম্পদ। এই তো সেদিন (১৯৯০, অক্টোবর), আমার নিজের দল—'দেশকাল নাট্যমণ্ডলে' "মরশুমের একদিন"-এর প্রযোজনায় অন্ধকার নদীর বুকে নৌকা বেয়ে রাতের আঁধার পার হওয়ার দৃশ্য। একটু আগেই যে পাটাতনে যাত্রার দৃশ্য বা গুদামে যাবার রাস্তার দৃশ্য হয়েছে একটু আলোর মোচড়ে তা হয়ে ওঠে আঁধার নদীতে ভাসমান নৌকা। মাঝির গানের লয়ে নৌকা দুলতে-দুলতে চলে। পারের উঁচুতে দাঁড়িয়ে হ্যারিকেনধারী লোকেরা নৌকাকে বিদায় জানাচ্ছে। জলও নেই নৌকাও নেই, মঞ্চের পুনঃসংস্থাপনও নেই অথচ ফিল্মের গতিতে সমস্ত দৃশ্য এবং মুডের পরিবর্তন হয়ে যায়। আমাদের দেশে ভাল লেনস পাওয়া যায় না, আলোর উজ্জ্বলতা নড়বড়ে ভোল্টেজের জন্য সবসময় ঠিক রাখা যায় না, মঞ্চ থেকে মঞ্চান্তরে অভিনয়ের ক্ষেত্রে সঠিক আলোক সংস্থাপনের নানান অসুবিধে। তা সত্ত্বেও অনেক ভাল-ভাল কাজ হচ্ছে—হয়েছে। এগুলি মানানসই ও মনোমতো হলে আরও ভাল হতো।

আমার প্রযোজনার ভাষায় আমি মঞ্চের হরাইজন্টাল প্লেনের সঙ্গে প্রসেনিয়ামের ভার্টিকাল প্লেনটাকে নানাভাবে খেলাতে চেয়েছি। এতে দৃশ্যগত একঘেয়েমি যেমন অনেকটা কাটে তেমনি চকিতে ফ্লোর লেভেল থেকে হায়ার লেভেলে দর্শকের দৃষ্টি সরিয়ে এনে এক ধরনের গতি নাট্য প্রযোজনায় আনা সম্ভব বলে মনে করি। তা ছাড়াও এই যে স্তরে-স্তরে ডাইনে-বাঁয়ে দর্শকের একাগ্রতা ভেঙে দিয়ে তাকে ফিজিক্যালি বিরক্ত করে নড়ানো—এর ফলে নাট্যের প্রসঙ্গে ইমোশনালি ডুবে যাওয়া থেকে দর্শকদের ঝাঁকি দিয়ে সচেতন রাখার একটা প্রয়াস পেয়েছি। ব্যক্তিগতভাবে আমি সবসময়েই চেয়েছি আমার প্রযোজনায় দর্শক কেবলমাত্র ইমোশনের দয়ে না মজে সচেতন বিচারক হয়ে বসে থাকুন।

কাঠের দাম ঊর্ধ্বমুখি। কাজেই নানারকমের পাইপ স্ট্রাকচার ব্যবহার করে সস্তায় বাঞ্ছিত এফেক্ট তৈরির প্রয়াসও করা গেছে। তাছাড়া চট, পেপার পাল্প ইত্যাদির ব্যবহার। আমি প্রযোজনায় বাইরের অর্থ আনতে কোনওদিনই পক্ষপাতী নই। এর জন্য প্রযোজনার অর্থ সংগ্রহ করতে দলের সবার খুব কষ্ট হয়েছে বটে কিন্তু প্রযোজনার প্রতিটি প্রকরণের সঙ্গে দলের সদস্যদের অধিকারবোধ এবং আত্মীয়তাও অনেক ঘনিষ্ঠতর হয়েছে। নাটকের প্রপার্টি, রিকুইজিশন ইত্যাদি আজও যতটা পারা যায় নিজেদের হাতে-হাতে গড়ে নেওয়ার ব্যাপারে আমি দৃঢ়মত পোষণ করি। এর ফলে গোটা সঙ্গতির বাধা অতিক্রম করতেও এই কৃচ্ছ্রসাধন অনেক নতুন-নতুন পথ এবং অর্থবহ সৃজন ঘটায় প্রযোজনায়। "রাংতার মুকুট" প্রযোজনায়—রাণা প্রতাপবেশী হাবিলদার ভাঙা ঝুল ঝাড়ার বর্শা কিংবা ভাঙা ছাতার তলোয়ার, ফেলে দেয়া বেতের চুবড়ির ঢাল কিংবা বাচ্ছাদের খেলনা ভূতের মুখোশের মুকুট এর

প্রকৃষ্টতম উদাহরণ! আমার "লোহার নূপুর" (১৯৭৬, ওয়ার্কার্স থিয়েটার), "রাংতার মুকুট" (১৯৮০, থিয়েটার ফ্রন্ট) "এ মহাজাগরণ" (১৯৮১ থিয়েটার ফ্রন্ট), "রঙের গোলাম" (১৯৮২, যান্ত্রিক), "হুকুমনামা" (১৯৮৩, যান্ত্রিক)-প্রভৃতি নাট্য-প্রযোজনাগুলিতে আমার প্রয়োগতত্ত্বের নিদর্শন বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে। বাইরে থেকে আনা অনুদান অথবা এই জাতীয় সহজপ্রাপ্য অর্থ কোথাও না কোথাও সংগঠনের শিরদাঁড়ায় একটা চাপ দেয় যার ছায়াপাত ঘটে প্রযোজনায়। থোক টাকা কোথা থেকে আসছে বা আসবে এই চিন্তাটা দলের প্রোডাকশন চ্যালেঞ্জকে থিতিয়ে দিয়ে ভোঁতা আয়েসি করে। সত্যিকথা বলতে কী আমাদের এই প্রযোজনাগুলিতে অর্থের একটা ভূমিকা থাকলেও নিয়ন্ত্রক ভূমিকা যতদিন ছিল না বা নেই ততদিন এই থিয়েটার প্রাণময় থাকবে। তা নাহলে কোনও নাটকের সাকসেসের মোহে মজে দর্শকের পর দর্শক হিচড়ে নিয়ে গিয়ে চর্বিত-চর্বণ করা ছাড়া পথ নেই। তাতে প্রতিষ্ঠা বাড়ে বটে তবে প্রতিষ্ঠান প্রাণহীন হয়ে পড়ে। নতুন সৃষ্টির উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে যায়। একটা সাকসেস ভাঙিয়ে জীবন কাটাতে হলে গ্রুপ থিয়েটার কেন, ব্যবসায়িক থিয়েটার হোক! পয়সা ঢেলেছি কাজেই এই প্রযোজনা থেকে যতদিন পয়সা পাব তাকে চটকে খাই : এ মানসিকতা এবং ব্যবহার সেক্ষেত্রে দোষণীয় নয়। আমাদের গ্রুপ থিয়েটারেও আমরা অনেকেই বোধহয় এমত মানসিকতার শিকার হয়েছি। কাজেই আমাদের প্রাণ মরছে। তাছাড়া এই সাফল্যের মোহ একটা গ্রুপকে কীভাবে ধ্বংস করে বার বার দেখছি।

একটা গ্রুপ যখন ধীরে-ধীরে বড় হয়, তাকে ঘিরে অনেক মানুষ জড়ো হন। সংগঠনও তখন লোকবল এবং তজ্জনিত অর্থবলে বলীয়ান হতে চায়। ইতিমধ্যে গ্রুপের এক-আধটা প্রযোজনা যদি 'লেগে' গিয়ে থাকে তো কথাই নেই। কত রকমের মানসিকতা এবং উদ্দেশ্য নিয়ে যে অজস্র সদস্য হাজির হন তা ভুক্তভোগী মাত্রেরই জানা : এঁদের মধ্যে কেউ-কেউ থাকেন যাঁরা প্রযোজনার কাজে ততটা আগ্রহী নন যতটা আগ্রহী সংগঠন পরিচালনার অন্যান্য বিষয়ে। অর্থকরী এবং সামাজিক সামর্থে প্রায়শই এই মাতব্বররা বেশ চৌকস এবং হাসি-হুল্লোড়ে অনেকেরই মনের মানুষ হয়ে ওঠেন এবং ক্রমশ এঁদের হাত ধরে নেতৃত্ব-বাসনা পূরণে আগ্রহী কিছু উঠতি আধা ক্ষমতার সদস্যরাও সোচ্চার হয়ে ওঠেন, ফলে তখন মূর্তিটির চেয়ে চালচিত্র বৃহত্তর প্রাধান্য পেতে চায়। নিত্যদিনের খুঁটিনাটি নিয়ে খটামটি শুরু হয়। দলের আসল কাজ অর্থাৎ প্রযোজনা চুলোয় যাক কে কত বড় মাতব্বর এবং দলীয় সংবিধান বিশেষজ্ঞ সেটা প্রমাণ করতে এবং প্রযোজনার কর্ণধারকে হেনস্থা বা হেয় করতে আদাজল খেয়ে লেগে যান। ফলে দলের মধ্যে উপদলীয় কোঁদল, কাদা ছোড়াছুড়ি ইত্যাকার মধ্যবিত্ত কেচ্ছার ডামাডোলে নাট্যসরস্বতীর বিসর্জন ঘটে যায় অলক্ষ্যে। কিন্তু একটি দল থেকে সত্যিকারের পূর্ণক্ষমতায় যদি কোনও স্রষ্টার, থিয়েটারের নতুন দিকদর্শক কোনও প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে তবে তাঁকে ঘিরে আর একটি নতুন দল গড়ে ওঠা থিয়েটারের পক্ষে স্বাস্থ্যকরই

মনে করি। পুরাতনের পক্ষচ্ছায়া থেকে নতুনের আগমন ঘটুক। স্বাগত জানাই। আর একটা অঘটন ঘটে—দলের পূর্ববর্তী কোনও হিট প্রযোজনা থাকলে কৌশলে চাপ সৃষ্টি করা, যাতে ওই মডেলেই পরবর্তী প্রযোজনা হয়। কারণ ঝুঁকি কম। এইসব আনপ্রোডাক্টিভ ননপ্রোডাকশনাল অফিসিয়াল দাদারা একই সঙ্গে সাপের গালে এবং ব্যাঙের গালে চুমু খেয়ে বহু তন্নিষ্ঠ নাট্য সংগঠনের সুস্থ অস্তিত্বের বারো বাজিয়েছেন, এই ব্যক্তিরাই নাট্য আন্দোলনের কেশর ফোলানো উদ্দাম বুনো ঘোড়াটাকে 'ঝুঁকি', 'পুঁজি', 'সাকসেস' ইত্যাকার লাগামে বেঁধে প্রায় হিসেবি ধুরন্ধর ব্যবসায়ী করে তুলতে পেরেছেন। সেই ধুরন্ধরপনার চাক্ষুষ প্রমাণ দেখি কিছু প্রাপ্তিযোগ ঘটবে বলে আদর্শ-বিগর্হিতভাবে বিগলিত উৎবাহু নৃত্যে শামিল ডানাভাঙা কত ইকারুসকে। যারা সদম্ভে সূর্য শিকার করবে বলে মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডকে আক্রমণে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু ধুরন্ধর বিচক্ষণতার ভারে আজ বিদ্রোহী-উদ্দাম পক্ষ-বিধুনন ভাড়াটে পাখাবরদারের 'পাখা-নাড়া'য় পর্যবসিত। 'এ আমার-এ তোমার পাপ' আমরা সবাই মিলে তিলে-তিলে এই ভুল, এ অন্যায়ের পঙ্কে নিমজ্জিত হয়েছি, আমাদের থিয়েটারের টানটান শিরদাঁড়াটাকে দয়ে মজিয়েছি। ফেরার উপায় আছে কিনা ভাবতে হবে। যদি পথ থাকে ফিরতে হবে। কীভাবে জানি না। সিরিয়াস ন্যাটকর্মীরা বসুন, সহনশীলতার সঙ্গে পরস্পরের মতামত বিনিময়ের পথ সন্ধান করুন। নইলে উত্তরকাল ক্ষমা করবে না। যেহেতু পূর্বকথিত ওই সব ক্ষমতালোভী দাদাদের প্রোডাক্টিভ কোনও ক্ষমতা নেই অথচ একটি সফল গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত হলে 'আমি অমুক দলের তমুক' বলে আজকাল অনেক ক্ষেত্রে সমীহ এবং সুবিধা পাওয়া যায়। কাজের নেশায় কাছাখোলা গরিব থিয়েটার-করিয়েদের এরা বহু সর্বনাশ করেছেন, ভবিষ্যতেও করবেন। এই সাংগঠনিক বিশেষজ্ঞদের থেকে সাবধান! এঁদের হাতে এবং এঁদের উপদলীয় চক্রের হাতে অনেকবার পেছন থেকে ছুরি খেয়েছি, এঁরা আমার অনেক রাতজাগা, রক্তঘামচোঁয়ানো চিন্তার ফসলে আগুন দিয়েছেন যার ফলে 'দল' বিষয়ে আমি খানিকটা যাকে বলে তিক্ত এবং অবিশ্বাসী হয়ে পড়েছি। যদিও মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, থিয়েটার তো আর একা করা যায় না। কিছু সঙ্গী মনের মতন অর্থাৎ কিনা সমমনস্ক সঙ্গীর প্রয়োজন হয়। চার-পাঁচজন একসঙ্গে হলেই তো একটা দল। দল সম্পর্কে আমার এই মানসিকতা। যে কারণে যখনই যে-দলে পেছন থেকে টান অনুভব করেছি, হাত জোড় করে পত্রপাঠ বিদায় নিয়েছি। থিয়েটার করাটাতে আমার অতলান্ত আগ্রহ আছে, দলের খুঁটি শক্ত করে বিখ্যাত হবার বিন্দুমাত্র বাসনা পোষণ করা, সেই ৭৬-এর সি পি এ টি ত্যাগের সঙ্গে-সঙ্গেই মুছে ফেলেছি। আমার থিয়েটার পরিক্রমা: 'ওয়ার্কার্স থিয়েটার', 'থিয়েটার ফ্রন্ট', 'যান্ত্রিক' 'থিয়েটার ক্যাম্প' কোনও ঘাটেই নোঙর বাঁধিনি। প্রায় নিরুদ্দেশ যাত্রা। শুধু থিয়েটারকে প্রতিমুহূর্তে নতুন করে পাওয়ার নেশা। পেশার টানে যাত্রা-টিভি-সিনেমা-ইত্যাদি মাধ্যমগুলিতে কাজ করেছি, করি। কিছু অর্থ এবং নামও পেয়েছি, পাই। কিন্তু মন

পড়ে থাকে সেই রামকেষ্ট ঠাকুরের গল্পের নষ্ট মেয়েটির মতো—মুড়ি ভাজছে গরম খোলায়, স্তন দিচ্ছে সন্তানকে, কিন্তু মন পড়ে আছে খিড়কির দোরে, কখন তার নাগর পুরুষ ইশারা করে। ঘুরে ফিরে সব মাধ্যমগুলি থেকেই টুকে-টুকে রোজগার করে রাখি থিয়েটারের জন্যে কিছু প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা। আমার থিয়েটারকে, কী করে তা সাজাব কিংবা থিয়েটারে আদৌ সেটা সাজে কিনা? কটা শো হবে ভাবি না। রিহার্সাল তো হবে? প্রতিটি রিহার্সালের মুহূর্ত আমার নতুন-নতুন সাজের নতুন-নতুন থিয়েটারি অভিজ্ঞতা প্রাপ্তির আলো। এর মৌজ যিনি না পেয়েছেন তাঁকে বোঝানো যাবে না। এ বড় মজার খেলা, মজবার নেশা! আদৌ প্রেক্ষাগৃহ পাব কিনা জানি না, পেলেও ক'দিন কীভাবে জুটবে জানি না, কারণ দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে গ্রুপ থিয়াটরের হালহকীকৎ-আদাবৎ-রেওয়াজ এত বদলে গেছে এ বয়সে তার সঙ্গে কতটা মানিয়ে নিতে পারব কে জানে। এই তো বছরখানেক আগে আকাদেমি মঞ্চে, যে মঞ্চ এক সময় আমার সর্বক্ষণের ঠাঁই ছিল, সেখানে প্রেক্ষাগৃহ পাবার কথা বলতে গিয়ে প্রশাসকমহাশয় স্পষ্ট বলে দিলেন 'নতুন লোকদের হল দেবার অসুবিধে আছে।' বসতে বলার সৌজন্যও দেখায়নি। এখন আমায় প্রমাণ করতে হবে আমি নতুন নই, পুরনো। কীভাবে প্রমাণ করতে হয় জানি না। তবে খালেদদা ঘটনাটা শুনে হেসে বলেছিলেন, 'এক কাজ করো জামা কাপড় ছিঁড়ে খুঁড়ে, চুল উস্কোখুস্কো করে ধুলোবালি মেখে তাঁর সামনে হাজির হও। বলো—এই দেখুন আমি কতো পুরনো।' সত্যি এছাড়া আমার প্রাচীনত্ব কিংবা পুরনোত্ব ও থিয়েটারি যোগ্যতা প্রমাণ করার পথ কই? থিয়েটার বলতে আমি বুঝি প্রসেনিয়াম থিয়েটার। সেই থিয়েটারের আদ্যোপান্ত চর্চা করেছি এতকাল ধরে, তা একটা প্রসেনিয়াম মঞ্চ সময়মতন হাতে না পেলে নিজের থিয়েটারটার যোগ্যতা প্রমাণ করব কী করে। খোলামাঠের থিয়েটার অন্য থিয়েটার। তার প্রকরণ এবং কিছু কিছু ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা থাকলেও সে আমার নিজের থিয়েটার কই? আমার থিয়েটারের ফ্রেমটায় আলো চাই, অন্ধকার চাই, মঞ্চপরিকল্পনায় নানান স্তর চাই, উইংস চাই, পর্দা চাই, ফ্লাই চাই, লাইট পার্চ চাই, সাউন্ড পার্চ চাই—সেই ছয়ের দশক থেকে যাতে অভ্যস্ত কাঠ চট লোহা রং সব মিলিয়ে নেপথ্য মঞ্চের প্রাণশৈলে করা যে সোঁদা গন্ধ সেটা চাই। হাউস না পেলে হল না পেলে কোথায়, কোথায় পাবো এসব? বছর দুই আগের কথা, কলকাতার সরকারি এক হলে নিয়মানুগ আবেদনের পর আবেদন করেও হল না পেয়ে কর্মকর্তাদের কাছে হাজির হলুম সশরীরে: 'কী মশাই, হল দেন না কেন?' ভদ্রলোক আমায় অনেকদিন থেকেই চেনেন, ভোলেনও নি, কাজেই পুরাতনত্বের প্রমাণ না চেয়েই কাঁচুমাচু হয়ে বললেন—'আপনার হল পেতে কোনও অসুবিধে হবে না। আপনি শুধু একবার মহাকরণে গিয়ে অমুকবাবুর সঙ্গে কথা বলুন।' মনটা ধনুকের ছিলার মতোন টান হয়ে উঠল ক্ষোভে, দুঃখে, বিতৃষ্ণায়। ফৈজ আহমেদ ফৈজের কবিতা মনে পড়ে গেল:

ইয়ে দাগ দাগ উজালা ইয়ে সব গুজেদা সহর,

জীসকে ইন্তেজার মে থা ইয়ে বো সহর তো নহী
ইয়ে বো সহর তো নহী জিসকে আরজু লেকে
চলে থেইয়ার সাথ সাথ
জো মিল জায়ে গী ক'হী ন ক'হী।'

এই আধা আলো-আঁধারির খাপছাড়া ভোর, যে উজ্জ্বল ভোরের প্রতীক্ষায় ছিলাম এ তো সে ভোর না ; এ তো সেই প্রভাত নয়, যার আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে বন্ধুরা একসঙ্গে যাত্রা শুরু করেছিলাম যাকে কোথাও না কোথাও পেয়ে যাব বলে।

"দিন বদলের পালা" থেকে পরিক্রমা শুরু করে পঁচিশ বছর পরেও যখন নিজের কানে শুনতে হল হল প্রাপ্তির জন্য ধর্না দিতে হবে মহাকরণে, চমকে উঠি দিন কি তাহলে বদলেছে? এ কেমন বদল। নাই বা করলাম থিয়েটার। আমি না করলে নাট্য-আন্দোলনের চাকা থেমে যাবে না কিন্তু, আমার অহং বা আত্মমর্যাদা বোধ বজায় থাকবে। একেবারেই মধ্যবিত্ত মানে বাংলায় থাকে বলে পাতিবুর্জোয়া ভ্যানিটি। শুধু আমি আমি এবং আমি। আদি-মধ্য-অন্ত-সবটাই আমি। অস্বীকার করে লাভ কি! আমরা পাতিবুর্জোয়া-মধ্যবিত্ত মধ্যচিত্ত ত্রিশংকুরা শুধু ভান করে গেছি, যাচ্ছি যে সাধারণ জনগন, তথা খেটে খাওয়া মানুষদের জন্য থিয়েটার করছি। সত্যিই কি করেছি? করছি? তাহলে সাধারণ মানুষের কাছে আমাদের এই থিয়েটারের স্থান কী! নিজেদের মনকে চোখ ঠেরে লাভ নেই, দীর্ঘ ১৪ বছর যাত্রায় অভিনয়ের সুবাদে গ্রামেগঞ্জে, হাটে-মাঠে ঘুরেছি, আমাদের জনগণের জন্য করা থিয়েটার সেখানে নেই। তারা মনোপলিস্ট ব্যবসাদার মালিকদের প্রযোজিত যাত্রা বা বায়োস্কোপের শিল্পী সমন্বয়ে ওয়ান ওয়ালের জগাখিচুড়ি দল বেঁধে দেখতে ছোটেন, আমাদের এ-থিয়েটার সেখানে যথাযোগ্যভাবে পৌঁছয়নি। যদি পৌঁছত তা হলে আমাদের থিয়েটার আরও সবল হয়ে মাথা উঁচিয়ে নিজেকে নিজের জোরে এগিয়ে নিয়ে যেত। থিয়েটার চালানোর দায়ে দানের জন্যে দোরে-দোরে ঘুরতে হতো না। আমাদের মধ্যেও কোনও-কোনও দলের কোনও প্রযোজনা লেগে গেলে ওরা ভাবেন এমনটাই চলবে। এটাই চলার নিয়ম। দলের লেজা থেকে মুড়ো পর্যন্ত চাল চলন পাল্টে যায়, একটা দাম্ভিকতা, নাক উঁচুভাব আসে—মধ্যবিত্তওয়ানার চূড়ান্ত প্রমাণ। তারপর যখন ব্যর্থতার সময় আসে হুড়মুড় করে তাসের প্রাসাদ ভেঙে পড়ে। আসলে মানসিক প্রস্তুতির অভাব। এই থিয়েটার নিয়ে শুধুমাত্র সফলই হয়ে যাব অথচ ব্যর্থতার ঝুঁকি নেব না এই মানসিকতা নিয়ে লড়াই-এর থিয়েটার করার জো নেই। আমাদের থিয়েটারে টান-টান সোজা মেরুদন্ডটা ছাড়া হারাবার কিছু নেই। নকলের মোহে মজে আমরা সেই একমাত্র সম্বল এবং সম্পদটাকেই দুমড়ে-মুচড়ে নানান কসরৎ দেখাতে মগ্ন হই। এতে জাতও যায় পেটও ভরে না। প্রযোজনাতেও পরে অনিবার্য ভাবে এর প্রতিফলন এসে যায়।

অথচ আমাদের এই থিয়েটারে উৎপল দত্ত, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র, দেবাশিস মজুমদার, চন্দন সেন—এঁদের মতো বলিষ্ঠ নাটকাররা আছেন। যাঁদের কলমের

একটু মোচড়ে আমাদের সস্তা চটকদার না হয়েও গভীর অনুভূতি নিয়ে, বোধ নিয়ে আপামর সাধারণ দর্শকের মন স্পর্শ করতে পারে। দীর্ঘদিন সফল-অসফল নানান ব্যবসায়িক পারফরমিং মিডিয়ার সঙ্গে কাজ করে দৃঢ়তার সঙ্গেই বলতে পারি ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সফলদের মধ্যেও ওঁদের সমতুল্য ক্ষমতা নেই। এবার মনে হয় আমাদের নাট্যকারদের সামাবদ্ধতার গণ্ডি ভেঙে গ্রুপ থিয়েটারকে ভিত্তি করেই ব্রিটিশ রেপার্টারির কেতায় পেশাদার সুস্থ থিয়েটার গঠন করা সম্ভব। নিশ্চয়ই সম্ভব—কারণ এখনও আমাদের এই থিয়েটারে বিভাস চক্রবর্তী, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, অরুণ মুখোপাধ্যায়, অশোক মুখোপাধ্যায়দের মতন প্রথম শ্রেণীর সংগঠক পরিচালকরা রয়েছেন। এঁরা যদি মনে করেন সুস্থ পেশাদার থিয়েটার গড়বেন তাহলে আমাদের থিয়েটারের রূপরেখা বদলে যাবে। নেশার সঙ্গে পেশার টান লাগলেই দীর্ঘদিনের অনেক আবর্জনা ঘুচে গিয়ে থিয়েটারের দুনিয়ায় নতুন ফুলের সৌরভ ছুটবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে কখনওই হতাশ হই না, হইনি অনেক সময় নানান বিসদৃশ কাণ্ড দেখে বিরক্তি হয়ত বা ক্রোধও হয়। কিন্তু হতাশ নই। আমাদের এই গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন একটা চালে চলে গতি হারিয়েছে, চাল ফেরালেই গতি এবং জীবনীশক্তি আবার উদ্দাম হয়ে উঠবে। পৃথিবীর যে কোনও আন্দোলনের ক্ষেত্রেই একথা সত্য। তবে চাল ফেরাবার মুহূর্তে সচেতন থাকা উচিত, নইলে ঘরের চালে আগুন লাগতে পারে। নতুনভাবে বাঁচার জন্য এটুকু ঝুঁকি তো নিতেই হবে। সকলের কাছে এখানকার সমস্ত থিয়েটার অনুরাগী কর্মীদের কাছে আমার একান্ত আবেদন: ভাবুন! নতুন করে ভাবুন! থিয়েটারের খোলা হাওয়ায় আবার বুক ভরে নিঃশ্বাস নিই। পুরনো দিনের মতোই না হয় প্রপ-বয় হয়ে আপনাদের সঙ্গে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াব।* □

---

* কথাটা শুনেই নিজের উরু চাপড়ে হাহা হাসিতে প্রায় ছাদ ফাটিয়ে 'যা বলেছেন মাইরি' বলে অজিতদা (অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়) তাঁর অননুকরণীয় প্রাণশক্তি ভরা বিশাল শরীরটাকে দমকে-দমকে কাঁপাতে থাকতেন আর শিশুর মতো উচ্ছল আভায় তাঁর মুখটা ভরে যেত। যেত-ই। অজিতদার প্রস্থান আমার থিয়েটারকে, থিয়েটারের ভাবনাগুলোকে ফাঁকা করে দিয়েছে। ওঁর অভাব আজ ভীষণ অনুভব করি। এই মুহূর্তে ওঁকে প্রয়োজন ছিল। আমাদের থিয়েটারে ওইরকম একজন কর্মীর একান্ত, একান্ত প্রয়োজন।

শিল্পের সত

খালেদ চৌধুরী

১ : ০

থিয়েটারে আসাটা অকস্মাৎই বলা যেতে পারে। কেন না, থিয়েটারে আসব, থিয়েটার করব কোনও দিনই আমার ভাবনার মধ্যে ছিল না। আমি মূলত চিত্রশিল্প এবং সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট ছিলাম। সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করত সংগীত। একেবারে ছেলেবেলায় আমার পাঠশালায় পড়ার দিনে একটা জিনিস দৃশ্যবস্তু হিসাবে ভীষণভাবে আমাকে আকর্ষণ করেছিল। আমাদের স্কুলের কাছেই একটা গ্রামে একবার নৌকা-পুজো হয়েছিল। নৌকাপুজো ব্যাপারটা হয়ত অনেকেরই জানা নেই। এটা এক ধরনের মানত। নৌকার আকৃতিতে বিশাল উঁচু একটা কাঠামো নির্মাণ করা হতো। তার দু দিকে দুটো গলুই-এর মতো জিনিস বানানো হতো। বিরাট আকার। ছেলেবেলায় তাকিয়ে দেখতে গিয়ে ঘাড়ে ব্যথা হয়ে যেত। তাতে ভূত, প্রেত, নানা অবতার আর দুর্গা প্রতিমা থেকে শুরু করে লক্ষ্মী সরস্বতী পর্যন্ত বহু দেবদেবীর মূর্তি থাকত। আর দুদিকে থাকত দুই রাখাল। এক বর্ধিষ্ণু চাষির মানত ছিল, তারই উদ্যোগে এই পুজোর শুরু। এক একটা করে মূর্তি তৈরি হয় আর উপরে বসানো হয়। আমি খবর পেয়ে গিয়ে দেখি অনেক মূর্তিই তৈরি হয়ে গেছে, জায়গা মতো বসানো হয়েছে আর কিছু মূর্তি তৈরি তখনও বাকি আছে। প্রচণ্ড কৌতূহল হল। রোজই মূর্তি গড়া দেখি আর স্কুল থেকে ফিরতে দেরি হয়ে যায়। বাড়িতে বলি, স্কুলে একসট্রা ক্লাস নিচ্ছে। ব্যাপারটা আমাকে এতই মুগ্ধ করেছিল যে ঘন্টার পর ঘন্টা আমি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতাম কীভাবে মূর্তি তৈরি হচ্ছে। দুপাশে দুটো তালিকা থাকত। রোজই ওটা একবার পড়া চাই। তাতে ভূত প্রেত থেকে শুরু করে অগ্নি বরুণ ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতাদের নাম লেখা থাকত। সমস্ত দেবদেবীর নাম আমাদের মুখস্থ হয়ে গেল। এমনকি দু দিকে দুই রাখাল বালকের নাম বলতে গিয়ে আমরা বলতামও 'রাখাল-রাখাল'। সেই মূর্তি-গড়া দেখে-দেখে একদিন বাড়িতে আমি মূর্তি বানানো শুরু করে দিলাম মাটি দিয়ে ছোট-ছোট নানা রকম মূর্তি বানিয়ে চলেছি। আমার তো কোনও ট্রেনিং ছিল না। যেমন-যেমন দেখেছি সেইভাবেই নিজে যতটা পারছিলাম চেষ্টা করছিলাম। অনেক মূর্তি বানিয়ে সারি-সারি সাজিয়ে রেখেছি। বাবা একদিন হঠাৎ যেতে-যেতে ওগুলো দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমার ছবি-আঁকা বা কিছু গড়ার কাজে বাবা সাধারণত কোনও আপত্তি করতেন না। এমনিতে বাবার সঙ্গে সম্পর্কটা খুবই খারাপ ছিল। কিন্তু এগুলোতে আপত্তি করতেন না। মূর্তিগুলো দেখে বললেন, 'এগুলো বানাবে না। এগুলো বানালে পুজো করতে

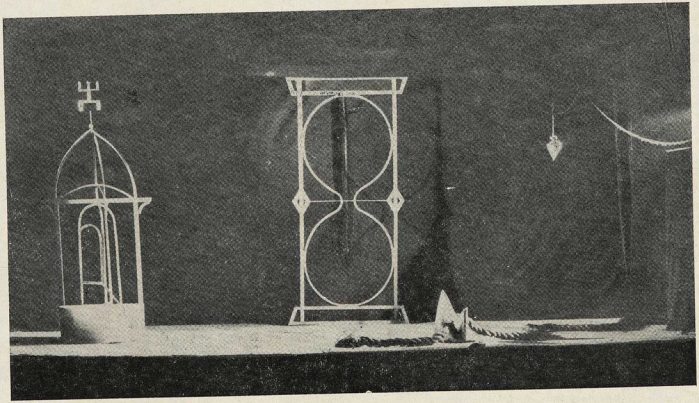

'কালের যাত্রা' ঃ খালেদ চৌধুরী কৃত মঞ্চসজ্জা।

হয়।' আমি ভাবলাম পুজো মানে তো দায়-দায়িত্বের ব্যাপার যেটা ওঁদের উপরে গিয়ে পড়বে। অতএব এগুলো বানানো উচিত নয়। সেইদিনই বন্ধ করে দিলাম। মূর্তি দেখে মূর্তি গড়া—এটাই আমার প্রথম ইনস্পিরেশন। অর্থাৎ ভিসুয়াল একটা জিনিসকে অনুকরণ করা। চোখের সামনে কীভাবে একটা মূর্তি তৈরি হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া স্কুলের ড্রইং ক্লাসে আমি বরাবরই এক নম্বর! মাস্টারের চেয়েও ভাল আঁকতে পারতাম। অন্যদের খাতাতেও এঁকে দিতাম। দেখা গেল, যে ছেলেটি আঁকতে আদৌ জানে না, সেও ভাল নম্বর পাচ্ছে। একদিন পরপর তিনটে খাতা দেখে মাস্টারের কেমন সন্দেহ হল। যে কোনদিনই আঁকতে পারে না, তার খাতাতেই সবচেয়ে ভাল আঁকা। আসলে পরপর এত এঁকেছি যে ওর খাতার ছবিটাই ভাল হয়ে গেছে। আমার খাতাটা আর না দেখেই আমাকে ডেকে কান ধরে দুটো চড় লাগালেন। বললেন, 'আর কখখনো কারও খাতায় আঁকবে না।' আমাকে জিজ্ঞাসাও করলেন না যে আমিই এঁকেছি কি না। এরপরে আমার জীবনের মোড় ঘুরে গেল। অন্যরকমের সমস্যা দেখা দিল আমার জীবনে। ফলে স্কুলের পরে আঁকার ব্যাপারটা আমার জীবন থেকে চলে গেল।

পরবর্তীকালে কীভাবে আবার এটা ফিরে এল তাই বলি। ১৯৩৮ সাল। তখন আমি বেশ বড় হয়ে গেছি। বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি। ছদ্মনামে আছি। তারপরে যুদ্ধ লাগল। এইসময় যুদ্ধের বাজারে সবাই টুকটাক কিছু কাজ করছে। আমিও মিলিটারির সাইন-পেন্টিং-এর কনট্রাক্ট নিয়ে ফেললাম। নানারকম ট্রাফিক-সাইন এঁকে দেওয়া, ট্যাংক, প্লেন রঙ করে দেওয়া, ক্যামোফ্লাজ কালার করে দেওয়া ইত্যাদি কাজ। লোক লাগিয়ে কাজ করতাম। আমার হাতের লেখা ভাল ছিল। লেটারিং-এর ক্ষেত্রে তাই আমার সুবিধা হল। আমি নিজে সাইন পেন্টার না হয়েও কাজটা যারা করে তাদের ডেকে বুঝিয়ে দিতাম কীভাবে কাজটা করতে হবে—কী জাতীয় টাইপ আঁকতে হবে। এইভাবে কিছু লোকের ধারণা হয়ে গেল যে আমি আর্টিস্ট। মফস্বল শহর তো!

এই সময় আমার এক মামারবাড়িতে আমি প্রায়ই যেতাম। এক ভদ্রলোককে আসতে দেখতাম ওখানে। নাম বিনোদবন্ধু দাস। উনি কমিউনিস্ট পার্টি করতেন। আমার মামাতো ভাইকে নানা কাগজ-পত্র দিতেন। 'জনযুদ্ধ' বা ওই জাতীয় কাগজ। ওখানকার কমিউনিস্ট পার্টি সবাই কিন্তু আগে কংগ্রেসি ছিলেন। সব খদ্দর পরতেন। পরে দু-একজন ছাড়া অধিকাংশই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। এই যে দলে-দলে সবাই কমিউনিস্ট দলে যোগ দিচ্ছেন এটা আমরা জানতাম মাত্র। ব্যক্তিগতভাবে আমার রাজনীতিতে তেমন আগ্রহ ছিল না, এখনও যেমন নেই। তবে খোঁজ-খবর সবই নিই। যাইহোক ওই বিনোদবন্ধু দাস একদিন আমাকে স্তালিনের একটা বড় ছবি এঁকে দিতে অনুরোধ করলেন। ছোট ভাইবোনেরা রয়েছে। আগে ওদেরকে ছবি আঁকা নিয়ে হয়ত বয়সজনিত বড়-বড় কথা কিছু বলেছি। তাই ভদ্রলোককে 'না' বলতেও

পারছি না। তাহলে তো ভাই-বোনেদের সামনে আর 'প্রেস্টিজ' থাকে না। ভদ্রলোককে বললাম, 'হ্যাঁ' নিশ্চয়ই এঁকে দেব।' দরজা-টরজা বন্ধ করে বড় একটা কাগজে চারকোল দিয়ে ছবিটা এঁকে ফেললাম। ভদ্রলোক ছবিটা নিয়ে চলেও গেলেন। পরে একদিন দুর্ভিক্ষের সময়ে এক প্রচার সভায় উনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। তখন চাঁদা তোলা চলছে, সমস্ত লোককে যে যা পারে তাই নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হচ্ছিল। সেই মিটিং-এ গিয়ে শেষ বেঞ্চে বসেছি। দূর থেকে অনেকগুলো পোর্ট্রেট দেখতে পেলাম। তার মধ্যে ছোট্ট সাইজের একটা স্তালিনের ছবিও ছিল। একজন নেতা উঠে এসে প্রথমে দুর্ভিক্ষের মোকাবিলায় সকলকে এগিয়ে আসতে অনুরোধ জানিয়ে তারপরে ছবিগুলোকে দেখিয়ে বললেন, 'এই স্তালিনের ছবি দেখে আপনাদের মনে হতে পারে যে এটা কলকাতার কোনও আর্টিস্ট-এর আঁকা। কিন্তু ছবিটা এঁকেছে আমাদেরই এখানকার একজন ছেলে।' বলে উনি আমার নাম ঘোষণা করলেন। শুনে তো আমার দারুণ রোমাঞ্চ হল। কিন্তু ভাবছি : আমি তো বড় ছবি এঁকেছি, এত ছোট ছবি কী করে আমার হবে? আসলে পারস্পেকটিভের কোনও ধারণা পর্যন্ত আমার ছিল না। বড় ছবিকে দূর থেকে দেখলে ছোট দেখানোর ব্যাপারটাই বুঝিনি। সেই সভায় তারপর সুন্দর চেহারার দুইজন পুরুষ ও একজন মহিলা গান শুনিয়ে মুগ্ধ করে দিলেন। ওঁরা ছিলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস, নির্মলেন্দু চৌধুরি ও শান্তা সেন। এই জাতীয় গান শোনার অভিজ্ঞতা সেই আমার প্রথম। অর্থাৎ শিল্প শুধু বিনোদন নয়, শিল্প যে একটা উদ্দেশ্যকে সফল করাতে পারে, গান-ছবি ইত্যাদি যে বিশেষ উদ্দেশ্যে কার্যকর হয়ে উঠতে পারে—এরকম একটা উপলব্ধি হল। তখন বিশ্বনাথ মুখার্জির সঙ্গে আলাপ হল। উনি খুব উৎসাহ দিলেন। কলকাতার লোকের প্রশংসা পেয়ে খুবই উৎসাহিত বোধ করলাম। এই সময় থেকেই লাগাতার ছবি আঁকা শুরু হয়ে গেল। ওঁরা থিম দিচ্ছেন, বুঝিয়ে দিচ্ছেন দুর্ভিক্ষের অবস্থা, মজুতদারি কাকে বলে ইত্যাদি। দুর্ভিক্ষ তো আমাদের ওদিকে ছিল না। তাই অনেক কিছুই জেনে বুঝে নিচ্ছিলাম। প্রকৃত অবস্থাটা আমাদের কাছে অকল্পনীয় ছিল। রেডিও, কাগজের মাধ্যমে যেটুকু জানতে পারছি। জয়নুল আবেদিন ও চিত্তপ্রসাদের ছবি ও সুনীল জানার ফোটোগ্রাফ দেখছি। এইসব দেখেশুনেই ভিতরে একটা আর্তি জন্মাল—একটা কিছু করা দরকার। কিন্তু আর্টের শিক্ষা তো আমি কোনও দিনই কারও কাছে পাইনি। তবু ওঁরা ধরেই নিলেন যে আমি সব জানি। আমিও আমার স্কুলে চিন্তায় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। মজুতদার আঁকতে গিয়ে অদ্ভুত একটা নখটখওয়ালা হাত ধানের আঁটি জাপটে ধরে আছে—এই সব ছবিতে চলে আসত। কিন্তু যেহেতু উদ্দেশ্য ছিল লোককে বোঝানো তাই প্রয়োজন থেকেই শিক্ষালাভ করতে থাকলাম। রঙ-টঙ ও হাতের কাছে যা পেতাম তাই ব্যবহার করতাম। থিম অনুযায়ী 'সিরিজ অব পিকচার্স' এঁকে যাচ্ছি তখন। নানা জায়গায় তার প্রদর্শনী চলছে। 'ফুড ক্রাইসিস' নিয়ে এমন একটা সিরিজ শিলঙে দেখানো হল। একটা সময়ে সুন্দরী

মোহন দাশের নাতনির বাড়িতে বসে এ ধরনের সিরিজের ছবি এঁকেছি। তবে রাজনীতির বা শিল্পের ধারণা আমার তখন পরিষ্কার ছিল না। তখন হেমন্ত দাশ, রাধিকা বল্লভ রায়চৌধুরি প্রমুখ শিল্পীদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। রাধিকাবল্লভ লোকসঙ্গীত গায়ক রণেন রায়চৌধুরীর দাদা। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরির ছাত্র। শিক্ষিত শিল্পী। ওঁরা যখন আমার ছবি দেখে ভাল বলতেন, তখন মনে হতো 'না, ছবি বোধহয় জাতে উঠছে।' প্রগতি লেখক শিল্পী সঙ্ঘের এক প্রদর্শনীতে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আমার আঁকা কিছু ছবি দেখেন। উনিও অনেক প্রশংসা করলেন। অজিত সিংহ ছিলেন গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলের পাশ করা শিল্পী। এক প্রদর্শনীতে আমার ছবিগুলি উনি সাজিয়ে দেন। তিনি বললেন, 'তোমার কলকাতায় যাওয়া উচিত।' আমার ছবির নানা গুটিও উনি ধরিয়ে দিতেন। কিন্তু কলকাতায় আসতে হলে টাকা চাই। ফার্নিচার ব্যবসায়ী এক ভদ্রলোক আমাকে বললেন যে ওঁর ফার্নিচারের ডিজাইনের একটি অ্যালবাম বানিয়ে দিলে আমাকে একশ টাকা দেবেন। উনি আমাকে পাঁচ-দশ টাকা হিসাবে দিয়ে যান আর আমিও সেটা খরচ করে ফেলি। শেষে এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির কাছে আমার কলকাতায় যাবার ব্যাপারটা শুনে বাকি চৌষট্টি টাকা আমাকে দিয়ে দিলেন। ওই পুঁজি নিয়ে কলকাতা চলে এলাম আর্ট স্কুলে ভর্তি হওয়ার বাসনায়। সেটা ১৯৪৪ সাল। অজিত সিংহ আমাকে নিয়ে গেলেন জয়নুল আবেদিনের কাছে। জয়নুল আবেদিন আমার অবস্থার কথা সব শুনে বললেন, 'থাক, তোমাকে স্কুলে যেতে হবে না।' আমি ভাবলাম বোধহয় টাকা দিতে পারব না কিংবা আঁকার মান ওঁকে সন্তুষ্ট করেনি এটাই কারণ। উনি কিন্তু প্রায়ই আমাকে প্রচুর কাজ দিতেন। ওঁর কাছে যে শিখছিলাম তাও নয়। উনি শুধু এটা-ওটা দিয়ে বলতেন, 'করে দাও তো।' পুজো সংখ্যায় ইলাস্ট্রেশন ইত্যাদি সেইসময় প্রচুর করেছি।

এরপরে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল। দেশভাগ হয়ে গেল। কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে রোজই যাতায়াত করছি—কাজও করে চলেছি। গোলাম কুদ্দুস দাঙ্গার পরিস্থিতিতে কিছু করতে পারি কিনা জানতে চাইলেন। আমি বললাম, রিলিফের কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় আমি সাংস্কৃতিক কাজ কিছু করতে পারি। নাসিরুদ্দিন রোডে ব্যারিস্টার লতিফের বাড়িতে কিছু লোক দাঙ্গাবিরোধী কোনও কাজ করা যায় কিনা সেই উদ্দেশ্যে জড়ো হতেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন রবিউদ্দিন, মোহায়মেন রোকেয়া কবীর, আবুল হাশেমের কন্যা প্রমুখ। ওঁদের সঙ্গে আলাপ হল। প্রস্তাব হিসাবে আমি বললাম, 'শ্যাডো প্লে করব'। এই 'শ্যাডো প্লে' নিয়ে ছোটবেলায় আমি একটা মজার খেলায় কিছুদিন মেতেছিলাম। গ্রামের অনেক ভিখারিরা এসে ব্যালাড-গান গেয়ে শোনাত। কোনও একটা করুণরস বা বীররসের আখ্যান নিয়ে এইসব ব্যালাড রচিত হতো। একটি কাহিনী ছিল : এক দামাল ছেলে জঙ্গলে যেতে চায়, মা কিছুতেই যেতে দেয় না। কিন্তু তার অ্যাডভেঞ্চারের নেশা—সে যাবেই। মাকে লুকিয়ে একদিন জঙ্গলে গিয়ে বাঘের কবলে পড়ল। বল্লম নিয়ে সাঙ্ঘাতিক লড়াই করেও শেষে সে মারা গেল। এই

রকম একটা গল্প। গানের কথাটা ছিল : 'মনাই যাইও না জঙ্গলের ধারে, বাঘে খাইব তোমারে, মনাই যাইও না জঙ্গলের ধারে'। এই মুখটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাওয়া হতো। যে ঘরে আমার জন্ম হয়েছিল, সেই আঁতুরঘরটাই ছিল আমার খেলার জায়গা। একটা ধুতি টাঙিয়ে, কুপি জেলে, কাগজ কাটা আকৃতি বানিয়ে তার ছায়া ফেলতাম। গান গাইতাম আর ছায়ারা পর্দায় নড়াচড়া করত। দর্শক ছিল মামাতো ভাইবোনের দল। সেই হল আমার 'শ্যাডো প্লে'-এর অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতা কাজে লেগে গেল। আমার আর একটা সাহসের কারণ ছিল। ১৯৪৪ সালে আই. পি. টি. এ.-র কেন্দ্রীয় শাখার পরিবেশনায় 'স্পিরিট অব ইণ্ডিয়া' দেখেছিলাম। তাতে নাচের ব্যবহার ছিল। ওই অনুষ্ঠানটি বিষয়-উপস্থাপনা ভাবনার অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করল। ব্রিটিশ কীভাবে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাকে চারিয়ে তুলেছে এটাকে বিষয় করে আমার 'শ্যাডো প্লে' তৈরি করে ফেললাম। সঙ্গে ছিল ডায়লগ আর বাজনা। গোলাম কুদ্দুস, নজরুল আর রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতার / গদ্যের অংশ নির্বাচিত করেদিলেন। সেগুলির আবৃত্তি বা পাঠ চলত। নৃত্যশিল্পীরা নাচতেন আর তাঁদের ছায়া পর্দায় গিয়ে পড়ত। বলা যায় একজন কোরিওগ্রাফারের কাজ করলাম। ব্র্যাবোর্ন কলেজে আয় মুসলিম ইনস্টিটিউটে 'শো' হয়েছিল মনে পড়ে। তবে গোটা কাজটা ছিল বেশ মোটা দাগের। উপযুক্ত আলো পাইনি, ফজলে লোহানি নামে একজন ফোটোগ্রাফারের লাইট ব্যবহার করে কাজ চালিয়েছিলাম। প্রথম 'শো' তে আপত্তি করলেও দ্বিতীয়বারে কলিম শরাফি নেপথ্যে ভূমিকা নিয়েছিলেন। আর 'শের আলি' নাম নিয়ে লুকিয়ে এসেছিলেন সুরপতি নন্দী। গান গাওয়া ছাড়া এটাই আমার নিজের থেকে করা গণনাট্যের প্রথম কাজ।

এর আগে অবশ্য আমি একবার গণসঙ্গীতগায়ক হিসেবে কলকাতায় এসেছিলাম। সেটা ১৯৪৪ সাল। ছবি আঁকার সঙ্গে-সঙ্গে আমি গান গাইতাম। লোকসঙ্গীতে ছেলেবেলা থেকেই আমার আগ্রহ ছিল। গ্রামে বড় হয়েছি লোকসঙ্গীতের আবহাওয়ার মধ্যেই। পালাকীর্তন, সংকীর্তন ইত্যাদি বাড়িতেই হতো। প্রজাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন দুর্দান্ত গাইয়ে। তাঁদের কণ্ঠে পদ্মাপুরাণের গান মুগ্ধ হয়ে শোনার মতো। নদীর পারেই ছিল আমাদের বাড়ি। অনবরত নৌকার আসা-যাওয়া দেখতাম আর মাঝিদের গান ভেসে আসত। বর্ষায় চলত নৌকা বাইচ আর সঙ্গে অপূর্ব গান। এছাড়া, চাষিদের গলায় নানা ধরনের গান শুনেছি, 'ধামাইল' নাচ দেখেছি। আমার দিদিমা ছিলেন 'ধামাইল' নাচের একজন প্রবক্তা। অসাধারণ গাইতে পারতেন। দিদিমার নাম ছিল কাত্যায়নী পুরকায়স্থ, গুরুসদয় দত্তের বড়দি। আমার হাত ধরে তিনি পাড়া বেড়াতেন আর 'ধামাইল' হলেই সোৎসাহে নেচে উঠতেন। মামারবাড়ির সকলেই গানের সঙ্গে অল্পবিস্তর যুক্ত ছিলেন। কাজেই গানের একটা পরিমণ্ডল ছিলই, শুনে-শুনে আমার কান তৈরি হয়ে গেল, যদিও সঙ্গীতের কোনও পাঠ আমি তখনও নিইনি। মিউজিক এর ট্রেনিং প্রথম নিতে শুরু করি ১৯৫০ সালে। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের পাঠ। ওই প্রথম

আমার মাস্টার ধরে কোনও জিনিস শেখা। যাইহোক, হেমাঙ্গ বিশ্বাস আবিষ্কার করলেন যে আমি গান গাইতে পারি, আমাকে বললেন 'চলে আসুন'। এইভাবে আমি আর নির্মল (নির্মলেন্দু চৌধুরি) মুখ্য গায়ক হয়ে গেলাম। দিনের বেলায় ছবি আঁকা আর সন্ধ্যার সময় গান। নানা জায়গায় ঘুরে-ঘুরে প্রোগ্রাম করছি। একটা সময় হেমাঙ্গ বিশ্বাস আর নির্মল দুজনেই অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমাকে একাই বহু প্রোগ্রাম করে যেতে হয়েছিল।

২ : ০

ওই 'শ্যাডো প্লে'-র পরে গণনাট্যের "শহীদের ডাকে"-র প্রোডাকশনের সঙ্গে যুক্ত হই। তার মঞ্চ সজ্জায় টু-ডাইমেনশনাল সেট ব্যবহার করা হয়েছিল। এর পরে চারমাস ধরে বাংলা আর আসামে পরিক্রমা চলল। ফিরে আসার পরে প্রবল বন্যায় আমার যাবতীয় ছবি বা অন্যান্য কাজ নষ্ট হয়ে যায়। একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেলাম। তখন রণদিভের পিরিয়ড শুরু হয়ে গেছে। আমার সঙ্গে মতপার্থক্য হতে থাকল। ১৯৪৮-৪৯ সাল থেকেই অল্প-অল্প করে ডিফারেন্স শুরু হয়। গানগুলো কেমন যান্ত্রিক মনে হতো। কোথাও যেন পৌঁছচ্ছে না। একটা উদাহরণ দিয়ে বলি। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের একটি গান ছিল : 'তোরা আয়, আয়রে ছুটে আয়, এই ভারতের হিন্দু-মুসলিম কে আছ কোথায়'। গানের সর্বশেষে ছিল : 'কৃষক সমিতি গড়িয়া তোলো দেশ রক্ষার দায়—' ইত্যাদি! সমবেত নৌকা-বাইচের গ্রাম্য সুরে গান। এই গানের রিহার্সাল দিচ্ছি। নির্মল তখন ছিল না। হঠাৎ একজন ছাত্রনেতা বললেন, 'দেশে আন্দোলন ছাত্ররা কিছু করে না বুঝি? আপনারা ছাত্রদের কথা কিছু বলছেন না কেন?' হেমাঙ্গদা বললেন, 'হ্যাঁ, তাও তো ঠিক। ওই কথাও তুমি লাগাইয়া দিও : ছাত্র আন্দোলন গড়িয়া তোলো দেশ-রক্ষার দায়'। আমরা সেভাবেই রিহার্সাল দিচ্ছি। এবারে মহিলা সমিতির এক মহিলা বললেন, 'আরে, মহিলারা বুঝি কিছু করে না?' আমরাও গাইলাম : 'আত্মরক্ষা সমিতি গড়িয়া তোলো দেশ রক্ষার দায়।' সবশেষে এলেন—যিনি আমাকে দিয়ে স্তালিনের ছবি আঁকিয়েছিলেন সেই বিনোদবন্ধু দাস। উনি ধাঙর ইউনিয়ন করতেন। উনি বললেন, 'কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে পিজান্টস অ্যান্ড ওয়ার্কার্স পার্টি'। সবার নাম গানে আছে, অথচ ওয়ার্কারদের নাম নেই! কী ধরনের গান গইছেন আপনারা?' অতএব শেষ লাইন যুক্ত হল : 'ধাঙর ইউনিয়ন গড়িয়া তোলো দেশরক্ষার দায়।' ওখানে ধাঙররাই ছিল ওয়ার্কার। আমরাও একটা 'সব দেবতার নাম' দিয়ে লিস্ট বানিয়ে নিয়েছি। মূল গানের তলায় লিস্টটা রেখে দিয়েছি। শিলচরে অনুষ্ঠান চলছে। মূল গানের শেষ লাইন 'কৃষক সমিতি গড়িয়া তোলো…' গেয়ে নির্মল ছেড়ে দিচ্ছিল। আমি ওকে একটা ধাক্কা দিয়ে ইশারায় লিস্টটা দেখিয়ে দিলাম। নির্মল আমার দিকে একটু তাকাল, তারপর এক-নম্বর দু-নম্বর করে আমার সঙ্গে গেয়ে চলল। পরে নির্মল বলল, 'এসব কবে থেকে হল?' আমি বললাম, 'প্রত্যেকে এসে বলাতে হেমাঙ্গদাই

এসব জুড়ে দিয়েছেন।' অন্যান্য অনেক গানেই এধরনের জিনিস ঘটতে থাকল। এইখান থেকেই আমার প্রথম প্রশ্ন জাগে। গানের মধ্যে যান্ত্রিকতাকে উপলব্ধি করতে শুরু করলেও সেটা ব্যাখ্যা করে কাউকে বুঝিয়ে বলার মতো বুদ্ধি তখন আমার নেই। কিন্তু বিরোধ দানা বাঁধতে শুরু করেছে। শুধু মনে হতো এটা ঠিক হচ্ছে না। এইসময় পার্টির আর একজন নেতা কথা প্রসঙ্গে একদিন বললেন যে আমাদের কাজ হল জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা। কথাটা শুনে আমার মনে হল আমি তো নিজেই শিক্ষিত নই। অন্যকে শেখাব কী? গান গাইবার সময় গলা ছেড়ে দিই। কিন্তু কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে কী গান গাইলে—বলতে পারব না। একজনের অনুপস্থিতিতে আসাম-বাংলা পরিক্রমার সময়ে চারমাস পার্কসনস বাজিয়েছিলাম। সেটা বাজনা হয়েছিল, কী তার তাল আমি জানি না। ততদিনে আমার বয়স প্রায় ২৮ বছর। রোজগারপাতি কিছু নেই। না খেয়ে থাকার মতো অবস্থা। মনে হল এমন একটা ব্যবস্থা করতে হবে যার থেকে জীবিকার সমস্যাও কিছুটা মেটে আর নিজেকে শিক্ষিত করতেও পারি। তখনই আমার বেহালার তালিম নেওয়া শুরু। ১৯৫০ সাল। এই সময়ে আমি আই. পি. টি. এ.-র কার্যনির্বাহী কমিটি থেকে রাগারাগি করে বেরিয়ে চলে আসি। তার একটা কারণ ছিল। পার্টি তখন আন্ডার গ্রাউন্ডে। কাকদ্বীপ থেকে কয়েকজন এসে বললেন অনুষ্ঠান করার জন্য চার-পাঁচ জনের ছোট একটা দলকে পাঠাতে হবে। রাতারাতি কী করা যায়? সলিল (সলিল চৌধুরি) তখন ঝটপট একটা নাটক লিখে ফেলল। যারা গান গাইত তারাই নাটক করল। তাই নিয়ে তুমুল বিতর্ক—গানের দল কেন নাটক করবে? তখন আই. পি. টি. এ-তে ড্রামা ইউনিট, ব্যান্ডে ইউনিট আর গানের ইউনিট ইত্যাদি বিভাজন হয়ে গেছে। কাজের সুবিধার জন্য এটা করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই ডিসিপ্লিন রক্ষার ব্যাপারটা রিজিডিটির পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। বয়স কম থাকার ফলে মিটিং-এ চেঁচামেচি করেছিলাম। ড্রামা ইউনিটকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলাম, 'গানের দল নাটক করলে কী হয়েছে? আপনারা এতদিন কী করছিলেন?' আইন তো আই. পি. টি. এ.-র জন্যই—নাকি আইনের জন্য আই. পি. টি. এ?' প্রকৃতপক্ষে চার-পাঁচ জনের টিমের ছোট নাটক ড্রামা ইউনিটের ছিল না। অবস্থার প্রয়োজনে গানের ইউনিট ওটা করতে বাধ্য হয়েছিল।

শিল্পগত নানা বিষয়ে শম্ভু মিত্র প্রমুখ তখন নানা প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। "নবান্ন" নাটক যখন প্রথম প্রযোজনা হয় তখন একটা উত্তেজনা ছিল। উত্তর কলকাতার চিরাচরিত নাটকের ধরন ভেঙে, নতুন ভাষায়, নতুন ঢঙে উপস্থাপিত এক নতুন নাটক। সংলাপে উপভাষার ব্যবহার, একেবারে রাস্তার দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জীবনকে মঞ্চে নিয়ে আসা—সবই নতুন এক ধারা। কিন্তু আঙ্গিকগতভাবে নাটকটির দুর্বলতা ছিল। এপিসোডিক। বাঁধুনি ছিল না। প্রথমবার পড়ার সময় নাটকের বিষয়বস্তু সবাইকে আকৃষ্ট করেছিল কিন্তু সকলেরই মনে হল পাণ্ডুলিপির পরিমার্জন ও সম্পাদনা প্রয়োজন। বিজন ভট্টাচার্যের "জবানবন্দী" কে "নবান্নের" খসড়া বলা যেতে

পারে। অর্থাৎ "জবানবন্দী"র ইলাবোরেশন হল "নবান্ন"। নানা এপিসোড ভিড় করেছিল নাটকে। ফলে "জবানবন্দী"র মতো ইনটিগ্রেটেড চেহারাটা ছিল না। এছাড়া আবেগের প্রাবল্য যথেষ্ট থাকলেও নাটকটি শিল্পগত মানের দিক থেকে দুর্বল ছিল। তখনই শম্ভু মিত্র স্পাদনার কাজে হাত লাগালেন। আর এইখানেই ক্ল্যাশটা বাঁধল। আমার মতে, শম্ভু মিত্র এডিট না করলে "নবান্ন" মাইলস্টোন হতো না। এতে "নবান্ন" নাটকের উন্নতি হয়েছিল ঠিকই কিন্তু এর পরে শম্ভু মিত্রের সঙ্গে বিজন ভট্টাচার্যের দূরত্বটা বেড়ে গিয়েছিল। যদিও ভিতরে আমরা চাইছিলাম বিজন ভট্টাচার্যের মতো একজন আবেগপ্রবণ নাট্যকার এবং শম্ভু মিত্রের মতো একজন ডিসিপ্লিনড ডিরেক্টর জোটবদ্ধ থাকুন। তাহলে দুর্দান্ত সব প্রোডাকশন হতে পারত। পরবর্তীকালে বিজনদার অনেক নাটক দেখতে গিয়ে কোনও দৃশ্যের দুর্বলতা দেখে আমার কেবলই মনে হতো, যদি এটা শম্ভু মিত্রের হাতে পড়ত! কিন্তু তখন সেটা আর হবার নয়। শম্ভু মিত্র প্রমুখ একসময় মনে করতেন যে আমরা প্রকৃতপক্ষে 'স্লোগান-মংগারিং' করে চলেছি। ওঁরা মনে করতেন শিল্পের দিকে জোর দেওয়া উচিত। স্লোগানে তাঁদের আপত্তি ছিল না, দুর্ভিক্ষের কথা বলতেও আপত্তি ছিল না কিন্তু তাঁরা চাইতেন শিল্পের শর্ত মেনে কাজটা হোক। শিল্পের বদলে প্রচার প্রাধান্য পেতে থাকুক—পার্টির দিক থেকে এমন একটা চাপ ছিল। এইখানেই ওদের সঙ্গে আই. পি. টি. এ.-র ডিফারেন্স হয়ে গেল।

আই. পি. টি. এ-তে আমরা সবাই একটা উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত হয়েছিলাম, ভাবিত হয়েছিলাম। কিন্তু ওই ভাবনার পেছনে কোথাও একটা শিল্পী-মন ছিল। চেয়েছিলাম আমাদের কাজটা শিল্পায়িত হোক। কিন্তু রেজিমেন্টেশন, যান্ত্রিক চিন্তাধারা, স্লোগান-মংগারিং ইত্যাদিই মুখ্য হয়ে উঠল। আজ পর্যন্ত আই. পি. টি. এ.-তে ওই ধারাই প্রবহমান। একই জায়গায় রয়েছে। এক ধরনের পুনরাবৃত্তির ছকে কাজ হয়ে চলেছে। সব কাজই ইস্যুভিত্তিক। কখনও হরতাল, কখনও সাম্প্রদায়িকতা, পার্টি প্রোগ্রাম যেমন হয়ে থাকে। যেমন যান্ত্রিক নাটক তেমনই তার কম্পোজিশন। এ কারণেই হয়ত প্রকৃতই যাঁরা সৃষ্টিশীল তাঁরা আই. পি. টি. এ. থেকে সরে গেছেন। এই সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে বিরোধের কারণে যেমন অনেকে সরে গেছেন, তেমনই কিছু লোক ছিলেন যাঁরা হয়ত সৃষ্টিশীল হলেও ধান্দাবাজ। আই. পি. টি. এ-কে তাঁরা একটা প্ল্যাটফর্ম হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। এই বৃহৎ প্ল্যাটফর্মে নানা উদ্দেশ্যে নানা লোকের সমাবেশ ঘটেছিল। ব্যক্তিগতভাবে এটুকু বলতে পারি যে, আই. পি. টি. এ-র নাম ভাঙিয়ে আমি অন্তত কিছু করিনি।

ইস্যুভিত্তিক ব্যাপার বা লিফলেটিং-এর একটা প্রয়োজন হয়ত আছে। কিন্তু লিফলেটটা লিটারেচার নয়। কোনও-কোনও লিফলেট হয়ত লিটারেচার পর্যায়ে পৌঁছে যেতে পারে। আবার এটাও ঠিক যে সমস্ত লিটারেচারই প্রচারধর্মী। সুপ্তভাবে হোক বা জাগ্রতভাবে হোক তার ভিতরে একটা বার্তা থাকেই। তার সারবস্তুটাই তার প্রচারের

দিক নির্দেশ করে। আবার হয়ত দেখা গেল লেখকের উদ্দেশ্য একপ্রকার হলেও লোকের কাছে তা ভিন্নভাবে প্রতিভাত হয়ে গেল। গণনাট্যে ওই লিফলেটিংটাকেই প্রধান করে ধরে নেওয়া হল। আমি হয়ত ছবি আঁকছি—পার্টির কোনও কর্মী যেতে যেতে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পোস্টার আঁকছেন?' ওঁদের কাছে পোস্টারটাই ছিল চূড়ান্ত ব্যাপার। আমিও তাই ভাবতাম। পরবর্তীকালে কলকাতায় এসে যখন পেট চালানোর দায়ে বইয়ের প্রচ্ছদ আঁকছি তখনও আমার মনে হত প্রচ্ছদ অঙ্কনই বুঝি শ্রেষ্ঠতম শিল্প। পঁয়তাল্লিশ বছর পরে দেখলাম আসলে পরের মুখে ঝাল খাচ্ছি। ওটা শিল্প-টিল্প কিছুই নয়।

৩ : ০

১৯৫০ সাল থেকে আমি বেহালা বাজাতাম। শম্ভু মিত্র একদিন এসে বললেন, 'তোমার নাটকে আগ্রহ নেই?' আমি বললাম 'না'। উনি বললেন 'তোমার টাকার দরকার নেই?' আমি বললাম, 'আছে। কিন্তু গণনাট্যের অভিজ্ঞতায় জানি যে নাটক করে টাকা হয় না।' তা সত্ত্বেও আমাদের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ ছিল, বাড়িতে যাতায়াত। এরপরে যখন বহুরূপী হয়েছে, তখন একদিন এসে ফেস্টিভ্যালের জন্য পোস্টার করে দিতে বললেন। "ছেঁড়া তার" আর "চার অধ্যায়" দেখানো হয়েছিল। আমি পোস্টার করে দিলাম। এরপরে "ধর্মঘট" নাটকের সময় 'সেট' করে দেবার জন্য অনুরোধ এল। আমি সেটের কিছুই জানি না, অথচ ওঁর অনুরোধও ঠেলতে পারি না। গেলাম একদিন। ওঁরা নিজেরা যা করেছিলেন সেগুলোই একটু দেখে দিলাম। আর নাটকের মিউজিকটা দেখিয়ে দিলাম। কারণ ওটাই আমার আওতার মধ্যে ছিল। এর পরে "রক্ত করবী"র ব্যাপারটা শুরু হল।

আগে ১৯৪৯ সালে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ডাকে শ্রীরঙ্গমে ওই নাটকের একটি অভিনয় হয়। তাতে বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন: শম্ভু মিত্র—রাজা, কালী ব্যানার্জি—সর্দার, দেবব্রত বিশ্বাস—বিশু পাগল, চন্দ্রা—তৃপ্তি মিত্র এবং নন্দিনী চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন কণিকা মজুমদার। আমি আর সূর্য রায় মিলে একটা সেট করেছিলাম। নাটকটা তখনই পড়া ছিল। কিন্তু খুবই ঝাপসা একটা ধারণা হয়েছিল তাতে। মনে হয়েছিল নাটকের ভিতরে একটা শক্তি রয়েছে কিন্তু তাকে যথার্থ বোঝার মতো ক্ষমতা বা বুদ্ধি তখন আমার ছিল না। শুধু বুঝতে পারতাম যে আই. পি. টি. এ.-তে আমরা যে কথাগুলো বলি সেগুলোই অনেক জোরালোভাবে এ। নাটকে বলা রয়েছে। পরবর্তীকালে যখন শম্ভু মিত্র "রক্তকরবী"র প্রসঙ্গ নিয়ে এলেন তখন নাটকটা আবার পড়ে ফেললাম। তখন মনে হল 'আরে এ যে দারুণ জোরালো ব্যাপার।' শম্ভু মিত্র বললেন, 'কী, করা যায়?' আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই! কেন করা যায় না?' এইভাবে নাটকে জড়িয়ে পড়ি। রোজ রিহার্সাল দেখি, ক্যারেকটার, ডায়লগ নিয়ে শম্ভু মিত্রর আলোচনা শুনি। আমিও আমার মতো করে ভাবছি। এদিকে মিউজিকের দায়িত্বও

রয়েছে। তখনও সেট নিয়ে কী করব কিছুই জানি না। সাহিত্যের নাটকটা কী করে জান্ত নাটক হয়ে ওঠে সে বোধ আমার একেবারেই ছিল না। শম্ভু মিত্র একদিন কাগজের মডেল বানিয়ে বললেন, 'এটা রাজার ঘর, এটা অন্ধক—ইত্যাদি।' আমি ভাবছি এতবড় একটা স্টেজ রয়েছে, এতটা স্পেস রয়েছে, তাতে থ্রি-ডায়মেনশনাল একটা জায়গা পাচ্ছি। কী দিয়ে তাকে ভরাট করব? রাজার ঘরই বা কেমন হবে? আস্তে আস্তে নাটকের ভিতরে ঢোকবার চেষ্টা করলাম। প্রশ্ন এল : এই রাজা কে? সর্দারই বা কে? মনে-মনে তাদের চেহারাগুলো অ্যানালিসিস করতে থাকলাম। কার্ডবোর্ডের মডেলে শম্ভু মিত্র তখন এক নম্বর দু-নম্বর করে প্রবেশ-প্রস্থানের রাস্তা চিহ্নিত করে অভিনেতাদের বোঝাচ্ছেন। আমিও বোঝার চেষ্টা করছি। যতই রিহার্সাল দেখতে লাগলাম ততই নাটকটা পরিষ্কার হয়ে উঠছে। কিন্তু মঞ্চের উপরে কীভাবে সেট-গুলোকে দাঁড় করাতে হয় তার কোনও জ্ঞান আমার ছিল না। সীতাংশু মুখার্জি নামে এক ভদ্রলোক দেখিয়ে দিলেন কীভাবে স্ট্রাকচারগুলো দাঁড় করাতে হয়। তখন আমি ডিজাইনের কাজ শুরু করলাম। এই ডিজাইনগুলো আস্তে-আস্তে অনেকটাই পালটে গেছে। প্রতিটি অংশই নির্মিত হয়েছে নির্দিষ্ট যুক্তিকে মেনে। শম্ভু মিত্র আমাকে নানা জিনিস বুঝতে সাহায্য করেছেন। যেমন, প্রথমে 'মকর মুখ' জিনিসটা কী ঠিক বুঝতাম না। পরে যখন 'রাজার এ'টো'-র তাৎপর্য ধরতে পারলাম তখন 'মকর মুখ'-এর একটা আর্কিটেকচারাল চেহারা নিয়ে এলাম। নাটকে যা বর্ণনা করা হচ্ছে সেটাই কিন্তু শুধু সেটুকুই নয়। ওর একটা আর্কিটেকচারাল রূপ থাকা দরকার, একটা পিকটোরিয়াল রূপ থাকা দরকার, এবং অভিনেতাদের গতির সঙ্গে একটা গতিশীলতাও বজায় রাখা চাই। পিকটোরিয়ালিটি আনার জন্য আমাকে লিনিয়াল আসপেক্টগুলো দেখে নিতে হবে। অর্থাৎ কোনখানে হরাইজন্টাল এবং ভার্টিকাল লাইনের ব্যবহার হবে অথবা কোথায় ত্রিভুজ আসছে কোথায় চতুর্ভুজ আসছে, কোথায় বক্ররেখা আসছে—রেখাগুলো আমাকে দেখে নিতে হবে। ঠিক করে নিতে হবে কীভাবে প্রয়োজনবোধে মুড অনুযায়ী এই রেখাগুলোকে কাজে লাগাতে পারি। কারণ রেখার দ্বারাই তো আমাদের 'মুড'-এর বদল হয়। আমাদের মুখের অভিব্যক্তি পালটে যায় রেখার বদল ঘটলে। হাসি-কান্না-রাগ-মন খারাপ ইত্যাদি মানসিক অবস্থার বিভিন্নতায় রেখারাও পালটে যেতে থাকে। এই রেখাগুলো কীভাবে ব্যবহার করব তাই নিয়ে ভাবতে থাকলাম। একটা জায়গায় আছে বিশু পাগল বলছে : আয়রে ভাই লড়াইয়ে চল। সে উঁচুতে উঠে চিৎকার করে আর তার চারপাশে সবাই জড়ো হয়। আমার পিরামিডের চেহারাটা মনে হল। মনুমেন্টাল একটা আকারে কম্পোজিশনটা গড়া হল। রাজার ঘরের সামনে যে জাল ছিল—প্রথমে সেটা গগন ঠাকুরের আঁকা "রক্তকরবী" বইয়ের প্রচ্ছদ থেকে হুবহু অনুকরণ করে তৈরি করা হয়। পরে সেটা সম্পূর্ণ বদলে দিলাম। পরে দরজাটা উপরে-নিচে হাঁ-হয়ে খুলে যেত আর মকর-মুখের চেহারাটা স্পষ্ট বেরিয়ে আসত। রক্তকরবীতে যে সমস্ত এলিমেন্টস আছে—রাজা বা নন্দিনী যে সমস্ত কথাবার্তা-

গুলো বলে ওই সমস্ত কিছু ওই দরজার কম্পোজিশনে ধরা আছে। সুপার-ইমপোজ করা হয়েছে। চট করে দেখলে মনে হবে গগন ঠাকুরের ছবি, আসলে কিন্তু তা নয়। নাটকটা যত ভাল করে বুঝেছি ততই পরিবর্তনের কাজ চলেছে। বেসিক কোরিওগ্রাফিকে অপরিবর্তিত রেখে বিভিন্ন স্কিবলের চেহারা পাল্টে গেছে, রূপ বদলে গেছে। দরজাটা আগে খাড়া মতন ছিল পরে উপরটা এমনভাবে ঢালু করে দিলাম যা দেখে বাংলা দেশের কোনও কুঁড়েঘরের চেহারাটা মনে আসে। এক নজরে হয়ত এটা কিছুই কনভে করে না। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল এটা বাংলারই নাটক। যখন বলা হয় 'তুমি তো আমাদের ঈশানী পাড়ার নন্দিনী' তখন আমাদের অতি পরিচিত বাঙালি মেয়েটিকেই যেন চিনে নিই। একই সঙ্গে নাটকটি আবার বিশ্বজনীনও বটে। পৃথিবীর যে কোনও জায়গারই চেহারা হতে পারে এটা। রাজার ঘরটি এমনই একটা জায়গা যেখানে নন্দিনীও বারবার আকৃষ্ট হচ্ছে আর রাজাও সেখানে নির্জনতার আড়াল ভাঙতে চাইছে। নির্জন ঘরটি হয়ে ওঠে তার একাকীত্বের নীড়। আর তারই দ্যোতক ওই কুঁড়েঘর। এটা খুবই সূক্ষ্ম একটা ইঙ্গিত। কেউ বুঝলে ভাল, না বুঝলেও কিছু এসে যায় না। এছাড়াও ওতে বিভিন্ন ডিটেলস্ আছে। তাতে বকযন্ত্র, মরা ব্যাঙ এমনকি পরবর্তীকালে অ্যাটমিক এনার্জিও চলে এসেছে। রাজার সংলাপে আছে : '...ওটা একটা মরা ব্যাঙ। হাজার বছর টিঁকে ছিল। কী করে বেঁচে থাকতে হয় জানে না।' যে শুধুই টিকে থাকে তাকে রাজা সহ্য করতে পারে না। মরা ব্যাঙটি দিয়ে 'টিঁকে থাকা মানুষ'কেই তো বোঝানো হয়। রাজা সেই 'মানুষ' এর ঊর্ধ্বে যেতে চায় কিন্তু পারে না। তথাকথিত কাজের জগতে সে আটকে থাকে। কিন্তু জীবনের প্রতি সে আকৃষ্ট। নির্জন নীড় সে ভাঙতে যায় তবু পারছে না। এই ইমেজগুলো কিন্তু নাটকের মধ্য থেকেই আমার কাছে উঠে এল। পরে ইমেজগুলোকে আমি আস্তে-আস্তে বদলাতে শুরু করি। এইটেই আমার নাটক দেখার বা নাটকের সেট করার সূত্র হিসাবে দাঁড়িয়ে গেল।

"রক্তকরবী"র পরে যখন "পুতুল খেলা"র সেট করি তখন ওই রেখাকেই ব্যবহার করলাম। মানুষ আঘাত পেলে ভেঙে পড়ে। অর্থাৎ, একটা ডাউন ওয়ার্ড কার্ভ-এর চেহারা পাওয়া গেল। মুখোশে হাসি আর কান্নার অভিব্যক্তি বোঝাতে আমরা ঠোঁটের রেখাটিকে কখনও উপরদিকে আবার কখনও নিচের দিকে বাঁকিয়ে দিই। ডাউন ওয়ার্ড কার্ভ-এ বেদনার অভিব্যক্তিই ধরা পড়ে। এটার একটা সূক্ষ্ম ব্যবহার করলাম। সেটটা এমনি দেখলে মনে হবে একটা মধ্যবিত্তবাড়ি। তাতে দরজা আছে, জানালা আছে, চেয়ার, আলনা ইত্যাদি নানা আসবাব আছে। প্রত্যেকটা জিনিসেই ওই কার্ভটা আছে। ওটা হিসাব করে রাখা হয়েছে। একটা জায়গায় নোরা ধরা পড়ে যায়, ভেঙে পড়ে কিন্তু বাইরের দিক থেকে প্রত্যাশার ইঙ্গিত থাকে। কার্ভটাও ধীরে-ধীরে উপরে উঠে আবার নিচের দিকে নেমে দরজার দিকে বাইরে বেরিয়ে যায়। একটা সময়ে তিনটি কার্ভের ব্যবহার হয়। একটিতে নোরার একাকীত্বের বেদনাকে ধরা হয়। ক্রগস্টাড প্রথমে ব্ল্যাকমেল করে পরে জীবনের

আশ্বাস পেয়ে ও কাজ ছেড়ে দেয়। দ্বিতীয়টিতে এই ক্রগস্টাড চরিত্রটির বিশেষ মুহূর্তের বিষণ্ণতা ধরা পড়ে। এছাড়া, বিছানার মধ্যেও একটা একাকীত্বের ব্যাপারকে বোঝানো হয়। আবার টোট্যালিটিতে শেষ পর্যায়ে নোরার বেরিয়ে যাবার সময় টরভাল্ড ভেঙে পড়ে। কার্ভটি ওখানে সম্পূর্ণ হয়। ত্রিকোণাকার, চতুষ্কোণ কিংবা বৃত্তাকার রেখাকে নানা অভিব্যক্তির রূপ প্রকাশে ব্যবহার করা যায়। একটি বৃত্তকে ভেঙেই যেমন আপওয়ার্ড আর ডাউনওয়ার্ড এই দুটো কার্ভ পাওয়া যায়। আবার তাদের পরপর সাজিয়ে দিলেই তরঙ্গায়িত একটা গতির ব্যঞ্জনা চলে আসে। নাটকের সুর অনুযায়ী কখনও লাইন এবং কখনও মাস-কে আমি স্পেসের মধ্যে ব্যবহার করে থাকি। ধরা যাক একটা সাধারণ দরজা আছে। কিন্তু দরজার দুদিকের দৈর্ঘে বা প্রস্থে অসমতা নিয়ে আসা হল। অর্থাৎ একটা ডিসটরশন ঘটানো হল। কেন? কারণ কোনও একটি চরিত্রের মধ্যে আমি ওই ডিসটরশন দেখতে পেয়েছি। কোনও অ্যাংগুলারিটি দেখতে পেয়েছি। সময় এবং স্পেসকে ধরার জন্য আমাকে পেন্টিং, স্কাল্পচার, আর্কিটেকচার ইত্যাদির নানা শিল্প বৈশিষ্ট্যকে ব্যবহার করতে হয়। সেটের প্রাথমিক চিন্তা নাটকের বিষয় থেকেই উঠে আসে। তারপরে দেখতে হয় কী ধরনের নাটক। যদি সুররিয়্যালিস্টিক প্যাটার্নের হয় তবে সম্পূর্ন সেটেও সুররিয়্যালিজমকে ব্যবহার করব। ইম্প্রেশনিস্টিক হলে সেভাবেই ভাবব, যদি বারোক প্যাটার্নের হয় তবে চেষ্টা করব বারোক ধরনের আর্কিটেকচার ব্যবহার করতে, একই আকৃতির পৌনঃপুনিক ব্যবহার করে একটা ছন্দকে ধরতে চাইব সেক্ষেত্রে হয়ত মঞ্চের উপর পরপর অনেকগুলো স্তম্ভের নির্মাণ করা হল। "রক্তকরবীর" ক্ষেত্রে কিন্তু কোনও বিশেষ ধরনের শিল্পরীতিকে মেনে চলা সম্ভব হয়নি। ওতে কিউবিজম স্ট্রাকচারালিজম সব মিশে গেছে। কারণ চরিত্রগতভাবে নাটকটি মিশ্র ধরনের। একই সঙ্গে নাটকের মধ্যে প্রতীক আছে আবার জীবন্ত চরিত্র আছে। নাম ধরে ডাকা হয় এমন চরিত্র আছে আবার কারুর বা নাম নেই। যেমন ফাগুলাল, আবার সর্দার। রাজা একটি প্রতীক চরিত্র, রঞ্জন একটি রূপক চরিত্র। একটা আইডিয়া। নাটকে নির্দিষ্ট কোনও স্থান দেওয়া নেই। কিন্তু তাদের এমন একটা স্থানে আনতে হবে যাতে প্রত্যেকেই খাপ খেয়ে যায়। "রক্তকরবী" ঠিক কী ধরনের নাটক বলা মুশকিল। রবীন্দ্রনাথ কোথাও হয়ত যাত্রার এলিমেন্ট ব্যবহার করেছেন, কিন্তু বিষয়বস্তুগতভাবে নাটকটি সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ধরনের। যান্ত্রিক সভ্যতা তো পাশ্চাত্য বিষয়। আবার নন্দিনীর 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে' গান একেবারেই দেশজ, মাটির ব্যাপার। মঞ্চে যে কোনও চরিত্রের চট করে চলে আসা এটা যাত্রাতে সম্ভব। "রক্তকরবী"র মঞ্চভাবনা সেই সময়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আমার কাছে এসেছিল। মনে হল 'এটা হওয়া উচিত'—সেভাবেই কাজ করলাম। আজ সেই কাজের বিচার বিশ্লেষণ যতটা করতে পারি তখন আমার পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। উত্তর কলকাতার কোনও মঞ্চের নাটকও আমার দেখা ছিল না। যা দেখে মঞ্চের একটা আইডিয়া পেতে পারি। "রক্তকরবী"র বহু পরে আমি প্রথম পেশাদারি মঞ্চের নাটক দেখি—"ক্ষুধা"। এমনকি শিশিরবাবুর কোনও নাটকও আমার

দেখা হয়নি।

নাটকের ক্ষেত্রে এখনও আমি নিজেকে জলজ্যান্ত অশিক্ষিত লোক বলে থাকি। কোনও প্রথাগত শিক্ষা নেই আমার। শুধু প্রচুর পেন্টিং দেখা ও মিউজিক শোনা ছিল। অর্থাৎ ছবি আর সঙ্গীতের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল আমার। ওটাই পরোক্ষভাবে আমাকে সাহায্য করেছে। এখনও সেটে ব্যালান্স আর রিদম-এর সমস্যা মেটাতে সঙ্গীতের বোধ কাজ করে। যদিও মিউজিক আর পেন্টিং-এর ইন্টারঅ্যাকশনটা আমাদের দেশে দুর্ভাগ্যবশত এখনও পর্যন্ত হয়নি।

"রক্তকরবী"র পরে রবীন্দ্রনাথের চূড়ান্ত পর্যায়ে লেখা নাটক "কালের যাত্রা"। এটিও পাশ্চাত্য জীবনধারা বিষয়ে একটি প্রতিক্রিয়া। "রক্তকরবী"র নাটকীয় উপাদান বেশি হলেও "কালের যাত্রা"র স্পষ্টতা অনেক বেশি। পরিষ্কার একটা সোশ্যাল স্ট্রাকচার পাওয়া যায় ওতে। তিনজন মন্ত্রী, তিনজন নাগরিক, তিনজন সৈন্য, তিনজন মহিলা, একজন সন্ন্যাসী, একজন কবি, একজন পুরোহিত—নানা প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রের একটা সোশ্যাল স্ট্রাকচারকে তুলে ধরে। যেন একটা প্রবন্ধের নাট্যরূপ। ব্যক্তি মানুষ কেউ নাটকে নেই। বিভিন্ন শ্রেণী আছে। এই নাটকে আমি স্ট্রাকচারাল সেট করলাম। একটা 'কাল' বা সময়কে পিকটোরিয়ালি ধরতে হবে। আবার ফ্যাংশনাল আসপেক্টটাও দেখা চাই। আমি এমন জিনিসই ব্যবহার করতে চাই যেটা ফাংশনাল হবে এবং একই সঙ্গে পিকটোরিয়াল বা স্কাল্পচারাল হবে। কিন্তু সহজেই চেনা যাবে। সময়ের প্রতীক হিসাবে ঘড়ি ব্যবহার করলাম। কাঁটাযুক্ত ঘড়ি দিলে সেটা ফাংশনাল হবে না, আমি সেটা ব্যবহার করতে পারব না। দেখাতে হবে ঘড়িটা অচল, কিন্তু শূদ্রদের হাতে যখন দড়িটা পড়ে ঘড়ি তখন সচল হয়ে ওঠে। অর্থাৎ সময় শূদ্রদের পথ করে দেয়। মঞ্চের পিছনে বেত দিয়ে বালু-ঘড়ির কাঠামো নির্মাণ করি। আবার দুটি পর্দাকে দুপাশে সরিয়ে মাঝখানে এমন একটি অংশকে অনাবৃত করা হতো যা দেখলে মনে হতো ঘড়ির নিচের প্রকোষ্ঠে কিছুটা বালি জমেছে, অর্থাৎ সময় কিছুটা এগিয়েছে। আগে ওমর খৈয়ামের ইলাস্ট্রেশনে এই বালু-ঘড়ি এঁকেছিলাম। একজন জ্ঞানীলোক যখন পৃথিবীর সব কিছু জেনে ফেলল তখন তাঁকে বলা হল, তোমার সময় হয়ে গেছে, এবার চলে এসো। এইভাবে পেন্টিং-এর অভিজ্ঞতা স্টেজে কাজে লেগে গেল।

"পাগলা ঘোড়া" নাটকে একটি মেয়ে মারা গেছে আর চারজন লোক তাকে পোড়াতে এসেছে। তাঁরা মদ খেতে-খেতে নিজেদের কাহিনী বলতে থাকে। আর ভূতের মতো মেয়েটি মাঝে-মাঝে গাছের ফাঁকে উঁকি দেয়। ভৌতিক একটা পরিবেশ আনতে হবে। চালাটাকে হেলিয়ে রেখে ডিসটর্টেড করে দিলাম। আস্ত গাছ না রেখে গাছের একটা কঙ্কালের চেহারা রাখলাম। এছাড়া শ্মশানের কিছু ডিটেলস থাকে। শ্যামানন্দ জালান নির্দেশিত "পাগলা ঘোড়া"র হিন্দি রূপান্তরের সেটটা মোটামুটি এইরকম। কিন্তু বাংলা নাটকে অন্যভাবে করেছি। শম্ভু মিত্রের ভাবনায় নাটকে প্রেমটা ছিল জৈবিক প্রেম। আমিও তখন সেভাবে ভাবলাম। ভাবনার সম্পূর্ণ 'কী-নোট'টা

পাল্টে নিতে হল। সংগীতে যেমন 'মধ্যম'-কে 'সা' ধরে নিলে সমস্ত নোটের সম্পর্ক-গুলোই পাল্টে যায়—একটা নতুন স্কেল পাওয়া যায়। জৈব চেহারাকে নাটকে আনতে আমি কপুলেটিং, এমব্রেসিং, কিসিং, স্কাল্পচার-এর ফর্ম ব্যবহারও করেছি। তাপস সেনকে শুধু বলে দিলাম যাতে দর্শকের রুচি বাঁচিয়ে আলোর ব্যবহারটা করেন। আবছা আলোয় শুধু সাজেশনস থাকে।

মঞ্চসজ্জায় আলো ও রঙের সম্পর্কে কিছু কথা বলতে গিয়ে "পুতুল খেলা"র প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক। রেখার ব্যবহার নিয়ে আগে বলেছি। নাটকটিতে মনস্তত্ত্বের নানা জটিল দিক ছিল। দর্শকের মধ্যে ওই সাইকোলজিকাল এফেক্ট আনতে গিয়ে আমি এমন একটা রঙ ব্যবহার করলাম যা সাধারণভাবে করা উচিত নয়। নোরা আর তার স্বামীর মধ্যে প্রচণ্ড মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন চলছে। সে নিজে যা নয় তাই স্বামীর কাছে দেখাতে চাইছে। কিন্তু স্বামীর উপকারের কথা ভেবেই সে টাকাটা ধার করেছে। অন্যদিকে স্বামী শুধু বড়-বড় নীতির কথা বলে, আসলে লোকটি নীচ প্রকৃতির। দুটো মানুষের পরস্পরকে বুঝতে শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। সত্য উদ্ঘাটিত হয়। নোরা বলে ওঠে : 'এতদিন একটা অচেনা লোকের সঙ্গে আমি থেকেছি। আজ জানতে হবে আমি কে।' গোটা মঞ্চের ব্যাকগ্রাউন্ডটা ডার্ক রাখলাম। তার ওপরে মঞ্চসজ্জায় উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার করলাম। একটা ধাক্কা দেওয়ার অভিপ্রায়ে ক্লোম ইয়েলো রঙটাকে ব্যবহার করলাম। বিছানার কভার, দুটো পর্দা, কুশন ইত্যাদি সব ওই রঙের। ক্লোম ইয়েলোতে আলো ফেলে একটা দারুণ উজ্জ্বলতা পাওয়া গেল। যাকে বলে ড্যাজলিং এফেক্ট। এছাড়া অন্যান্য আসবাব সবই দৃশ্যমান। জানালা দিয়েও শরতের উজ্জ্বল আকাশ দেখা যাচ্ছে। যেন বাইরের সূর্যকে টেনে ভিতরে আনা হয়েছে। বানানো সংসারের উপর বাইরের ওই উজ্জ্বল আলো এসে পড়ে নোরার সমস্ত আউটলাইনকে মুছে দিয়েছে। অর্থাৎ মানুষের পরিচয় রেখাকে মুছে দিতে চাইছে। নিজেদের বানানো জিনিসে তাদেরই অস্তিত্ব লোপ পেতে চলেছে। প্রথম দৃশ্যের শেষে নোরাকে হাতে উল-কাঁটা নিয়ে বুনতে দেখা যায়। লাল আর ধূসর রঙের উল। টরভ্যাল্ড বলে : 'কেউ এসেছিল। নোরা : কই না তো! টরভ্যাল্ড : আশ্চর্য! দেখলাম যেন··· নোরা : হ্যাঁ, হ্যাঁ এসেছিল—। টরভ্যাল্ড : তুমি মিথ্যে কথা বললে কেন?' এরকম সংলাপের পরেই নোরার হাত থেকে উল-এর বল পড়ে যায়। তার মিথ্যে কথা ধরা পড়ে গেছে। তাড়াহুড়োতে গোটাতে গিয়ে লাল আর ধূসর বর্ণের উল জড়িয়ে-পাকিয়ে যায়। এমনিতে দেখলে মনে হয় সাধারণ, নৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু ভীষণ ক্যালকুলেট করে ওটা রাখা হয়েছে। অঙ্কের হিসাবটা জানি শুধু আমি, দর্শক নয়। তাদের উপরে শুধু সাইকোলজিকাল এফেক্টটা গিয়ে পড়ে। পরের দৃশ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা বিষাদময় হয়ে ওঠে। সমস্ত মঞ্চে ধূসর রঙের চাদর, কুশন ইত্যাদির উপরে ছড়িয়ে পড়ে লাল রঙের মাকড়সার জাল। কারণ মূল নাটকে এর পরেই আছে ট্যারেনটুলা নাচ। ট্যারেনটুলা অর্থাৎ রূপকথার সেই বিষাক্ত মাকড়শা যা কামড়ালে ওঝা এসে নেচে-নেচে

বিষ ঝেড়ে দেয়। নাচের বদলে শম্ভু মিত্র ওখানে "ঝুলন" কবিতাটির অনবদ্য ব্যবহার করেন : 'পরাণের সাথে খেলিব আজিকে মরণ খেলা'। অন্য একটি জায়গায় নোরা একাকীত্বে ভীত। তখন ঘরের পর্দার রঙ পালটে গেছে। তাতে আলট্রা মেরিন ব্লু আর ভার্মিলিয়ন রেড-এর কম্বিনেশনে সাধারণ আল্পনা আঁকা। দেখে মনে হতো যেন কেউ তাকিয়ে আছে। গা ছমছম করে উঠত। অ্যানক্যানি একটা ফিলিং হতো। শুধুই রঙের ব্যবহার।

তৃপ্তি মিত্রের নির্দেশনায় পরবর্তীকালে যখন রঙ্গকর্মীর "গুড়িয়াঘর" (পুতুল খেলা) হয়, আমার নতুন ধরনের সেটের পরিকল্পনা মাথায় এল। আর রেখার ব্যবহার নয়, আমি চাইলাম পাখির খাঁচার আকার ব্যবহার করতে। সবই ট্রান্সপারেন্ট। কে ঢুকল, কে বেরুল, সবই দেখা যাবে। শুধু খাচার মধ্যে ব্যক্তিত্বের একটা দশাকে তুলে ধরতে চেয়েছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত সেটা করা আর সম্ভব হয় নি।

৪ : ০

সিমফনির ক্ষেত্রে একই মিউজিক বিভিন্ন কন্ডাকটরের পরিচালনায় নানা ব্যঞ্জনায় পরিবেশিত হয়। টোসকানিনির বাজনা এক রকম, জুবিন মেহতারটা আরেকরকম। ইনটারপ্রিটেশনটা ভিন্নতর হয়ে যায়। একটি নাটকের ক্ষেত্রেও নির্দেশক কীভাবে ভাবছেন সেটাই প্রধান হয়ে ওঠে। সিমফনিতে মূল ভায়োলিনের সঙ্গে কাউন্টার হিসাবে দ্বিতীয় একটা ভায়োলিন থাকে। নইলে সিমফনির ডায়মেনশন তৈরি হয় না। নাটকে আমার ভূমিকাটি ওই দ্বিতীয় ভায়োলিনের মতো। শুধুমাত্র দ্বিতীয় ভায়োলিন বাজলে কিছুই শোনা যায় না। মূল ভায়োলিনের সঙ্গে সুরের মিলনে সে 'হার্মনি' তৈরি করে। নাটকে নির্দেশকের ভূমিকাটিই প্রধান। আমি তার সঙ্গতকারী তার অনুগামী নই, তার সহায়কারী। সেট তৈরির ক্ষেত্রে আমি এই মনোভাব নিয়ে কাজ করি। কোনও নাটক সংক্রান্ত ব্যক্তিগত ইনটারপ্রিটেশন আমার যাই থাকুক, মেলোডি অনুযায়ী কাউন্টার মেলোডি সৃষ্টি করাই আমার কাজ। নাটকের নির্দেশকের ব্যাখ্যার সূত্র ধরে মূল নাটকটাই পালটে গেল এমনটা হওয়াও অসম্ভব কিছু নয়। দেখা গেছে পিটার হলের মতো অল্পবয়সী পরিচালকের ব্যাখ্যায় লরেন্স অলিভিয়ারের মতো সেরা অভিনেতা মন দিয়ে শুনছেন। কারণ নতুন ধরনের ব্যাখ্যা শুনতে তিনি প্রকৃতই আগ্রহী। একই নাটকের ভিন্নতর ব্যাখায় আমাকেও ভিন্নতর সেটের কথা ভাবতে হয়। নতুন আইডিয়ার সন্ধান করতে হয়। এটা এক অর্থে যেমন আমার খুশির কারণ, অন্যদিকে চিরন্তন অখুশির কারণও বটে। যেহেতু বরাবরই আমাকে ওই দ্বিতীয় ভায়োলিনের কাজটা করে যেতে হয়। এই কারণেই নিজেকে নাটকের 'নির্বেদিত প্রাণ' কর্মী না বলে 'হাফ-হার্টেড' কর্মী বলে থাকি।

শিল্পের বিভিন্ন বিভাগে ফর্ম নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে। নাটকেও যদি ফর্মের এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে তবে আমিও সেভাবে চেষ্টা করতে পারি। যেমন একটি

স্বপ্নদৃশ্য। সম্ভাব্যতা-অসম্ভাব্যতা মিলিয়ে স্বপ্নের একটা অদ্ভুত জগত থাকে। স্বপ্ন ভেঙে যাবার পরেও যদি তা মনে থাকে তবে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়। ওই অনুভূতির কিয়দংশও যদি আমি এনে দিতে পারি, ওই আমেজটা যদি ধরতে পারি, তাহলেই সেই স্বপ্নের জগতকে দর্শক নিজের অভিজ্ঞতার জগতে আইডেনটিফাই করতে পারবে। মনে করা যাক একজন লোক ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল—পড়ার সময় স্লো-মোশানে তার দেহটি শূন্যে দু-তিনটি পাক খেল—কেউ বসে-বসে এটা ভাবছে। এই যে চিন্তার জগতের একটি ঘটনা যদি কোনও ভিভাইস-এর সাহায্যে ব্যক্ত করতে পারি তাহলেই ওই ঘটনাজনিত অস্বাভাবিক অনুভূতিকে জাগাতে পারব। অর্থাৎ ইমেজ-এর দাবিতেই আমি তখন টেকনিক্যালিটির সন্ধান করতে থাকব।

৫ : ০

বর্তমানে আমাদের সমাজ-জীবনে অস্থিরতা বেড়ে গেছে। আজকের নাট্যপ্রয়াসকে তারই প্রেক্ষাপটে বিচার করতে হবে। স্রষ্টা ও ভোক্তা দুইয়ের মধ্যেই এই অস্থিরতা প্রতিফলিত। আজ যা দেখি, আগামীকাল তা দেখে আর সন্তুষ্ট হই না। আমার ছেলেবেলার চুষিকাঠিটি আমার পরেও ভাইবোন সকলেই পরপর ব্যবহার করে গেছে। আজকের শিশুর হাতের খেলনা পাঁচ মিনিটও টেকে না। তাও চুষিকাঠি নয়—লিওটয়। বন্দুক দিয়ে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা। বস্তুত আমাদের চাহিদা এখন পণ্যেরই চাহিদা। অস্থিরভাবে নিত্য নতুন জিনিস পেতে চাইছি। কিন্তু শিল্পসৃষ্টির কাজ কোনও চটজলদি উৎপাদনের রীতিতে হতে পারে না।

শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্তের মতো নাট্য প্রতিভারা আই পি. টি. এ. রীতির মধ্যে যে খামতি ছিল তা শুধরে নিয়ে নতুনভাবে চেষ্টা করেছেন এবং একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছেন। কিন্তু তাঁদের সীমাবদ্ধতাগুলো তাঁরা নিজেরা ধরতে পারছেন না। ফলে উত্তরসূরীদের হাতে নতুন কোনও ধারা তুলে দেওয়াও তাঁদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এখন যাঁরা চেষ্টা করেন তাঁরা ততটা ক্ষমতাবান নন। তেমন নাট্যকারই বা কোথায়? চাহিদা মেটাতে পাশ্চাত্য অনুবাদ নাটকের আমদানি চলছে। কিন্তু এই 'ফাস্ট ফুড'-টিও খিদে মেটাতে পারছে না।

শিকড় থেকে আমরা সরে গিয়েছি। ফুল ফোটাচ্ছি ঠিকই, তবে তা কচুরিপানার ফুল। কচুরিপানার মতোই ভেসে চলেছি। তবে এ অবস্থাই যে চিরস্থায়ী হবে এমনটা মনে করি না। পথ খোঁজার চেষ্টা তো হচ্ছে। বাদলবাবুরা প্রসেনিয়াম ভেঙে অন্য রীতির সন্ধান করেছেন। মডার্ন কনটেন্ট, মডার্ন ইমেজারি নিয়ে শরীরকে ব্যবহার করে ওঁরা একটা রাস্তা খোঁজার চেষ্টা করেছেন। বেশি সংখ্যক দর্শকের কাছে পৌঁছতে চেয়েছেন। সে চেষ্টা খুব একটা ফলপ্রসূ হয়েছে বলে মনে হয় না। রাস্তায় মাদারির খেলা দেখতে দর্শক সমাগম হয় বটে কিন্তু পয়সা দেবার বেলায় ভিড় পাতলা হয়ে যায়। মাদারির পেটে তবে চলে কী করে? অন্যদিকে প্রসেনিয়াম নিয়ে নানা পরীক্ষা, নানা

সন্ধানই এখনও বাকি রয়ে গেছে। অনেক নির্দেশক বা নাট্যকারই আছেন যাঁরা প্রসেনিয়ামের স্পেসের ব্যবহার, রঙ ও রেখার তাৎপর্য ইত্যাদি আদৌ জানেন না।

একজন চিত্রকর অসংখ্য ছবি এঁকে চলে। কেন? ছবি আঁকতে-আঁকতে হয়ত একটা সমস্যার উদ্ভব হয়। সে তখন ওই সমস্যাটিকেই ধাওয়া করতে থাকে। হয়ত কোনও একটি রেখাই তাকে ভাবিয়ে তুলল। অথবা Juxtapositions of Colour এমন একটা সিচুয়েশন তৈরি করল যেটাকে নিয়ে ওই ছবিতে আর কিছুই করা যাচ্ছে না। সে তখন নতুন ছবিতে হাত লাগাল। এইভাবে একটি সমস্যার সমাধানের সূত্র ধরেই নতুন সৃষ্টির আবির্ভাব ঘটে। এই সমাধানের প্রচেষ্টা থেকেই অনেক ক্যানভাস জমে ওঠে। কোনটাই ফ্যালনা নয় আবার মহত্তমও নয়। একজন নাট্যশিল্পী অবিরত কাজ করে গেলেন কিনা, তাঁর লক্ষ্য আছে কি না, কী ধরনের নাটক তিনি করলেন, অভিনয়ের মান কীভাবে বজায় রাখছেন এবং সাংগঠনিক দিকটা কীভাবে পরিচালনা করেন—এই সমস্তটাই আমার বিচার্য। নিজেকে পরিচালনা করার জন্যও একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা দরকার। চারপাশের ঘটনাবলি থেকে কি কি শুধু অভিনয়টাই শেখার? জীবন-দর্শনকেও গড়ে নিতে হবে। আমার নিজের কাজটা হল সাব-ক্রিয়েটিভ জব। ক্রিয়েটিভ কাউকে না পেলে আমার কাজেরও কোনও মানে থাকে না।

সত্যি বলতে কী, আনন্দ পাওয়ার মতো সেটের কাজ জীবনে খুব কম করেছি। অনেক নির্দেশকদের ঠিক মতো কনভে করতে পারিনি, নানা ক্ষেত্রে আমাকেই ইন্টারফেয়ার করতে হয়েছে। দায়-দায়িত্ব আমার ওপরেই বর্তেছে। ভাবনার বৈচিত্রে যে দুজন একসময় আমাকে উৎসাহিত করেছেন তাঁরা হলেন শম্ভু মিত্র ও শ্যামানন্দ জালান। শম্ভু মিত্র তো কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন আর শ্যামানন্দ জালানের কাছে আমি আর নতুন কিছু আশা করি না। অন্যান্যরা বেশির ভাগই অন্ধের মতো আমার উপরেই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। 'বাঃ, চমৎকার, খালেদদা ছাড়া এরকম হয় না'—ইত্যাদিই শুনি, আমার কাজের প্রকৃত একটা মূল্যায়ন আর হয় না। একটা চ্যালেঞ্জ সিচুয়েশন পেতে চাই। দুর্ভাগ্যবশত তা পাই না।

গঙ্গাদাকে (গঙ্গাপদ বসু) একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিলাম: 'নাটকে আমি অশিক্ষিত। উনি বললেন: সেটাই তোমার অ্যাডভানটেজ। তোমার কোনও ট্রাডিশন নেই বলে তুমি সহজেই ট্র্যাডিশন ভাঙতে পার।' সত্যিই, গুরু-পরম্পরা রক্ষার কোনও দায় আমার নেই। আমি করতে-করতে শিখি আর শিখতে-শিখতে কাজ করি। □

রঙ্গকর্মী সবাই, সর্বকর্মী কোথায়

ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়

পত্রিকার তরফ থেকে ঊষার কাছে একটি লেখার জন্য আবেদন করা হয়েছিল, বাংলায় লিখতে ঊষার কিছু অসুবিধা থাকায় **সত্য ভাদুড়িকে** দায়িত্ব দেওয়া হয় ঊষার একটি সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য।

☐ ঠিক কীভাবে, কেনই-বা থিয়েটারে এলেন ?

সময় কাটানোর জন্যেই প্রথম নাটক শুরু করি—সংগীত কলামন্দিরে যোগ দিয়ে নাটক করলাম "মিটি কি গাড়ি"—সাল ১৯৭০। আগে নাচতাম বলে বসন্তসেনার চরিত্রে আমাকে অভিনয় করতে হল। তবে এই শুরুটা মানে থিয়েটার সময় কাটাবার জন্য। সংগীত কলামন্দিরের সংগে আমার কাজ করতে ভাল লাগল না। যদিও একের পর এক ভাল প্রোডাকশন করেছি কিন্তু কিছুদিন পরেই আমার মনে হল এটা আমার জায়গা নয়, আমার পরিবেশ নয়। মনে হতো এখানে কোনও ভাল থিয়েটার করা সম্ভব নয়। ওদের অ্যাটিচুড-টা ছিল ভীষণ অ্যামেচারিশ। সময়ের কোনও ঠিক নেই, থিয়েটারেরও কোনও ঠিক নেই, রেগুলার থিয়েটার করতে চায় না ইত্যাদি। আমার এরকম মনে হওয়ার অবশ্য একটা অন্য কারণও আছে (ইনডায়রেক্টলি)। ওই সময় বাংলা থিয়েটারে আমার এক বন্ধু ছিলেন, কেয়াদি। তখন ওঁর সংগে আমার প্রচণ্ড বন্ধুত্ব। সই করেছেন আমার বিয়েতেও। 'নান্দীকার' সম্পর্কে জানতে শুরু করি তখন থেকেই। 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ-এর নাটক দেখলাম, উৎপলদার "মানুষের অধিকার" দেখলাম। এই থিয়েটারগুলোর দিকে কেমন যেন এক টান অনুভব করি। অবাঙালি হলেও, বাংলা-সংস্কৃতির প্রতি আমার একটা টান ছিল। সময়টা ১৯৭৩-৭৪ সাল। মনে হল, না এভাবে আর থিয়েটার করা যায় না—নতুন দল গড়া দরকার। তরুণদের মধ্যে যারা কিছু করতে চায়, তাদের সংগে এক বছর শুধু আলাপ-আলোচনা চালিয়ে গেলাম। আমার মনে হয়, ওই যে একটা বছর আমরা শুধু বসে-বসে কথা বলেছিলাম সেই কারণেই এখনও টিকে আছি। বিভিন্ন বিষয়ে কথাই বলেছি শুধু, দলের কী নাম হবে, কী কাজ হবে এইসব নিয়ে আলোচনা করেছি। একশো লোক এসেছিল। পরে দেখলাম সংখ্যাটা কমে কুড়ি-পঁচিশ হয়ে গেল। ঠিক হল নেতাজী মঞ্চে প্রথম থিয়েটার করব। কিছু শোনা কথা, কিছু জানা কথা এইসব

নিয়েই ভাল করে থিয়েটার করব। কিন্তু কাজের মধ্যে কোনও সঙ্কোচের ছাপ রাখব না। তিনটি নাটক করলাম। ৭৭-এর জানুয়ারিতে করলাম চেকভের "ম্যারেজ প্রোপজাল"—এটা আমি ডিরেক্ট করেছিলাম। মাঝখানে করলাম ভারতেন্দুর নাটক আর তিন নম্বরটা হল মারাঠি নাট্যকার পি. এল. দেশপাণ্ডের "বেচারা গোপাল"—ধর্মান্ধতাকে আক্রমণ করে লেখা।

রঙ্গকর্মীর যাত্রা শুরু ১৯৭৭-এ। ১৯৭৯-তে রুদ্রবাবু আরনল্ড ওয়েসকারের "রুটস"-টা আমাদের ওখানে করলেন। অ্যাডাপ্টেশনের কাজ আমরা নিজেরাই করি। নাটকটির অনেক জায়গায় শো হয়। তারপরে "জাতি পুছে শান্তি"—অনামিকাতে। তৃপ্তিদির সঙ্গে যোগাযোগ হল—"গুড়িয়া ঘর" করলাম। তারপর এম. কে. রায়নার নাটক "মা" করলাম। এই চারটে নাটকের ক্ষেত্রে আমি পরিচালকদের সহায়তা করেছিলাম।

☐ তো, আগেকার সংগঠন থেকে যে সরে এলেন, সেটা কেন? মানে নেহাতই ব্যক্তিগত কিছু, নাকি তত্ত্বগত, থিয়েটারের আদর্শগত কোনও প্রশ্ন, কোনও তফাতের জন্য?

তখন আমার মনে হতো কলকাতার হিন্দি থিয়েটার, নাচ-গান সবই উচ্চবিত্তের হাতের মুঠোর মধ্যে। মধ্যবিত্তের কোনও স্থান ছিল না, মধ্যবিত্ত শিল্পীও ছিলেন না। সবই ফ্যাশনেবল-ওয়েতে হচ্ছিল। আর্লি সেভেনটিজের কথা বলছি। কোনও ব্যাঙ্কের কর্মচারি, বাড়ির গিন্নি, ছাত্রছাত্রী, মার্কেন্টাইল ফার্মের কোনও দারোয়ান বা ইউনিভার্সিটির কোনও অধ্যাপককে দর্শক হিসাবে আমি পাইনি। আমাদের শ্রেণীর লোকজনদের তখন থিয়েটারে আমরা পাইনি। তারা টিকিট কাটত না, দেখতে যেত না। পুরো ব্যাপারটাই ছিল উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ওরা যা চাইত সেটাই হতো। মুখ্য ব্যাপার ছিল আমোদ। আমোদের জন্য থিয়েটার করতে আমার কোনও আগ্রহ ছিল না। ছোটবেলার থেকে যে পরিমণ্ডলে বড় হয়েছি, আমার বাড়ি বা চারদিকের যে পরিবেশে মানুষ হয়েছি তাতে আমার পক্ষে ওই থিয়েটারকে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। ষাটের শেষের দিকে বাংলা থিয়েটারে তখন যাকে বলে রমরমা অবস্থা। নান্দীকার, থিয়েটার ওয়ার্কশপ, এল টি জি ইত্যাদির একের পর এক প্রোডাকশন হচ্ছে। কলেজে পড়ার সময় আমি নাটকগুলো দেখেছিলাম।

☐ থিয়েটার তাহলে আপনার কাছে নিছক আমোদ, স্রেফ বিনোদনের মাচা নয়, থিয়েটারে কোনও একটা আদর্শ কাজ করছে বলে মনে করেন?

নিশ্চয়ই। এটা আগে জানতাম না। এখন বুঝতে পারি একটা সামাজিক দায় বোধহয় কোনও জায়গায় লুকিয়েছিল। থিয়েটারের কাজ মানুষকে শিক্ষিত করা, নৃত্যশিল্পী হিসেবে আমি নানা জায়গায় গিয়েছি—পারফর্ম করেছি কিন্তু ওটা করে আমি আনন্দ পেয়েছি আর আনন্দ দিয়েছি। আমার মনে হয় না নাচের মাধ্যমে কোনও লোককে আমি শিক্ষিত করতে পেরেছি—মনে হয় না কোনও লোককে ডিসটার্ব করতে পেরেছি,

এইজন্যই নাচ আমাকে শেষপর্যন্ত টেনে রাখতে পারেনি। এখন নাটক করতে গিয়ে মনে হয়, খুব কম সংখ্যক হলেও কিছু লোককে অন্তত আমি ভাবাতে পারছি, তাদের ডিসটার্ব করতে পারি, প্রশ্ন করতে পারি। কম মাত্রায় হলেও এটা আমি করতে পারছি—নির্দ্বিধায় একথা বলতে পারি। এটাই আমার থিয়েটার করার সার্থকতা। একশো জনের মধ্যে দশটা লোককেও যদি ডিসটার্ব করতে পারি···

☐ সামাজিক দায়বদ্ধতার সঙ্গে কি রাজনীতির প্রশ্ন-ও জড়িয়ে থাকে না? মানে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি আর কি।

রাজনীতিকে আমি সীমিত অর্থে দেখি না। জীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত বলে ভাবি। এটা গোষ্ঠীগত, পলিটিক্যাল পার্টির রাজনীতির কথা নয়। রাজনৈতিক চেতনার কথা। খুব কম পড়েছি হয়ত—কিন্তু আমি মার্কসবাদে বিশ্বাস করি। একটা নির্দিষ্ট মেথোডিক্যাল ওয়েতে বিশ্বাস করি। কিন্তু কীভাবে এর প্রয়োগ করা যায় তা আমি জানি না। কারণ, এটা আমার কাজ নয়। আমার কাজে আমি হয়ত অপ্রত্যক্ষভাবে এর সঙ্গে যুক্ত। জীবনে বাঁচার যে লড়াই সেটাই আমার রাজনীতি।

☐ এভাবে দেখলে জিনিসটা খুব ঢিলে হয়ে যায়, এতে ঠিক আপনার চিন্তা···ধরুন যদি এভাবে বলা যায়—আপনার নিজস্ব প্রয়োজনায় মার্কসীয় দর্শনের ছাপ কীভাবে রাখেন?

আমার প্রত্যেকটা নাটকই রাজনৈতিক। ব্রেষ্টের "মা", "মহাভোজ", "লোককথা"—সবেতেই রাজনীতি আছে।

☐ শেষের দুটোয় লড়াইটা কি সঙ্কীর্ণ নয়?

আমি এটা বিশ্বাস করি না।

☐ "লোককথা"য় জগনার লড়াই একার। সেখানে গোষ্ঠী কোথায়? এই থিয়েটার কী করে মার্কসীয় হয়?

যেখানে ট্রু-সেন্সে 'সংগঠন' ইত্যাদি বিচারপদ্ধতি যথাযথ রেখে নাটক হচ্ছে তার থেকে কিন্তু আমার এই নাটকটি বেশি সফল। আপনি যেভাবে বলছেন আমি তা করিনি, কারণ আমি সেভাবে করতে চাইনি। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি ওভাবে থিয়েটার করলে আর্ট ফর্ম-টা এত বেশি প্রচারমুখি হয়ে পড়ে যে মানুষকে নাড়া দেবার ক্ষমতা তার আর থাকে না। আমি প্রোপাগান্ডা মোটেও চাই না।

☐ আপনার নাটক দেখে দর্শকের প্রতিক্রিয়াটা একদিক থেকে তো ভুল। আপনি যা দেখাচ্ছেন লোক সেটাকেই সত্যি ভাবছে। দূরত্ব, ব্যবধান কোথায়? এভাবে কি সচেতন দর্শক তৈরি হয়? যেমন "লোককথা"য়—

না। নানাধরনের দর্শকের সঙ্গে কথা বলে আমি দেখেছি—ওরকম ব্যাপার ঘটে না। আমাদের দর্শকদের চেতনা সর্বত্র একরকমের নয়। কলকাতার দর্শকের রিঅ্যাকশনের

সঙ্গে হালিশহরের দর্শকদের রিঅ্যাকশনে তফাত আছে। কলকাতা বা লক্ষ্ণৌ-এর ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায় দর্শকরা দমবন্ধ করে বসে থাকে। একটা সায়লেন্স ছেয়ে থাকে। কোনও তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হয় না। ভীষণ ইনভলভড হয়ে পড়েন। আবার আমার মনে হয় তাঁরা খুব ডিস্টার্বড হন। এটাই আমি বেশি দেখেছি। ৮৭ থেকে পাঁচ বছর ধরে "লোককথা"-র অভিনয় চলে আসছে। প্রতিক্রিয়ার নানা দিক আমি লক্ষ করেছি। একদিকে যেমন দর্শকদের দেখে মনে হয় যেন তাঁরা ইনভলভড হয়ে পড়ে জীবনের লজিকটাই হারিয়ে ফেলেছেন। কোনও শিক্ষা বা চেতনাই তাঁদের নাড়া দিতে পারছে না। পুরো ব্যাপারটার সত্যিটাই তাঁরা নিতে পারছেন না। আবার এমনও দেখেছি তাঁরা ভাবছেন, 'সত্যি, এরকম একটা ব্যবস্থার মধ্যে এখনও আমরা আছি!' কলকাতায় ছিয়াশিটি অভিনয় হয়েছে "লোককথা"র। এর মধ্যে নানারকম প্যাটার্নে আমি এসব প্রতিক্রিয়া খোঁজার চেষ্টা করেছি। ডিস্টার্বেন্সটা খুবই হয়। সায়লেন্ট হয়ে গেল। কেউ কিছু বলতেই পারছেন না। পরে আমি জিজ্ঞাসা করে দেখেছি অনেক। একবার এক মহিলা আমাকে বললেন, 'আমি খুবই ডিস্টার্বড, এখন কিছুই বলতে পারছি না।' এই বিচলিত অবস্থাটা যে কীভাবে হয়েছে—কোনদিকে তাকে নিয়ে যাবে সেটা হয়ত তিনি পরে বুঝবার চেষ্টা করেছেন। "কোর্ট মার্শাল"-এ যেমন কোনও সংগঠিত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ দেখানো হয় না কিন্তু নাটক যখন শেষ হয় তখন একটা 'হাঃ' ধ্বনি দর্শকদের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে। 'ইস, এই ঘটছে আমার চারদিকে? আমিতে এটা হচ্ছে? রেশন ব্ল্যাক এভাবে? আমরা কোনদেশে কীভাবে রয়েছি। পুরো সেটআপ-টা তাহলে এই?'

☐ এ তো আমরা বাংলা নাটকে চারের দশকে-পাঁচের দশকেও দেখেছি।

ইট ইজ নট ফরটিজ-ফিফটিজ, আই ডোন্ট বিলিভ ইট অ্যাট অল। ইট ইজ আ কনটেম-পোরারি ইন্ডিয়া হুইচ উই আর শোয়িং ইন থিয়েটার।

☐ একটা সাদা চরিত্র আর একটা কালো চরিত্র, এইরকম শুভ-অশুভ—বাংলা নাটকে তো এটা কবেই খারিজ হয়ে গেছে।

এটা "লোককথা"-র ক্ষেত্রে হতে পারে। "মহাভোজ"-এর ক্ষেত্রে স্বীকার করা যায় না। ওখানে রাজনৈতিক চেহারাটাকে যথেষ্ট সাদায়-কালোয় দেখানো হয়েছে। ইট ইজ আ মোস্ট রিমার্কেবল প্লে—রিটিন বাই মনু ভান্ডারি। আপনি যা বললেন—সেটা আপনার দেখার ব্যাপার। আমি তা নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। আমার মনে হয় না ৪০-৫০-এর নাটক। না ফর্মের দিক থেকে না কনটেন্টের দিক থেকে। "লোককথা"য় হয়ত একটা ক্লিশে থাকতে পারে। একটা পুরনো বিষয়কে একটা দল সমকালীনতার সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছে। দ্যাটস অল, বাট নট "মহাভোজ", নট "হোলি" বা "কোর্টমার্শাল"। আমি যে চারটি নাটক পরিচালনা করেছি তারমধ্যে লোককথার স্ক্রিপ্ট সবচেয়ে দুর্বল। কিন্তু সেই দুর্বল স্ক্রিপ্টকে একটা ওয়ার্কশপের মধ্যে ফেলে

তাকে অ্যাডাপ্ট করে, পরিবর্তন করে একটা প্রযোজনায় দাঁড় করানো হয়েছে। ওর শেষে যেমন ছিল 'লাল সূর্য জাগাও'—বলে সবাই গান গাইতে চলে গেল। এই শেষটাকে কেটে পাল্টে এক মানবিক চেহারা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। একটা বাচ্চাকে দেখিয়ে বলা হয়েছে এর ভবিষ্যতটা কী? এরকম রোজই চলছে, রোজই চলে—"লোককথা" দেখে একজন বলেছিলেন 'দেশে এরকম হয় নাকি?' তো, আমি কী বলব। কাগজে তো রোজই বিহারের হরিজন হত্যার খবর থাকে। অন্ধ্রে গুলিচালনার খবর থাকে, তারপরেও যদি কেউ বলে 'হয় কিনা' তাহলে আমার আর কিছুই বলার থাকে না।

☐ আপনার থিয়েটার যদি গরিবের থিয়েটার হয় তাহলে কলামন্দির কেন? গরিবের কাছে পৌঁছনো যাচ্ছে?

বাবা আমাকে উত্তরপ্রদেশ বা বিহারে গিয়ে নাটক দেখানোর কথা বলতেন। আমি কেবল তার চেষ্টাটুকুই করতে পারি। কলকাতায় থেকে চাকরি করি। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও অনুদান পাই না বা দল থেকে আমি কোনও আর্থিক সাহায্য পাই না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থসাহায্য দলের প্রয়োজনেই লাগে। কোনও মাসিক বৃত্তি আমি পাই না বা বাংলা-থিয়েটার দলের অনেক পরিচালকদের মতো বাঁধা টাকা আমাদের জন্যে থাকে না। কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে পুরো কলকাতার গ্রুপ যত টাকা পায়—রাজ্য সরকারের থেকে সেটা পায় না। বাঁচার জন্য আমাকে একটা চাকরি করতে হয়। চাকরি করেই কলকাতায় টিকে থাকতে হয়। এখানেই আমি মানুষ হয়েছি। আমি কতটা চেষ্টা করতে পারি? ভাষার বাঁধনটা ভেঙে বাংলারই প্রত্যন্তে ঢুকতে পারি, যে বাঙালি হিন্দি জানেন না, তাঁদের কাছে যেতে পারি। কীভাবে যাব? মহানগর থেকে মফস্বল—মফস্বল থেকে গ্রাম। এই হচ্ছে আমার কাজের প্যাটার্ন। তারপরে যদি সুবিধা হয় তখন উত্তরপ্রদেশ কি বিহার পরিক্রমার কথা ভাবা যেতে পারে। এটা বলা যতটা সহজ, করা ততটা নয়। আমার মাথায় ভাবনাটা কিন্তু আছে। গত চার-পাঁচ বছর ধরে কলামন্দির থেকে বেরিয়ে এসে কলকাতার বাইরে বিভিন্ন ছোট-ছোট জায়গায় অনুষ্ঠান করছি। কাঁকিনাড়া, হালিশহর, উত্তরপাড়া, চন্দননগর এসব জায়গায় 'শো' করছি। সাধারণ বাঙালিরা কিন্তু ভাষার বাধা পেরিয়ে আমাদের নাটককে গ্রহণ করতে পারছেন। পরিস্থিতি এমন নয় যে এখনই এর চেয়ে বেশি কিছু করে ফেলব। বিহারে, উত্তরপ্রদেশে তিরিশজনের গাড়িভাড়া দিয়ে কে নিয়ে যাবে আমাদের? যোগাযোগের চেষ্টা আমি করিনি—এমন নয়।

☐ প্রসেনিয়াম রীতিই কি এক্ষেত্রে বড় বাধা নয়? তাহলে কেন এটাকেই আঁকড়ে থাকছেন?

দেখুন, আমি যেটুকু করতে পারব, ততটাই বলব। আজ বড়-বড় কথা বলে কাল আবার রবীন্দ্রসদন-গিরিশ মঞ্চ পছন্দ করলাম—এটা আমি করতে চাই না।

☐ এম কে রায়না, তৃপ্তি মিত্র, রুদ্রপ্রসাদ প্রমুখের পরিচালনায় কাজ করেছেন, এঁদের কাজের ধরনের প্রভাব পড়েছে আপনার নিজের কাজে। ঠিক কী ধরনের ঋণ…

প্রশ্নটা আমি নিজেকে করে দেখেছি। ভীষণ রুথলেসলি বিচার করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু যতটা ভাবা যায়, ততটা বলা হয়ে ওঠে না। মনে-মনে বিচারের সময় সত্যের একটা জোরালো চেহারা ধরা পড়ে, ছবির মতো সত্যগুলো উঠে আসতে থাকে—কিন্তু বলা যায় না। বলা সম্ভব হয় না।

রঙ্গকর্মীতে রুদ্রপ্রসাদ প্রমুখ যখন নির্দেশনার কাজ করেছেন আর পরবর্তীকালে আমি যখন নির্দেশনার কাজ করলাম—এই দুই পর্যায়কে দুটি আলাদা ধারা হিসাবে ধরা যেতে পারে। অর্থাৎ, চুরাশি পর্যন্ত একটা ভাগ আর চুরাশি থেকে নব্বই আর একটা ভাগ। এ দুইয়ের মধ্যে তফাতটা কোথায়? একটা সময়ে আমাকে নানাভাবে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। নানা ফাঁদ এমনভাবে বিছানো হয়েছিল যে একটু লোভ করলেই তাতে গিয়ে পড়তে হতো। পুরো সময়টা ধরে একদিকে কলকাতার বড়-বড় বাংলা গ্রুপ থেকে আমাকে বলা হচ্ছিল, 'এসো, ডিরেক্ট করো'—অন্যদিকে শ্রীরাম সেন্টার, সঙ্গীত-নাটক অকাদেমি, লক্ষ্ণৌ থেকে ডাক আসছে। পাঁচ-আট-দশ হাজারি অফার। থাকা, পরিবহন ইত্যাদি। আমি সবই নাকচ করে যাচ্ছিলাম।

যে চারটে নাটক এঁরা ডিরেক্ট করেছিলেন সবই তাঁদের যার-যার দলে আগে অভিনীত হয়েছিল। "পরিচয়" নান্দীকারে, বহুরূপীতে "পুতুলখেলা (গুড়িয়াঘর)" আগেই হয়ে গেছে। রায়নাও আগেই করেছেন ব্রেখট-এর "মা", শরৎ শেঠ করেছেন "জাতি পুছে শান্তি।" এই প্রোডাকশনটির সঙ্গে আমি কোনওভাবেই একাত্ম হতে পারিনি, ভীষণ আউটডেটেড মনে হয়েছিল। রঙ্গকর্মীর ওটা করা উচিত হয়নি। আজ ভাবি, রঙ্গকর্মী আজকের এই চেহারাটা কোথা থেকে পেল, কার কাছ থেকে পেল। রুদ্রবাবুর সঙ্গে কাজ করার সময় কোনও নতুনত্ব বা উদ্দীপনার আভাস পাইনি। হয়ত কেয়াদির মৃত্যুর কারণে উনি কিছুটা বিপর্যস্ত ছিলেন। একটা কাজের প্রয়োজন ছিল তাই আমাদের গ্রুপে এসেছিলেন। একটা 'প্লে' ঠিক যেভাবে তৈরি হয় "পরিচয়" সেভাবে হয়নি। নিজেরাই হয়ত কিছুটা অ্যাডাপ্টেশন করে, রিহার্সাল দিয়ে কাজ চালিয়েছিলাম। কিন্তু সত্তর-আশিটা শো হয়েছে নাটকটার। এখন ভাবি, কেন করেছিলাম? ওয়েসকারের "রুটস" এখন দশবার বিচার করেও আমি করব না। "গোস্ট" করতে বললেও করব না। কেন করব? মায়ের চরিত্রে অভিনয় করতে পারি বলে? না, নিজের অভিনয়ের জন্য আমি থিয়েটার করি না। পাঁচ জনে পাঁচটা মনোমতো চরিত্র বেছে নিয়ে গ্রুপে চলবে এমন একটা নাটক করলাম—এটা আমার রাস্তা নয়। রুদ্রবাবু "ডলস হাউস" করতে বলেছিলেন। কিন্তু কেন "গুড়িয়াঘর(ডলস হাউস)" করলাম জানি না। জানি না কেন পুনরাবৃত্তির পথে গেলাম। কিন্তু "গুড়িয়াঘর" করতে গিয়েই তৃপ্তিদির সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল। সেরা এক থিয়েটার কর্মীর বাইরেও উনি ছিলেন সত্যিকারের একজন ভালমানুষ। কাজের মধ্যে ওঁর সাথে আমার

নানা বিষয়ে মতপার্থক্য ছিল। অভিনয়-প্রক্রিয়া নিয়ে ভাবনায় কিছু অমিল ছিল। বাট আই ওয়াজ এ ভেরি ডিসিপ্লিনড অ্যাকট্রেস। তা ছাড়া, ওঁর সঙ্গে কাজ করার একটা সুবিধে ছিল—উনি প্রথমেই অনেস্টলি বলে দিয়েছিলেন, 'উনি (শম্ভু মিত্র) যা করেছেন তার চেয়ে বিশেষ কিছু পালটাতে পারব না। আমি ওটাই করব।' যদিও খালেদদা নতুন সেটের কথা ভেবেছিলেন। প্রোডাকশনটা চেঞ্জ হবে ভেবেছিলেন। সেটা হয়নি। নাটকটার অনেক শো হয়েছে, রঙ্গকর্মীর পরিচিতি বেড়েছে, অভিনেতারাও সমাদর পেয়েছেন। তবু কোথাও একটা 'কিন্তু' রয়ে গেছে। এরপরে "জাতি পুছে শাতি" আমাকে পরিচালনা করতে বলেছেন অনেকেই। কিন্তু আমি সাহস পাইনি। আমি বললাম : আমি একজন সংগঠক, এটা আমি পারব না।

এবারে রায়নার কথা বলি। আজকের রায়নার সঙ্গে দশবছর আগের রায়নার অনেক তফাত। আজ উনি আমাকে শেখাচ্ছেন : তুমি মূর্খ, আদর্শ নিয়ে বসে আছ! কেন আমি এটা-সেটার সুযোগ নিচ্ছি না, বারে-বারে সেটাই আমাকে বলতে থাকেন। বলছেন : আদর্শের পিছনে ছুটে তুমি মরবে। দশবছর পরের এই রায়না! কিন্তু ৮২-তে উনিই একটা দল, তাঁর আদর্শ, পড়াশোনা, রাজনৈতিক চেতনার কথা বলতেন। দলের মধ্যে একটা উদ্দীপনা এনেছিলেন উনি। "পরিচয়", "গুড়িয়াঘর" পর্যন্ত জনা আট-দশ মিলেই নাটক করে এসেছি। রায়নাই কিন্তু একটা টোটাল টিমকে দাঁড় করান, তার বিহেভিয়ার ইত্যাদির নির্মাণ করে যান, যে দলটাকে পরে আমাকে চালাতে হল। ব্রেষট এর "মা" করার সময়েই দেখলাম একটা শিক্ষা, একটা চেতনা কীভাবে দলের শিল্পীদের উদ্বুদ্ধ করে তুলল। বিভিন্ন পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা মোটামুটি এই। এর মধ্যে কার প্রভাব কতটা আপনারা (বিচার করবেন)···

☐ "মহাভোজ", "লোককথা" দেখে আমার মনে হয় রায়নার যথেষ্ট প্রভাব আছে আপনার নাটকে। যেমন ধরুন, ফিজিক্যাল অ্যাকটিং, ভোকাল অ্যাকটিং-এর ব্যাপারটা—এ-দুটোই আপনি ব্যবহার করেন। রায়নার বেশ কিছু প্রযোজনায় আমরা এ-দুয়ের সুস্পষ্ট ব্যবহার, এর উপর জোর দিতে দেখেছি। এ সম্পর্কে আপনি কী বলেন?

এক্ষেত্রে রায়নার থেকে ব্রেষটিয়ান পদ্ধতিই আমি বেশি ব্যবহার করেছি। বলা ভাল, নিজের মতো করে নিয়ে আমি কাজ করেছি। আমি আসলে টোটালিটিতে বিশ্বাস করি।

☐ না, মানে এখানে একটা সমস্যা থেকে যায়, যেমন আপনার থিয়েটারে ইনভলভমেন্টটাই প্রধান হয়ে ওঠে। ব্রেষটিয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটা তো মেনে নেওয়া যায় না?

আমার কতকগুলো নাটকে হয়ত পুরোটাই 'রিয়্যালিস্টিক অ্যাপ্রোচ' আছে। প্রশ্ন উঠতে পারে : তবে ব্রেষটের সাথে মিল কোথায়? আমার মনে হয় বিশেষত "লোককথা"-য় কয়েকটা জায়গা আছে যেখানে 'ইনভলভমেন্ট'ই শুধু নয়, ওই 'ছাড়া' (অ্যালিয়েনেশন)

ব্যাপারটাও আছে। অনেক জায়গাই সম্পূর্ণ বৌদ্ধিক।

বিরাশির পরে আমার কাজের ধারা অন্যদিকে মোড় নিয়েছে। "লোককথা"-য় রায়নার প্রভাব আছে এটা অনেকের ধারণা। তবে আমি তা মনে করি না। বরং দল গঠন ও পরিচালনার ব্যাপারে রায়নার অবদান অনেকটাই রয়েছে। তবে উনি এখন যেভাবে কাজ করেন—তিন-চারটে ছোট চরিত্র নিয়ে ইবসেন, পিরানদেল্লো কিংবা বেকেট থেকে একটা নাটক বেছে নেওয়া—ওতে আমার বিশ্বাস নেই। আমি শেখাতে চাই, নতুন লোক তৈরি করতে চাই। কালেকটিভ ওয়ার্ক-এর মধ্যে একটা গ্রুপ থিয়েটার গড়ে তোলার প্রেরণা অবশ্যই রায়না দিয়ে গেছেন, অত্যন্ত ভালভাবে উনি এটা আমাদের বুঝিয়েছিলেন। আলাদা করে কিছু বলা নয়, "মা"-এর রিহার্সালেই ওই বোঝানোর পালা চলেছিল।

"লোককথা"র ব্যাপারটা বলি। প্রবীর (গুহ) আমাকে খুব বলত, 'ঊষাদি, আমার সাথে থিয়েটার করো।' বাদলবাবুদের কয়েকটি নাটক আমার দেখা ছিল। প্রবীরকে বললাম, 'আমি কেন করব? আমি তো তোমার থিয়েটারে বিশ্বাস করি না।' আদর্শ বা মানসিকতার ফারাক থাকলেও প্রবীরের সাথে আমার সম্পর্ক বন্ধুত্বের। ওই ধরনের থিয়েটারে আঙ্গিকের একটা বাড়াবাড়ি লক্ষ করেছি আমি। একটা সাজানো, বানানো ব্যাপার বলে মনে হতো। নাটকে নানান বিষয়ে ওরা কথা বলত: কখনও মেয়েদের সমস্যা, কখনও বেকারি। সব কেমন যেন ছড়িয়ে দিত, দর্শক যাবার সময়ে মূল বক্তব্য হিসাবে কিছুই নিয়ে যেতে পারত না। দুই পদ্ধতিকে মিলিয়ে একটা রাস্তা বের করার কথা মাথায় এল। যেটা প্রসেনিয়ামে হবে সেটা খোলামাঠেও হবে। মাত্র দুটো স্পট ব্যবহার করেও কিন্তু যে কোনও জায়গায় "লোককথা" করা সম্ভব। নাটকে অভিনেতারাই দেওয়াল তৈরি করে ভেঙে আবার মানুষ হয়ে যায়। প্রয়োগের এই সারল্য "লোককথা"য় আছে। সেট বাবদ এন. এস. ডি. একলক্ষ টাকা খরচ করেছে, আমরা করেছি সাড়ে চারহাজার টাকা। সেট নিয়ে যেখানে-সেখানে চলে যেতে পারব, মানুষের সঙ্গে সরাসরি একটা সংযোগ ঘটবে। মেক-আপ, কসটিউম কিছুই লাগবে না, কিন্তু জবরদস্ত, জোরালো একটা ব্যাপার করতে পারব, মানুষকে ধাক্কা দিতে পারব। এই সরল পন্থায় ধাক্কা দেওয়ার ব্যাপারটা "লোককথা"য় অনেকটাই সম্ভব হয়েছে।

অনেকেরই ধারণা হয়েছিল ঊষা গাঙ্গুলি হয়ত এই ফর্ম-এরই চর্চা করে যাবে। কিন্তু পরের নাটকে ("হোলি") ওই ফর্মকে ভেঙে ফেলা হয়েছে। ইয়ুথদের একটা ফ্রাসট্রেশনকে ধরা হয়েছে—বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটা শৃঙ্খলা আনা হয়েছে। "হোলি"র স্ক্রিপ্ট নিয়ে আমি সন্তুষ্ট এমনটা নয়। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ কোনও ছবি ওতে নেই। আমি অন্তত বিশ্বাস করি না যে গোটা দেশের ছাত্রদের আজ এটাই চেহারা। কিন্তু যা দেখানো হয়েছে সে চেহারাটিও বড় সত্য আর সেই কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দুত্বকে সংস্কৃতির নামে কীভাবে আমাদের মাথায় চাপিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে আর অন্যদিকে

ব্যবসায়ীদের উপরে তোলা হচ্ছে—ইট বেশি তৈরি হলে তো তাদেরই লাভ—এইসব ওই নাটকের প্রেক্ষাপট।

☐ আপনার নাটকে প্রায়শ 'খুন', 'মৃতদেহ' এইসব থাকে। এগুলো কি মোটিফ হিসাবে আসছে?

নো, ইট'স নট দ্যাট। মৃত্যুর যে মরবিডিটি বা নৈরাশ্য—একটা নেগেটিভ আসপেক্ট—তা কিন্তু আমি চাইনি। 'মৃতদেহ'রা এসেছে কীভাবে আমি জানি না। এটা আনকনশাসলি ঘটেছে।

☐ কিন্তু আপনি তো অন্যের স্ক্রিপ্ট পড়েই নাটক নির্বাচন করেন। সেক্ষেত্রে 'আনকনশাসলি' বলি কী করে?

মার্ডার ইজ নট সো ইমপরট্যান্ট ফর মি। "কোর্ট মার্শাল" করার আগে মৃত্যু ব্যাপারটা এতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে আমি ভাবিনি। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হল নতুন যে নাটকটা করতে যাচ্ছি, তাতেও মৃত্যুর ঘটনা রয়েছে। আমি নিজেই অবাক, কিন্তু ঠিক কেন এটা বারবার ঘটে চলেছে, নিজেকে প্রশ্ন করে তার কোনও সদুত্তর আমি পাইনি।

☐ আপনার নাটকে নারী সবসময়ই নির্যাতিত, নিপীড়িত। কোর্টমার্শালে নারী চরিত্র নেই কিন্তু নারী নির্যাতিত তার উল্লেখ আছে। এটা কেন? সত্যিই কি আপনার এতটা মনে হয়? তাহলে আপনি নিজে বেরিয়ে এলেন কী করে?

এর সত্যতা অবশ্যই আছে। আমি বা আমার মতো গুটিকয়েক ব্যতিক্রম থাকতেই পারে। কিন্তু এতে সাধারণ কোনও চেহারা ফুটে ওঠে না।

☐ কিন্তু আপনার মার্কসবাদ! সেখানে মেয়েরা আলাদাভাবে নিপীড়িত, শ্রেণীর বাইরে, একথা কি বলা যায়?

আমি তো একথা বলার জন্য থিয়েটার করিনি—ওটা এসে গেছে!

☐ এ তো ফেমিনিজম। আপনি বিশ্বাস করেন?

আপনি কি "বামা" দেখেছেন? জেনেশুনে কখনও কোনও ফেমিনিস্ট চিন্তার বশবর্তী হয়ে কাজ করিনি। এ ধরনের ফ্যাশনেবল কোনও আইডিয়া আমার নেই। আর মার্কসবাদে বিশ্বাস করার অর্থ এই নয় যে আমার দেশের বাস্তব চেহারাটাকেই আমি অস্বীকার করতে থাকব।

☐ আপনার করা নাটকগুলো—"লোককথা", "মহাভোজ", "হোলি", "কোর্ট-মার্শাল" সবই আগে হয়েছে, অন্যরা করেছেন। নাটক নির্বাচন থেকে মঞ্চায়ন পর্যন্ত পরিচালকের যে স্বাধীনতা সেটা আপনি···

এই নাটকগুলো আগে যারা করেছে, অর্থাৎ এন. এস. ডি.-র "মহাভোজ", রত্নাকর

নাদকারের "লোককথা" কিংবা বিজয় মেহতার "হোলি" আমি আগে দেখিনি। হ্যাঁ, অনেকসময় এরকম হয় যে বহু আলোচিত কোনও একটি নাটকের একটা প্রোডাকশন দেখার পরে সেটা করার কথা ভাবা হল। আমার ক্ষেত্রে অবশ্য এরকম হয়নি। আমাদের নাটক দেখে দর্শক, বন্ধু, নির্দেশক কিংবা সমালোচকদের মধ্যে অনেকেই বলেছেন যে নাটকগুলো সমাদৃত হবার একটা প্রধান কারণ হল এদের স্ক্রিপ্ট। এটা সত্যি যে নাটকগুলো আমরাই প্রথম অভিনয় করিনি। তবে এটা নেহাতই অ্যাক্সিডেন্ট বলা যায়। আসলে, এমন নাটকই নির্বাচন করি যা সহজে বেশিরভাগ দর্শকের কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠতে পারে। তাই 'আগে অন্য কেউ করেছে' কিংবা 'আমিই প্রথম করলাম'—এসব দৃষ্টিভঙ্গিতে আমার বিশ্বাস নেই। "মহাভোজ"-এর ক্ষেত্রে যেমন আমার মনে হয়েছিল ওর মধ্যে এমন কিছু উপাদান আছে যা সমকালীন রাজনীতির একটা প্রকৃষ্ট চেহারাকে তুলে ধরতে পারে। ভীষণ অ্যাপিল করেছিল নাটকটা। "হোলি"টাও একটা ওয়ার্কশপ প্রোডাকশন হিসাবে যথেষ্ট আকর্ষণীয় বলে মনে হয়েছিল। রিহার্সালের শেষ পর্যায়ে আমরা কেতন মেহতার ফিল্মটা দেখি। খুব খারাপ লেগেছিল। কেতনের ছবি আর আমাদের নাটক একেবারেই আলাদা। বিষয়কে দেখার মধ্যেই ফারাক রয়েছে। নাটক লেখার দাবি উঠতে পারে। সে চেষ্টা যে করছি না তাও নয়। একটা গল্পকে অবলম্বন করে পরবর্তী নাটকের স্ক্রিপ্ট আমি নিজেই করেছি। গল্পটা একজনকে বলেছিলাম। শুনেছি সে ওটা ফিল্ম করবে। তাতে অবশ্য আমার কিছু এসে যায় না। সে কীভাবে ফিল্মটা করবে আমি অনুমান করতে পারি। আমি নিজের মতো করে স্ক্রিপ্ট করছি। আগে কখনও লিখিনি। নানাদিক নিয়ে ভাবতে হচ্ছে।

☐ গণনাট্য সম্পর্কে আপনার কী মনে হয়? এ ধরনের আন্দোলনের কোনও প্রাসঙ্গিকতা আছে কি?

গণনাট্যে নিশ্চয়ই আমি বিশ্বাস করি। এ ধরনের আন্দোলন এখন করতে গেলে বর্তমান অবস্থার কিছু পরিবর্তন করার দরকার হবে। মাস থিয়েটার যারা করছে—গণনাট্য বা গ্রুপ থিয়েটার যাই বলুন—যেভাবে এখন থিয়েটার করা হচ্ছে তাতে আমি অন্তত সন্তুষ্ট নই।

☐ তাহলে আপনার স্বপ্নের থিয়েটারটা কী?

আমি স্বপ্ন দেখি যে থিয়েটারকর্মীরা মুখে যতটা বলেন, অন্তত ততটা মানুষের কথা ভেবে থিয়েটার করবেন। রোজই ভাবি, মুখে যতই মানুষের জন্য থিয়েটার করার কথা বলি না কেন, আমরা কিন্তু আসলে আমাদের জন্যই থিয়েটার করি। দশ বছরে এমন একটা ধারণা আমার হয়েছে। মানুষের কথা আমরা কেউই ভাবছি না। নাটক-নির্বাচন ইত্যাদির পেছনেও নানা ধরনের ইগো-ক্ল্যাশ থাকে। আমরা আমাদের জন্য চিন্তা করি। হাউসের জন্য, কাউন্টারের জন্য চিন্তা করি। নিজের অ্যাম্বিশন আর নাম নিয়ে ভাবি। 'মানুষ' আস্তে-আস্তে সরে যায়। সততার ভীষণ একটা অভাব রয়েছে আমাদের। ওটা

না হলে কিছুই হবে না। না গণনাট্য, না গ্রুপ-থিয়েটার—কোনওটাই হবে না।

☐ আপনার 'মানুষ-মানুষ' তত্ত্বে রাজনীতি কোথায় ?

আমি 'মানুষ'-'মানুষ' বলে রাজনীতিকে উড়িয়ে দিতে চাইছি না। কিন্তু মানবিক মূল্যবোধ সমাজ বা রাজনীতি সবকিছুকেই টেনে ধরতে পারে তো ? আমি যদি কাজের মধ্যে সময়টাকে ধরতে পারি আমার সাফল্য হবে না ? প্রোপাগান্ডা না করে ইন রিয়্যাল সেন্স একটা চেহারা যদি তুলে আনতে পারি, সেটা একটা কাজ নয় ?

☐ বামফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারে একবার নেমেছিলেন, কেন ?

সবাই মিলে আমাকে বলল, তাই করলাম। ভারতবর্ষের অন্যান্য সরকারকে দেখে, তুলনা করে, একান্ত নিজের অভিজ্ঞতাবশত এই সরকারকে আমি সমর্থন করেছি। সংস্কৃতির বিকাশের জন্য অন্য কাউকে এত কিছু করতে দেখিনি। আমি এই সরকারকে বিশ্বাস করি।

☐ আপনার চিন্তা আপনার থিয়েটার-আদর্শ তার সঙ্গে এই সরকারের সম্পর্ক কতটা ? এই সরকারও গরিবের উপর গুলি চালিয়েছে, চালায়নি ?

বিরোধ নিশ্চয়ই জাগে। বিভিন্ন ঘটনার প্রতিফলনে নানা প্রশ্ন তৈরি হয়। আমাকে কিন্তু কেউ কিছু চাপিয়ে দিতে পারে না। আমি এখনও এতটাই সতেজ যে কেউ জোর করে 'এটা করো' বলে কোনও কিছু আমাকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারবে না। না সরকার না দর্শক কারুর পক্ষেই আমাকে এভাবে বলা সম্ভব নয়। হয়ত কাল বলবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত পারেনি। কেউ বলেনি 'এরকম' থিয়েটার করুন। এই সবলতা আমার রয়েছে।

☐ এরপরও বিশ্বাস ! প্রতিবাদের বদলে ?

ঘটনাগুলো নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, আলোচনা হয় এমনকি প্রতিবাদও হয়। তার কোনও প্রচার হয়ত হয় না। আপনি কীভাবে জানেন প্রতিবাদ হয় না, প্রতিবাদ কি শুধু কাগজেই হয় ?

☐ কিন্তু এই সরকারের হয়ে প্রচার করেছেন বলে গ্লানি হয় না ?

সবচেয়ে ভাল হতো যদি আমাদের 'নির্বাচনী নাটক' দেখতেন। তাতে অন্তত এটা পরিষ্কার হতো যে নির্বাচনী-নাটকে শুধুমাত্র সো-কলড প্রোপাগান্ডা বা পলিটিক্যাল প্লে-ই হয়না। নাটকে একটা হিউম্যান ভ্যালুও থাকে।

আমার এ সরকারে বিশ্বাস আছে। আমি এমন কোনও সম্পর্কে বিশ্বাস করি না যে এই সরকার আমাকে কিছু দিল না তো আমিও কিছু করলাম না বা কখনও কাছে থাকছি কখনও দূরে যাচ্ছি। সরকারের সঙ্গে আমার তেমন কোনও লেনদেনের যোগাযোগ নেই।

☐ ইদানীং অভিনয় করছেন না বললেই চলে, কেন ?

কতগুলো প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম থাকে। "মহাভোজ"-এর নির্দেশনার কাজ করতে গিয়ে মনে হয়েছিল, পঞ্চাশটা ব্লোক নিয়ে কাজ করছি, তার উপরে নিজে অভিনয়ে থাকলে সমস্যাটা বাড়বে। কিন্তু "লোককথা"য় আমার অভিনয়ে থাকা সম্ভব হয়েছিল। নিজের কথা নাই-বা ভাবলাম। সময়ের টানে আমার প্রয়োজন হয়েছিল, পরবর্তীকালে আবার হয়ত হবে। নিজে অভিনয়ে নেই, তাই নাটকটা নির্বাচন করলাম না—এটা আমার কাজের ধরন নয়। এই রীতিটাই চলে আসছে। "কোর্ট মার্শাল"-এও কোনও মহিলা চরিত্র নেই। নাটকটা এত জোরালো যে নিজের অভিনয়ে থাকার সুযোগ নেই বলে নাটকটা বাতিল করে দেব—এটা আমি ভাবতে পারিনি। এধরনের শিক্ষা আমার নেই তাই ফাঁদে পড়িনি। যদি 'গুড অ্যাকট্রেস' হই সেক্ষেত্রে নিজে অভিনয় করলাম আর সঙ্গে পনেরোজনের একটা টিমকেও তৈরি করে নিলাম—এতে নাটকেরই লাভ। কিন্তু অনেকদিন অভিনয় করছি না, বসে আছি, সেই কারণে একটা নাটক বাছা আমার উদ্দেশ্য নয়। "বামা"-তো করেছি। "বামা"-র তুলনায় "কোর্ট মার্শাল" বেশি করছি কারণ দ্বিতীয়টি অনেক বেশি মিনিংফুল নাটক। একটা সময়ে, দারিয়ো ফো-র নাটকে তখন আমি আর সন্তুষ্ট নই, ভাবছি ভারতবর্ষের মেয়েদের কোনও সমস্যা নিয়ে নাটক করতে পারি কিনা। দু-রাত্রি জেগে নিজে চেষ্টা করেছি, ছটফট করেছি কিন্তু লিখতে পারিনি। "বামা"-র একটা প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু "কোর্ট মার্শাল" যেভাবে ধাক্কা দেয়, ভাবায়, স্তব্ধ করে রাখে, "বামা"-য় তেমন কিছু ঘটে না। অবশ্য নাটকের শেষাংশে জার্নালিস্ট মেয়েটিকে খুন করে যখন আত্মহত্যা বলে চালাবার চেষ্টা হয় তখন একটা মুহূর্ত গড়ে ওঠে।

☐ আপনার দলের অভিনয়ের স্টাইলে "আক্রোশ" (ফিল্ম), "চক্র" (ফিল্ম)—ইত্যাদির একটা টাইপ পাওয়া যায়। কিন্তু পরিচালকের নিজের চিন্তা, তিনি যেভাবে শেখান তাঁর মধ্যে তো একটা স্বকীয়তা থাকে। যেমন ছিল অজিতেশের, যেমন আছে বহুরূপীর, পি এল টির? আপনার দলে এরকম কোনও নিজস্বতা দেখি না কেন?

আপনি যা বললেন এটা একটা কমপ্লিমেন্ট। আমি নিজস্বতা খুঁজতে চাই না। দলের ছেলেদের উৎপল দত্ত বা শম্ভু মিত্র বানাতে চাই না। কোনও নিজস্বতাকে আরোপিত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আই ডোন্ট বিলিভ ইন ইট। বলতে বাধ্য হচ্ছি, এটা বাংলা থিয়েটারকে নষ্ট করেছে। প্রত্যেকেই চায় তৃপ্তিদির মতো অভিনয়। আমি চাই না।

☐ না, না, এভাবে নয়। আমি বলতে চাইছি, ঊষা গাঙ্গুলি নির্দেশিত অভিনয়েরই নিজস্বতা নেই যেন, বেনেগালের, নিহালনির ছবির অভিনয়ের সঙ্গে গুলিয়ে যায়। এরকম কেন?

এটা আপনার দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। একথা প্রথম শুনলাম আমি। ব্যক্তিগত অভিনয়ের বদলে দলগত অভিনয়ের উপরেই আমরা বেশি জোর দিই। কোনও সুপার-স্টার প্রথায়

আস্থা নেই আমার। নিজস্বতা বলতে এটাই যে আমি একটা টিম তৈরি করতে পারি—তাদের কাছে সরল মানুষের একটা সহজ জীবনের চেহারা হাজির করাতে পারি। দলের যে ছেলেটি 'ছাত্র' চরিত্রে অভিনয় করে তখন সে ছাত্রই, 'রাজনৈতিক নেতা'র চরিত্রে নিজেকে প্রয়োজনানুসারে পালটে নিতেও সে সক্ষম। আবার "কোর্ট মার্শাল"-এ ব্রিগেডিয়ারের অভিনয়ে কখনওই পুনরাবৃত্তি করে না। সকলেই ঈর্ষা গাঙ্গুলির অভিনয়-ধারার অনুবর্তী হবে আর সেটাই দলের অভিনয় ধারা হিসাবে চিহ্নিত হতে থাকবে—এটা আমি কখনও চাইনি। এ রীতির বাইরে নিজেদের রাখতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। ভবিষ্যতেও এ কাজ করব না। নিজস্বতা দিয়ে নাটকের ক্ষতি করতে পারব না। এভাবে চললে থিয়েটারের মঙ্গলই হবে। জেনেশুনেই এটা করছি। দলের ছেলে-মেয়েদের আমি একেবারেই অভিনয় শেখাই না। চাই না, ওরা আমার স্টাইলে অভিনয় করুক। রিহার্সালে, ক্লাসে একটা জিনিসই বারবার শেখাই—কীভাবে অভিনয়ে কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগানো যায়। পনেরো মিনিট এই আলোচনা, তারপর মিনিট দশেকের শরীর-চর্চা। এবার রিহার্সাল শুরু।

☐ এখনকার বাংলা নাট্যচর্চা আপনার চোখে কেমন লাগছে ?

'গান্ধার'-এর "নীলাম নীলাম" ভাল লেগেছে। তবে পুরো থিয়েটারটাই এখন একটা আধা-বাণিজ্যিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি এতে বিশ্বাসী নই। নানারকম প্রশ্ন আছে আমার, আবার সততার সঙ্গে সে সব প্রশ্ন তোলারও অনেক সমস্যা আছে। অজান্তে বা জ্ঞাতসারেই এই আধা-বাণিজ্য বাংলা থিয়েটারের নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে। নানাভাবে। কখনও পারিবারিক, কখনও ব্যক্তিগত বা কখনও সামাজিক চেহারা নিচ্ছে এটা। অত্যন্ত বিপজ্জনক এক প্রবণতা। বিভাস বলছিল, 'এই যে আপোস (কমপ্রোমাইজ) আমরা করছি, তার জন্য মূল্য দিতে হবে (রি-পে করতে হবে)।' "দায়বদ্ধ", "নাথবতী অনাথবৎ", "মাধব মালঞ্চী কইন্যা", "অলকানন্দার পুত্রকন্যা"—ইত্যাদি দেখেছি। কিছু প্রশ্ন ছিল—যা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি বা পরে করতে চাই। যে প্রশ্নটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে, তা বোধকরি কিছুকাল পরে ইতিহাসের প্রশ্ন হয়ে যাবে। আমার কেমন যেন মনে হয় একটু চমককে, গিমিককে আমরা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে চলেছি। একটা বৃহৎ দেশ, মানুষ ও সামাজিক প্রেক্ষাপটকে সুকৌশলে ব্যবহার করে—সামাজিক অবস্থার একটা ছকের মধ্যে—মানুষের দৈনন্দিন বিড়ম্বনা ইত্যাদি বিষয়কে নিয়ে আমরা একটু শরৎচন্দ্রীয় রাস্তায় চলে যাচ্ছি। এটা ঠিক নয়।

☐ প্রিয় অভিনেত্রী, নাট্যকার কে বা কারা ?

তৃপ্তিদি আর কেয়াদির অভিনয় আমার ভাল লাগত। ব্যক্তিগতভাবে থিয়েটারকর্মী হিসাবে নানা বিষয়ে আমি ওঁদের কাছে ঋণী।

সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে কোনও নাট্যকারের কাজ দেখেই আমি তেমন খুশি নই। আমার মনের চাহিদা থেকেই গেছে। একটা সময়ে বিজয় তেন্ডুলকর বা মোহন

রাকেশের নাটক ভাল লাগত। এখন লাগে না। পদাতিকের "বারিষওয়ালা" প্রোডাকশন হিসাবে ভাল তবে ওটা করার দরকার কী ছিল আমি জানি না।
এখন উই আর ডুয়িং থিয়েটার ফর থিয়েটার'স সেক। সেদিন ক্লাসে প্রশ্ন করেছিলাম: জীবনের একটা টুকরো বলে মনে হয় এমন একটা নাটকের নাম বল তো? বেরিয়ে এসে সে আলোচনার কথাও সব ভুলে গেছি।

☐ বাঙালি নাট্যকার—কার নাটক ভাল লাগে? নির্দেশক হিসাবেই বা কাকে ভাল লাগে?

বাঙালি নাট্যকারের মধ্যেও এখন তেমন কাউকে দেখি না। বাদলবাবুর অধিকাংশ নাটকই বহু অভিনীত, আমি রিপিট করতে চাই না। আর, রবীন্দ্রনাথের নাটক করার ক্ষমতা যখন হবে তখন নিশ্চয়ই করব।
নির্দেশকদের মধ্যে বিভাস চক্রবর্তী, রমাপ্রসাদ বণিক, মেঘনাদ ভট্টাচার্য এঁরাতো আছেনই। তবে এঁদের কারও কাজকেই আমি আদর্শ বলে গ্রহণ করতে পারব না।
বাংলা থিয়েটারে কর্মীর সংখ্যা কমে গেছে। বিশেষত, মেয়েরা তো আসতেই চায় না।

☐ আপনার চারপাশের, সবচেয়ে কাছের বাস্তব নাটকে নেই কেন? পশ্চিমবঙ্গ আপনার নাটকে কতটা উপস্থিত?

পরিপার্শ্ব থেকে আমি বিচ্ছিন্ন নই। সবে তো কাজ শুরু করেছি, পশ্চিমবঙ্গের বিষয়বস্তু হয়ত ভবিষ্যতে আমার নাটকে আসবে।
"লোককথা", "মহাভোজ" যদি বহু ব্যবহৃত বিষয়ের নাটক হয় সে ক্ষেত্রে "কোর্ট-মার্শাল" নিশ্চয়ই একটি ব্যতিক্রম। তবে "লোককথা" করেই আমি সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছি। সাধারণ মানুষের কথা ভেবেই এ নাটকের উপস্থাপনাকে যথাসম্ভব সরল করা হয়েছিল। প্রচলিত শিক্ষায় অশিক্ষিত সরল মানুষদের দেখাতে পারলে নাটকটি সত্যিই সার্থক হয়ে উঠত।
দলে ট্রেনিং চলে রোজই। ভীষণ চর্চা করতে হয়। কেউ হয়ত ভীষণ অহঙ্কারী হয়ে উঠেছে—তার ভুল ধারণা ভাঙতে হবে। সবাই মিলে গোল হয়ে বসে হাসি ঠাট্টা শুরু হল। সদস্য কেউই দল ছেড়ে যায়নি। বাংলা থিয়েটারের মতো দল ছেড়ে দল গড়ার প্রবণতা আমাদের মধ্যে এখনও দেখা যায়নি। আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা শুরু হলেই আলাদা দল গড়ার ঝোঁক দেখা যায়। আমাদের সমস্যাটা বরং উল্টো—কেউই ছাড়বে না দল। বলা যেতে পারে দলে থেকে দলের কষ্ট বাড়াচ্ছে! ষোল বছরের 'রঙ্গকর্মী' থেকে 'সঙ্ঘকর্মী' আর হচ্ছে না। ☐

দাস-সংস্কৃতি

নির্মল ঘোষ

আমাদের বাড়ির আত্মীয় পরিজন সবারই খুব অল্প বয়স থেকে নাচ, গান আর নাটক বা যে কোনও সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা যেন নিত্য-কর্মের মতো ব্যাপার ছিল। তাই ছোটবেলা থেকে বড়দা (নিমাই ঘোষ—"ছিন্নমূল" খ্যাত) মেজদা (জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ), চারুদা (চারুপ্রকাশ ঘোষ) ও দাদার (অমলেন্দু ঘোষ) প্রভাবে যেমন একাধারে সুভাষচন্দ্র, গান্ধীজি, শরৎ বোস, নীহারেন্দু দত্তমজুমদার (তখন কমিউনিস্ট), নৌসের আলির বক্তৃতা শুনেছি, আবার তেমনই সামনে বসে শুনেছি আবদুল করিম, রোশনারা বেগম, কেশরী বাইয়ের গান। আর জ্ঞান গোঁসাইয়ের রেওয়াজ মেজদার সঙ্গে শুনেছি সারপেন্টাইন লেনের বাড়িতে, বাণীর (বাণী কোনার) সঙ্গে উঠোনে জল-কুমীর খেলতে-খেলতে।

আজ যাঁরা কিংবদন্তী তাঁদের অনেকেই আমাদের জীবনচর্যার সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে মিশে ছিলেন। আট মিলিমিটারের ছবির প্রোজেকশন বাড়িতে বসে দেখেছি। বড়দাকে নানা রকম ছবির, ফোটোগ্রাফি ও পেইন্টিং-এর নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে দেখেছি। আবার তখনকার জাতীয়তাবাদী, সন্ত্রাসবাদী নেতাদের সম্পর্কে অনেক কথা জেনেছি। ঘরের মানুষ হয়েছেন ট্রটস্কি, লেনিন, স্তালিন, বুখারিন, প্লেখানভরা। দর্শনের ছিটেফোঁটাও আসতে আরম্ভ করেছে আড়ম্বরহীন মোটামুটি সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারে। নাটকের থেকেও বাড়িতে সিনেমার প্রভাবটা ছিল বেশি। কারণ, 'পিকচার গোয়ার' ও 'পিকচার পোস্ট' কাগজের নিয়মিত পাঠক ছিল বড়দা।

দাদাদের প্রভাবে চিন্তাধারাটা দানা বাঁধে। আজ আমি অনেকটাই সরে এসেছি ওসব থেকে। বড়দা আর চারুদার একটা দৃঢ় ধারণা ছিল যে শিশিরকুমারের নাট্যচিন্তা বা নাট্যধারাটা খুবই বাস্তবতাবিরোধী। অভিনয় রীতিও ভীষণ পুরাতন পন্থার অনুসারী। এটা বোধহয় ওদের বোঝার ভুল ছিল। ১৯৪৩ সালে চারুদা এবং বড়দা গণনাট্যের ভিতর ওদের নাট্যচিন্তার মুক্তির পথ খুঁজে পায়। ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সঙ্ঘ থেকেই গণনাট্য জন্ম নিয়েছে।

এর পরবর্তী অধ্যায় সবারই জানা। "জবানবন্দী" ছোট নাটক বিজন ভট্টাচার্যের, দেখতে গিয়েছিলাম বড়দার সঙ্গে। সেদিন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এসেছিলেন মনে আছে, পূর্ণ থিয়েটারে নাটকটি হয়েছিল। নাটকের শুরুতে শম্ভু মিত্র আবৃত্তি করেছিলেন "মধুবংশীর গলি"—আর গান হয়েছিল বটুকদার "নবজীবনের গান"। সেদিন আমার নাট্যচিন্তার আকাশ রাঙিয়ে দিয়েছিল এই অনুষ্ঠান। আমি তখন বাড়ির মধ্যে একমাত্র ছেলে যে ট্রটস্কিপন্থী রাজনীতি করে। বলশেভিক লেনিনিস্ট পার্টির সভ্য ছিলাম।

স্কটিশ কলেজে পড়তাম। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জেহাদে আমি ছিলাম ছাত্র-জেহাদি। কিন্তু কলেজে গান নাটক করতাম আর ফুটবলটা খেলতাম।

কোনও এক রাজনৈতিক কারণে আমি পার্টি ছেড়ে দিয়ে ছাত্রফেডারেশনে এলাম আমার দুই বন্ধু ডাঃ দেবকুমার বসু আর সুকুমার বসুর প্রভাবে। এই সময় "নবান্ন" হচ্ছে টানা কয়েকদিন ধরে শ্রীরঙ্গমে (বর্তমান 'বিশ্বরূপা')। সেখানে ছাত্র ভলান্টিয়ার হয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ মঞ্চের ভিতর থেকে ডাক এল। বড়দা আর চারুদা ডাকছে। গিয়ে শুনি একটি ছোট চরিত্রের এক অভিনেতা অসুস্থ, আমাকে নামতে হবে। যাইহোক অপ্রস্তুতি সত্ত্বেও দুদিন অভিনয় করেছিলাম। সেদিন ধারণাই করতে পারিনি যে এমন একটা যুগান্তকারী নাটকের সঙ্গে আমার নামটা জড়িয়ে পড়বে। আজ এজন্য সত্যিই গর্ব বোধ করি।

গণনাট্যের "নবান্ন"-র পরের নাটক শম্ভু মিত্রের পরিচালনায় "মুক্তধারা"। আমি তখন কমিউনিস্ট পার্টির লিটারেচার-সেলের কর্মী। চারুদার ডাকে "মুক্তধারা"য় অভিনয় করলাম। রাজপুত্র সঞ্জয়ের ভূমিকায়। এরপরই আমার সমস্ত আকর্ষণ গিয়ে পড়ল ওই গণনাট্যের দিকে। কিন্তু গণনাট্য সঙ্ঘ তখন অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্মুখীন। একদিকে শিল্পীদের আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই অন্যদিকে সংগঠকদের প্রাধান্য বিস্তারের প্রচেষ্টা। সবই আসছে নানা ধরনের আদর্শবাদের মোড়কে। কম বয়স, অল্প অভিজ্ঞতা, কিন্তু আমার উৎসাহের শেষ ছিল না। যদিও চোখের সামনে নাট্য-প্রচেষ্টা সবই স্তব্ধ হয়ে গেল।

সেইসময় বোম্বাই গণনাট্যের "স্পিরিট অব ইন্ডিয়া" কলকাতায় এসে সারা শহর মাতিয়ে গেছে। "স্পিরিট অব ইন্ডিয়া"তে রবিশঙ্কর, প্রীতি ব্যানার্জি, আপুনি, শচীনশঙ্কর, প্রেম ধাওয়ান তাদের যৌবনের শিল্প সাধনার সমস্ত ক্ষমতাটা একেবারে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলেন। এঁরা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে জাতীয় চেতনা ও সংস্কৃতির মধ্যে একটা মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন। এঁরা সবাই একসঙ্গে থাকতেন বোম্বাইয়ের কমিউনে। অত্যন্ত সাদামাটা জীবনযাপন করতেন। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখনই এটা সম্ভব হতে পেরেছিল। আজকের এই দিশেহারা সমাজে এ আর সম্ভব নয়। শুধু বসা, শুধুই আলোচনা, শুধু গোষ্ঠী-দ্বন্দ্বের একটা ক্লান্তিকর পরিবেশ। এরই মধ্যে বিজনদার "জীয়নকন্যা"-র রিহার্সাল হয়, আবার থেমেও যায়। অনাদিপ্রসাদ, ঘনশ্যাম, পিনাকি—এঁরা তিনজন এসেছেন কলকাতায়। উদয়শঙ্করের আলমোড়া সেন্টার ভেঙে গেছে। গণনাট্যে একটা সৃষ্টিশীল কাজের ক্ষেত্রে ওঁরা এসে পড়লেন। পিনাকিদা একটা নৃত্যনাট্য করেছিলেন—যার ফাঁকে-ফাঁকে ছিল ছোট-ছোট নাটিকার দৃশ্য। এতে তখন যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা আজ সংস্কৃতি জগতে খুবই পরিচিত নাম। কিন্তু তখন এঁরা সবাই শিক্ষানবীশমাত্র। যেমন শোভা সেন, সাধনা রায়চৌধুরি (বর্তমানে চট্টোপাধ্যায়) কলিম শরাফি (বর্তমানে বাংলাদেশের রবীন্দ্র-সঙ্গীতের এক প্রবাদপুরুষ)। কলিমদা তখন অভিনয়ের দলে ছিলেন। কলিমদা,

দেবব্রত বিশ্বাস আর জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের কাছে গানের তালিম নিচ্ছেন আর গণনাট্যের কোরাসেও অংশগ্রহণ করছেন।

দেশের অবস্থা তখন চরম সংকটের দিকে যাচ্ছে। প্রাক-স্বাধীনতার বছরগুলো, সবে দুর্ভিক্ষ থেকে মরে-ঝরে দেশটা উঠে আসছে। কিন্তু অপরদিকে দেশভাগের প্রস্তুতি চলছে। কমিউনিস্ট পার্টির তখন প্রধান স্লোগান হচ্ছে : 'গান্ধী জিন্না ফির মিলেঙ্গে' কারণ, তখন অনেকগুলো বৈঠকই (এঁদের মধ্যে) ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এদিকে, কলকাতার উপর দিয়ে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঝড়ও বয়ে যাচ্ছে টানা। ব্রিটিশ সৈন্য-বাহিনীর সঙ্গে ছাত্র শ্রমিকদের মোকাবিলা। রশিদ আলি, রামেশ্বরের শহিদ হওয়া, হিন্দু-মুসলমানের দেশভাগের উত্তেজনা মাঝে-মাঝে স্তিমিত হয়ে একটা মিলনের বাতাবরণও তৈরি করছে।

স্বভাবতই এই রাজনৈতিক নাগরদোলার দোলানি এসে লাগছে আমাদের সংস্কৃতি-কর্মী, নাট্যকর্মীদের উপর। শুধু আঁচ লাগার প্রশ্নই নয়—আমরা তো কমিউনিস্ট সংস্কৃতি-কর্মী। মূলের প্রতিচ্ছবির যে সুপারস্ট্রাকচার তার তো আমরাই প্রধান অঙ্গ। তাই রাজনৈতিক সমস্ত অবস্থার প্রেক্ষাপটে তৈরি হল "শহিদের ডাক"। এই শহিদের ডাক তৈরির যে ফর্মটা—সেটা ছিল ভারতে একেবারে একটি নতুন ফর্ম। যদিও এই ফর্মটির উপর অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন উদয়শঙ্কর। কিন্তু আমরা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের সমস্ত ইতিহাসকে শ্যাডো-প্লে এবং ব্যালের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরলাম। শহর গ্রামের লক্ষ-লক্ষ দর্শক দিনের পর দিন তা মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের চিত্রনাট্য, তাঁর সঙ্গে সহায়ক ছিলেন সুধী প্রধান। আর এটাকে পরিচালনা করার ব্যাপারে প্রধান দায়িত্বে ছিলেন তখনকার সর্বভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের সহ সম্পাদক নিরঞ্জন সেন। নিরঞ্জনদার সঙ্গে সর্বক্ষণের সহযোগী ছিলেন অতুল চৌধুরি, কল্যাণী সেন এবং আমিও। এই শ্যাডো-প্লে-র প্রধান অনেকগুলি সিকোয়েন্সের নায়ক ছিলাম আমি। কখনও রামেশ্বর, কখনও রশিদ আলি, কখনও তেভাগা আন্দোলনের কৃষক নেতা, আবার কখনও রায়ত বিদ্রোহী। মিউজিক, নানারকম আবহ ইত্যাদিতে যাঁরা ছিলেন তাঁরা পরবর্তীকালে অন্যান্য মাধ্যমেও বিখ্যাত হয়েছিলেন। যেমন বংশীচন্দ্র গুপ্ত সবে গুজরাত থেকে এসেছেন। বংশীদা আমাদের সঙ্গে ঢোল বাজাতেন। বংশীদা ছিলেন জ্ঞান মজুমদারের সহকারী। এছাড়া ব্যালের ব্যাপারে যেমন অনাদিদা, পিনাকিদা আর ঘনশ্যামদা ছিলেন তেমনই কোরিওগ্রাফার ছিলেন বুলবুলে চৌধুরি। বুলবুলদার নামেই পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানে তৈরি হয় 'বুলবুলে অকাদেমি'। সেই বুলবুলে ডান্স ড্রামা অকাদেমি এখন বাংলাদেশের গর্ব। বুলবুলদার খুব প্রিয় ছাত্র ছিলাম আমি। এখনও মনে পড়ে এয়ারলাইনসের অফিসার ব্রিটিশ আমলে চাকরি যাওয়ার ভয় উপেক্ষা করে বিকেলে গলদঘর্ম হয়ে এসে আমাদের নাচ শেখাচ্ছেন। চোস্ত স্যুটপরা উচ্চশিক্ষিত মানুষটি টাই খুলে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছেন। বুলবুলদা আর নারাণদা (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়) ছিলেন সহপাঠী বন্ধু।

দেশ জ্বলছে সাম্প্রদায়িক বিষে, সেইসময় এই দুই বন্ধুর কী মধুর, কী স্পর্শাতুর সম্পর্ক চোখের সামনে দেখেছি। উত্তর কলকাতার কমল বসুর বাড়িতে মহড়া দিয়ে বেরোনোর সময় নারাণদা বারবার বলছেন 'বুলবুল তোকে কেউ বুঝতে পারবে না তো—সাবধানে যাস' ইত্যাদি। বুলবুলদা মুসলমান ছিলেন। কী যন্ত্রণা নিয়ে বুলবুলদা পাকিস্তানকে নিজের দেশ হিসাবে পরবর্তীকালে বেছে নিয়েছিলেন জানি না। কিন্তু এরপরেও সারা পূর্ণিয়া নাচের দল নিয়ে যখন ঘুরেছেন সেখানে সবসময় সঙ্গে নিয়েছেন তাঁর প্রথম জীবনের গণনাট্যের হিন্দু ছাত্রদের। এরকমই এক ছাত্র শম্ভু ভট্টাচার্য।

"শহিদের ডাক" শ্যাডো-প্লে আর ব্যালে ট্রুপের সাফল্য যখন প্রায় ভেঙে যাওয়া গণনাট্যকে আবার তার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে যাচ্ছে, সালটা ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৬-এর মধ্যে, ঠিক সেইসময়ে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল আর্টিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সর্বক্ষণের অফিস সম্পাদকের কাজ করতে। নিছক কেরানির কাজ। সেই কাজের মধ্যে থেকেও গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিন্ন হয়নি।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা ভাল যে এই দেশব্যাপী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সময় বর্তমানের বিপ্লবী বাগাড়ম্বরকারী নাটুকে নেতাদের বা নবনাট্যের কোনও সৈনিকের দেখা পেয়েছিলাম কিনা আমার মনে পড়ে না। এখন নবনাট্যের যাঁরা নেতা সত্যিকথা বলতে কি, তাঁদের নাটক কিন্তু আপামর জনসাধারণের কাছে গৃহীত হয়নি। তাঁদের অস্তিত্ব নির্ভর করে সরকারি সাহায্যের উপর। সে কি এখানে, কি দিল্লিতে। তখনকার গণনাট্য যে বামপন্থীদের দ্বারা পরিচালিত ছিল তাঁরা ক্ষমতার চৌহদ্দিতে ছিলেন না। বর্তমানে রাষ্ট্রক্ষমতার আনুকূল্য আছে। আর সেই আনুকূল্যের জন্য জনতার আনুকূল্য হারাতে হয়েছে। সোমনাথ লাহিড়ি মন্ত্রী থাকার সময় শিল্পী-সাহিত্যিকদের এক সভাতে বলেছিলেন 'আপনারা কথায়-কথায় সরকারি সাহায্য চান কেন? আমি আপনাদের সাহায্য করলে আমার একটা প্রতিদানের দাবি তো থাকবেই। তাতে আপনাদের স্বাধীন-মতপ্রকাশের অঙ্গীকার কি অক্ষুণ্ণ থাকবে?' কথাটা যে কত বড় সত্য তা আজকের শিল্প সংস্কৃতির দিকে চেয়ে দেখলেই বোঝা যায়। সেদিন কাগজে দেখছিলাম সলিল চৌধুরি এক সম্বর্ধনা সভায় একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হন। প্রশ্নটি হচ্ছে: 'আপনি সেকালের মতো গণসঙ্গীত আর লিখছেন না কেন?' তার উত্তরে সলিলদা বলেন, 'আমাকে সেই কালটা ফিরিয়ে দিন আমি গণসঙ্গীতে-সঙ্গীতে ভরিয়ে দেব। এখানে পলায়নপর মনোবৃত্তির একটা আভাস থাকলেও কথাটা অনেকাংশে সত্যিও বটে।

সলিলদার লেখা নাটক "সংকেত" ১৯৪৯ সালে আক্রান্ত হয়েছে। শহরের গণ-আন্দোলনের উপর লেখা। পরবর্তীকালে বাংলার বিখ্যাত নাট্যকার, যিনি শেষজীবনে গণনাট্যের প্রাদেশিক ও সর্বভারতীয় সভাপতিও ছিলেন, শচীন সেনগুপ্তকে বলতে শুনেছি—এমন সর্বগুণসম্পন্ন নাটক আমি খুব কমই দেখেছি। সেও তো ছিল সংগ্রামের নাটক; কিন্তু স্লোগানধর্মী নাটক তা ছিল না।

৪৮-৪৯ সালে বি টি রণদিভের নেতৃত্ব এল কমিউনিস্ট পার্টিতে, পি সি যোশির পরিবর্তন হল বহু বছরের পর। সংস্কারপন্থী নেতৃত্বের পরিবর্তে এল সোশ্যালিস্ট বিপ্লবের ডাক। সঙ্গে-সঙ্গে গণনাট্যের সাংস্কৃতিক মতাদর্শেরও পরিবর্তন হল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংস্কৃতির যে লাইনের সঙ্ঘাত ছিল তারই অনুকরণে এখানেও এল পরিবর্তন। লুই আরাগ'র লাইন ছিল, রাইটার ফাইটার। সংগ্রামে যে লেখক বন্দুক না ধরছেন তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে কলম ধরারও অধিকার নেই। ক্যাসানোভার লাইন ছিল, লেখককে যুদ্ধক্ষেত্রে যে নামতে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা থাকতেই পারে না। লেখক-শিল্পীদের একটা বিশেষ অনুভূতি থাকে যার দ্বারা তাঁরা জীবন-সংগ্রামের মূলে সত্যকে ধরতে পারেন।

কিন্তু ৪৮-৪৯ সালে ঝানভের থিসিসও এল ; সেও এক অতিবিপ্লবী চেতনার প্রতিভূ। মজার ব্যাপার হল ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের দিকপালরা এই চিন্তার দ্বারাই পরিচালিত হলেন। আমাদের এখানে দেখলাম ননী ভৌমিক, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমনাথ হোড়, রেবা হোড় প্রমুখ লেখক-শিল্পীরা বড়কমলাপুরের কৃষক বিদ্রোহে গিয়ে অংশগ্রহণ করলেন—ওখানকার সম্মেলনে যোগদান করেন। আমিও এই দলে গিয়েছিলাম, সেখানে গিয়ে দেখলাম কালী ব্যানার্জি, সাধনা রায়চৌধুরিরাও এসেছেন গণনাট্যের তরফ থেকে। এই ঘটনাগুলো সাধারণ ঘটনা কিন্তু এগুলোর মূল্যায়ন করতে গেলে বর্তমান বিপ্লবী সাংস্কৃতিক নেতারা যাঁরা কথায়-কথায় হাজার-হাজার টাকা খরচ করে প্রায়শই সাংস্কৃতিক সংহতি আর নানা ছুতোনাতায় বোম্বাইয়ের মিঠুন কিংবা এই শহরের একসেট চেনামুখের সমাবেশ করছেন, আর একই কথা রেকর্ডে পিন আটকে যাওয়ার মতো বক্তৃতায় বিপ্লবের দায়িত্ব সমাধা করছেন তাঁদের সঙ্গে পূর্ববর্তিদের তুলনা করলে বর্তমানের চেহারাটা বোঝা যাবে। এই ধরনের কার্যকলাপ করে যেতে-যেতে তাঁরা দ্রুত খাদে গিয়ে পড়ে যাচ্ছেন।

জাতীয় সংহতিই বলুন, আর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিই বলুন এসব যে কিছু সরকারি সাহায্যের সুবিধাভোগী এলিটের সান্ধ্যবিলাস, এটা বুঝতে আর কারও বাকি নেই। এঁরা কিন্তু রাজহরার শ্রমিক নেতা শঙ্কর গুহ নিয়োগির হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে মুখর হতে সঙ্কোচ বোধ করেন। কারণ, প্রথম কথা শাসকদলেরা কেউ শঙ্কর গুহ নিয়োগিকে তাদের ব্যান্ড-ওয়াগনের সদস্য করতে পারেনি। শঙ্কর গুহ নিয়োগি শ্রমিক আন্দোলনের যে বিকল্প মডেল খাড়া করেছিলেন, সেটা এঁদের পক্ষে হজম করা ছিল অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, যে শিল্পপতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক কর্মীদের মুখর হতে হবে তাঁদের আর্থিক আনুকূল্য তো এঁদের যে কোনও উৎসব সংগঠিত করতে গেলে প্রয়োজন হয়। শিল্পপতিদের আনুকূল্য সরকারি নেতাদেরও প্রয়োজন। টাকার লেনদেনের এইসব ছক বিপ্লবী সাংস্কৃতিক নেতাদের একেবারে নখদর্পণে।

এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ে, একবার ওয়েলিংটনে গণনাট্য প্রাদেশিক সম্মেলন হয়েছিল সাতদিন ধরে। আমি তখন গণনাট্যের সম্পাদক। সারারাত্রি যাত্রা আর ক্ল্যাসিকালের

প্রোগ্রাম ছিল। তখনকার দিনের সংগীতপ্রেমিক এক মাড়োয়ারি ব্যবসাদার এসেছিলেন তা শুনতে, অনুষ্ঠানের মাঝে তিনি হঠাৎ ঘোষণা করলেন যে তিনি একহাজার টাকার একটা চেক আমাদের দিচ্ছেন। সাহায্য হিসাবে। চেক পেয়ে আমরা খুবই ম্রিয়মাণ। সম্মেলন চুকে যাবার পর আমরা দেখলাম চেকটি অ্যাকাউন্ট-পেয়ি। আমাদের কোনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল না। কিন্তু তিনমাস ধরে সেই চেক ভাঙানোর কোনও পন্থা আমরা বের করতে পারিনি। চেকটা নষ্ট হয়ে গেল। আমরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। টাকার লেনদেন করতে আমরা তখন শিখিনি। সম্ভবত আমাদের শক্তির উৎসও বোধহয় সেটাই ছিল। এখন নাট্য আন্দোলনই বলুন আর সাহিত্য আন্দোলনই বলুন সবই সীমাবদ্ধ—কমিটিতে ঢোকা, সুবিধা আদায় করা, কিছু টাকা, কিছু খামচে নেওয়া ইত্যাদির মধ্যে। সমস্ত মুক্তির পথের লক্ষ্য ওই রাইটার্স বিল্ডিং, দিল্লি, মান্ডি-হাউস। সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা, তাকে পথ দেখানো এসব সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডগুলো আসছে পরে। এইসব করতে-করতে শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে একটা সুবিধাভোগী ধান্দাবাজশ্রেণীর জন্ম হচ্ছে, আর তা হচ্ছে সরকারি আনুকূল্যে। তথাকথিত শিল্পীরা তাঁদের যৎসামান্য সৃজন ক্ষমতাও হারাচ্ছেন। কিন্তু প্রচারের ঢক্কানিনাদের পিছনে বাঘারি লাগিয়ে খড়ের কয়েকটা পুতুলকে সাংস্কৃতিক নেতা হিসাবে দাঁড় করাচ্ছেন ক্ষমতার মধ্যমণিরা। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এরাও মারা পড়বে—যেমন পড়েছে রুমানিয়া, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়াতে।

ডাঃ বিধান রায়ের আমলেও শিল্পী সাহিত্যিকদের একটা মধুচক্র ছিল। তখন সেখানে সেসময়ের দারুণ প্রভাবশালী এক অভিনেত্রীকে দেখা যেত। রাইটার্সে দিবারাত্র এঘর-ওঘর করছেন তিনি। আবার একালেও তখনকার দিনের এক আন্ডারডগ অভিনেত্রীকে দেখা যায় ঘোরাফেরা করতে। ক্ষমতার বৃত্তের চারপাশে ঘুরতে-ঘুরতে সমৃদ্ধি এসেছে কিন্তু শিল্পী হিসাবে ভোঁতা হয়ে গেছেন।

এটা তো গেল আমাদের শিল্পী সাহিত্যিকদের আত্মসমর্পণের ধান্দার কথা। ৪৪ সালে আনন্দভবন থেকে গণনাট্যসঙ্ঘের একজন সম্পাদিকা শ্রীমতী পার্বতী কুমারমঙ্গলমকে একটি চিঠিতে নেহরু লিখেছিলেন, নাট্য আন্দোলনের কোনও মূল্যই নেই চীন বা স্পেনের যুদ্ধের পার্টিজানদের প্রচারধর্মী নাটক যদি তাতে না থাকে। নাটকটা কতটা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী হচ্ছে তার উপরেই নেহরুর গণনাট্যের প্রতি বন্ধনটা নির্ভর করছে। সেসময় গণনাট্যের সভাপতি যথারীতি বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, এন এম যোশিরা ছিলেন। ভাবুন ক্ষমতায় আসার পর এই নেহরুই গণনাট্যের উপর আক্রমণ শুরু করলেন। তেলেঙ্গানাতে নাটক চলাকালীন গুলি চলল, শিল্পীরা মারা গেলেন। ক্ষমতা বা শাসনের নামই দমন, পীড়ন এবং তণ্ডকতা।

এখন পশ্চিমবঙ্গেই বা কী হচ্ছে। এখানকার সরকার নাকি 'বীভৎস' সংস্কৃতিপ্রেমী। নাটকের কমিটি হচ্ছে। সিনেমার কমিটি হচ্ছে। সরকার অনুদান দিচ্ছেন। সাহায্য করছেন। এসব কথাগুলো দারুণ ভাল কথা। কিন্তু কমিটিতে

কারা আছেন। তাঁদের বিশেষ-বিশেষ শিল্পকর্মের উপর কতটা দখল আছে? তাঁরা সরকারকে নিশ্চয়ই নাটক, ফিল্ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতে পারবেন। সরকারের ভাণ্ডার খালি করে যাতে কিছু অপগণ্ড পোষা না হয় তা তাঁরা নিশ্চয়ই দেখবেন। এসবই এই সরকারের কাছে সবাই আশা করতে পারত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ঘটল ঠিক এর উল্টোটা। সরকারের ভাণ্ডার শূন্য করে ছবির পর ছবি তৈরি করানো হয়েছে সরকারের এবং দলের সমর্থকদের দিয়ে। যাঁরা সমর্থনের ভান করেছেন তাঁরাও ছবির ঠিকা পেয়েছেন। সেই সব ছবি গুদামজাত হয়ে পড়ে রয়েছে। কোটি-কোটি সাধারণ মানুষের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জিত অর্থে ভাগ বসিয়ে কিছু জাল বিপ্লবী ছবির কারিগরকে দিয়ে ছবি বানানো হয়েছে—আর তারা সেই ছবিগুলো করতে গিয়ে টাকা নয়-ছয় করেছে বলেও শোনা যায়। এখন কোনও সময় যদি জনসাধারণ সরকারকে চেপে ধরে বলে, এই ধান্দায় এই টাকাতে সরকারি কর্তাদেরও ভাগ ছিল —তাহলে? পূর্ব ইয়োরোপ বা সোবিয়েতে ঠিক এইরকম নানাধরনের প্রশ্নও উঠেছিল। প্রসঙ্গত, গোরবাচভের আমলে যখন পেরেস্ত্রোইকা আর গ্লাসনস্তের রমরমা যুগ চলেছে তখন সেখানকার কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী কলকাতায় এসেছিলেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি সবে মন্ত্রী হয়েছেন। তেরো বছর বয়স থেকে বলশয় থিয়েটারের শিল্পী হিসাবে কাজ করেছিলেন। শেষকালটা সোবিয়েতের নাটক অকাদেমির চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। গোরবাচভ এসে কাজ জানা অভিজ্ঞ মানুষ হিসাবে ভদ্রলোককে সংস্কৃতি-বিষয়ক মন্ত্রী করেছেন। তাঁর সঙ্গে ঘণ্টা দুয়েক একান্তে আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছিলাম। তিনি ওখানকার সমস্যার কথা বললেন। বললেন, পার্টির চারপাশের লোকেরা পার্টির নেতৃত্বকে বোঝাতেন সমস্ত নাট্য প্রচেষ্টাকেই সরকারি অনুদান দেওয়া উচিত। তাঁরা সরকারকে একেবারে দেউলে করে দিয়ে গেছেন। আলমা আতায় শ্রমিকদের পরিচালিত থিয়েটারে পাস দিলেও লোক আসে না। তাই এখন সমস্ত অনুদান দেওয়া বন্ধ। পেশাদার থিয়েটারকেও বলা হয়েছে, টিকিট বিক্রি করে যদি থিয়েটার না চলে তো সেই থিয়েটার ভর্তুকি দিয়ে চালানো যাবে না। এখানে এখনও সরকারের দাসানুদাস শিল্পীদের নানানখাতে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। যাঁরা গাঁটছড়া বাঁধতে অনিচ্ছুক সেইসব শিল্পীকে নানান কায়দায় একঘরে করার চেষ্টাও একই সঙ্গে চলছে। তাও এখানকার সরকার এমন একটা মিশ্র ব্যবস্থার ভিতর আছেন যেখানে যা-ইচ্ছা করার পুরো স্বাধীনতা নেই। সেটা পেলে না জানি আরও কত কী হতো!

সংস্কৃতি জগতের এইরকম দাসসুলভ কার্যকলাপ কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকেই আরম্ভ হয়েছে। এখন তো ঢালাও পুরস্কার, খেতাব, সরকারি-সম্মান বিতরণের যুগ। যে শিল্পী একবার এই ফাঁদে পা দেন, প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে, কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠস্বরও চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যায়। আমি এমন একজন সংস্কৃতিসেবী যে ব্রিটিশ আমলের নাট্য আন্দোলনের সংগ্রামের ভিতর দিয়ে গেছি—আবার উত্তর স্বাধীনতাপর্বে দাস-সংস্কৃতি যুগের গর্ভগৃহের অবস্থাও দেখেছি। হাড়ে-হাড়ে সেই যন্ত্রণাও ভোগ করেছি। □

অনুদান অনুযোগ

অসিত মুখোপাধ্যায়

গ্রুপ থিয়েটারগুলির আর্থিক দৈন্যদশা বরাবরই। সঙ্গত কারণেই। এই দৈন্য ঘোচাতে কারুর মুখাপেক্ষী হতেই হয়। একটি প্রযোজনার ব্যয়ভার এখন এতই বেড়ে গেছে যে নিজেদের গাঁটের কড়ি দিয়ে তা সামলানো দায়। একসময়ে যা সম্ভব ছিল। অকাদেমি মঞ্চে এখন একটি সন্ধ্যায় অভিনয়ের খরচ সাড়ে চারহাজার টাকার বেশি বৈ কম না। টিকিট বিক্রি থেকে এই টাকা তোলা সব দলের পক্ষে সম্ভব নয়। কেউ সাহায্যের হাত বাড়ালে ভাল হয়। কে আর বাড়াবে? এখন তো আর রাজা-রাজড়া, জমিদাররা নেই। দু-চারটে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আছে যারা বিজ্ঞাপনটুকু স্পনসর করে। তাদের পক্ষে অগণিত নাট্যদলের দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয়। এ অবস্থায় সরকার এগিয়ে আসুক সেটাই কাম্য। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গ্রুপ থিয়েটারকে যে মর্যাদা দিয়েছে তার জোরেই এমন কামনা করা গেছে। গ্রুপ থিয়েটারগুলির প্রত্যাশা বেড়েছে এই সংস্কৃতিদরদী সরকারের কাছে। সরকার এগিয়ে এসেছেও। প্রয়োজনের তুলনায় কম হলেও কিছু আর্থিক সাহায্য ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অনেক দল পাচ্ছে। প্রয়োজনের সবটাই সরকার মেটাবে এমন আশা করা অন্যায়। কিন্তু সাহায্যের হাত বাড়াতে পেছনে কেউ আছে এমন ভাবতে পারার মধ্যেও একটা স্বস্তি পাওয়া যায়। নীতিগতভাবে এমন সাহায্য খুবই জরুরি। তাই কাম্যও। তা সরকার সে কামনা পূরণ করতে হাত বাড়িয়েছে। দলগুলির সাহায্য পাওয়া জরুরি ছিল, দলগুলি তা পাচ্ছে। তবে তো আদর্শ পরিবেশ। বিরোধ কোথায়? কিন্তু ইদানীং এই সাহায্যকে কেন্দ্র করে নানা মন্তব্য অনুযোগ শোনা যায়। সব দলকে খুশি করা কোনও সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই কিছু অনুযোগ থাকবেই। যারা পাবে না তারা না-পাওয়া দলগুলির পাবার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলবে। বিচারে দু-একটা ভুলভ্রান্তি হতেই তো পারে। তবে সামগ্রিকভাবে বণ্টনব্যবস্থায় আমি অন্তত অখুশি নই। সেইসঙ্গে এটাও লক্ষণীয় যে সম্প্রতি দলগুলির গ্রান্টনির্ভরতা বেড়েও যাচ্ছে। যাদের সঙ্গতি আছে তারাও আর্থিক সাহায্যের জন্য হাত পাতছে। এর স্বপক্ষে ও বিপক্ষে—দু পক্ষেই যুক্তি আছে। সেই যুক্তির সূত্র ধরেই বুঝি আর একটা কথার চল হয়েছে যে, হাত পেতে সরকারের কাছ থেকে গ্রান্ট নিতে গিয়ে গ্রুপ থিয়েটারগুলি বুঝি তাদের প্রতিবাদী চরিত্র বিসর্জন দিয়েছে। সভা-সমিতিতে এমন বিতর্ক উঠছেও। এ বিষয় নিয়ে লেখার অনুরোধ মাঝে-মাঝেই আসে। কেন এ অভিযোগ? সরকার অব্যবসায়িক দলগুলিকে অর্থ সাহায্য করবে এটা তো সঙ্গত দাবি। তাহলে নিতে বাধা কোথায়? এ কোনও

দাক্ষিণ্য নয়। আর হাত পেতে নিলেই বুঝি চরিত্র বদলে যায়? সত্যিই কি প্রতিবাদ হারিয়ে গেছে গ্রুপ থিয়েটারের কাজে? আসলে প্রতিবাদ বলতে এতদিন লোককে যা বোঝানো বা দেখানো হয়েছে তাতেই বোধকরি একটু ফাঁকি থেকে গিয়েছিল। বেশ হাঁকডাকের সঙ্গে সহজ-সরল ভাষায় প্রতিষ্ঠান বিরোধিতায় সস্তা হাততালি পাওয়াই ছিল যেন গ্রুপ থিয়েটারের মূল লক্ষ্য। নইলে প্রগতিবাদী ইমেজ গড়া যায় না যেন! বেশি হাঁকডাক যার সে তো নজর কাড়েই। নজর-কাড়াটা যে বড় জরুরি।

চারপাশে ব্যস্তসমস্ত মানুষ। প্রত্যেকের নিজের-নিজের জটিলতা। তার ফাঁকে চারপাশ খুঁটিয়ে-খতিয়ে দেখার এবং শুধু দেখা নয় বিচার করার অতশত সময় কোথায় লোকের। তাই হাঁকে আকৃষ্ট করতে পারলে সুবিধে দুপক্ষেরই। আবার অসুবিধেও যে কম নয়। প্রতিবাদী ইমেজ একবার গড়ে উঠলে হ্যাপাও যে মেলা। সেই হ্যাপার ফল ফলছে এখন। প্রতিবাদের টার্গেট সরে গেছে। সরকার বদল হয়েছে। একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে নাটক করার সীমাবদ্ধতা এখানেই। নাটকের উদ্দেশ্য বোধকরি অত স্থূল নয়। সূক্ষ্ম চেতনার উন্মেষ ঘটানোই এই থিয়েটারের লক্ষ্য। মোটা দাগের আবেগ-সর্বস্ব থিয়েটার নয়। প্রায়ই শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর উল্লেখ শুনি—'থিয়েটারে লোকশিক্ষে হয়।' ঠিকই এ কথাটা শ্রীরামকৃষ্ণের আবিষ্কার নয়। ব্যাখ্যা। থিয়েটারে লোকশিক্ষা শ্রীরামকৃষ্ণের আগেও হতো। এখনও হয়। লোকশিক্ষা মানে রাজনৈতিক তত্ত্বশিক্ষা নয়। লোকচরিত্র থেকে শিক্ষা। অভিজ্ঞতা। বিশেষ পরিবেশে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানুষের আচার-আচরণ থেকে শিক্ষা নেওয়া। অন্যের জীবন থেকে শিক্ষা নেওয়া। বাস্তবে আমরা সেভাবেই শিক্ষিত হই। কিন্তু এই শিক্ষা দিতে গিয়ে লক্ষ্য যদি সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ে তখন ওই শিক্ষায় অর্ধসত্যের অনুপ্রবেশ ঘটে। একটি নাটকে দেখেছিলাম কোনও এক বিশেষ রাজনৈতিক মতাবলম্বীদের উপর অত্যাচার করছে বিরোধী মতের দুষ্কৃতিরা। খুবই মর্মস্পর্শী সেই অত্যাচারিতদের কাহিনী। কিন্তু তা যে অর্ধসত্য। ওই অত্যাচারিতরাই যে অন্যত্র বদলা নিতে অত্যাচারীর ভূমিকা নিচ্ছে, সেকথাটা নাটকে চেপে যাওয়া হচ্ছে। কোনটা যে কার বদলা বোঝা দুষ্কর। এমনই একাধিক অত্যাচারিতের মৃত্যুতে স্মরণসভায় নিন্দাধ্বনি যেমন শুনেছি, বদলার সঙ্কল্প নিতেও দেখেছি। তাহলে কীসের নিন্দা। যা নিন্দনীয় তা সদাই নিন্দনীয়। অন্যে করলেও, আমি করলেও। 'বদলা' বিশেষণ লাগিয়ে দিলে নিন্দাভার কমে না। তাহলে নৈতিকতা কোথায়। কিন্তু লক্ষ্য সঙ্কীর্ণ হলে তাই হয়। নৈতিকতার প্রতি চোখ টিপতে হয়। নইলে ভয়। একটি বিশেষ শ্রেণীর দর্শকের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হই। হাউসফুল যদি না হয়। 'মাস' যদি না 'খায়'। কিন্তু বুদ্ধির কাছে আবেদন পৌঁছে দিতে গেলে 'মাস'-এর কথা ভাবলে চলবে কেন? ওখানেই তো ব্যবসায়িক থিয়েটারের সঙ্গে আমাদের তফাত। এই গোঁজামিলও বোধহয় ওই বিভ্রান্তির আর একটা কারণ।

এই থিয়েটারের হাউসফুল না হওয়াটারই চল ছিল এই কিছুদিন আগে পর্যন্তও। এখন

বেশ কয়েকটি দলের হাউসফুল না হওয়াটাই আশ্চর্যের। এ আবার কেমন কথা! চোখ কি একটু টাটায় না! অতএব সহজ সিদ্ধান্ত—এরা আর প্রতিবাদী নেই। প্রতিবাদের অর্থ টাই যে অন্য ছিল। আমার তো মনে হয় এখনই সঙ্কীর্ণতা কাটিয়ে বৃহত্তর অর্থে প্রতিবাদী হয়েছে। হাঁকডাক নেই বটে, অনৈতিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আছে। সামাজিক প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আছে। সুমতি (বেলা অবেলার গল্প), দ্রৌপদী (নাথবতী অনাথবৎ), অলকানন্দা, মালঞ্চী, ভবতারণ (ভস্মা), অপর্ণা (বিসর্জন) প্রমুখের নীরব প্রতিবাদে তথাকথিত দায়বদ্ধতা হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে না, কিন্তু আবেদন অনেক তীব্র। সুমতি যদিও হাতে ঝাণ্ডা বয়েছেন, অন্যেরা তা না বয়েই প্রতিবাদী থাকতে পেরেছেন। আমার কাছে জগন্নাথ অনেক বেশি প্রতিবাদী মারীচসংবাদের চেয়ে। সামাজিক ন্যায়-অন্যায় শুধু শ্রমিকদের স্বার্থের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত নয়। রাজনৈতিক স্বার্থের বাইরে সামাজিক ন্যায়-অন্যায় চেনা দরকার। চেনার জন্যে যুক্তিবাদী মন তৈরি করা দরকার। এখন তা হচ্ছেও। তাই দর্শক আবার আসতে শুরু করেছেও। এখানে একটা ভয়ের কথাও আছে। হাউসফুলের মোহে যেন আচ্ছন্ন হয়ে না পড়ে দলগুলি। আবেগের বন্যা বইয়ে যুক্তিবাদের থিয়েটারকে দূরে ঠেলে দেওয়া না হয় যেন। শেক্সপিয়ার, গোগোল, ইবসেন, চেখভ, ব্রেখট, রবীন্দ্রনাথ চর্চা বিফল করে "উৎকা" ইত্যাদি আবেগসর্বস্ব নাটকের পুনর্বাসন না করা হয় যেন। দর্শকের চাওয়ার কাছে নতিস্বীকার না করি যেন। এই অশুভ আশঙ্কা-বোধ করার কারণও ঘটেছে। সম্প্রতি একটি আলোচনা চক্রের বিষয় ছিল গ্রুপ থিয়েটার ও ব্যবসায়িক থিয়েটারের মধ্যে কোনও ফারাক আছে কিনা এই মর্মে। সভায় আমি হাজির ছিলাম না। কোনও ফারাক নেই প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে গ্রুপ থিয়েটারের প্রথম সারির নেতারা নাকি সব হাস্যকর যুক্তি রেখেছিলেন বলে শুনেছি। শোনাকথা, অতিরঞ্জন থাকতেও পারে। কিন্তু যা আমাকে আশ্চর্য করেছে তা হল এ ধরনের বিষয় নির্বাচন করেছিল একদল গ্রুপ থিয়েটারকর্মীই। কেন? তাহলে কি তারাও বিভ্রান্ত? এমন বিভ্রান্তিই একদল লোককে অনুদান ইত্যাদি নিয়ে অযৌক্তিক অভিযোগ আনতে সাহায্য করছে না তো? নইলে খামোকা গ্রান্ট বা স্পনসরশিপকে কাঠগড়ায় তোলার অন্য কোনও কারণ তো আমি খুঁজে পাই না। □

থিয়েটার-ই, তবে পর্দায়

সলিল সরকার

"আমরা তো ছবি করি না, কেবলই দেখি লোককে কী করে চমক লাগানো যায়। এ যেন দরজার আড়াল থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসে চমক দেওয়ার মতো। এরই নাম আমরা বলি নাটক।" —রেনোয়া*

একথা বলা নিষ্প্রয়োজন উল্লিখিত উদ্ধৃতিটি আর যাই হোক নাটক বা নাট্যের সংজ্ঞা নয়। কিন্তু চলচ্ছবির ক্ষেত্রে অর্থাৎ চলচ্চিত্র নির্মাণের কালে এই 'চমক' যে নাটকেরই অনুকরণ বা অনুসরণ তা সবাই মানবেন। আর আমাদের আলোচনাও চলচ্চিত্রের এই নাট্যের অনুকরণ ও অনুসরণ বিষয়ে।

বিশিষ্ট নাট্যকার, পরিচালক ও চলচ্চিত্র স্রষ্টা জাঁ ককতো একদা গ্রীক রীতির অনুসরণ করে চলচ্চিত্রকে অভিষিক্ত করেছিলেন শিল্পের গ্রহমণ্ডলীর দশম গ্রহ বা টেনথ্ মিউজ নামে। ককতোর এই অভিধা যেমন গভীর অর্থবহ তেমনই বাস্তব। কারণ, বয়সের নিরিখে চলচ্চিত্র অন্যান্য শিল্পের তুলনায় নেহাতই শিশু হলেও জনপ্রিয়তা, গতিশীলতা ও নান্দনিকতার বিচারে সে আজ শিশু বা কিশোর নয়, একেবারে যুবক। জন্মের প্রায় পরে-পরেই বিশ্বের আধুনিকতম শিল্পের দাবিদার হয়ে উঠেছে সে। বস্তুত নান্দনিক শিল্পের জগতে চলচ্চিত্র আজ একমাত্র শিল্প যা আধুনিক প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল হয়েও মূলত দৃশ্য-শ্রব্য-কাব্য এই তিনের তাবৎ মাধ্যমকে আত্মস্থ করে এক স্বতন্ত্র, সার্বিক শিল্প। এখন প্রশ্ন হল চলচ্চিত্রের পূর্বসূরী আমরা কাকে বলব? বলা বাহুল্য তার উত্তর ততটা সহজ নয়, তবুও সরলভাবে বলতে গেলে বলা যায়, দুটি বিষয়ের উপরই গড়ে উঠেছিল সে। প্রথমত, প্রযুক্তির দিক থেকে স্থির চিত্র যেদিন চলমান চিত্রে রূপান্তরিত হল আর দ্বিতীয়ত বা নান্দনিক দৃষ্টিতে এই চলমান চিত্র যখন আশ্রয় নিল পূর্বজ নাট্যকলাতে। বস্তুত, চলচ্চিত্র সৃষ্টির পূর্বে নাট্যশিল্পই ছিল দৃশ্য কাব্য সমন্বিত এক শিল্প যা সর্বগ্রাসী ও সার্বিক। নাট্যশাস্ত্র রচয়িতা ভরত নাট্যের এই পল্লবগ্রাহিতা ও আত্মস্থতাকে বর্ণনা করেছিলেন এইভাবে—

ন তজ্জ্ঞানং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা।
ন তদ্ যোগ ন তদ্ কর্ম নাট্যোহস্মিন্ যন্ন দৃশ্যতে ॥

অর্থাৎ, এমন কোনও জ্ঞান নেই, শিল্প নেই, বিদ্যা নেই, কলা নেই, যোগ ও কর্ম নেই (অবশ্যই মানুষের অধিগত) যা নাট্যে দৃশ্যমান হয় না বা গৃহীত হয় না। নাট্যকলার

---

* 'রেনোয়ার চোখে বাংলাদেশ' : চিদানন্দ দাশগুপ্ত

বিষয়ে একথা আজও সত্য।

চলচ্চিত্র নাট্যের এই সব ধর্মকে আত্মস্থ করে বাড়তি মাত্রা হিসাবে পেয়েছে আধুনিক প্রযুক্তির যাবতীয় উপকরণ। অবশ্য এই কারণে সে যে একেবারে স্বতন্ত্র শিল্প তা বলতে তার সময় লেগেছে বেশ কিছুদিন। অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের মতোই জন্মের শুরুতে তাকে নির্ভর করতে হয়েছিল ঠিক তার পূর্ববর্তী সার্বিক শিল্প নাট্যের প্রতি। তখন থিয়েটার বা নাট্যকলাই ছিল তার শিল্প উপকরণ বা শৈল্পিক উপাদান সংগ্রহের আকর। এমনকি এই আকরের প্রভাব শুরুতে এতই তীব্র ছিল যে তার থেকে মুক্ত হতে—মুক্ত যে হওয়া যায়, চলচ্চিত্র যে নিছকই চিত্রের চলমানতা নয়, কাহিনীর চিত্ররূপ নয় অর্থাৎ সে যে এক স্বতন্ত্র শিল্প, তার যে থাকতে পারে নিজস্ব ভাষা তা বুঝতে ও অর্জন করতে তাকে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। তার আগে পর্যন্ত নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র শিল্পের সম্পর্ক যেমন একমুখি তেমনই নির্ভরতা ও অনুকরণ প্রিয়তার। একথা সারা বিশ্বের চলচ্চিত্র শিল্পের নির্মাণকালে প্রযোজ্য। আর ভারতীয় এবং বাংলা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এই সেদিনও ছিল তা রূঢ় বাস্তব।

ভারতবর্ষ ও পশ্চিমবাংলায় চলচ্চিত্রের অনুপ্রবেশ

শুনতে আশ্চর্য লাগলেও একথা সত্যি, ভারতবর্ষে চলচ্চিত্র শিল্পের শুরু ইয়োরোপের প্রায় সমসাময়িক কালেই, আর বেশ কিছুকাল পর্যন্ত ভারতীয় চলচ্চিত্র গুণ, মান ও পরিমাণে পাশ্চাত্য দেশগুলির সঙ্গে সমানতালে পাল্লা দিয়ে চলত। আজ চেহারাটা অবশ্য একেবারে ভিন্ন এবং আমাদের আলোচনাও সে প্রসঙ্গে নয়। যাই হোক, এদেশে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের প্রথম কৃতিত্ব ফরাসি লুমিয়ের ভাইদেরই প্রাপ্য। লুমিয়ের ভাইয়েরা তাঁদের 'সিনেমাটোগ্রাফ' নিয়ে এদেশে আসেন ১৮৯৬ সালেই।* বোম্বাইয়ের ওয়েস্টন হোটেলে ১৮৯৬-র জুন-জুলাইয়ে তাঁরা যে টুকরো-টুকরো চলমান কিছু দৃশ্য প্রদর্শন করেছিলেন সেগুলির টাইটেল ছিল—Arrival of a train, Sea bathers, Parade of the guards, Stormy sea, ইত্যাদি। এর দু বছর বাদে অর্থাৎ ১৮৯৮ সালে পশ্চিমবাংলার কলকাতায় প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় মিস্টার স্টিফেন-এর 'দ্য রয়েল বায়োস্কোপ কোম্পানি'র সাহায্যে। কলকাতায় সে সময় চলচ্চিত্র দেখানোর জন্য কিন্তু কোনও হোটেল বা ময়দান বেছে নেওয়া হল না, নেওয়া হল শহরের উৎকৃষ্ট স্থান যে স্থানে সপ্তাহের তিনটি দিন কয়েকশো লোক উপস্থিত হতোই। কলকাতায় সে সময় যে দুটি স্থান নির্বাচিত হয়েছিল তার দুটিই তখনকার জনপ্রিয় নাটমঞ্চ—একটি ধর্মতলায় সাহেবপাড়ার 'থিয়েটার রয়েল' (বর্তমানে যে স্থানে গ্র্যান্ড হোটেল) আর দ্বিতীয়টি বাঙালিপাড়ার 'স্টার' রঙ্গমঞ্চ (পরবর্তীকালে যার নাম হয় 'এমারেল্ড', 'ক্লাসিক', 'আর্ট' ইত্যাদি। ৬৮, বিডন স্ট্রিটের এই নাটমঞ্চ আজ নিশ্চিহ্ন। ১৯৩১ সালে সেন্ট্রাল

* ফরাসি লুমিয়ের ভাইয়েরা (LUMIERE BROTHERS) ১৮৯৬ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি লণ্ডনে দুটি ছোট খণ্ড দৃশ্য প্রথম চৌষট্টিজন দর্শকের সামনে পর্দায় প্রতিফলিত করেছিলেন।

এভিনিউ তৈরির জন্য নাটমঞ্চটি ভেঙে ফেলা হয়।) প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে স্টিফেন দীর্ঘদিন স্টার থিয়েটারের নাট্য প্রযোজনার ফাঁকে-ফাঁকে চলচ্চিত্র দেখাতেন। পরবর্তীকালে অর্থাৎ অমরেন্দ্রনাথ দত্তের আমলেও এই মঞ্চে চলচ্চিত্র প্রদর্শন হল এবং সেই দৃশ্য যা একটু আগেই মঞ্চে অভিনেতা-নেত্রীরা মঞ্চস্থ করলেন। এইভাবেই আধুনিক শিল্পটি নাটমঞ্চের স্বারস্থ হওয়ার পর দীর্ঘকাল মঞ্চের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকল। কিন্তু কীভাবে? সে কথাতেই আসছি।

বাংলা চলচ্চিত্র নির্মাণের হেঁসেল সংবাদ

ভারতবর্ষে চলচ্চিত্রের অনুপ্রবেশের পর ক্রমে ক্রমে তাকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে বিদেশি কোম্পানিগুলিই এগিয়ে আসে, কিছু পরে ভারতীয়রা। বিশেষত কলকাতায় চলচ্চিত্রকে সাধারণের কাছে পরিচিত ও গ্রহণীয় করে তোলার জন্যে স্টিফেন যেমন চেষ্টা করলেন পরে ফ্রেমিং নামে এক ব্যবসায়ী পূর্ববর্তী 'থিয়েটার রয়েল' ও 'ক্লাসিক' থিয়েটারে (পূর্ববর্তী 'স্টার') চলচ্চিত্র প্রদর্শন করতেন। একটু ভিন্নভাবে ফাদার লাঁফো সিনেমাটোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে (একসময় যা ছিল সাঁ সুসি থিয়েটার) শিক্ষামূলক ছবি দেখাতেন। পরবর্তীকালে এঁদের প্রদর্শিত পথে চলতে উৎসাহী হলেন বাঙালিরা, অর্থাৎ শুরুতে চলচ্চিত্র প্রদর্শন ব্যবসা ও পরে চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী হলেন তাঁরা।

কলকাতায় বাঙালি হীরালাল সেন (১৮৬৬-১৯১৭) প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী হন। তিনি শুরুতে চলচ্চিত্র প্রদর্শন ব্যবসায় যুক্ত হন, তার থেকেই নির্মাণে উৎসাহী হয়ে পড়েন এবং এই নির্মাণে তিনি প্রথমেই তৎকালীন মঞ্চের জনপ্রিয় প্রযোজনাগুলির স্বারস্থ হলেন। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বলা যায় হীরালাল সেন ১৯০৩ থেকে ১৯০৪ এর মধ্যে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রযোজিত ও অভিনীত নাট্যপ্রযোজনার খণ্ড দৃশ্য গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে যে নাটকগুলির উপর তিনি নির্ভর করেছিলেন সেগুলি সে সময়ে কোনও না কোনওভাবে সমাদৃত ছিল। যেমন তিনি গ্রহণ করেছিলেন 'সীতারাম' নাটকে সীতারামরূপী অমরেন্দ্রনাথ দত্তের ঘোড়ার পিঠে চড়ে অভিনয়। 'আলিবাবা' নাটকে হুসেন চরিত্রের অভিনয়, এইভাবে 'ভ্রমর'-এ গোবিন্দলাল, 'হরিরাজ' (শেকস্‌পীয়ারের 'হ্যামলেট' নাটকের রূপান্তর) নাটকের খণ্ড দৃশ্য, 'সরলা' নাটকের বিধুভূষণ চরিত্রের অভিনয় এবং 'বুদ্ধদেব' নাটকের খণ্ডিত অভিনয় দৃশ্য। এই দৃশ্যগুলিতে মূলত অভিনয় করেছিলেন তৎকালীন প্রবাদপ্রতিম নট ও প্রযোজক অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাছাড়া বাংলা মঞ্চে জনপ্রিয় অপেরাধর্মী নাটক 'আলিবাবা'-র মর্জিনা ও আবদাল্লার নাচের দৃশ্য গৃহীত হল যাতে অভিনয় করলেন মঞ্চেরই কুসুমকুমারী ও নৃপেন্দ্র চন্দ্র বসু। তারপর নাটক অভিনয়ের অবসরে এইসব চলচ্চিত্রায়িত দৃশ্যগুলি পর্দায় দেখানো শুরু হল। যদিও দৃশ্যগুলি মঞ্চে ছিল আলো-ঝলমল সবাক ও উত্তেজনা উদ্রেককারী দৃশ্য আর পর্দায় ছিল নির্বাক মূকাভিনয় মাত্র। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন

জাগে হীরালাল চলচ্চিত্র নির্মাণে উৎসাহী হওয়ার কালে মঞ্চেরই দ্বারস্থ হলেন কেন? পাশ্চাত্য চলচ্চিত্র (অবশ্যই প্রাথমিক শিল্প ও অনুপ্রেরণার বিষয় ছিল তাঁর কাছেও) যখন প্রাথমিক পর্যায় থেকেই বহির্দৃশ্য গ্রহণে আগ্রহী সেখানে হীরালাল সেনও কেন বহির্দৃশ্য গ্রহণ না করে মঞ্চের প্রতি ধাবিত হলেন? অথচ আমরা জানি চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগে দৃশ্য গৃহীত হতো প্রাকৃতিক আলোয়। আলোক নিয়ন্ত্রণের জন্যে সাদামাটা সিলভার ও গোল্ডেন রিফ্লেক্টার ব্যবহার করা হতো। চিত্রগ্রহণ করা হতো ডেবরি ক্যামেরায়, যে ক্যামেরায় হাতে দম দিয়ে চারশো ফুটের বেশি চিত্রগ্রহণ সম্ভব ছিল না। ফলে ভাবতে অবাক লাগে এতসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মঞ্চপ্রযোজনাগুলিকেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন চলচ্চিত্রায়নের জন্য। তাঁর এই আকর্ষণের হেতু কী? প্রথমত, হীরালাল সেন ও অমরেন্দ্রনাথ দত্ত পরস্পরের বন্ধু ছিলেন এবং অমরেন্দ্রনাথ নতুন কিছু প্রবর্তনে সবসময়েই উৎসাহী ছিলেন। রমাপতি দত্তের লেখা থেকে জানা যায়—'অমরেন্দ্রনাথ জনসাধারণের কৌতূহল অধিক পরিমাণে করিবার জন্য অন্যান্য থিয়েটারের মতো কেবল বিদেশ হইতে আনীত ছবি দেখাইয়াই ক্ষান্ত না হইয়া কি উপায়ে দেশী ছবি, দেশীয় অভিনেতৃবৃন্দের দ্বারা তোলাইয়া দেখান যাইতে পারে তাহার জন্য বিশেষজ্ঞের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার থিয়েটার সম্প্রদায় লইয়া বিখ্যাত নির্ধারিত দৃশ্যের চিত্র উঠাইলেন।' ('রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ': রমাপতি দত্ত) এই বিশেষজ্ঞ আর কেউ নন, হীরালাল সেন। তিনি হীরালাল সেনকে নানাভাবে যেমন সাহায্য করেছিলেন তার দৃষ্টান্ত সে সময়ে বিরল। এমনকি চলচ্চিত্র নির্মাণে স্টুডিওর জন্য জমিও কিনেছিলেন। এই প্রথম কারণ ব্যতীত হীরালাল সেনের উৎসাহের অন্য কারণ হল বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চ সেসময় যেমন সমৃদ্ধ তেমনই জনপ্রিয়, ফলে স্বাভাবিক ভাবেই বাঙালি চলচ্চিত্র নির্মাতা নির্মাণকালে এই জনপ্রিয় ও সমৃদ্ধ শিল্পমাধ্যমটির প্রভাব এড়াতে পারেননি। তৃতীয়ত নবতম মাধ্যমটিকে জনপ্রিয় করে তুলতে গেলে ও একই সঙ্গে ব্যবসায়িক সাফল্য-লাভ করতে হলে মঞ্চই তখন একমাত্র উপযুক্ত স্থান যেখানে অনেক দর্শককে একসঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে। এবার বিষয়টি যদি দর্শকের চোখ দিয়ে দেখা যায় তাহলে দেখব সেসময়কার বাঙালি দর্শকরা পাশ্চাত্যদেশের মতো শুরুতেই উৎসাহী হয়ে ওঠেনি। তারা কালেভদ্রে বায়োস্কোপ দেখত। ফলে মঞ্চে নাটকের সঙ্গে অধিকন্তু হিসাবে চলচ্চিত্র (যা সেই নাটকেরই খণ্ড চিত্ররূপ) দর্শন ধীরে ধীরে ভাল লাগতে থাকে, পরে তাই নেশা হয়ে দাঁড়ায়। এইভাবেই বাঙালি চলচ্চিত্র নির্মাতারাও প্রথমে খণ্ড দৃশ্য পরে সমগ্র প্রযোজনা চিত্রায়িত করে ধীরে ধীরে নাট্যপ্রযোজনাতেই চলচ্চিত্র নির্মাণের তৃপ্তি খুঁজছিলেন। বস্তুত এই সৌদনও মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের এই নিবিড় সম্পর্ককে অনেকে সুস্থ ও স্বাভাবিক বলেই মনে করতেন এবং চলচ্চিত্রের যে নিজস্ব একটা ভাষা রয়েছে তা বুঝতে অনেক সময় লেগেছিল। ডক্টর কালিদাস নাগ এক নিবন্ধে চলচ্চিত্র ও নাটকের এই সম্পর্ক বিষয়ে গৌরব করেই তাই লেখেন: 'Bengali films show an organic connection with the stage—the earliest and noblest of arts

in the whole of India—and therefore, I may venture to say that they simultaneously develop the screen and the stage actors and actresses and here Bengal resembles her Marath cousins, both equally proud of their stage.' (*'Bengal's Cultural Contribution to the Screen'*: Dr. Kalidas Nag.) ডক্টর নাগের এই গৌরবপূর্ণ উক্তি বাংলা চলচ্চিত্রের শুরুর কয়েক দশকের (নির্বাক ও সবাক উভয় যুগেই) ক্ষেত্রে গভীরভাবে প্রযোজ্য, কিন্তু একইসঙ্গে এ প্রশ্নও জাগে—বাংলা নাটক ও বাংলা চলচ্চিত্রের এই নৈকট্য এবং সম্পৃক্তি চলচ্চিত্রকে সেসময় সমৃদ্ধ করেছিল না স্বাতন্ত্র রচনায় ও নিজস্ব ভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল ?

চলচ্চিত্র না নাট্যের চিত্ররূপ ?

চলচ্চিত্রের নির্মাণপর্বে বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই চলচ্চিত্র মঞ্চের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল ছিল। কেবলমাত্র আমেরিকাতেই চলচ্চিত্র শিল্প দীর্ঘকাল প্রায় শতাধিক মঞ্চসফল নাট্যপ্রযোজনার উপর নির্ভরশীল ছিল। যেমন ১৯০৩-এ নির্মিত এডুইন এস. পোর্টার পরিচালিত 'আঙ্কল টম'স কেবিন' আঙ্গিকে যতটা না চলচ্চিত্র হয়ে উঠেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল তৎকালীন জনপ্রিয় মঞ্চ প্রযোজনার সেলুলয়েডে আবদ্ধ চিত্ররূপনাট্য। ফ্রান্সেও চলচ্চিত্র শুরুতে ব্যালে, অপেরা ও নাটকের উপর নির্ভরশীল। ১৯০৮ সালে Le Film d' Art 'নামে এক প্রোডাকশন কোম্পানির সৃষ্টি হয় যাদের সৃষ্ট অধিকাংশ চলচ্চিত্রই ছিল 'French National Theatre' এর বিভিন্ন সময়কার জনপ্রিয় মঞ্চ প্রযোজনার চলচ্চিত্রায়িত রূপ। এমনকি এরা সেসময়ে কোনও-কোনও ব্যালে অনুষ্ঠানের সরাসরি চিত্রগ্রহণ করে তাকে চলচ্চিত্র বলে চালাতে দ্বিধা বোধ করেনি। পাশ্চাত্য চলচ্চিত্রের এই মঞ্চপ্রীতির কথা বলতে গিয়ে ফ্রাঙ্ক ই. বেভার লিখেছেন : 'The early motion-picture director, however, did not immediately take full advantage of the naturalistic possibilities of the medium. Because the filming of existing plays was the simplest way of producing dramatic Stories, pioneering film-makers borrowed freely from the stage, not always recognizing that what was regarded as theatrical realism was not necessarily cinematic realism. Most early film-makers who photographed parts of stage play merely recorded the event.' এমনকি দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাওয়ার সময় 'The methods of changing scenery and location utilize stage machinery rather than the editing devices of the motion picture.' (*On Flim* : Frank E. Beaver) প্রকৃতপক্ষে বেভারের দর্শানো এই কারণগুলি শুধুমাত্র ইয়োরোপ ও আমেরিকাতেই প্রযোজ্য নয়, ভারতবর্ষের আদিযুগ—বিশেষ করে হিন্দি ও বাংলা চলচ্চিত্র

নির্মাণের ক্ষেত্রে দারুণভাবে প্রযোজ্য।

আশ্চর্যের বিষয়, পাশ্চাত্য চলচ্চিত্রের এই মঞ্চনির্ভরতা থেকে মুক্ত হতে বেশি সময় লাগেনি এমনকি তারা অতি দ্রুত খুঁজে পেল চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষা। ব্যতিক্রম ভারতবর্ষ। অথচ চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে এই দেশ ১৯৩০ পর্যন্ত বিশ্বের চারটি দেশের একজন ছিল। যাই হোক ভারতীয় চলচ্চিত্রের এই মঞ্চনির্ভরতাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে যদি দেখি তাহলে বোঝা যাবে তার যথার্থ রূপ। এক, বিষয়বস্তু বা কাহিনীর প্রয়োজনে নাটকের কাছে আশ্রয়গ্রহণ। দুই, চিত্রকে আকর্ষণীয় ও মনোরঞ্জনমূলক করে তোলার জন্য মঞ্চ উপকরণ অর্থাৎ স্টেজ টেকনিক ও ট্রিকস ইত্যাদির মিশ্রণ। তিন, মঞ্চের অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরই চলচ্চিত্রে গ্রহণ করার ফলে মঞ্চ অভিনয়ের বাহুল্য। চার, সঙ্গীতের ব্যবহার। সর্বোপরি এইসময়কার চলচ্চিত্রগুলিতে ক্যামেরার ভূমিকা ছিল নেহাতই প্রেক্ষাগৃহের মাঝের আসনে উপবিষ্ট দর্শকের মতো। মঞ্চের পরিসরে যা ঘটছে বা ঘটানো হচ্ছে তাই তার দেখার বিষয়, তার বেশি কোনও ভূমিকা ছিল না।

নির্বাক সে যুগ

চলচ্চিত্রের আদিতে কলকাতায় যখনই কোনও কোম্পানি চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী হয়েছে প্রায় সব ক্ষেত্রেই তারা মঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছে নানাভাবে। শুরুতেই হীরালাল সেন ও অমরেন্দ্রনাথ দত্তের যৌথ প্রয়াসের কথা বলা হয়েছে, এরপরেই নাম করতে হয় মদন কোম্পানির (যা ম্যাডান কোম্পানি বলে পরিচিত) যারা ১৯১২ থেকে ১৯৩২ পর্যন্ত কলকাতা ছাড়িয়ে ভারতবর্ষের নানাপ্রান্তে এমনকি, সিংহল, বর্মা ও সিঙ্গাপুরেও চলচ্চিত্র শিল্পের অধিপতি ছিল। একসময় তারা প্রায় ১৭২ টি চিত্রগৃহের মালিক ছিল। কলকাতায় তাদের পার্সি ও বাংলা থিয়েটারের কয়েকটি নাটমঞ্চ ছিল। তার মধ্যে উল্লেখ্য কোরিন্থিয়ান (বর্তমানে 'অপেরা' চিত্রগৃহ), মুনলাইট, অ্যালফ্রেড (বর্তমানে 'গ্রেস') কর্নওয়ালিস (বর্তমানে 'উত্তরা') ও ক্রাউন (বর্তমানে 'শ্রী') নাটমঞ্চ। এঁরা যখন চলচ্চিত্র নির্মাণে উদ্যোগী হলেন তখন স্বাভাবিকভাবেই নির্বাচন করলেন নিজস্ব মঞ্চের কলাকুশলী ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের। এইভাবে তাঁরা যেমন পার্সি থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিলেন তেমনই নিলেন তৎকালীন প্রখ্যাত উর্দু নাট্যকার আগা হাসান কাশ্মিরীকে। বাংলা নাট্যজগত থেকে নিলেন পর্যায়ক্রমে শিশিরকুমার ভাদুড়ি, মধু বসু, নরেশচন্দ্র মিত্রের মতো অভিনেতা, পরিচালকদের। কালীশ মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ে লিখেছেন : '...দেশীয় ও বিদেশীয় ছবি দেখিয়েও ম্যাডান কোম্পানী যখন ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটিয়ে উঠতে পারছিল না—তখন চিত্র নির্মাণে হস্তক্ষেপ করল। কোরিন্থিয়ান ও আলফ্রেড থিয়েটারের নট-নটীদের নিয়ে ম্যাডানের সুযোগ্য ম্যানেজার রুস্তমজী দোতিওয়ালা, চিত্রশিল্পী জ্যোতিষচন্দ্র সরকারের সহায়তায় 'রাজা হরিশ্চন্দ্র', 'মহাভারত', 'নল-দময়ন্তী', 'ধ্রুব-চরিত্র' প্রভৃতি হিন্দি চিত্র নির্মাণ করেন। বাঙালি ও ফিরিঙ্গি মেয়েদের সংগ্রহ করে বাংলা চিত্র নির্মাণেও হস্তক্ষেপ করেন।' (বাংলা চলচ্চিত্র

শিল্পের ইতিহাস : কালীশ মুখোপাধ্যায়)। উপরোক্ত চলচ্চিত্রগুলির সবকটিই ছিল পার্সি থিয়েটারের অনুসৃত। এই কোম্পানির তোলা বাংলা সাব-টাইটেল যুক্ত কাহিনী চিত্র 'শিবরাত্রি' (১৯২৬) যার কাহিনী রচয়িতা ছিলেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত আর অভিনয় করেছিলেন বাঙালি অভিনেতা-অভিনেত্রীরাই। একইভাবে অন্যেরা সিনেমা কোম্পানি যখন ১৯১৬-১৭ সালে চিত্রনির্মাণ শুরু করে তখন তাদের প্রথম ছবি ছিল 'বিষবৃক্ষ' নাটকের কয়েকটি খণ্ড দৃশ্য যা মনমোহন থিয়েটারে (পূর্বের 'স্টার') দেখানো হয়েছিল। এরপর এই কোম্পানি 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'চন্দ্রশেখর' ইত্যাদি মঞ্চনাটকের খণ্ড দৃশ্য সেলুলয়েডে রূপান্তরিত করে চিত্রগৃহ ও মঞ্চে দেখাতে থাকে। 'চন্দ্রশেখর' চিত্রটিতে সেসময় অভিনয় করেছিলেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তারাসুন্দরী, নীহারবালা প্রমুখ অভিনেতা-অভিনেত্রী। 'কৃষ্ণসুদামা' নামের একটি চিত্র গ্রহণ করেন তাঁরা যার চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনার ভার পড়েছিল অহীন্দ্র চৌধুরির উপর। অভিনয়ে ছিলেন সন্তোষ সিংহ ও অন্যান্যরা। সে সময়কার জনপ্রিয় আর একটি নাটক 'বাসবদত্তা'ও তখন চিত্রায়িত হয়। বাংলা চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগকে মূলত ন্যাডান কোম্পানির যুগ বলা হলেও সেসময় আরও কয়েকটি কোম্পানি চলচ্চিত্র নির্মাণে উৎসাহী ছিল এবং তারা সেসময় যেসব খণ্ড ও পূর্ণ চিত্র নির্মাণ করে তার বেশ কয়েকটিরই ছিল নাটকের আদলে কাহিনী-বিন্যাস। এইভাবে নির্মিত তাজমহল ফিল্ম কোম্পানির 'আঁধারে আলো' অন্যতম, তার পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন শিশির ভাদুড়ি। নরেশ মিত্র পরিচালনা করেছিলেন 'মানভঞ্জন' ও 'চন্দ্রনাথ' এরমধ্যে স্বিতীয়টি উপন্যাস হলেও নাটক হিসাবেও জনপ্রিয় ছিল। যেমন ব্রিটিশ ডোমিনিয়নস্ ফিল্মস্ লিমিটেড এক-সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অলীকবাবু' নাটকটি চিত্রায়িত করতে আগ্রহী হল কেননা নাটকটি তখন মঞ্চে শতাধিক রজনী অতিক্রম করেছে। চিত্র নির্মাণের সময় মূলত তাঁরাই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করলেন যাঁরা মঞ্চে মূল চরিত্রগুলির অভিনয় করছিলেন। ১৯৩০ সালের ২৪ মে সাত রিলের এই ছবি মুক্তিলাভ করল এবং মঞ্চের মতোই জনপ্রিয় হল। কালীশ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : 'এই ছবিখানি প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হবার সময় দর্শক সমাজের হাসি রোলে প্রেক্ষাগৃহ ফেটে পড়ার উপক্রম হতো।' (বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস : কালীশ মুখোপাধ্যায়)।

নির্বাক যুগে বাংলা মঞ্চ থেকে যেসব নাটক সরাসরি বা ঈষৎ ভিন্নরূপে চলচ্চিত্রে আমদানি হয়েছিল (খণ্ড চিত্র বাদ দিয়ে) সেগুলি হল—'বিল্বমঙ্গল' (১৯১৯)'মোহিনী' বা 'একাদশী' (১৯২২) 'কমলে কামিনী' (১৯২৪) 'মিশর রাণী' (১৯২৫) 'শিবরাত্রি' (১৯২৬) 'প্রফুল্ল' (১৯২৬) 'জয়দেব' (১৯২৭) 'জনা' (১৯২৭) 'ভ্রান্তি' (১৯২৮) 'সরলা' (১৯২৮) 'শঙ্করাচার্য' (১৯২৮) 'শান্তি কি শান্তি' (১৯২৮) 'অলীকবাবু' (১৯৩০) বিবাহ-বিভ্রাট(?) বেলার কীর্তি(?) ইত্যাদি। নির্বাক যুগে নির্মিত এদেশীয় চলচ্চিত্র বাংলা ও পার্সি থিয়েটারের কাছে ঋণী ছিল যতটা না পরিমাণগত দিক থেকে তার চেয়ে অনেক বেশি বিন্যাস ও আঙ্গিকগত দিক থেকে। বিষয়বস্তু অধিক পরিমাণে গ্রহণ করা সম্ভব

ছিল না। যেহেতু নাটক মূলত সংলাপনির্ভর আর চলচ্চিত্র তখন নির্বাক। ফলে সে গ্রহণ করল মঞ্চের টেকনিক ও অভিনয়। তখনকার চলচ্চিত্রে কীভাবে স্টেজ টেকনিকের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল তার চমৎকার উদাহরণ ১৯২৮ সালে নির্মিত ইন্ডিয়ান সিনেমা আর্টস প্রযোজিত 'শঙ্করাচার্য' ছবিটি। নাট্যকার গিরিশ ঘোষের লেখা 'শঙ্করাচার্য' নাটকটিকে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করার সময় পরিচালনা ও চিত্রনাট্য রচনার দায়িত্ব বর্তেছিল কালী-প্রসাদ ঘোষের উপর। পরবর্তীকালে এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন : 'শঙ্করাচার্যের চিত্রনাট্য যখন লিখি তখন ফিল্ম তোলা ও চিত্রনাট্য লেখা সম্বন্ধে আমার বিশেষ কোন জ্ঞান ছিল না,...এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত নির্বাক চিত্র "জয়দেব" তখন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। "জয়দেব" সে যুগের অত্যন্ত জনপ্রিয় চলচ্চিত্র। থিয়েটারের সংগীতবহুল "জয়দেব" নাটককে কী করে নির্বাক চলচ্চিত্রে পরিণত করে সাফল্য লাভ করেছেন পরিচালক মশায়, সে সম্বন্ধে অত্যন্ত কৌতূহল নিয়ে চিত্রটিকে বিশ্লেষণ করে ফেললাম। কিন্তু হঠাৎ যখন একটা গরুর মধ্যে থেকে শ্রীকৃষ্ণ বেরুলেন, আর সমস্ত দর্শক বিপুল আনন্দে করতালি দিয়ে উঠলেন—তখন তা দেখে আমি মনকে সমঝালাম যে এই হচ্ছে তা হলে নির্বাক চলচ্চিত্র লেখার আসল কায়দা! অর্থাৎ ধর্মমূলক বা ভক্তিমূলক বইয়ে আজগুবি সব স্টান্ট থাকা দরকার, নইলে দর্শক মেতে উঠবে না।' (রূপ-মঞ্চ চতুর্দশবর্ষ, ১৩৬৯) ফলে দর্শক মাতানো যাবে এই ভাবনাতেই তিনি শঙ্করাচার্যের চিত্রনাট্য লেখার সময় অলৌকিকতাকে প্রশ্রয় দিলেন এবং সে কারণেই মঞ্চের ট্রিকগুলিকে পর্দায় আমদানি করলেন। বাকি ফাঁকটুকু পূরণ করার জন্য মঞ্চের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ডাক পড়ল। এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ি, ধীরেন গাঙ্গুলি, নিভাননী দেবী, রেণুবালা প্রমুখ সেসময়কার মঞ্চের খ্যাতনামা অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। তাহলে দেখা যাচ্ছে তখনকার চলচ্চিত্রে ভিস্যুয়ালের থেকেও জোর দেওয়া হচ্ছে ট্রিক ও ড্রামাটিক-অ্যাকশনে আর এই ট্রিক ও ড্রামাটিক-অ্যাকশন সরাসরি আমদানি করা হচ্ছে পার্সি থিয়েটার ও বাংলা নাট্যপ্রযোজনা থেকে।

বাংলা মঞ্চে দর্শককে আপ্লুত করার জন্যে কী ভাবে ট্রিক ব্যবহার করা হতো আর কখনও-কখনও কেমন দুর্ঘটনা ঘটত তা এখানে বর্ণনা করলে আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না বরং দৃষ্টান্তেই উদ্দেশ্য যে এক ছিল তা বোঝা যাবে। বিনোদিনী তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন : 'একবার গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে ব্রিটোনিয়া সেজে আমি শূন্য পথে আসছি, এমন সময় হঠাৎ তার ছিঁড়ে গিয়ে আমি ধপ্ করে স্টেজের মাঝে এসে পড়লাম।... ওদিকে সুধী দর্শকবৃন্দের হাতের তালি হাতেই রয়ে গেল।' স্টার থিয়েটারে 'নল-দময়ন্তী' নাটকে : 'একটি সরোবরের দৃশ্য ছিল, সরোবরে পদ্ম ফুটে রয়েছে। মধ্য-স্থলের পদ্মটি সবচেয়ে বড়, সেই পদ্মের মধ্য থেকে একজন কমলবাসিনী বের হতেন, বের হয়েই তিনি পা বাড়িয়ে আর একটি কম্পমান পদ্মে গিয়ে দাঁড়াতেন। এমনভাবে একে একে ছয়জন কমলবাসিনী বার হয়ে আসতেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের গানও গাইতে হত।...

সরোবরের এই দৃশ্যটি দেখতে ভারি সুন্দর হত। জহর ধর মহাশয় এই সিনটা সাজিয়েছিলেন, তিনি সত্যিকারের একজন কলাবিদ ছিলেন।' (আমার কথা : বিনোদিনী দাসী) তাহলে দেখা যাচ্ছে বাংলা মঞ্চের আদিযুগে যেসব ট্রিক দিয়ে বা মঞ্চমায়া সৃষ্টি করে দর্শককে মুগ্ধ করে রাখার চেষ্টা হতো ঠিক সেই একই পদ্ধতি গ্রহণ করা হচ্ছিল চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগে, হোক না সে গল্প বা উপন্যাস কিংবা নাটকের চিত্ররূপ।

সবাক যুগের শৈশবে

বাংলা চলচ্চিত্র জগত নির্বাক যুগে যেমন মঞ্চের ট্রিকগুলিকেই অধিক পরিমাণে গ্রহণ করেছিল চিত্রকে অলৌকিক ও নাটকীয় করে তোলার প্রয়োজনে আর সবাক যুগে এসে সে আশ্রয় গ্রহণ করল কাহিনীতে। এই কাহিনী যেমন নেওয়া হতো গল্প বা উপন্যাস থেকে তেমনই নেওয়া হতে থাকল মঞ্চখ্যাত নাটক থেকেও। এর সঙ্গে নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত, চমক ও সংলাপ ব্যবহারে মূলত নাটককেই আদর্শ বিবেচনা করেছিলেন সে সময়কার পরিচালক, প্রযোজক ও চিত্রনাট্যকারগণ। হামিদউদ্দিন মেহমুদ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন: 'The verse-dance-music tradition of classical Sanskrit drama, which persisted in the Indian theatre, provided the Indian film maker the model for the talkie. The first victim was speech itself.' শুধু তাই নয়, 'Hence, the Hindi film took on the Parsi theatre. Whereas the historical and mythological subjects still marked a thematic continuity form from the silent era, the dramatic styles of each language governed the acting and presentation styles of a film in that language. In Bengal, the stage and literature were quite powerful and the Bengali film borrowed heavily from both. (*'The Kaleidoscope of Indian Cinema'* : Hameeduddin Mahmood.) এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। হিন্দি চলচ্চিত্র যেমন প্রত্যক্ষভাবে পার্সি থিয়েটার প্রভাবিত ছিল একইভাবে বাংলা চলচ্চিত্রও নির্বাক যুগের পর সবাক যুগের কয়েক দশকে বাংলা ও পার্সি মঞ্চের কাছে বহুলাংশে ঋণী। বাংলা মঞ্চের কাছে ঋণী মূলত বিষয় ও বিন্যাসে আর পার্সি মঞ্চের কাছে ঋণী মঞ্চমায়া বা চমৎকারিত্বের প্রদর্শনের উপকরণ সংগ্রহে। একইভাবে আদিতে (এমনকি আজও) বাংলা চলচ্চিত্র, বিশেষত বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র বাংলা লোকনাট্য যাত্রা ও মঞ্চনাট্যের কাছে ঋণী আর একটি বিশেষ উপাদানের জন্য।

সবাক যুগের শুরু থেকেই বাংলা চলচ্চিত্রের অধিকাংশই সঙ্গীতবহুল। যদিও চারিত্র বৈশিষ্ট্যে ছবিটি গীতিচিত্র নয় তবুও একাধিক সঙ্গীতের ব্যবহার ভারতীয় এবং বাংলা বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের এক বিশেষ লক্ষণ। এই লক্ষণকে অবশ্য কেউ কেউ সৎ বলে মনে করে সাধুবাদ জানিয়েছেন। কোনও কোনও গবেষক আবার এই ব্যবহারের মধ্যে খুঁজে

পান যৌনতার বিকল্প ব্যবহার। অর্থাৎ চলচ্চিত্রে নর-নারীর মিলন ও ভাবের আদান-প্রদান যখন সরাসরি দেখানো অসম্ভব হয়ে পড়ে তখনই গানের ব্যবহার করা হয় আমাদের চলচ্চিত্রে। লেখক কমলকুমার মজুমদার অবশ্য মনে করতেন আমাদের চলচ্চিত্রে গানের ব্যবহার কখনওই অপ্রয়োজনীয় নয় বরং বড় বেশি প্রাসঙ্গিক : 'পৃথিবীর অন্য কোন দেশের ছবিতে এত গান নেই। তারা গানের জন্য, বিশেষ করে গানের জন্যই, আলাদা করে ছবি তোলে ; তার নাম দেয় "গীত-চিত্র"। তারা গান বলতে বোঝে হয়তো চটুল আনন্দের রূপকে। আমাদের গানে আনন্দের চটুলতাও আছে গভীরতাও আছে ; আবার বেদনার অতলস্পর্শী স্তব্ধতাও আছে সুরে। তখন অবাক হয়ে কথা হারায়। তাই আমরা যেখানে সেখানে তখন কথার আগে গান খুঁজে পাই। কিছু বা বলি কিছু বা শুনি গানে। আমাদের ছবির এটা নিজস্ব রূপ, একমাত্র রূপ বলতে পারি ; যাকে কেন্দ্র করে আমরা ডুবে থাকতে পারি। হোক না হাসির ছবি, হোক সুখের কি দুঃখের, গান আছে কিনা জানতে চাই সবার আগে আমরা; পরিচালনার অভাব হলে ক্ষমা করি, ফোটোগ্রাফী আশ্চর্য না হলেও বসে থাকি, তার পরেও একটা গানও যদি ভালো না হয়, সহ্য হয় না আমাদের।' (চলচ্চিত্রে গানের ব্যবহার : কমল মজুমদার) এখন চলচ্চিত্রে গানের ব্যবহার সঙ্গত না অসঙ্গত সে আলোচনায় না গিয়ে আমরা বলতে পারি ভারতীয় ও বাংলা চলচ্চিত্রে গানের এই ব্যাপক ব্যবহার সম্ভবত লোকনাট্য ও মঞ্চনাট্যেরই প্রভাবে।

মন্দভালর দ্বন্দ্ব

যাই হোক, এখন প্রশ্ন উঠতে পারে বাংলা চলচ্চিত্রের এই মঞ্চপ্রীতি চলচ্চিত্রকে সমৃদ্ধ করেছে না বিপথগামী করেছে? আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় আদিতে চলচ্চিত্রের এই মঞ্চপ্রীতি ও মঞ্চপ্রভাব চলচ্চিত্রকে নিশ্চিতভাবেই সমৃদ্ধ না করুক নির্মাণে সহায়ক হয়েছিল। তৎকালীন বাংলায় মঞ্চ জগত (শুধু বাংলা নয় পার্সি মঞ্চও) যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। শিশির ভাদুড়ি, অহীন্দ্র চৌধুরি, সতু সেন, নির্মলেন্দু লাহিড়ি প্রমুখ পরিচালক ও অভিনেতারা তখন মঞ্চের মধ্যগগনে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতোই দীপ্যমান ফলে তাঁদের সহায়তায় ও নাট্যের অনুকরণ ও অনুসরণের ফলে চলচ্চিত্রকে তার নির্মাণপর্বে অনেক বাধা ও প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়নি। অনেক সহজেই সে দর্শকের কাছে পৌঁছতে পেরেছিল। পাশাপাশি ক্ষুদ্র বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে বিষয়টিকে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় চলচ্চিত্রের এই মঞ্চপ্রীতি ও প্রভাব নবতম শিল্পমাধ্যমটিকে সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে আরও আড়ষ্ট ও পঙ্গু করে তুলছিল। মঞ্চ ও চলচ্চিত্র যে দুটি ভিন্ন শিল্প ও মাধ্যমগত দিক থেকেও দুটিতে যে বিশাল তফাৎ রয়েছে, চলচ্চিত্রের আবেদন যে আরও ব্যাপক, চলচ্চিত্র যে সর্বত্রগামী একথা বুঝতে বাংলা চলচ্চিত্রের নির্মাতাদের অনেক সময় লেগেছিল। চলচ্চিত্র যে নিছক কাহিনীর চিত্রায়িত রূপ নয়, নয় সংলাপ-সর্বস্বতা কিংবা কেবল দাপটে অভিনয় ও চমক, তার যে একটা স্বতন্ত্র ভাষা রয়েছে যা একেবারে নিজস্ব এবং ইতিপূর্বে আর কোনও শিল্পেই তা প্রতিভাত হয়নি সে কথা বুঝতে

বাংলা চলচ্চিত্রকে বেশ কটি দশক অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তারপরে আবার দেখা গেল বাংলা নাট্যমঞ্চ কখন যেন চলচ্চিত্র দ্বারা প্রভাবিত হতে শুরু করেছে, অর্থাৎ চলচ্চিত্রের টেকনিক, দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে দ্রুতগমন এমনকি সংলাপের সংযত ব্যবহার, অভিনয়ে স্বাভাবিকতা এই সবই ধীরে ধীরে মঞ্চে অনুসৃত হতে থাকল। এ অবশ্য ভিন্ন এক প্রবেশ।

বাংলা চলচ্চিত্রের সবাক যুগে চিত্রায়িত উল্লেখযোগ্য খণ্ডনাট্যদৃশ্য

কলকাতায় সবাক ছবি প্রথম দেখানো হয় গ্লোব থিয়েটারে ১৯২৮ সালের ১ ডিসেম্বর। এদেশে নির্মিত সবাক ছবি প্রথম দেখানো হয় ক্রাউন থিয়েটারে (বর্তমান উত্তরা) ১৯৩১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি, গায়িকা মুন্নি বাঈয়ের 'জয় জয় ভবানীপতি' গান ও চিত্রের মাধ্যমে। এরপর ১৩ মার্চ ওই চিত্রগৃহে দেখানো হয়েছিল কৃষ্ণচন্দ্র দে গান গাইছেন, এছাড়া বেশ কয়েকটি নাটকের নির্বাচিত দৃশ্য—১. অহীন্দ্র চৌধুরি অভিনীত 'আলমগীর' ও 'মৃণালিনী'র দৃশ্য। এই দুটি দৃশ্যে অহীন্দ্র চৌধুরির কণ্ঠস্বর কিছুটা ভাঙা-ভাঙা শোনা গিয়েছিল যা যান্ত্রিক ত্রুটি বলেই মনে হয়, কারণ পরবর্তীকালে তিনি মঞ্চের মতোই চলচ্চিত্রে সাফল্যলাভ করেছিলেন। ২. দানীবাবু অভিনীত 'প্রফুল্ল' নাটকের 'একটি পয়সা দাও না'—সেই বিখ্যাত সংলাপ। ৩. 'সীতা' নাটকের নির্বাচিত দৃশ্যে নির্মলেন্দু লাহিড়ির রাম চরিত্রে অভিনয়। ৪. 'কৃষ্ণকান্তের উইল' নাটকের গোবিন্দলাল চরিত্রে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়। ৫. 'চাঁদবিবি' নাটকের ইব্রাহিম চরিত্রে ভূমেন রায়ের অভিনয়। ৬. 'কৃষ্ণকান্তের উইল' নাটকের রোহিণী চরিত্রে সরযূবালার এবং ৭. 'আবুহোসেন' নাটকের রোশেনা, 'চাঁদবিবি' নাটকের ফয়জান ও 'রংবাহার' নাটকের বীণা চরিত্রে রেণুবালার অভিনয়। এসবগুলিরই প্রযোজক ছিলেন মদন (Madan) কোম্পানি।

শুরুর এই প্রচেষ্টা মোটামুটিভাবে সাফল্যলাভ করায় ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন প্রযোজক কোম্পানি এগিয়ে এল সবাক চলচ্চিত্র নির্মাণ কাজে এবং স্বাভাবিক প্রবণতায় আশ্রয় নিল উপন্যাস ও মূলত নাট্যকাহিনীতে। এগুলি জনপ্রিয়তা পেল, কখনও স্বতন্ত্র সৃষ্টি হয়ে উঠল আর অধিকাংশই মঞ্চপ্রযোজনার ব্যর্থ অনুকরণ হিসাবে ইতিহাসের পাতাবন্দী হয়ে থাকল।

পূর্ণ দৈর্ঘ্য সবাক নাট্যচিত্রের কয়েক দশক

১৯৩২

নটীর পূজা : জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের একাত্তরতম জন্মদিন উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা রবীন্দ্রনাথেরই পরিচালনায় 'নটীর পূজা' নাটকটি কয়েক রাত্রি অভিনয় করে। এই অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং অভিনয়ও বেশ সুন্দর হয়েছিল বলে সে সময়কার পত্র-পত্রিকার সমালোচনা থেকে জানা যায়।

নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড এই অভিনয়েরই সবাক চিত্রগ্রহণ করে এবং তা চলচ্চিত্র হিসাবে মুক্তিলাভ করে ২২ মার্চ, ১৯৩২, চিত্রা (বর্তমান মিনার) প্রেক্ষাগৃহে।

পুনর্জন্ম : নিউ থিয়েটার্স এরপর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রহসন 'পুনর্জন্ম' চিত্রায়িত করে। পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী স্বয়ং ও অমর মল্লিক, দেববালা প্রমুখ অভিনয়ে ছিলেন।

ছবিটি প্রথম প্রদর্শিত হয় ২ এপ্রিল, ১৯৩২, চিত্রা প্রেক্ষাগৃহে।

চিরকুমার সভা : প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' প্রহসনটি চিত্রায়িত হয় নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড-এর তত্ত্বাবধানে ১৯৩২ সালে।

অভিনয় করেছিলেন তিনকড়ি চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, অমর মল্লিক, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, ফণি বর্মা, নিভাননী দেবী, সুনীতিবালা, অন্নপূর্ণা ও অন্যান্য চরিত্রে মলিনা দেবী, চানি দত্ত, অনুপমা প্রমুখরা।

চিত্রটি সম্পর্কে তৎকালীন 'চিত্রপঞ্জী' পত্রিকার মত লক্ষণীয়—'প্রেমাঙ্কুর বাবু 'চিরকুমার সভা' নাটকের কয়েকটি অংশ বাদ দেওয়া ছাড়া আর কোনও অদল বদল করেন নি। সমস্ত নাটকখানি স্টেজের টেকনিকে তোলা হয়েছে। এ কারণে এবং বহির্দৃশ্যের অভাবে ছবিখানি অমন প্রাণহীন এবং অসাড়।' (চিত্রপঞ্জী, শ্রাবণ ১৩৩৯, ৪র্থ সংখ্যা)

পল্লীসমাজ : 'পল্লীসমাজ' মূলত শরৎচন্দ্রের উপন্যাস হলেও ইতিপূর্বে বাংলা নাট্যমঞ্চে তা শিশির ভাদুড়িরই পরিচালনায় জনপ্রিয়তা লাভ করেছে ফলে চিত্রায়িত করার সময়ও চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনার দায়িত্ব পড়েছিল শিশির ভাদুড়ির উপর।

ছবিতে অভিনয় করেছিলেন শিশির ভাদুড়ি, বিশ্বনাথ ভাদুড়ি, শৈলেন চৌধুরি, যোগেশ চৌধুরি, অমলেন্দু লাহিড়ি, নৃপেন রায়, তারাকুমার ভাদুড়ি, কঙ্কাবতী দেবী, প্রভা দেবী প্রমুখ।

ছবির বিন্যাস বিষয়ে 'চিত্রপঞ্জী' মন্তব্য করে : 'পল্লীসমাজ আমাদের তৃপ্ত করেছে বটে, কিন্তু মুগ্ধ করতে পারে নি। ... সমস্ত ছবিখানি স্টেজ টেকনিকে তোলা হয়েছে। স্ক্রীন টেকনিক খুব অল্পই আছে।' (চিত্রপঞ্জী, শ্রাবণ ১৩৩৯, ৪র্থ সংখ্যা)

১৯৩৩

সীতা : আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি সবাক যুগের শুরুতে খণ্ড দৃশ্য চিত্রায়িত করার সময় 'সীতা' নাটকের খণ্ড দৃশ্যে নির্মলেন্দু লাহিড়ির রাম চরিত্রে অভিনয় দৃশ্যায়িত করা হয়। তবে এটি ছিল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা 'সীতা' নাটক। মঞ্চে অবশ্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল শিশির কুমার ভাদুড়ির পরিচালনায় 'সীতা' যার নাট্যকার ছিলেন যোগেশ চৌধুরি। যাই হোক এই যোগেশ চৌধুরির 'সীতা' নাটকটি শিশির কুমার ভাদুড়ির পরিচালনা ও অভিনয় নিপুণতায় বাংলা মঞ্চে জনপ্রিয়তা লাভ করায় ১৯৩৩ সালে নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড নাটকটিকে চিত্রায়িত করতে উৎসাহী হয় এবং

পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় শিশির ভাদুড়িকেই। অভিনয় করেছিলেন শিশির ভাদুড়ি, বিশ্বনাথ ভাদুড়ি, তারাকুমার ভাদুড়ি, অহীন্দ্র চৌধুরি, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শৈলেন চৌধুরি, কঙ্কাবতী, প্রভা দেবী প্রমুখ।

'সীতা' মঞ্চে যতটা সাফল্য পেয়েছিল চিত্রে ততটা সফল হতে পারেনি। সে ক্ষেত্রেও কারণ ছিল একটাই—মঞ্চের বিষয়কে হুবহু চিত্রে রূপায়িত করার সীমাবদ্ধতা।

বিল্বমঙ্গল : গিরিশ ঘোষের ভক্তিমূলক নাটকগুলির মধ্যে 'বিল্বমঙ্গল' ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয়। ১৯৩৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিজ-এর প্রযোজনায় প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় রূপান্তরিত হয় মঞ্চনাটক থেকে চলচ্চিত্রে।

অভিনয় করেছিলেন তিনকড়ি চক্রবর্তী, যোগেশ চৌধুরি, রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রাণীবালা প্রমুখ।

ছবির নির্মাণ সম্পর্কে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকা মন্তব্য করে :

'বিল্বমঙ্গল চিত্রখানি প্রায় সর্বদিক দিয়েই মঞ্চাভিনীত বিল্বমঙ্গলকে অনুসরণ করেছে।... অভিনয়ের দিক থেকে বিচার করলে চিত্রখানি মধ্যম শ্রেণীর হয়েছে।' (দেশ, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৩৩)

এই বছরই বাংলা ভাষার চিত্র ছাড়াও বাংলা নাটকের আশ্রয়ে অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রয়াস দেখা যায়। যেমন ইস্ট ইন্ডিয়া ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিজ এবছরই 'সীতা' নাটকটিকে হিন্দি চলচ্চিত্রে রূপায়িত করার দায়িত্ব দেয় দেবকীকুমার বসুকে। এছাড়া, নিউ থিয়েটার্স ও 'সীতা' নাটকের চিত্রায়ন করবে একথা তৎকালীন চিত্রসংবাদে প্রচারিত হয়।

এ. আর. কারদারের পরিচালনায় উর্দুতে 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের চিত্রনির্মাণ শুরু হয় এ বছরই। পরিচালক মধু বোস সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের বাংলা নাটক 'বুমেলা' উর্দুতে নির্মাণে উদ্যোগী হন।

১৯৩৪

ভক্ত ধ্রুব : পায়োনিয়ার ফিল্ম সর্বপ্রথম যে সবাক চিত্র নির্মাণ করে তা গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটক 'ধ্রুব', ১৯৩৪ সালে। ছবিটির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম, এছাড়া ছিলেন শ্রীমতী আঙুরবালা, পারুলবালা, মিস্ শরিফা প্রমুখ।

চলচ্চিত্রের মানে 'ভক্ত ধ্রুব' অত্যন্ত নিকৃষ্ট চিত্র হিসাবে নিন্দিত হয় সে সময়েই। ১ জানুয়ারি, ১৯৩৪-এ চিত্রটি ক্রাউন মঞ্চে মুক্তিলাভ করে।

চাঁদ সদাগর : নাট্যকার মন্মথ রায়ের 'চাঁদ সদাগর' নাটকটি মঞ্চে যেমন জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল চিত্ররূপেও তেমনি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এককালীন বাহান্ন সপ্তাহ চলেছিল ছবিটি সেসময়।

এটি শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স নির্মিত প্রথম সবাক চিত্র যার পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন

প্রফুল্ল রায়। অভিনয় করেছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরি, ধীরাজ ভট্টাচার্য, নীহারবালা, পদ্মাবতী, দেববালা, শেফালিকা (পুতুল) প্রমুখ।

মন্মথ রায়ের চিত্রনাট্য ও সংলাপ সমালোচিত হয়েছিল যদিও অভিনয় ও দৃশ্যপটের প্রশংসা করেছিল সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা।

ছবিটি ১৯৩৪ সালের ১৭ মার্চ ক্রাউন মঞ্চে প্রথম প্রদর্শিত হয়।

মহুয়া : এটি নাট্যকার মন্মথ রায়ের অপর এক মঞ্চসফল নাটক। ১৯৩৪ সালে নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড নাটকটিকে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করার ও পরিচালনার দায়িত্ব দেয় হীরেন বসুকে। অভিনয় করেছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরি, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মলিনা দেবী।

১৯৩৪-এর ১ সেপ্টেম্বর চিত্রা প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি মুক্তিলাভ করে।

১৯৩৫

বিরহ : নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা প্রহসনের একটি হল 'বিরহ'। কালী ফিল্মস নাটকটি চলচ্চিত্রে রূপায়িত করার জন্য চিত্রনাট্য ও পরিচালনার দায়িত্ব দেয় তিনকড়ি চক্রবর্তীকে। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন তখনকার মঞ্চের খ্যাতনামা গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে এবং অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনকড়ি চক্রবর্তী, তুলসী লাহিড়ি, রাণীবালা প্রমুখ।

ছবিটি প্রথম দেখানো হয় ১৮ মে, ১৯৩৫ ক্রাউন মঞ্চে।

প্রফুল্ল : নির্বাক যুগে গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল' নাটক হিসাবে মঞ্চসফল হওয়া সত্ত্বেও চিত্ররূপে সাফল্য পায়নি কিন্তু সবাক যুগে এসে পুনরায় নির্মিত হয়ে সাফল্য-লাভ করেছিল। কালী ফিল্মস প্রযোজিত চলচ্চিত্রের পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন তিনকড়ি চক্রবর্তী। এ ছবিরও সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে। অভিনয়ে ছিলেন তিনকড়ি চক্রবর্তী, অহীন্দ্র চৌধুরি, নরেশ মিত্র, যোগেশ চৌধুরি, প্রভা দেবী, রাণীবালা, নগেন্দ্রবালা, হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকি)। এছাড়াও অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন জহর গাঙ্গুলি, শীতল পাল, তারাকুমার ভাদুড়ি, শেফালিকা, রাজলক্ষ্মী, চুনীবালা প্রমুখ।

ছবির বিষয়ে সেসময়কার দুটি পত্রিকা দুরকম মন্তব্য করেছিল :

ক) 'সাধারণত আমরা দেখতে পাই যে রঙ্গমঞ্চে যে নাটক সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়, চিত্রে তাহার কোন স্থান থাকে না, কিন্তু কালী ফিল্মের প্রফুল্ল চিত্রখানিতে সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়েছে।' (দেশ, ২১ ডিসেম্বর, ১৯৩৫)

খ) 'The treatment of the story though a bit stagey yet the suspense and grip has been maintained all through on account of good continuity and quick tempo.' (*Depali*, 20 Dec. 1935)

ছবিটি মুক্তিলাভ করে উত্তরা চিত্রগৃহে ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৩৫ সালে।

হরিশ্চন্দ্র : পায়োনিয়ার ফিল্মস প্রযোজিত নাট্যকার অমৃতলাল বসুর 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকটির চিত্রনাট্য ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন প্রফুল্ল ঘোষ। অভিনয়ে শান্তি গুপ্তা প্রশংসা লাভ করেছিলেন। চিত্রনাট্য হয়েছিল মণ্ডনানুযায়ী। ছবিটি সেসময় দেখানো হয়েছিল বিজলী ও ছবিঘরে। প্রথম প্রদর্শন ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৩৫-এ।

খাসদখল : নাট্যকার অমৃতলাল বসুর অপর একটি নাটক সোনেরা পিকচার্স চিত্রায়িত করে। পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত। অভিনয় করেছিলেন যোগেশ চৌধুরি, চানি দত্ত, নগেন্দ্রবালা, রেণুকা প্রমুখ। চিত্রনাট্যর ত্রুটিতে চলচ্চিত্রটি সাফল্য পায়নি।

ছবিটি মুক্তিলাভ করে ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৫ সালে।

তরুবালা : সুশীল মজুমদারের পরিচালনায় পায়োনিয়ার ফিল্ম অমৃতলাল বসুর 'তরুবালা' নাটকটি চিত্রায়িত করে মঞ্চের মতো সফলতা না পেলেও কিছুটা সফল হয়েছিল। অভিনয় করেছিলেন জহর গাঙ্গুলি, অহীন্দ্র চৌধুরি, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রভা দেবী, পদ্মাবতী দেবী, নগেন্দ্রবালা, হরিসুন্দরী (র‍্যাঙ্কি) প্রমুখ। চিত্রনাট্য রচনা করা হয়েছিল মঞ্চের অনুকরণেই। এ বিষয়ে সেসময়কার এক পত্রিকার মন্তব্য :

'...Some of the scenes he [Sushil Mazumdar] has lapsed into stage technique.' (*Depali*, 7 Feb. 1936)

মানময়ী গার্লস স্কুল : এই নাটক লিখে নাট্যকার রবীন্দ্রমোহন মৈত্র রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন। নাটকটি বহুবার অভিনীত হয়েছে বাণিজ্যিক মঞ্চে ও সৌখিন নাট্যদলের দ্বারা। রাধা ফিল্ম এই কমেডিকে চলচ্চিত্রায়িত করার জন্য পরিচালনার দায়িত্ব দেয় জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি প্রায় মঞ্চের নাটকটিকেই সরাসরি চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করেছিলেন।

মঞ্চে মানসের ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলি অভিনয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। চলচ্চিত্রেও একই ভূমিকায় তাকে অভিনয় করতে হয়েছিল। এছাড়া অভিনয়ে ছিলেন তুলসী চক্রবর্তী, কানন দেবী, জ্যোৎস্না গুপ্তা প্রমুখ।

১৯৩৬

পরপারে : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা এই সামাজিক নাটক চন্দ্র ফিল্মস্ চলচ্চিত্রে রূপায়িত করে যতীন দাসের পরিচালনায়। চিত্রনাট্য রচনার দায়িত্বও ছিল তাঁর উপর। সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা বিষয়ে সেসময়কার 'সাহানা' পত্রিকা মন্তব্য করেছিল এরকম :

'...যাঁরা পরপারে নাটক পড়েননি (যদিও তাঁদের সংখ্যা অল্প) তাঁরা যে সহজেই গল্পাংশ বুঝতে পারবেন, এ কথা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু পরিচালক ছবির পর্দায় গল্পাংশ interesting করে তুলতে পারেননি। সেইজন্যেই ছবি দেখলে মনে কোনও ছাপ পড়ে না।' (সাহানা, ১১ জুলাই, ১৯৩৬, প্রথম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা)। ছবিতে

অভিনয় করেছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরি, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য নির্মলেন্দু লাহিড়ি, নিভাননী দেবী প্রমুখ। ছবির প্রথম প্রদর্শন ৪ জুলাই, ১৯৩৬ চিত্রাতে।

পথের শেষে : ইস্ট ইন্ডিয়া ফিল্মস্ প্রযোজিত, জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত চলচ্চিত্রটি মূলত নাট্যকার নিশিকান্ত বসু রায়ের লেখা সামাজিক নাটক।
এ ছবিকে অভিনয় করেছিলেন নরেশ মিত্র, যোগেশ চৌধুরি, ভূমেন রায়, জহর গাঙ্গুলি, জ্যোৎস্না গুপ্তা, পদ্মাবতী দেবী প্রমুখ অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। এসবের পরেও নাটকটি চলচ্চিত্র হয়ে উঠতে পারেনি কারণ—'মঞ্চের অভিনয়কে সরাসরি চিত্রে অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছিল' (বাংলা সাহিত্য ও বাংলা চলচ্চিত্র : নিশীথ কুমার মুখোপাধ্যায়)।

বাঙালী : ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা সামাজিক নাটক 'বাঙালী' একসময় মিনার্ভা মঞ্চে যেমন জনপ্রিয় হয়েছিল তেমনই যাত্রা ও চলচ্চিত্রেও তা রূপান্তরিত হয়েছিল। ভারতলক্ষ্মী পিকচার্স প্রযোজিত চারু রায় পরিচালিত এই ছবি মঞ্চনাটক থেকে কিছুটা ভিন্নতর হয়েছিল বলে তৎকালীন এক পত্রিকার মন্তব্য : 'মূল নাটক আমরা পড়েছি, মঞ্চে তার অভিনয়ও দেখেছি। মূল নাটকে গল্পাংশ ছিল অতি দুর্বল—মাত্র বাঙালীর জীবন, নাটকের কয়েকটি নির্বাচিত দৃশ্যসমষ্টি বললেও অত্যুক্তি হয় না মোটেই। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল কয়েকটি ফুল, পরিচালক চারু রায় সেগুলি কুড়িয়ে গল্পের সূত্রে যেটির পর যেটি সাজে, সেইভাবে গেঁথেছেন এই চিত্রমালিকা যার রূপ হয়েছে অনবদ্য।'
(সাহানা, ২২ আগস্ট, ১৯৩৬, প্রথম বর্ষ)

আবর্তন : নাট্যকার নিশিকান্ত বসু রায়ের 'ধর্ষিতা' নাটক অবলম্বনে সতু সেন পরিচালনা করেন 'আবর্তন'। অভিনয়ে ছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তিনকড়ি চক্রবর্তী, শান্তি গুপ্তা, প্রভা দেবী, রাণীবালা প্রমুখ।
ছবিটি মুক্তিলাভ করে ১৯৩৬-এর ৯ মে 'শ্রী' চিত্রগৃহে।

১৯৩৭

টকী অব টকীজ : শিশির ভাদুড়ির পরিচালনায় জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'রীতিমত নাটক' মঞ্চে প্রচুর জনপ্রিয় হয়েছিল। এই মঞ্চসফল নাটকটি কালী ফিল্মস্ শিশির কুমার ভাদুড়ির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনায় চলচ্চিত্রায়িত করার সময় নাম হয় 'টকী অব টকীজ'। অভিনয় করেছিলেন মঞ্চেরই শিল্পীরা। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ নাটকটিতে পূর্বেই অভিনয় করতেন যেমন শিশির ভাদুড়ি, বিশ্বনাথ ভাদুড়ি, কঙ্কাবতী এছাড়া চলচ্চিত্র নির্মাণকালে ছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরি, তুলসী লাহিড়ি, রাণীবালা প্রমুখ।
মঞ্চসফল এই নাটক যখন চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয় তখন তৎকালীন প্রায় সব পত্র-পত্রিকাই এর ব্যর্থতার কথা বলেছে :
'টকী অব টকীজ চিত্রখানি দেখিয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। শিশির কুমার অর্ধোন্মাদ অধ্যাপকের ভূমিকায় অবশ্য চমৎকার অভিনয় করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অভিনয়টুকু

ছবির সবকিছু নয়। ছবির অন্যান্য দিক যেমন চিত্রনাট্য, পরিচালনা, অভিনয় প্রভৃতি—সেইগুলি অত্যন্ত দুর্বলভাবে চিহ্নিত হইয়াছে। রঙ্গমঞ্চের 'রীতিমত নাটক'-এর সঙ্গে এর তুলনাই চলে না।' (দেশ, ২৩ জানুয়ারি, ১৯৩৭)

ছবিটি ১৪ জানুয়ারি, ১৯৩৭ সালে উত্তরা চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করে।

আলিবাবা : ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের এই গীতিনাট্য তাঁর কালে এমনকি পরবর্তীকালেও মঞ্চে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ফলে চলচ্চিত্রে তা যে সাদরে গৃহীত হবে এটাই স্বাভাবিক। নির্বাক যুগে হীরালাল সেন ও অমরেন্দ্রনাথ দত্ত পরিচালিত 'আলিবাবা' নাটকের নৃত্যদৃশ্য চিত্রায়িত হয়েছিল। পরবর্তীকালে মধু বোস প্রথমে মঞ্চে ও পরে চলচ্চিত্রে তা রূপান্তরিত করেন। উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সাফল্য ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তার কারণ তিনি মঞ্চ প্রযোজনা ও চলচ্চিত্র নির্মাণ দুটিকে পৃথকভাবে দেখেছিলেন। যদিও পরিচালক, অভিনেতা-অভিনেত্রী সবই এক ছিল।

'আলিবাবা' মঞ্চপ্রযোজনাকে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করার বিষয়ে মধু বোস তাঁর আত্মস্মৃতিতে লিখেছেন : 'পরপর কয়েকটি নাটক প্রযোজনা করে সি. এ. পি. সম্প্রদায় মঞ্চরসিকদের কাছে এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেও বেশ একটা আলোড়ন আনতে পেরেছিলেন।...এবার সব বন্ধু-বান্ধব এবং শুভানুধ্যায়ীরা উৎসাহ দিল—সি. এ. পি-র শিল্পীদের দিয়ে একটা ফিল্ম তৈরী কর—আর করতে যদি হয় তবে 'আলিবাবা'ই করা উচিত।' (আমার জীবন : মধু বসু)

অভিনয় করেছিলেন মধু বসু, সাধনা বসু, সুপ্রভা মুখার্জি, বিভূতি গঙ্গোপাধ্যায়, প্রীতি মজুমদার প্রমুখ। শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স প্রযোজিত ছবিটি রূপবাণী চিত্রগৃহে ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭ সালে মুক্তিলাভ করে। তারপরের ইতিহাস আজ সবারই জানা।

হারানিধি : কালী ফিল্মস্ তিনকড়ি চক্রবর্তীর পরিচালনায় গিরিশচন্দ্র ঘোষের এই নাটকটি চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করে এবং ব্যর্থ হয়। ছবির চিত্রনাট্য ছিল ত্রুটিপূর্ণ। অভিনয়ে ছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরি, তিনকড়ি চক্রবর্তী, ছবি বিশ্বাস, প্রভা দেবী, রাণীবালা প্রমুখ। মুক্তিলাভ করেছিল ১ মে, ১৯৩৭ সালে শ্রী চিত্রগৃহে।

ছবিটির বিষয়ে তৎকালীন পত্রিকার মন্তব্য : 'মহাকবি গিরিশচন্দ্রের 'হারানিধি' বিখ্যাত নাটক। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বাংলাদেশের সামাজিক আবহাওয়া যে রকম ছিল তাহারই চিত্র গিরিশচন্দ্র এই নাটকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সে যুগে এই ধরনের নাটকের বিশেষ সমাদর ছিল, কিন্তু এখন আর সেদিন নাই,...গিরিশচন্দ্রের কোন নাটকের যদি চিত্ররূপ দিতে হয় তবে তাহা এভাবে দিতে হইবে যাহাতে গিরিশ-প্রতিভা দর্শকের চক্ষের সম্মুখে অম্লান থাকে।' (দেশ, ৮ মে, ১৯৩৭)

ছিন্নহার : অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লেখা এই নাটক রাধা ফিল্মস্ চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করে। পরিচালনা করেছিলেন হরি ভঞ্জ। অভিনয় করেছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরি, নরেশ মিত্র প্রমুখরা। ছবিটি ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭-এ উত্তরাতে মুক্তিলাভ করে।

এ বছরই নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা'র হিন্দি সংস্করণের কাজ

শুরু করে। মূল অভিনেতা ছিলেন সায়গল।

১৯৩৮

খনা : নাট্যকার মন্মথ রায়ের এই নাটক বহুবার অভিনীত হয়েছে এবং প্রশংসাও পেয়েছে। নেটোপলিটান পিকচার্স নাটকটিকে জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় চলচ্চিত্রে রূপায়িত করে। ১৯৩৮ সালের ১২ নভেম্বর উত্তরাতে তা দেখানো হয় এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করে। অভিনয় করেছিলেন ছায়া দেবী (খনা), অহীন্দ্র চৌধুরি (বরাহ) প্রমুখ।

১৯৩৯

চাণক্য : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক অবলম্বনে কালী ফিল্মস্ শিশির কুমার ভাদুড়ির চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় চিত্রায়িত করে 'চাণক্য' নামের ছবিটি। 'চন্দ্রগুপ্ত' দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জনপ্রিয় ঐতিহাসিক নাটক যা মঞ্চে বিভিন্ন সময়ে বহুবার অভিনীত হয়েছে। শিশির ভাদুড়িও এই নাটকের মঞ্চাভিনয়ে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। চলচ্চিত্র নির্মাণকালে তিনি ততোধিক ব্যর্থ হয়েছিলেন।

এ বিষয়ে তৎকালীন পত্রিকার মন্তব্য : 'আলোচ্য চিত্রের যে পরিবর্তন ও রূপ আমরা দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহা শিশির প্রতিভার উপযুক্ত একেবারেই হয় নাই।...কথাবহুল কাহিনীকেও সফল চিত্ররূপ দেওয়া যায়, উদাহরণস্বরূপ আমরা বার্ণাড শ-র 'পিগ মেলিয়ান' চিত্রের নাম করিতে পারি। মঞ্চে সুন্দর কথাবহুল স্থানগুলির প্রতি চিত্র-পরিচালকের নিরপেক্ষ ও অমায়িক হওয়া উচিত ছিল।' (দেশ, ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৩৯) বস্তুতপক্ষে মঞ্চপ্রযোজনাকেই সেলুলয়েডে ধরে রাখা হয়েছিল,কারণ দৃশ্যগুলি ছিল মঞ্চের মতো এবং অভিনয় অবশ্যই মঞ্চাভিনয়, দৃশ্যসজ্জাও তাই।

অভিনয় করেছিলেন শিশির ভাদুড়ি, নরেশচন্দ্র মিত্র, বিশ্বনাথ ভাদুড়ি, অহীন্দ্র চৌধুরি, ছবি বিশ্বাস, রাজলক্ষ্মী দেবী, কঙ্কাবতী প্রমুখ। এখানে উল্লেখ প্রয়োজন কঙ্কাবতী দেবীর মৃত্যু হয় ১৯৩৯ এর ২১ জুন, ফলে তাঁর 'মুরা' চরিত্রের বাকি অংশ অভিনয় করে সমাপ্ত করেছিলেন রাজলক্ষ্মী দেবী। ছবিটির সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে। 'চাণক্য' প্রথম মুক্তিলাভ করে ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৩৯ সালে।

জনক-নন্দিনী : বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের নাটকটি চলচ্চিত্রে পরিচালনা করেন ফণী বর্মা, প্রযোজনা করে রাধা ফিল্মস্।

অভিনয় করেছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরি, জহর গাঙ্গুলি, রাজলক্ষ্মী দেবী প্রমুখ।

রিক্তা : নাট্যকার তুলসী লাহিড়ির লেখা 'মায়ের দাবী' নাটকটি চলচ্চিত্রে রূপান্তর কালে নাম হয় 'রিক্তা'। ছবিটি তেমন ভাল হয়নি, বরং নানা কারণে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল ছবিটির নির্মাণ নিয়ে। ছবিটিতে অভিনয় করেছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরি, তুলসী লাহিড়ি, ছায়া দেবী প্রমুখরা। পরিচালনা করেছিলেন সুশীল মজুমদার, প্রযোজনা

করেছিল ফিল্ম কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেড।

১৯৪০

স্বামী-স্ত্রী : নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তের 'স্বামী-স্ত্রী' নাটক হিসাবে নাট্যমঞ্চের উপযোগী করে লেখা। এই নাটকটির চিত্ররূপ দিলেন সতু সেন কমলা টকিজ লিমিটেড-এর প্রযোজনায়।
অভিনয়ে ছিলেন ছায়া দেবী, চন্দ্রাবতী দেবী, রাজলক্ষ্মী দেবী, ছবি বিশ্বাস, সন্তোষ সিংহ প্রমুখ।
ছবিটি মুক্তিলাভ করেছিল ২১শে মার্চ, ১৯৪৩-এ উত্তরা চিত্রগৃহে।

তটিনীর বিচার : এই নাটকটিও শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের লেখা একটি মঞ্চসফল প্রযোজনা। পরিচালক সুশীল মজুমদার ফিল্ম কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেডের প্রযোজনায় নাটকটিকে চলচ্চিত্রে রূপান্তর করে। এটি মঞ্চে যেমন সার্থক ও জনপ্রিয় হয়েছিল চলচ্চিত্রেও তা সাফল্য পেয়েছিল।
অভিনয়ে ছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরি, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, রাণীবালা, রাজলক্ষ্মী দেবী প্রমুখ।
ছবির সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। মুক্তিলাভ করে ৪ মে, ১৯৪০ রূপবাণী চিত্রগৃহে।

১৯৪১

রাজনর্তকী : ওয়াদিয়া মুভিটোনের প্রযোজনায় মধু বোসের চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় বাংলা, হিন্দি ও ইংরাজি এই তিনটি ভাষায় চলচ্চিত্রায়িত হয়েছিল। এর মূল কাহিনী নাট্যকার মন্মথ রায়ের লেখা 'রাজনটী' নাটক থেকে নেওয়া।
নাটক হিসাবে যতটা না সফল ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি সাফল্য ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল চলচ্চিত্রটি। এই চলচ্চিত্র মধু বসুর পরিচালনা, সাধনা বসুর অভিনয় ও তিমির-বরণের সুরের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছে।

১৯৪২

শোধবোধ : রবীন্দ্রনাথের এই নাটকের চলচ্চিত্ররূপ আমরা পাই ১৯৪২-এ এসে। সৌমেন মুখোপাধ্যায় চিত্রনাট্য ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। প্রযোজনা করেছিল নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড। ছবিটি দেখানো হয় ২৮ মার্চ, ১৯৪২ চিত্রা-তে।

১৯৪৩

সহধর্মিনী : নাট্যকার যোগেশ চৌধুরির লেখা নাটকগুলির মধ্যে যতটা না সাহিত্য-মান ছিল তার ছেয়ে বেশি ছিল প্রযোজনার উপকরণ। 'সীতা' প্রযোজনা হিসাবে জনপ্রিয়তা পেয়েছিল কারণ সেখানে ছিল শিশির ভাদুড়ির মতো মঞ্চ পরিচালকের

চিন্তা ভাবনা। যদিও চলচ্চিত্র হিসাবে তা ব্যর্থ হয়েছিল একই পরিচালকের হাতেই। পরবর্তীকালে অবশ্য মোটামুটিভাবে মঞ্চে সফল এবং চলচ্চিত্র হিসাবেও সফল এমন নাটক 'পরিণীতা'। নাটকটি মিনার্ভা মঞ্চে মঞ্চস্থ হয়েছিল। এরপর রূপশ্রী লিমিটেডের প্রযোজনায়, নীরেন লাহিড়ির পরিচালনায় নাটকটি 'সহধর্মিনী' নামে চিত্রায়িত হয়।
চলচ্চিত্রটি সফল হয়েছিল এই অর্থে—'মঞ্চসফল 'পরিণীতা' নাটককে পরিচালক নীরেন লাহিড়ি বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে সহজ সরল ভাবে পর্দায় প্রতিফলিত করতেপেরেছিলেন।'
(বাংলা সাহিত্য ও বাংলা চলচ্চিত্র : নিশীথ মুখোপাধ্যায়)

স্বামীর ঘর : নাট্যকার জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'রীতিমত নাটক' ইতিপূর্বে চিত্রায়িত হয়েছে শিশির কুমার ভাদুড়ির পরিচালনায়। এরপর ইউরেকা পিকচার্স-এর প্রযোজনায়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের পরিচালনায় 'স্বামীর ঘর' নাটকটি চিত্রায়িত হয়। চলচ্চিত্র হিসাবে তা ব্যর্থ হয়েছিল।

১৯৪৪

শেষরক্ষা : রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ' প্রহসনের রবীন্দ্রনাথ কৃত নাট্যসংস্করণ 'শেষরক্ষা' পেশাদার মঞ্চে বহু জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। চলচ্চিত্র হিসাবেও নাটকটি জনপ্রিয়তা পেল চিত্রভারতীর প্রযোজনায়, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের চিত্রনাট্য ও পরিচালনায়।
এতে অভিনয় করেছিলেন পদ্মা দেবী, অমর মল্লিক, জীবেন বসু, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রভা দেবী, রেবা দেবী প্রমুখ। রূপবাণী চিত্রগৃহে ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৪৪-এ মুক্তিলাভ করেছিল।

মাটির ঘর : বিধায়ক ভট্টাচার্যের বহু নাটক পেশাদার মঞ্চে ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করেছে। চিত্রায়িত হয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি। হরি ভঞ্জের পরিচালনায় ভারতলক্ষ্মী পিকচার্স প্রযোজনা করে 'মাটির ঘর'। অভিনয় করেছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরি, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলি, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন মজুমদার, তুলসী লাহিড়ি, সন্তোষ সিংহ, মলিনা দেবী, পদ্মা দেবী, রাজলক্ষ্মী প্রমুখ।
চলচ্চিত্র হিসাবে 'মাটির ঘর' ছিল মঞ্চ নাট্যেরই চিত্ররূপ।

১৯৪৫

দুই পুরুষ : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস ও ছোট গল্পের পাশাপাশি কয়েকটি নাটকও লিখেছিলেন। তারাশঙ্করের এমনই একটি নাটক 'দুই পুরুষ' নিউ থিয়েটার্স-এর প্রযোজনায় সুবোধ মিত্রের পরিচালনায় ১৯৪৫ সালে চিত্রায়িত হয়।
মঞ্চে সফল হলেও 'দুই পুরুষ' চলচ্চিত্র হিসাবে ব্যর্থ হয়েছিল।

পরিশিষ্ট

এর পরেও বহু নাটক বহুবার চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে তবে তা পরিমাণে যেমন বেশি নয় এবং পূর্বের মতো ধারাবাহিকভাবে প্রতিবছরও নয়। যাই হোক সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৯৪৮ সালে বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'বিশ বছর আগে'। ১৯৫১-তে তুলসী লাহিড়ির 'দুখীর ইমান' ও বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী'। ১৯৫২-তে গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'আবু হোসেন' ও দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'। ১৯৫৩-তে গিরিশ-চন্দ্র ঘোষের 'বিল্বমঙ্গল' (এ. জে. প্রোডাকশনের পুনর্নির্মাণ) সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী', তুলসী লাহিড়ির 'পথিক' ও ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কেরানীর জীবন'। ১৯৫৫-তে অমৃতলাল বসুর 'চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে'। ১৯৫৬-তে 'চিরকুমার সভা' ও 'শ্যামলী'। ১৯৬৪-তে শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্রের 'কাঞ্চনরঙ্গ' এবং ১৯৬৫-তে অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'থানা থেকে আসছি'। উল্লিখিত নাটকগুলি মঞ্চে যতটা জনপ্রিয় ছিল চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়ে তার সবকটাই জনপ্রিয়তা পায়নি। যে কটি পেয়েছে সেগুলির মধ্যে তখন চলচ্চিত্রের উপকরণগুলিকে কাজে লাগানো হয়েছে। কেননা চলচ্চিত্র তখন আর মঞ্চের প্রত্যাশী নয়, বরং মঞ্চই তখন ধীরে ধীরে চলচ্চিত্রের দ্বারা প্রভাবিত হতে শুরু করেছে। □

মফস্বলের থিয়েটার

অমল রায়

শিল্পে স্থান মাহাত্ম্যও কম নয়। কলাকার হাজার চেষ্টা করেও স্থান কালের চিহ্ন মুছে ফেলতে পারেন না। হয়ত-বা একটু দূরের হয়ে যায়, একটু অস্পষ্ট হয়ে আসে বড় জোর।

মফস্বলের থিয়েটার বলতে আমরা সাধারণত যে নাট্যকর্মকে চিহ্নিত করে থাকি, তা কিন্তু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যসমন্বিত দেশজ লোকনাট্য নয়, তা হল প্রসেনিয়াম থিয়েটার, বাংলা প্রসেনিয়াম থিয়েটারের মফস্বলি সংস্করণ। মফস্বলের থিয়েটার শহরের সংশ্রববর্জিত দূরতম কোনও গ্রামের নাট্যকর্ম নয়। অত দূরে মফস্বলের প্রসেনিয়াম থিয়েটারও আজ পর্যন্ত ঢুকতে পারেনি। সেখানকার লোকসাধারণ এখনও লোকায়ত নাট্যকলার নানা রূপকেই নাট্যরস আস্বাদনের জন্য আঁকড়ে ধরে থাকেন। মফস্বলের থিয়েটার গ্রাম বাংলার সেই সব প্রান্তিক ভূমিতে আজও পা ফেলতে পারেনি। সেখানে সে-ও বহিরাগত। কলকাতা মহানগরী বলতে আমরা শুধু কলকাতা পৌরনিগমের এলাকাকে না ধরে বৃহত্তর কলকাতা—অর্থাৎ সি. এম. ডি. এ অঞ্চলকেও ধরতে পারি। তাহলে কলকাতার থিয়েটার যদি রাজধানীর থিয়েটার বা মেট্রোপলিটান থিয়েটার হয়ে থাকে, মফস্বলের থিয়েটার হল কলকাতার চেয়ে ছোট শহরের, আধা-শহরের, প্রায়-শহরের বা বড়জোর বর্ধিষ্ণু গঞ্জের থিয়েটার, কখনওই তা গ্রামীণ লোকায়ত নাট্যকলা নয়।

আর এখানেই একটা বড় রকমের সংশয় কণ্টকিত জিজ্ঞাসার চিহ্ন ঝুলে থাকে। পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে প্রসেনিয়াম থিয়েটার প্রচলিত আছে, তাদের মধ্যে নাট্য-উপস্থাপনাগত কিছু-কিছু সাধারণ লক্ষণ দেখা যায়। তার কারণ, বাঁধা মঞ্চ বা প্রসেনিয়াম থিয়েটার বলতে আমরা আজ যা বুঝি, তা মূলত ইয়োরোপীয় প্যাটার্নের। এই ইয়োরোপীয় প্রসেনিয়াম থিয়েটার পৃথিবীর অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েছে শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিক শক্তির তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে গ্রাস করার সূত্রে। আর ইয়োরোপের বাইরে সর্বত্রই এই প্রসেনিয়াম থিয়েটার প্রধানত গড়ে উঠেছে রাজধানী বা বড়-বড় শহর-গুলিতেই। তার কারণ—ঔপনিবেশিক শাসন ছিল মূলত নগরকেন্দ্রিক, তাই ইয়োরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাবও নাগরিক পরিমণ্ডলটিকে খুব একটা অতিক্রম করতে পারেনি। প্রায় সর্বত্রই বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে লোকায়ত দেশজ নাট্যকলার নানা রূপের চর্চা চলেছে, অনেকটা নগরের প্রসেনিয়াম থিয়েটারের সমান্তরাল একটি ধারা

হিসাবেই।

একথা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও সত্য। আমাদের প্রসেনিয়াম থিয়েটারও ব্রিটিশ আধিপত্যের সাংস্কৃতিক উপজাত ফল। যদিও ভারতীতিহাসের আদি পর্বে এদেশেও রাজসভাপৃষ্ঠ-পোষিত বাঁধা মঞ্চে নাট্যানুশীলনের একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ছিল, সংস্কৃত নাটকের স্বর্ণযুগের সেই পরম্পরা কিন্তু অব্যাহত থাকেনি, মধ্যযুগের তুর্কি মোঘল শাসনের যুগে রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষণার অভাবে ক্রমশ মঞ্চের সেই দেশীয় নাট্যরীতি পরিত্যক্ত ও অপ্রচলিত হয়ে যায়। বরং দেশজ লোকনাট্যেরই একটি অব্যাহত ধারাবাহিকতা বজায় থেকে গেছে, যেহেতু সে চিরদিনই রাজশক্তির আনুকূল্যবঞ্চিত ব্রাত্য ও অন্ত্যজ, তাই রাষ্ট্রযন্ত্রের অধিপতিকুলের পালাবদলে তার কিছু এসে যায়নি, সে তার মতো করেই বেঁচে থেকেছে, নিজস্ব ভূমি থেকে আহরণ করেছে প্রাণরস। এই লোক-নাট্যকলার কিন্তু কোনও সাধারণ রূপ কোনও কালেই ছিল না। অঞ্চলভেদে আঙ্গিকের ভিন্ন-ভিন্ন রূপ গড়ে উঠেছিল। তবে সমস্ত লোকনাট্যেরই একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য তা কিন্তু বাঁধা মঞ্চের নাটক নয়, তা প্রধানত পথ-ঘাট ও মাঠ-ময়দানের নাটক, কখনও-বা মিছিলের মতো চলমান নাটকও।

আমাদের আধুনিক থিয়েটার কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় লৌকিক নাট্যরীতির বিবর্তিত রূপ নয়। আগেই বলেছি এ থিয়েটার বৈদেশিক আধিপত্যের হাত ধরে আসা ইয়োরোপীয় প্যাটার্নের প্রসেনিয়াম থিয়েটার। স্বভাবতই এ থিয়েটার চরিত্রের দিক থেকে নাগরিক। কলকাতার প্রসেনিয়াম থিয়েটারও নাগরিক থিয়েটার, মফস্বলের থিয়েটারও তাই। তফাতটা শুধু বড় শহরের সঙ্গে ছোট শহরের বা আধা ও প্রায়-শহরের। তদুপরি যে সাধারণ লক্ষণগুলোর জন্যে কলকাতার প্রসেনিয়াম থিয়েটারের সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য দেশের প্রসেনিয়াম থিয়েটারের মিল রয়েছে, সেই মিল অল্পবিস্তর মফস্বলের থিয়েটারের সঙ্গেও আছে। যেটুকু অমিল তা আধুনিকতম মঞ্চোপকরণের অভাবজনিত, মৌলিক কোনও প্রভেদ নেই।

অবশ্য একথাও আমাদের মানতে হবে ইয়োরোপীয় প্যাটার্নের প্রসেনিয়াম থিয়েটার যে পৃথিবীর অন্যত্রও নাগরিক নাট্যচর্চার প্রধান মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে, সেটা শুধু ইয়োরোপীয় বিভিন্ন দেশের উপনিবেশ বিস্তারের অনুষঙ্গ হিসাবেই নয়, ওই প্রসেনিয়াম থিয়েটারের মাধ্যমগত অন্তর্নিহিত প্রচন্ড শক্তিও এর কারণ। বিশ্ব নাট্যসাহিত্যে বিভিন্ন দেশের যে নাটকগুলি সেরা সৃষ্টি হিসাবে বন্দিত হয়েছে, তার বেশির ভাগই প্রসেনিয়াম থিয়েটারের জন্য লেখা। আর সেইজন্যেই প্রসেনিয়াম থিয়েটার নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটি বিশ্বজনীন নাট্যভাষা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

কিন্তু তার মানে এই নয়, প্রসেনিয়াম থিয়েটারের দেশভেদে-অঞ্চলভেদে কোনও পার্থক্য নেই। স্থানগত বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত না হলে কোনও শিল্পকলারই সজীব বিকাশ ঘটে না। ফলে মূল সাধারণ চরিত্রটি এক থাকা সত্ত্বেও তা দেশে-দেশে ভিন্ন-ভিন্ন রূপ নিয়েছে, সেই দেশগুলির নিজস্ব সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র ও পারম্পর্যকে আত্মস্থ করেই একেকটি

দেশের থিয়েটার একেক রকমের চেহারা নিয়েছে, ব্রিটিশ থিয়েটার, ফরাসি থিয়েটার বা রুশ থিয়েটার তাদের নিজস্ব জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করেই বিকশিত হয়েছে। ফলে এইসব থিয়েটার একটি মূলগত সর্বজনীন ঐক্যসূত্রে বিধৃত হয়েও জাতীয় থিয়েটার হতে পেরেছে।

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বিষয়টি অবশ্য অন্যরকম। যদিও ইদানীং 'ভারতীয় থিয়েটার'-এর একটি স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত নিজস্ব রূপরীতি অন্বেষণের জন্যে বহু নাট্যবিদ আদাজল খেয়ে লেগে পড়েছেন, তথাপি 'ভারতীয় থিয়েটার' বলে সর্বজনগ্রাহ্য কোনও কিছু অদ্যাবধি গড়ে ওঠেনি। এই দেশে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের চর্চা লেবেদফের পূর্বসূত্রবিরহিত ও পরবর্তী যুগে প্রভাবহীন বিচ্ছিন্ন চেষ্টাটিকে ধরলে দুশো বছর এবং না ধরলে প্রায় দেড়শো বছর ধরে চলছে, তথাপি 'ভারতীয় প্রসেনিয়াম থিয়েটার' বলে কোনও কিছু গড়ে ওঠেনি। ইদানীং যে সব 'জাতীয় নাট্যমেলা' হয়ে থাকে, সেখানে বহু আঞ্চলিক লোকনাট্যকেও প্রসেনিয়াম মঞ্চে হাজির করা হয়, তিজন বাইয়ের 'পাণ্ডবানি' তো কোনওভাবেই প্রসেনিয়াম থিয়েটার নয়।

অবশ্য একথাও ঠিক, বৈদেশিক প্রভাবসঞ্জাত প্রসেনিয়াম থিয়েটারকে জাতীয় চরিত্র দিতে গেলে তার চালচিত্রে স্বদেশি আদল আনতেই হবে, আর এক্ষেত্রে দেশজ লোকনাট্যের বিভিন্ন রূপের সঙ্গে তার মেলবন্ধন ঘটাতেই হবে। সেদিক থেকে 'জাতীয় নাট্যমেলা'-য় লোকনাট্যের আবাহনের পিছনে নিশ্চয়ই একটা যৌক্তিকতা আছে। কিন্তু গলদটা সম্ভবত বিসমিল্লাতেই। ভারতীয় থিয়েটার নামক অলীক সোনার হরিণটিকে আমরা কোথায় খুঁজে পাব?

তা ছাড়া, বহু জাতিসত্তা, বহু ভাষা ও নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী অধ্যুষিত এই ভারতীয় উপ-মহাদেশে ভারতীয় থিয়েটার বলে আদপেই কোনও কিছু তৈরি হতে পারে না, এমন কি দেশজ লোকনাট্যের মশলা মিশিয়েও না। কার্যত আমরা বাঙালির থিয়েটার বুঝি, মরাঠি থিয়েটার বুঝি, গুজরাতি থিয়েটার বুঝি, তেলেগু, তামিল বা মালয়ালম থিয়েটার বুঝি, কিন্তু ভারতীয় থিয়েটার বুঝি না। এইসব কিছু মিলিয়ে একটা জগাখিচুড়ির নাম যদি কেউ ভারতীয় থিয়েটার দিতে চান, দিতে পারেন, কিন্তু যে অর্থে নরওয়েজিয় বা জাপানি থিয়েটার তাদের জাতীয় থিয়েটার, সে অর্থে ভারতীয় থিয়েটার কদাপি নয়। আর তা ছাড়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের বিকাশও সমানভাবে ঘটেনি, ফলে বাংলায় নাট্যচর্চার প্রধান মাধ্যম যেমন প্রসেনিয়াম থিয়েটার, অন্য বহু প্রদেশেই তা নয়, সেখানে লোকায়ত নাট্যকলার বিভিন্ন রূপই জনমানসের নাট্যরস আস্বাদনের প্রধান ক্ষেত্র।

মফস্বল বাংলার থিয়েটারের আলোচনার সূত্রে ভারতীয় থিয়েটার পর্যন্ত দৌড়নো অনেকের কাছে ধান ভানতে শিবের গীত বলে মনে হতেই পারে। কিন্তু যেহেতু আমরা মফস্বল বাংলার থিয়েটারের নিজস্ব কোনও স্বতন্ত্র রূপরীতি আছে কিনা তার বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছি, সুতরাং এই বিষয়টি তথাকথিত ভারতীয় থিয়েটারের পরিপ্রেক্ষিতেও

আলোচনা করতে হবে। আমরা দেখলাম, ভারতীয় থিয়েটারের কোনও অবিভাজ্য একক রূপ নেই, যা আছে তা হল, ভাষাভিত্তিক জাতিসত্তাগুলির নিজস্ব থিয়েটার। যেমন আমাদের বাংলা থিয়েটার বা বাঙালির থিয়েটার। এই বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর থিয়েটারকেও আমরা ইদানীং কলকাতার থিয়েটার ও মফস্বল বাংলার থিয়েটার এই দুই ভাগে ভাগ করে বিচার করতে শুরু করেছি। এটা কতদূর বাস্তবসম্মত, এই প্রশ্ন আজ আমাকেও কুরে-কুরে খাচ্ছে। যদিও একদা আমি নিজেই ছিলাম মফস্বল বাংলার থিয়েটারের স্বাতন্ত্রগর্বিত থিয়েটারি সেপাই, তথাপি আজ আমাকেও ফিরে দেখতে হচ্ছে। বিভাজনটা যদি হতো—বাংলার নগরসভ্যতার প্রতিনিধি প্রসেনিয়াম থিয়েটারের এবং বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলের নাট্যকলা লোকনাট্যের মধ্যে, সে ক্ষেত্রে এই বিভাজনের অন্তত কিছুটা যৌক্তিকতা থাকত। যদিও এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে—যা আমরা আগেই সংক্ষেপে বলেছি, দেশজ লোকনাট্যেরও কোনও একটি সর্বজনগ্রাহ্য রূপরীতি নেই, এটা শুধু ভারতীয় উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটেই সত্য নয়, এটা সত্য ভাষাভিত্তিক জাতিসত্তার ক্ষেত্রেও। অর্থাৎ বাংলার লোকনাট্যেরও কোনও সর্বজনীন রূপ নেই, শুধু জেলাভেদে নয়, একই জেলা বা একই মহকুমার মধ্যেও বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের লোকায়ত নাট্যকলা প্রচলিত। অনেকে অবশ্য যাত্রার কথা তুলবেন। যদিও যাত্রা উৎসে একটি লৌকিক নাট্যমাধ্যমই ছিল, কিন্তু নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজ সে যেখানে পৌঁছেছে, বিশেষত বাণিজ্যিক প্রসেনিয়াম থিয়েটার এবং চলচ্চিত্রের কু-প্রভাবে তার যাত্রাপথ যেখানে গিয়ে আপাতত শেষ হয়েছে, সেখানে সে ফর্মের দিক থেকে অনেকটা মিশ্র রীতির এবং সেই সঙ্গে সর্বজনীন হয়ে উঠলেও তার লোকায়ত চরিত্র বহুলাংশে বিনষ্ট হয়ে গেছে। তা ছাড়া মফস্বলের থিয়েটার লোকনাট্য নয়, যাত্রাও নয়, সেটাও কলকাতার মতোই প্রসেনিয়াম থিয়েটার। তাহলে কী সেই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যা মফস্বলের নাট্যচর্চাকে কলকাতার থিয়েটারের থেকে পৃথক করেছে।

এই বিভাজন প্রসেনিয়াম বা নন-প্রসেনিয়াম বা অফ-প্রসেনিয়াম নাট্যরীতিরও নয়। বাদলবাবুদের থার্ড থিয়েটারের চর্চা মফস্বলের কিছু নাট্যসংস্থা—যেমন, ঋতম বা লিভিং থিয়েটার বা পথসেনা—করে থাকেন, তেমন করেন কলকাতার শতাব্দীও। তা হলে এ ক্ষেত্রে কলকাতা ও মফস্বলের ফারাক বোঝাও যায় না। তাছাড়া মফস্বল বাংলার থিয়েটার বলতে আমরা যা বুঝি, তা যে প্রধানত প্রসেনিয়াম থিয়েটার একথাও বারবার বলা হয়েছে।

আসলে বাংলা নাট্যচর্চাকে প্রসেনিয়াম থিয়েটার ও লোকনাট্য, প্রসেনিয়াম থিয়েটার ও যাত্রা, প্রসেনিয়াম থিয়েটার ও নন বা অফ-প্রসেনিয়াম বা স্টিট-থিয়েটার, মুনাফালোভী পেশাদার থিয়েটার ও অবাণিজ্যিক অপেশাদার থিয়েটার কিংবা কমার্শিয়াল থিয়েটার, জীবনমুখি ও শিল্পশোভন গ্রুপ থিয়েটার ও অ্যামেচার থিয়েটার—এই রকম নানা বিভাগে বিভক্ত করা যতটা সহজ, সম্ভবত ততটা সহজ নয় কলকাতা ও মফস্বলে ভাগ করা। কেননা উল্লিখিত প্রতিটি বিভাজিত অংশই কলকাতাতেও আছে, মফস্বলেও আছে, এক

স্থায়ী পেশাদার মঞ্চ ছাড়া। এটা কেবলমাত্র কলকাতাতেই আছে, মফস্বলের দুয়েকটা শহরে এ ধরনের নিয়মিত বাণিজ্যিক নাট্যপ্রযোজনার চেষ্টা হলেও তা স্থায়ী হয়নি। তবে মফস্বলও পেশাদার বাণিজ্যিক থিয়েটারের কলুষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়, কেননা কলকাতার বাণিজ্যিক থিয়েটার মফস্বলে প্রায়ই কল শো করতে যায়। তা ছাড়া একেবারে হালফিল ওয়ান ওয়াল থিয়েটার নামে কলকাতায় একটি খুড়োর কল তৈরি হয়েছে, যা যাত্রা এবং প্রসেনিয়াম থিয়েটারের একটি ককটেল ছাড়া কিছু নয় এবং এটা তৈরিই করা হয়েছে মফস্বলে কলকাতার বাণিজ্যিক থিয়েটারের পসরা নিয়ে যাত্রার জন্যে, শুধু শহরগুলিতে নয়, দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলেও এটা যেতে শুরু করেছে।

এত সব বলার পরেও কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, যদিও কলকাতার থিয়েটার ও মফস্বলের থিয়েটারের মধ্যে মৌলিক কোনও প্রভেদ নেই এবং গুণগত বিচারেও কলকাতাই শ্রেষ্ঠ এবং মফস্বল হীনতর—বা উল্টোটা—এমনটিও বলা চলে না—(কুমার রায়ের বহুরূপীর আর বালুরঘাটের হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের ব্রি-তীর্থের 'গালিলিও' প্রযোজনা দেখিয়ে দিয়েছে—কেউ কারুর থেকে কম যায় না।) তথাপি মফস্বল বাংলার থিয়েটার আলাদা করে কেন আজ আমাদের মনোযোগ দাবি করছে, কেনই বা আজ অনেকেই বিশ্বাস করছেন—মফস্বলের থিয়েটারের সত্যিই বর্তমানে কলকাতা-নিরপেক্ষ একটি নিজস্ব চেহারা গড়ে উঠেছে, সে কথা বোধহয় আরেকটু তলিয়ে বোঝবার দরকার আছে। সবটাই অলীক কিংবদন্তী নয়, আর তা ছাড়া কিংবদন্তীরও ভিত্তিভূমিতে কিছু সত্যের বনিয়াদ থেকে যায়।

আসলে ষাটের দশকের শেষ দিক থেকে মফস্বলের প্রসেনিয়াম থিয়েটার দীর্ঘদিনের উপেক্ষা, অবহেলা ও অনাদরের অন্ধকার ছিন্ন করে পাদপ্রদীপের আলোয় নতুন করে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং কলকাতার থিয়েটারের প্রতিস্পর্ধী হিসাবে সগর্বে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। এটা অবশ্য গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনে। আমি এখানে বাণিজ্যিক থিয়েটার বা অ্যামেচার থিয়েটারের কথা ধর্তব্যের মধ্যেই আনছি না। এই পর্বে আমার সমস্ত আলোচনাই কলকাতা ও মফস্বলের গ্রুপ থিয়েটার হিসাবে চিহ্নিত নাট্যদল-গুলিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হবে।

মনে থাকতে পারে—ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ শেষ পাঁচটি বছরে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক কাঠামোয় একটা বিশাল ভাঙনের সূত্রপাত হয়েছিল। এই অগ্নিগর্ভ উত্তাল সময়ের কতটুকু প্রতিফলন পড়েছিল সেদিন কলকাতার থিয়েটারে? না, গ্রুপ থিয়েটার নামটি তখনও প্রচলিত হয়নি। গণনাট্য সঙ্ঘ বেশ কয়েকবার হল ভেঙে গেছে বা সক্রিয়তা হারিয়েছে। গণনাট্য সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসা শক্তিশালী নাট্যদলগুলি তখন নবনাট্যের (পরে সংনাট্য) তত্ত্ব আমদানি করে মঞ্চে জনজীবনের রূপময় নাট্যভাষ্য নির্মাণের বদলে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতবিহীন ব্যক্তিমানসের সমস্যা-সঙ্কট-দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাতের রহস্যময় অবচেতন অন্ধকারে ডুব দিয়ে ঝিনুক কুড়োতে ব্যস্ত। ছেষট্টির খাদ্য আন্দোলন ও বন্দীমুক্তির দাবি তাঁদের বেশিরভাগকেই তেমনভাবে

স্পর্শ করতে পারেনি, অন্তত তাঁদের নাট্যকর্মে তার প্রকাশ নেই। অবশ্যই এই পরিমণ্ডলে উৎপল দত্ত ছিলেন মহৎ ব্যতিক্রম। এল. টি. জি-র নাটকে সেই দুঃসময়েও বিদ্রোহের রক্তকেতন উড়েছিল। উৎপল দত্ত, জ্যোছন দস্তিদারদের জেলেও যেতে হয়েছিল। কিন্তু ব্যতিক্রম তো মূল প্রবাহ নয়। কলকাতার থিয়েটারের মূল প্রবাহে কিন্তু উত্তপ্ত সমকালের প্রতিফলন নেই। হ্যাঁ, এইসময় থেকেই মফস্বলের নাট্যদলগুলি অন্তত সমাজমনস্কতার প্রশ্নে কলকাতাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে থাকে।

এই সময়েই মফস্বলে নাট্যপ্রতিযোগিতাগুলির প্রচলন শুরু হয় প্রধানত বামপন্থী সাংস্কৃতিক কর্মীদের উদ্যোগে। ১৯৬২ সালে বামপন্থী আন্দোলন আক্রান্ত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লে মফস্বল বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে নাট্য প্রতিযোগিতার নামে বামপন্থী নাটক করার একটি পরিকাঠামো গড়ে উঠতে থাকে অনেকটাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে। আর এইভাবেই সেই দুঃসময়ে, গণতান্ত্রিক অধিকারহীন কালবেলায় বাংলা নাটক অন্তত মফস্বল বাংলায় গণপ্রতিবাদের বলিষ্ঠ মাধ্যম হয়ে ওঠে। ঠিক এই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল নকশালপন্থী আন্দোলনের ভাঁটার সময়ে, সাতের দশকে, যখন গণআন্দোলনের নেতারা কারাবন্দী, সেই সময় মফস্বল বাংলার প্রতিযোগিতামঞ্চে ফ্যাসিস্ত বর্বরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের রক্তকেতন উড়েছিল—এ প্রসঙ্গে একটু পরে বিস্তারিত আলোচনা করব। আপাতত মফস্বলে নাট্য প্রতিযোগিতাগুলির উদ্ভবের পরিপ্রেক্ষিতটি সংক্ষেপে বুঝে নিতে চাই। যদিও নাট্যপ্রতিযোগিতার শুরু কলকাতাতেই, পাঁচের দশকে বিশ্বরূপা আয়োজিত পূর্ণাঙ্গ নাট্য প্রতিযোগিতা বা থিয়েটার সেন্টারের নাট্যপ্রতিযোগিতাকে ঐতিহাসিকভাবে এই ধারার প্রবর্তক বললেও কলকাতাতে কিন্তু কখনওই নাট্যপ্রতিযোগিতার ব্যাপক প্রচলন ঘটেনি এবং এখনও কলকাতায় কয়েকটি নাট্যপ্রতিযোগিতার আসর বসলেও প্রতিযোগিতামঞ্চ কখনওই কলকাতার নাট্যচর্চার, এমন কি বামপন্থী নাট্যচর্চারও প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু ষাটের দশকের গোড়া থেকেই বিশেষত ভারত-চীন সীমান্ত সঙ্ঘর্ষের পর থেকে মফস্বলে নাট্যপ্রতিযোগিতার আসর বসতে থাকে এবং ক্রমশ মফস্বলবাংলার নাট্যচর্চা আবর্তিত হতে থাকে প্রতিযোগিতামঞ্চকে ঘিরেই। বস্তুত নাট্যপ্রতিযোগিতাগুলিই হয়ে ওঠে মফস্বলের থিয়েটারের প্রধান মাধ্যম। আর এখানে, এই প্রতিযোগিতাগুলির ক্ষেত্রে, আরেকটি বিষয়ও উল্লেখযোগ্য। যদিও মফস্বলে আগেও যেমন কিছু-কিছু পূর্ণাঙ্গ নাটকের প্রতিযোগিতা হয়েছে এবং এখনও স্বল্পপরিমাণে হয়ে থাকে, তবু মফস্বলের অধিকাংশ নাট্যপ্রতিযোগিতাই কিন্তু একাঙ্ক নাট্যপ্রতিযোগিতা। উপযুক্ত মঞ্চোপকরণের অভাবের জন্যেই হোক বা মহিলা শিল্পীর অপ্রতুলতার জন্যেই হোক (কেননা, পূর্ণাঙ্গ নাটকে মহিলা চরিত্র না থাকাটা নেহাতই ব্যতিক্রম, বেশিরভাগ পূর্ণাঙ্গেই একাধিক নারীচরিত্র থাকে। অথচ একাঙ্ক নাটক স্ত্রী ভূমিকাবর্জিত হতে কোনও বাধা নেই এবং বেশিরভাগ একাঙ্ক নাটক তাই-ই হয়ে থাকে।) মফস্বলের থিয়েটারে একাঙ্ক নাটকই প্রধানত অভিনীত হয়ে থাকে। ষাটের দশকের প্রথমার্ধেই মফস্বলে একাঙ্ক

নাটক প্রতিযোগিতার সূত্রপাত হয়। এক্ষেত্রে নিমতার সংগঠনী ক্লাব. নৈহাটির যান্ত্রিক, চুঁচুড়ার কল্লোল সাংস্কৃতিক সংস্থা প্রভৃতিকে পথিকৃতের মর্যাদা দিতে হবে। দু-এক বছর আগুপিছু এঁরাই একাঙ্ক নাট্যপ্রতিযোগিতা শুরু করেন, যা পরে ঝড়ের মতো মফস্বল বাংলার অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে আরেকটি তথ্য নথিবদ্ধ করা উচিত উল্লিখিত তিনটি সংস্থাই কিন্তু মোটামুটি বামপন্থী রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত ছিল।

এই আলোচনা থেকে আমরা ছয়ের দশকে মফস্বলের নাট্যচর্চার যে সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত পেলাম, তা থেকে মফস্বলের থিয়েটারের তিনটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ছে। এক, রাজনীতি, বিশেষত বামপন্থী রাজনীতির নাট্যভাষ্য নির্মাণ মফস্বলের থিয়েটারের অভীষ্ট। কলকাতাতেও সেই যুগে বামপন্থী থিয়েটারের দল ছিল, কিন্তু উৎপল দত্তের মতো বড় মাপের নাট্যব্যক্তিত্বের অবস্থিতি সত্ত্বেও সেটিই প্রধান ধারা ছিল না। অথচ মফস্বলের প্রতিটি সিরিয়াস নাট্যদলই রাজনীতি-সচেতন শুধু নয়, তা বাম রাজনীতির প্রতি সহানুভূতিশীলও বটে। দুই. মফস্বলের থিয়েটার প্রধানত আবর্তিত হতে থাকে প্রতিযোগিতা-মঞ্চকে কেন্দ্র করে। কলকাতায় নাট্যপ্রতিযোগিতার সূত্রপাত ঘটলেও কখনও তা মফস্বলের মতো ব্যাপকতা পায়নি। তিন, মফস্বলের থিয়েটার প্রধানত একাঙ্ক নাটক নির্ভর। বস্তুত সাম্প্রতিক কালে বাংলা একাঙ্ক নাটকের যেটুকু সমৃদ্ধি ঘটেছে, তার সবটুকুই মফস্বলের নাট্যকর্মীদের অবদান। কলকাতায় যে একেবারে একাঙ্ক নাটকের চর্চা হয় না তা নয়, কচিৎ বড় দলগুলিও একাঙ্ক নাটক করে থাকেন বটে, তবে তা তাঁদের অবসরের খেলা মাত্র। আর মফস্বলের নাট্যদলগুলির কাছে একাঙ্ক নাটক শুধু আত্মপ্রকাশের প্রধান মাধ্যম নয়, তা হল তাঁদের আত্মার আনন্দ। পূর্ণাঙ্গ নাটক কদাচ কখনও মফস্বলের দলগুলি প্রযোজনা করলেও, তা সংখ্যার দিক থেকেও যেমন কম, মানের দিক থেকেও বালুরঘাটের ত্রিতীর্থ বা বহরমপুর রেপার্টরি থিয়েটার বা ছাদ্দিকের মতো কিছু ব্যতিক্রমী দলকে বাদ দিলে কলকাতার তুলনায় দীনতর। আসলে পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক নাটক প্রযোজনার ক্ষেত্রে কলকাতা এবং মফস্বল একেবারেই বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে।

অবশ্যই এগুলিকে কলকাতার থিয়েটারের সঙ্গে মফস্বলের নাট্যচর্চার পার্থক্য হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। তবে এই ফারাকটি কিন্তু ছয়ের দশকের আগে এতটা প্রকট হয়নি। এর আগে মফস্বলের থিয়েটার ছিল অনেকটাই অ্যামেচার থিয়েটার। দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই অ্যামেচার থিয়েটার কলকাতার পেশাদার রঙ্গমঞ্চকেই হুবহু অনুকরণ করার পবিত্র কর্তব্যে নিরত ছিল। রাজধানীর রঙ্গমঞ্চে যে নাটকগুলি 'হিট' বা জনসমাদৃত হতো, সেগুলিই মফস্বলে পুজোর সময় বা পালা-পার্বণে পুনরাভিনীত হতো। প্রায় সব মফস্বল শহরেই একজন করে নকল দানীবাবু, নকল নরেশ মিত্র, নকল শিশির ভাদুড়ি, নকল দুর্গাদাস, নকল নির্মলেন্দু লাহিড়ি, নকল অহীন্দ্র চৌধুরির সসম্মানে বিরাজ করতেন। সাধারণত জমিদারবাবুরা এইসব থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মফস্বলের বহু অঞ্চলে এঁরা এইসব বাৎসরিক নাট্যানুষ্ঠানের জন্যে বাঁধা মঞ্চও তৈরি

করে দিয়েছিলেন। সম্প্রতি আমি দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগরে এমন একটি প্রাচীন মঞ্চ দেখে এসেছি, যেখানে দানীবাবু 'কল শো' করে গেছেন। যেখানে মঞ্চ ছিল না সেখানে নাটমন্দিরে বা অস্থায়ী বাঁধা মঞ্চে মফস্বলের অ্যামেচার থিয়েটার কলকাতার পেশাদার থিয়েটারের সাধ্যমতো অনুকরণ করত।

মফস্বলের অ্যামেচার থিয়েটার যে গোড়া থেকেই কলকাতার মুখাপেক্ষী ছিল, এমনটা কিন্তু জোর দিয়ে বলা যাবে না। আগেই বলা হয়েছে—মানসিক প্রবণতার বিচারে বাংলা থিয়েটারের তিনটি ধারা—সখ মেটাবার জন্যে নাটক করে অ্যামেচার থিয়েটার, মুনাফার লোভে নাটুকে ব্যবসা করে বাণিজ্যিক থিয়েটার এবং যে থিয়েটার নাট্যশিল্পের প্রতি আভ্যন্তরীণ আনুগত্যে বা সমাজমনস্ক প্রতিবাদী ভূমিকা পালনের জন্যে লড়াই করছে, ইদানীং তার শিথিল পরিচয় গ্রুপ থিয়েটার। যেহেতু মুখে রঙ মেখে 'অ্যাক্টো' করার জন্যেই অ্যামেচার থিয়েটারের জন্ম, তাই তার প্রতি, সিরিয়াস নাট্যপ্রেমী মানুষের করুণামিশ্রিত অবজ্ঞা জন্ম নিয়েছে। কিন্তু একথাও অস্বীকার করা যাবে না যে, বাংলা প্রসেনিয়াম থিয়েটারের সূচনাপর্বে অ্যামেচার থিয়েটারই ছিল আমাদের নাট্যচর্চার শুধু প্রধান নয়, একমাত্র প্রবাহ। শোভাবাজার, পাথুরিয়াঘাটা বা জোড়াসাঁকোর জমিদার বাড়িতে যে বাংলা থিয়েটার হতো সাহেবদের ইংরেজি থিয়েটারের অনুকরণে সেগুলোর পেছনে যতটা না ছিল নাট্যকলার উন্নতির প্রয়াস, তার চেয়ে বেশি ছিল ইংরেজের সংস্পর্শে এসে অর্থনৈতিক ভাবে আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদার-নন্দন, মধ্যস্বত্বভোগী মুৎসুদ্দি, ফড়ে ও বানিয়াদের আলোকপ্রাপ্ত সংখ্যালঘু অংশের 'প্রগতিশীল' সৌখিনতা—অন্য পশ্চাৎপদ বৃহদংশটি যখন বেড়ালের বিয়ে দিত, বুলবুলির লড়াই বাঁধাত, বাঈ নাচ দেখত, এঁরা তখন 'থ্যাটার' করতেন। তাই চরিত্রের দিক থেকে এই থিয়েটার অ্যামেচার থিয়েটারই, যদিও এর কুশীলবরা অনেকেই ছিলেন বেতনভুক কর্মচারি মাত্র। বাংলা থিয়েটারের এই আদি পর্বের অ্যামেচার থিয়েটার কলকাতাতেই শুধু হতো না, মফস্বলের কোথাও কোথাও এই সময়েই হয়েছিল মফস্বলের জমিদারবর্গের পৃষ্ঠপোষণায়। মফস্বলের এই আদি পর্বের অ্যামেচার প্রসেনিয়াম থিয়েটার নিশ্চয়ই কলকাতার অনুকরণ করত না, কেননা—কলকাতায় তখনও থিয়েটারের কোনও নিজস্ব ধরানা তৈরি হয়নি, তা ছাড়া বাংলার সংস্কৃতিতে কলকাতার প্রভাব তখনও সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠেনি। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর মফস্বলের অ্যামেচার থিয়েটার তখনও কলকাতার মুখাপেক্ষী ছিল না। "স্বদেশী যাত্রা বিলাতী থিয়েটার" গ্রন্থে ঊনবিংশ শতাব্দীর মফস্বলের অ্যামেচার থিয়েটারের নিজস্ব স্বাতন্ত্রচিহ্নিত কয়েকটি নাট্যপ্রযোজনার উল্লেখ আছে।

মফস্বলে কলকাতার থিয়েটারি প্রভাব পড়তে শুরু করে ১৯৭২ সালে পেশাদার রঙ্গমঞ্চের সৃষ্টির ফলে নিয়মিত নাট্যপ্রযোজনার রীতি চালু হবার পর থেকে। যেহেতু মফস্বলে নিয়মিত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে থিয়েটার চলার কোনও বাস্তব ভিত্তি ছিল না, তাই এখন থেকে মফস্বল বাংলার অ্যামেচার থিয়েটার পুরোপুরি কলকাতা নির্ভর

হয়ে ওঠে। এই নির্ভরতার হাত থেকে মফস্বলের থিয়েটার মুক্তি পায় এই শতাব্দীর ছয়ের দশকে এসে। এমনকি, চল্লিশের দশকের গণনাট্য সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলা থিয়েটারে অ্যামেচার ও পেশাদার থিয়েটারের বাইরে যে সমাজ সচেতন ও গণমুখি নাট্যধারার সূচনা হল, যার পরিণতিতে গ্রুপ থিয়েটারগুলির জন্ম, সেই গণনাট্য সঙ্ঘও সেদিন মফস্বল-বাংলার থিয়েটারের চালাচিত্রে তেমন কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। গণনাট্য সঙ্ঘ ও তার যুগান্তকারী নাট্যপ্রযোজনা "নবান্ন" সম্পর্কে যত ইতিবাচক কথাই বলা হোক না কেন, তবুও একথা দিবালোকের মতো সত্য যে, গণনাট্য কলকাতার থিয়েটারকে প্রভাবিত করলেও, এমনকি পেশাদার থিয়েটারে শিশির ভাদুড়িকে "দুঃখীর ইমান" নামাতে অনুপ্রাণিত করলেও মফস্বল বাংলায় তার প্রভাব-বলয়টি বহু পরে বিস্তৃত হয়েছিল। যদিও সেই সঙ্গেই মফস্বলের কোনও কোনও অঞ্চলে গণনাট্যের শাখা গড়ে উঠেছিল, তবু মফস্বলের থিয়েটার প্রধানত, দীর্ঘদিন পর্যন্ত কলকাতার পেশাদার থিয়েটারের দাসত্ব করেছে, হয়ত বা কখনও-সখনও কলকাতার গ্রুপ থিয়েটারের সমাদৃত কোনও নাটক মফস্বলে মঞ্চস্থ হয়েছে, তাও নিতান্ত কম, তবু তা এক ধরনের কলকাতা-নির্ভরতা তো বটেই! অর্থাৎ মফস্বলেও অন্য ধরনের যে থিয়েটার আস্তে-আস্তে গড়ে উঠছিল, তাও ছিল কলকাতার প্রভাবেই প্রভাবিত, নিজস্ব কোনও নাট্যভাষা তৈরির তাগিদ সেখানে ছিল না।

ষাটের দশক, বিশেষত তার শেষার্ধ থেকেই মফস্বল বাংলা তেজী ঘোড়ার মতো বাংলা থিয়েটারের প্রশস্ত অঙ্গনে দাপিয়ে বেড়াতে লাগল। সেটা মূলত তার রাজনৈতিক অবস্থানের জন্যে। নকশালবাড়ির ঘটনা ঘটার পর সারা দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে, বিশেষত তার যুবমানসে যুগান্তকারী পরিবর্তনের দোলা লাগল, কলকাতার গ্রুপ থিয়েটারে তার প্রভাব যতটা না পড়েছিল, তার শতগুণ বেশি প্রভাব পড়েছিল মফস্বলের ছোট ছোট নাট্যদলে। অস্বীকার করার উপায় নেই কলকাতার মঞ্চেও নকশালবাড়ির রাজনীতির প্রভাবে "তীর" থেকে শুরু করে "চাকাভাঙা মধু,", "কলকাতার হ্যামলেট" "পদ্য-গদ্য-প্রবন্ধ" ইত্যাদি অসাধারণ শিল্পগুণান্বিত নাটক নেমেছে; কিন্তু ৭২ সাল থেকে স্বৈরাচারী বর্বরতার অন্ধকার কালরাত্রি শুরু হবার পর থেকে, বিশেষত জরুরি অবস্থার রক্তচক্ষু প্রদর্শনের পর থেকে কলকাতার থিয়েটার তার একদা তীব্র প্রতিবাদী ভূমিকা ক্রমশ হারিয়ে ফেলতে থাকে এবং কোনও না কোনওভাবে প্রতিপক্ষের সঙ্গে আপোস করে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে থাকে। ঠিক এই সময়েই মফস্বল বাংলার দুঃসাহসী ছোট ছোট নাট্যদলগুলি স্বৈরতন্ত্রের আঁধার শাসন ছিন্নভিন্ন করে নকশালবাড়ির সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনীতি মঞ্চে-মঞ্চে প্রচার করে বেড়িয়েছে শুধু নয়, স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনজাগরণ সৃষ্টির ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে মফস্বল বাংলার নাট্যকর্মীরা নাট্যপ্রতিযোগিতা ও নাট্যোৎসবের মঞ্চে দাঁড়িয়ে স্বৈরতন্ত্র-বিরোধী যে সমস্ত নাটক একের পর এক নামিয়ে গেছেন, তার সবগুলিই হয়ত শিল্পোত্তীর্ণ ছিল না, কিন্তু সময়ের সত্যকে তা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিল, দেশ ও কালের

প্রতি দায়িত্ব পালন করেছিল। স্বৈরতন্ত্রবিরোধিতার প্রশ্নটিকে অকুতোভয়ে যে সমস্ত নাট্যদল তুলে ধরেছিল, তাদের মধ্যে নাট্যকার রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের নেতৃত্বাধীন নৈহাটির যান্ত্রিক, অকালপ্রয়াত নাট্যকার রাধারমণ ঘোষের নেতৃত্বাধীন হাওড়ার ইউ. টি. সি. ও পরে কালপুরুষ নাট্যসংস্থা, সম্প্রতি প্রয়াত শক্তিশালী নট ও নির্দেশক আশিস চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন উত্তরপাড়ার ইউনিট থিয়েটার, প্রতিভাবান অভিনেতা ও নির্দেশক গৌতম মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শৌভিক সাংস্কৃতিক চক্র, মনোরঞ্জন ঘড়ার নেতৃত্বাধীন শৌভিক (দক্ষিণেশ্বর) ও পরে ব্যঞ্জনা, খ্যাতিমান নট ও নির্দেশক শ্রীকুমার ঘোষের নেতৃত্বাধীন বারাকপুরের নটতীর্থ, বিজয় ভট্টাচার্যের নেতৃত্বাধীন কোন্নগর-নবগ্রামের কিংশুক, অকালপ্রয়াত অসিত ঘোষের নেতৃত্বাধীন নাট্যবৃত্ত, সুচারু দাস ও সমর চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন চন্দননগরের ক্লাসিক, সমর দত্তের নেতৃত্বাধীন চেনা-অচেনা, দিব্যেশ লাহিড়ির নেতৃত্বাধীন বহরমপুরের প্রান্তিক, সলিল চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তারকেশ্বরের অভিযান ও অগ্রগামী, অমল মজুমদারের নেতৃত্বাধীন বাটানগর থিয়েটার ইউনিট, বাটানগর থিয়েটার ওয়ার্কস, অমৃত মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন গরিফার ভিন্নভিষাস, চুঁচুড়ার কল্লোল সাংস্কৃতিক সংস্থা, প্রতিষ্ঠিত নট ও নির্দেশক সুব্রত দত্তের নেতৃত্বাধীন মহেশতলার অন্বেষক, শিলিগুড়িতে অমল চক্রবর্তীর নেতৃত্বাধীন নাট্যদলগুলির কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে। এই তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করাই যেতে পারে, নিশ্চয়ই অনেক সংস্থার নাম এখানে বাদ গেল, এই নিবন্ধলেখকের বিস্মরণ-জনিত কারণে, সেজন্যে সে ক্ষমাপ্রার্থী। তালিকায় উল্লিখিত দলগুলির মধ্যে অনেকেই উর্দি পরিহিত সরকারি আরক্ষাবাহিনীর হাতে এবং শাসকদলের মস্তানবাহিনীর হাতে অত্যাচারিত ও নিগৃহীত হয়েছেন। না, তবু তাঁরা কেউ রণক্ষেত্র ছেড়ে পালাননি। এর মধ্যে ইউনিট থিয়েটারের ওপর শান্তিপুরে স্বৈরশাসনের আঁধারবাহিনীর আক্রমণ তো ইতিহাস হয়ে রয়েছে, ইতিহাস হয়ে রয়েছে শিবপুরে ব্যঞ্জনা-র ওপর আক্রমণ, ইতিহাস হয়ে রয়েছে যান্ত্রিকের প্রতিযোগিতায় কল্লোলের সাজঘরে বোমাবর্ষণ।

বস্তুত রাজনৈতিক অবস্থানের প্রশ্নে সাতের দশকে মফস্বলের মঞ্চ কলকাতাকে অনেক-অনেক পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিল বলেই আমরা একদিন মফস্বলের থিয়েটারের স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত নিজস্ব চরিত্রকে একটি তাত্ত্বিক অবয়ব দেবার জন্যে চেষ্টা করেছিলাম। এই স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা যতটা আবেগপ্রসূত ছিল, ততটা যুক্তিসম্মত ছিল না। কিন্তু তাহলেও একথা ঐতিহাসিকভাবেই সত্য—অন্তত সাতের দশকের সেই উত্তাল দিনগুলিতে মফস্বলের প্রসেনিয়াম থিয়েটার কলকাতা মুখাপেক্ষিতাকে সর্বাংশে বর্জন করে চেষ্টা করেছিল নিজের পায়ে দাঁড়াবার। না, এটা শুধু মতাদর্শগত প্রশ্নই নয়, নিজস্ব একটি নাট্যভাষা খোঁজারও প্রয়াস ছিল তার মধ্যে। একথা সকলেই জানেন অন্তত সেদিন মফস্বলের অস্থায়ী বাঁধা মঞ্চে বা পুরনো ভগ্নপ্রায় প্রেক্ষাগৃহে আলোর সাজ-সরঞ্জামই বলুন বা সেট-সেটিং-ই বলুন, সবই ছিল প্রয়োজনের তুলনায় নেহাৎই অপ্রতুল। এমন কি টেপরেকর্ডারের আবহ বা কস্টিউম বা মেক-আপের দিক থেকেও মফস্বলের

নাটদলগুলির দৈন্য ঢাকা যেত না। তখন তো প্রগতিশীল নাটক করার জন্যে সরকারি তহবিল থেকে হাজার হাজার টাকা দেওয়া হতো না! ফলে উপকরণগত এই অভাব ও দৈন্যের জন্যে টোটাল থিয়েটারের এফেক্ট মফস্বলের মঞ্চে নিশ্চয়ই পাওয়া যেত না। বহু জায়গাতেই সামান্য স্পট লাইটও পাওয়া যেত না, ফ্লাড লাইটের ছড়ানো আলোয়, এমনকি হ্যাজাকের আলোতেও নাট্যপ্রতিযোগিতা হয়েছে। এই অবস্থায় উপকরণগত বাহুল্যকে বর্জন করে একটি ছিমছাম নাট্যরীতি গড়ে তোলার চেষ্টা হতে থাকে। পরে অনেকে প্রয়াত রাধারমণ ঘোষের নাটককে ব্যঙ্গ করে বলতেন—চারটে ছেলে সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে কোমরে রঙিন ফিতে জড়িয়ে হাতে একটা ঢোল নিয়ে এসে হাজির হয়ে নাটক করে গেল! এইসব পণ্ডিতরা বোঝেননি—রাধারমণের এই ফর্মটি গড়েই উঠেছিল মফস্বল বাংলার মঞ্চের সরঞ্জামগত দারিদ্রের ফলে। যতদিন এই দারিদ্র ছিল, ততদিন রাধারমণের জনপ্রিয়তায় ভাঁটা পড়েনি।

আরেকটা চেষ্টাও হয়েছিল। আজ কলকাতায় বিভাসবাবুরা "মাধবমালঞ্চী কইন্যা" নামিয়ে দেশজ লোকনাট্যের সঙ্গে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের মেলবন্ধন ঘটিয়ে বাঙালির নিজস্ব নাট্যভাষা আবিষ্কারের চেষ্টা করছেন বলে প্রচুর সাধুবাদ পাচ্ছেন। সত্যের খাতিরেই বলতে হয়—একাজটাও সাতের দশকেই মফস্বলের মঞ্চে শুরু হয়েছিল। যাঁরা সে সময়ে বহরমপুরের প্রান্তিকের "নানা হে" (রচনা—দিব্যেশ লাহিড়ি) নাটকটি দেখেছেন, তাঁরাই বলবেন—কী অসাধারণ নৈপুণ্যে স্থানীয় লোকনাট্য গম্ভীরার ফর্মকে মঞ্চে ব্যবহার করেছিলেন ওঁরা! অবশ্য এই ধরনের প্রয়াস খুব বেশি হয়নি।

কিন্তু এতো গেল অতীতের কথা। আজ? আজকে কলকাতার থিয়েটারের সঙ্গে মফস্বলের থিয়েটারের তফাত কোথায়? বিরানব্বই সালে দাঁড়িয়ে বলতে হবে, না, নেই। ভাল নাটক কম হলেও, কলকাতাতেও হচ্ছে, মফস্বলেও হচ্ছে, মফস্বলের বেশ কিছু দল রবীন্দ্রসদন, শিশির মঞ্চে এসে দর্শকের প্রশংসা কুড়োচ্ছেন, বহরমপুর ছান্দিকের রবীন্দ্রনাট্য প্রযোজনার যে উচ্চমান রক্ষিত হয়, তা কেবল কলকাতার একটি-দুটি দলেই মিলবে। আবার শিল্পবর্জিত অসার নাটক কলকাতাতেও যেমন বেশি হচ্ছে, তেমনই হচ্ছে, মফস্বলেও। দু-জায়গাতেই গ্রুপ থিয়েটার দর্শকের আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কিন্তু যেখানে ছিল মফস্বলের আসল গর্বের জায়গা—তার রাজনৈতিক অগ্রণী ভূমিকা, সেটা আজ আর মফস্বলের মঞ্চে দেখা যায় না। □

আঁধার পেরিয়ে

দেবাশিস মজুমদার

১

যে বালক কোনও এক নির্জন দুপুরে রাঙতার মুকুট আর একটুকরো পরিত্যক্ত ভাঙা লাঠিকেই তলোয়ার বানিয়ে রাজ-সাজে আপনমনে সংলাপ আবৃত্তি করতে থাকে—তার চারিপাশের বল্গাহীন স্বপ্ন যে কতদূরে সাম্রাজ্য বিস্তারের শেষ নিশানটা পুঁতে আসে তার সঠিক পরিমাপ কেউ জানে না। এই শব্দহীন অধিকার প্রতিষ্ঠায় কারও সঙ্গে কোনও যুদ্ধ নেই, হত্যা কিংবা রক্তপাত নেই। শুধু খুশির হাওয়ায় কল্পনার পালতোলা ডিঙা এক তীর থেকে আর এক তীরের দিকে এগিয়ে যায়। এগিয়ে যায়, কিন্তু তারপর……? তারপর, যেতে যেতে যেতে নদী একদিন মোহানার দেখা পায়, আর হাতের মুঠিতে ধরা টাটকা ফুল বাসি হয়ে যায়। তখন শিল্পের কারিগর হিসাবে সেদিনের বালক পরিণত পুরুষ-মননে সীমাহীন উধাও প্রান্তে আর অনায়াসে নিশান পুঁতে আসতে পারে না। এখন, চারিপাশের রুখাশুখা জমিনে তাকে প্রতিদিন, প্রতিটি নির্মাণের আবাহন কাল থেকে সমাপ্তির মুহূর্ত পর্যন্ত—স্বপ্নের সব রঙ, সব রেখা, শব্দের সকল কম্পন নিঃশেষিত করে রাঙতার মুকুট আর ভাঙা লাঠির তলোয়ারকে এক শৈল্পিক সত্যে পৌঁছে দেবার পরিশ্রমে প্রণত থাকতে হয়। এখানে, বিশেষত নাট্যের ভুবনে কোনও নির্জন দুপুর নেই, আছে শুধু এক টুকরো ফাঁকা জমি আর দুই থেকে সহস্রাধিক তৃষ্ণার্ত চোখ। যাদের প্রদেয় ছাড়পত্র ব্যতিরেকে সৃষ্টির পূর্ণতা নেই। এখানে সাফল্যের উল্লাস পলকের মধ্যে স্বর্গারোহণের পথ আলোকিত করে দেয়, আবার ব্যর্থতার হাহাকার একাকী বহন করে ফিরে যেতে হয় অন্ধকারে। তখন সে ভাবতে বসে, কেমন করে, কার জন্যে সে কাজ করবে? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর না জানা পর্যন্ত সে কাজ শুরু করতে পারে না। আত্মভাবনার কর্মশালায় যে সৃষ্টিকে সে শ্রেষ্ঠত্বের মান দিয়েছে তার সার্থক রূপায়ণের চেষ্টায় শুরু হয় পথ খোঁজা। তার মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু তার নির্মাণ আকাঙ্ক্ষা আর হাজার দৃষ্টির স্বীকৃতির প্রার্থনায়।

এই দ্বন্দ্বের কারণেই একে-একে বন্ধ দুয়ার খুলতে থাকে। প্রতিমুহূর্তে তাকে জানতে হয় নিজেকে আর নিজের বাইরেটাকে। আর জানবার সেই ঝোড়ো হাওয়ায় ভেঙে যায়, অচেনা দূরে হারিয়ে যায় নির্মাণের সকল মাপ, সকল হিসাব। তখন সে নতুন অভিজ্ঞতায়—ঐতিহ্যের প্রজ্ঞায় আবার শুরু করে। কিন্তু তাকেও আবার ভাঙতে হয় বেঁচে থাকবার তাগিদে। শুধুমাত্র শিল্পীর গভীরে নয়, শিল্পের বিস্তারেও এই

তত্ত্বের স্বীকৃতি আছে। যেমন এক পশ্চিমী সাহেব লিখেছেন : থিয়েটার কী ? এই মুহূর্তে যা হচ্ছে তা নয়, যা হয়েছিল বা হয়েছে তা নয়, এমনকি যা হবার কথা ভাবা হচ্ছে তাও নয়। অর্থাৎ শেষ সীমারেখা বলে কিছু থাকতে পারে না। তাকে বাঁধা যাবে না সঙ্কীর্ণগণ্ডির নির্দিষ্ট সংজ্ঞায়। প্রতিনিয়ত সে ভাঙবে এবং গড়ে উঠবে তারই মধ্যে। যে কোনও দেশের ঐতিহ্যের আপাত রূপের মতো। একজন কারিগরকে হাজার-হাজার বছরের ঐতিহ্যের পরম্পরায় অভিষিক্ত হতে হয় আবার সেই ঐতিহ্যকেই ভেঙে গুঁড়িয়ে নতুন হয়ে ওঠবার মধ্যে যেমন শৈল্পিক পরমাণু বেড়ে যায়, তেমনই ঐতিহ্যেরও আসে নবায়ন। অর্থাৎ প্রতিমুহূর্তে ভাঙতে-ভাঙতে গড়তে হবে, আবার তাকেও ভেঙে ক্রমশ প্রবাহিত নির্মাণের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। যেমন বলেছেন সেই চৈনিক দার্শনিক, প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব এবং তার মীমাংসার মধ্যে সঠিক উত্তরণ। আবার সেখানেই শুরু হয় আর এক নতুন দ্বন্দ্ব। কোনওদিন এই ছন্দ হারালেই মৃত্যু, না হলে ফুটে ওঠে জীবনের শত ফুল। পাকাচুলের গুটিকয়েক মানুষ মাথা নেড়ে বলবেন, 'ঠিক কথা। একেবারে হক কথাটি ভেবেছো হে। থিয়েটারে দ্বন্দ্বের বড় দরকার, যাকে বলে সঙ্ঘাত, ঘটনার আর চরিত্রের সঙ্ঘাত। পৃথিবীর সকল ভাল থিয়েটারেই তার দেখা পাওয়া যায়। সে তোমার ধ্রুপদী সময় থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত। এইটে না বুঝলেই তুমি, বেনো জলে ভেসে হবে কালিদহ পার।' সন্দেহ নেই সম্পূর্ণ ভুল এই ধারণা। কারণ, তাহলে থিয়েটারের ঘাড়ে চাপাতে হয় সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞার দায়। আসলে জানতে হয় যে সময় ও সমাজে আমার থিয়েটার করা বা দেখা তার প্রধান দ্বন্দ্বগুলি কী কী, কোনটি প্রধান বা মুখ্য ? কে এগিয়ে যাবার পক্ষে আর কোনটিই বা বিপরীতগামী শক্তি ? শিল্পে তথা নাট্যে যে মুহূর্তে তার সঠিক প্রতিফলন ঘটে তখনই সে হয়ে ওঠে আধুনিক। হাজার হাজার বছর আগে একাকী মানুষ কিংবা মানুষের দল হিংস্র উল্লাসে, অথবা অলঙ্কার-হীন যন্ত্রণার তীব্র ঝোঁকে গুহার পাথরে—রেখার টানে বেঁধে রেখেছিল একদল পশু। হয়ত-বা সেই পশু শিকারের আকাঙ্ক্ষায়, অলিখিত পাণ্ডুলিপির অনুশাসনে অর্জিত-শরীর আর অস্ফুট শব্দের উচ্চারণে তৈরি হয়েছিল অনুষ্ঠানিক নৃত্য, মুহূর্তের বিন্যাসে অসংযত নাট্য। মানুষের ইতিহাস আমাদের শেখায়, জীবনধারার সেই ঊষা লগ্নে মুখ্যত যে দুটি দ্বন্দ্বের প্রাধান্য ছিল তারই সুস্পষ্ট প্রতিফলন পাওয়া যায় ওই প্রাগৈতিহাসিক শিল্পকর্মের গভীরে। অর্থাৎ মানুষের বেঁচে থাকবার উপাদান সংগ্রহের উপায় বা কৌশল যেহেতু প্রাথমিক স্তরে শুধুমাত্র সমাজকে সংগঠিত করেছে তাই নয়, বিভিন্ন পর্যায়ে তাকে বদলও করেছে। এবং সমাজস্রোতের এই বিভিন্নতা বিধৃত হয়ে আছে সেই সময়কার শৈল্পিক কর্মকাণ্ডের বিকাশ ও বৈভবেও। আমাদের এই বুড়ো পৃথিবীটা একটি সত্য খুব স্থিরভাবে নির্দিষ্ট করেছে, যে শিল্পী 'সামাজিক' নয় তার শিল্প তথা সৃষ্টিকে ইতিহাস কখনও আদর দেয় না। তা সে যে সমাজব্যবস্থাই হোক না কেন। এই সত্য এড়িয়ে যে কেউ সাময়িকভাবে যত বিচিত্র মুখোশ ব্যবহার করুক না কেন, সময়ের দুরন্ত হাওয়ায় তা বিবর্ণ হতে বাধ্য। অশ্বিনী বাউলের ভাষায়, 'ওরেমন, সংসারেতে ডুব না

দিলে, মানুষ চিনবি কেমন কোরে ? / মাটি ছেনে তুই যে ঘর গড়িস, তোকেই সে ঘর নিত্য গড়ে।' এখন প্রশ্ন হল 'সামাজিক' বলতে আমরা কী বুঝি ?

২

থিয়েটারে নানা আয়োজন করবার পরেও এক বা একাধিক মানুষ, অপর প্রান্তের এক বা একাধিক মানুষের সামনে না দাঁড়ানো পর্যন্ত সৃষ্টি হিসাবে সম্পূর্ণ হয় না। মানুষকে মানুষের সামনে কিছু করতে হয়। নাট্যকলার সৃষ্টিজগতে 'এর' বিকল্প ব্যবস্থার আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কোথাও কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ একজন দর্শক যখন প্রেক্ষাসনে বসে নাটকটি দেখেন তিনি যেমন তার প্রতিমুহূর্তের অনুভূতিকে এড়িয়ে যেতে পারেন না, আবার সমভাবে সেই দর্শকের নাট্যদর্শনের হাজার প্রস্তুতি থাকলেও তার প্রতিটি প্রতিক্রিয়ার মধ্যে মিশে থাকে সামাজিক অবস্থান ও তার প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা বোধ। অর্থাৎ সামগ্রিক প্রতিক্রিয়ায় দৈনন্দিনতার রকমফেরের প্রভাবকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। অন্য যে কোনও শিল্প মাধ্যমের ক্ষেত্রে এই সীমাবদ্ধতা নেই। একজন মানুষ তার বেঁচে থাকবার সময়কালের মধ্যে নানাভাবে সংযোগ স্থাপন করতে পারে সাহিত্য পাঠে, চিত্র প্রদর্শনে, চলচ্চিত্র কিংবা সঙ্গীত শ্রবণে। থিয়েটারে সে সুযোগ নেই। কারণ নাট্যের সৃষ্টি এবং লয়-এর মধ্যে সময়কাল কয়েক পলক মাত্র। প্রেক্ষকের দ্বিতীয়বার উপভোগের কোনও সুযোগ থাকে না। আর একদিকে, মঞ্চে আমাদের যত-উপকরণ উপস্থাপিত করা হোক, আলো কিংবা ধ্বনির কৌশল করা হোক, শেষ পর্যন্ত একজন অভিনেতা হিসাবে একজন মানুষকেই এসে দাঁড়াতে হয়। যতই আমরা বিমূর্ততা অথবা রূপকের আশ্রয় করি না কেন, কোনওদিন হয়ত দালির স্বপ্নের কাঁটাহীন ঘড়িও টেবিলে বা বিছানায় বিছিয়ে দেওয়া যাবে, কিন্তু পিকাসো অথবা গণেশ পাইনের বিশেষ শারীরিক উপস্থাপন ঘটানো কখনও সম্ভব নয়। একজন অভিনেতা, একজন মানুষ যখন মঞ্চে দাঁড়ায় তখন এক আকাড়া বাস্তবের টান থাকে তার মধ্যে, তাকে স্বীকার করে নিয়েই অভিনেতাকে পৌঁছতে বা প্রেক্ষককে পৌঁছে দিতে হয় অতি বাস্তবের কল্প-লোকে। আর কোনও শিল্পেরই প্রায় এই দায় নেই। আধুনিক পৃথিবী প্রতিনিয়ত বিজ্ঞানের উত্তাল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সেই সমস্ত শিল্প মাধ্যমকে যুক্ত করে পৌঁছতে চাইছে অতিপ্রাকৃত এক যাদুকরের দরজায়। তার সেই এগিয়ে যাওয়া, ছড়িয়ে পড়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে যে পৌঁছতে পারছে না—সেই মাধ্যমকেই সরে যেতে হচ্ছে দূর থেকে আরও দূরে। পারিপার্শ্বিক এই আবহাওয়ায় সাবেক থিয়েটার তার সাম্প্রতিক অবস্থানের অমীমাংসিত দ্বন্দ্বে ছটফট করছে।

গ্যালিলিও যে বাতাবরণে এই পৃথিবীর অবস্থান ও গতিময়তার ব্যাখ্যা করেছিলেন তার অনুরণন একদিকে যেমন এই শতাব্দীর মধ্যভাগে হিরোশিমায় এসে ধাক্কা খেয়েছিল, আবার বিপরীতে তা পড়েছে হকিং-এর মহাজাগতিক বিস্তারে। তবু আজও সভ্যমানুষ সে বিজ্ঞানের যথার্থ সামাজিক অবস্থানকে নির্দিষ্ট করতে পারেনি। প্রযুক্তি

বিজ্ঞান আমাদের দেশে যতটাই বীর-সম্মানে পূজিত, ঠিক ততটাই বোধহয় অবহেলায় আচ্ছন্ন। শহর এবং শহরকেন্দ্রিক জীবনকে সে প্রতি পলকে বাঁধতে চাইছে, সম্পূর্ণভাবে না পারলেও সেই লোভের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তার ভাল-মন্দের বিচার এখানে নয়। কিন্তু, পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছি অনাগরিক বেঁচে থাকার মধ্যে কী ভয়ানক অবহেলা ছড়ানো আছে! পশ্চিমবঙ্গে দু-একটি গ্রাম অনুসন্ধানে এই সিদ্ধান্ত না নেওয়াই ভাল, উড়িষ্যা, বিহার বা হিমাচল প্রদেশের প্রত্যন্তের পরিচয়ে আমার এই ধারণা। চন্দ্রগিরির পথ পার করে এক জনবসতির মাঝে দাঁড়িয়ে হাজার অনুরোধেও কাউকে কথা বলাতে পারিনি, তার কারণ, সেই সব মানুষগুলোর মনে হয়েছিল আমি চোখের মধ্যে যে 'দর্পণ' লাগিয়েছি তা আসলে অলৌকিক শক্তি বিস্তারের উপাদান। চোখ থেকে চশমা ফেলে দেবার পর আতিথ্য পেয়েছিলাম। সন্দেহ নেই এই অসম বিকাশের পরিপূর্ণ দায় আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের, যাঁদের মানসিক গঠন সম্পূর্ণ-ভাবে অবৈজ্ঞানিক।

যাই হোক, দেশের একাংশে বিজ্ঞানের আধুনিক বৈভবের উজ্জ্বলতা আর বাকি অংশের অজ্ঞানতাকে মেনে নিয়ে আমাদের শিল্প-সংস্কৃতির জাতীয় সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা। তবে মস্ত সুবিধে হল এই, আমাদেরও সকল সমন্বয় শহর, খুব বেশি হলে মফস্বল-কেন্দ্রিক। সেই কারণেই বিভিন্ন শিল্প মাধ্যমগুলিও বিজ্ঞানের সঙ্গে বোঝা-পড়া সেভাবেই করছে। কোনোওদিন যদি শব্দ-বিজ্ঞান সুরে বা সঙ্গীতকে সেইভাবে উপস্থিত করতে পারে যা আমি একজন শিল্পীর সামনে চোখ বন্ধ করে শুনতে পাই, বা দূরদর্শন, ভিডিও পর্দার পার্থক্য ঘটাতে পারে এবং রঙের সামান্যতম বিকৃতি না ঘটিয়ে চিত্রকরের সৃষ্টিকে উপস্থিত করে, তবে ক-জন আর দৌড়ে অনুষ্ঠান বা প্রদর্শনীতে যাবে? বিজ্ঞান এমনই এক ভয়ঙ্কর সময়ের দিকে আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে। নতুন কোনও আবিষ্কারে, চলচ্চিত্র যেভাবে প্রভাবিত হয়, নতুন হয়ে ওঠে— থিয়েটারের সে অবকাশ নেই। তাহলে পৃথিবী কি থিয়েটারের প্রতি সাদা রুমাল নাড়াতে শুরু করেছে?

পণ্ডিতরা মনে করেন 'সমাজ মানসের কেন্দ্র' অনুসন্ধান এবং তার সমকালীনতায় উপস্থাপন সব থেকে বেশি জরুরি। অবশ্যই এটা কোনও সাফল্য লাভের উপকারী বটিকা নয়। কারণ সমাজের যথার্থ 'মানস কেন্দ্রের' অনুসন্ধান বিষয়ক সিদ্ধান্তই তো পার্থক্য সৃষ্টি করবে। আমি আগেই লিখেছি, শিল্পীকে 'সামাজিক' হতে হবে। মুশকিল হচ্ছে, অনেকেই ধরে নেন 'সামাজিক' হবার প্রকৃত উপায় বা পরিপূর্ণ অর্থ হচ্ছে তাকে খুব ভালভাবে রাজনৈতিক দর্শনকে জানতে হবে। বিপদ হয় এইখানে। বেশ কিছু মানুষ মানতেই চান না যে যথার্থ সমাজ মানসের বোধ কোথাও রাজনীতির থেকে ছোট নয় বরং বড়। আমাদের দেশেই তার হাজারো প্রমাণ দিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। একজন শিল্পীকে এই অনুসন্ধানে ব্রতী হতে হয় সমাজেরই নানান পথ বেয়ে, বিশেষ থেকে নির্বিশেষ পদ্ধতিতে। প্রতিটি মুহূর্তে তাকে জানতে হয়, এই

জানার মধ্যে কোনও মিথ্যার স্থান নেই—তা সে যে কোনও শিল্পের ক্ষেত্রেই সত্য। বিশেষত থিয়েটারে একজন মানুষ (অভিনেতা) যখন অপর এক মানুষের সামনে কোনও চরিত্রের সংলাপ উচ্চারণ করে তখন 'তুমি ভাল না খারাপ অভিনয় করেছো সেটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার না ; গুরুত্বপূর্ণ হলো অভিনয়ে সত্যাশ্রয়ী ছিলে কি না।' আমাদের সমকালীনতায় এই সত্যদর্শনের সিদ্ধান্ত বোধহয় খানিকটা পাতি সার্বিক ভাবনা, আর বাকিটা অবাস্তব বলে মনে হয়।

নাট্যপ্রেক্ষিতেও এই সমাজ-বাস্তবতায় আমরা একটি আপাত বিরোধ দেখতে পাই। তা হল এই যে, থিয়েটার একদিকে যেমন বিভিন্ন শিল্প মাধ্যমের 'সংযুক্ত শিল্প' আবার এই থিয়েটার কখনও একা-একা হয় না। এমনকি একজন দর্শক আর একজন মাত্র অভিনেতার সংযোগেও তার মুক্তির আকাশের যথার্থ সন্ধান পাওয়া ভার। বহুর সম্মেলনেই এই মাধ্যমটির সৃষ্টির আরাম। অথচ সারা দুনিয়ায় রাষ্ট্রিক ব্যক্তি বিচ্ছিন্নতাই আজ অন্যতম আধুনিক প্রবণতা হিসেবে স্বীকৃত। প্রসঙ্গত আমাদের প্রায়শই একটি প্রশ্ন শুনতে হয়, 'কী হে, দল-টল ঠিক আছে তো, না আবার ভেঙেছে ? থিয়েটারের দলগুলোর যা অবস্থা !' আসলে প্রশ্নকর্তা সেই মুহূর্তে ভুলে যাবার চেষ্টা করেন তাঁর জানা-চেনা ব্যক্তি থেকে পরিবার, রাজনৈতিক, ধর্মীয় সংগঠন থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক প্রতিকূলতার কথা। বিশেষত আমাদের মতো নাট্য দলগুলি কোনও খোলা বা বন্ধ বাজার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়—যেমন অন্যান্য দু-একটি শিল্প মাধ্যমের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। থিয়েটারের যৌথ কর্মকাণ্ড শুধু কয়েক ঘণ্টার অভিনয়ের মধ্যেই শেষ হয় না। প্রস্তুতির সূচনা ঘটে তারও বেশ কয়েক মাস আগে। থিয়েটার বোধহয় একমাত্র মাধ্যম যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দাবি করে একাধিক মানুষের দীর্ঘকালীন মানসিক সংযোগ, যার ব্যতিরেকে কোনও নির্মাণে পৌঁছনো প্রায় অসম্ভব। আজ প্রযুক্তিবিদ্যা আর বিকৃত রাজনীতির উৎকট দ্বন্দ্বে ব্যক্তি যৌথ মননের ভাবনাকে ছুঁতে পারে না। আত্ম-কেন্দ্রিকতার চোরা বালিতে দাঁড়িয়ে সে পণ্য অর্থনীতিতে নিজেকে বড় করে দেখতে শুরু করে। ফলে সে বিচ্ছিন্ন হয়, সাময়িক ধাক্কা খায় থিয়েটার। শুধু দল ভাঙা নয়, দলের মধ্যে থেকেও এই বোধ অন্ধকার গর্তের দিকে টেনে নিয়ে যায়। আবার প্রশ্ন জাগে এই অপরাহ্নিক আঁধারে তবে কি 'নাট্যকলা' শেষ হয়ে যাবে ?

৪

শেষ হয়ে যাবে ? বোধহয় না। তারও কারণ আবার সেই সমাজ এবং মানুষ। আগেই বলেছি থিয়েটারই বোধহয় একমাত্র শিল্প মাধ্যম যেখানে সৃষ্টি-মুহূর্তে স্রষ্টা এবং ভোক্তা উভয়কেই সক্রিয় থাকতে হয়।

বিজ্ঞান শেখায় মানুষের কোনও বিকল্প নেই। মানুষ শেষ পর্যন্ত মানুষকেই চায়। সেই চাওয়া, কিছু ঘৃণ্য কাজ বাদ দিয়ে, কখনওই শুধুমাত্র রক্তমাংসকে চাওয়া নয়। মানুষ অর্থাৎ অবস্থানগত সবটুকু নিয়েই তাকে পেতে চায়। যতদিন পর্যন্ত না পৃথিবী এই আকাঙ্ক্ষাবোধকে মুছে দিতে পারছে—ততদিন মানুষের সামনে মানুষের থিয়েটার বেঁচে থাকবেই। □

S. K. MITRA & CO.

SURVEYORS & LOSS ASSESSORS

STEPHEN HOUSE
5TH FLOOR
4, B. B. D. BAG (East)
CALCUTTA-700 001
Phone : 28-9172

CITIBANK CARDS
The Best Way To Pay

□

KAWALITY LEATHER GOODS CO.

1 KAMARDANGA ROAD

CALCUTTA-700 046

□

Mackinnon Mackenzie & Co. Ltd.

MACKINNONS BUILDING
16, STRAND ROAD. CALCUTTA-700 001

Sub-Office at :
CALCUTTA DOCKS □ CALCUTTA AIRPORT
Phones : 20-1661/1666, 20-0035, 20-9155, 20-1679
Telex : 7217
Cable : Mackinnons Calcutta

Range of Services :
Travel & Tourism □ Clearing & Forwarding
Ship Agency □ Air Cargo □ Property
Development & Consultancy

Call on us for your Problems
We blend Expertise with Enterprise

□

ক্রোড়পত্র

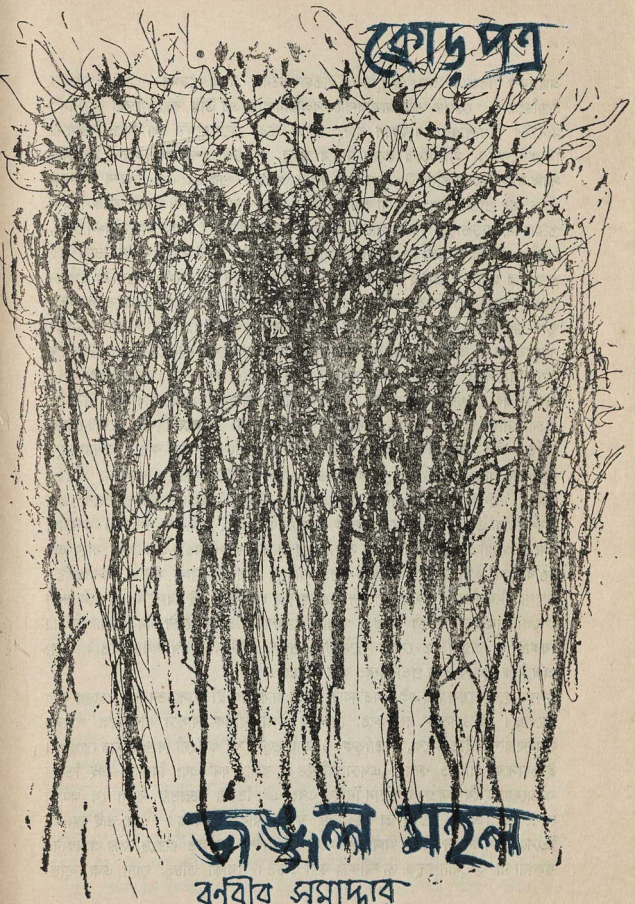

জঙ্গল মহল

রণবীর সমাদ্দার

আধুনিক বিজ্ঞান আর আধুনিক ইতিহাসচেতনার যুগে জেমস ফ্রেজার মানুষ হয়েছিলেন। ফ্রেজার তাই আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে এই উক্তি করতে দ্বিধা করেননি : মানুষের চিন্তাশক্তির ক্রমবিকাশ যাদু থেকে শুরু করে ধর্মের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের দিকে গেছে। ম্যাজিকের ক্ষেত্রে মানুষ ভাবে, তার চারপাশের বিবাদ-সমস্যা বিপদের-সমাধান সে নিজস্ব শক্তির উপর ভর করে করতে পারে। প্রকৃতির এক নিজস্ব শৃঙ্খলা আছে, এই প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলা বা অর্ডারের উপর ভরসা করা যায়, এবং মানুষ তাকে নিজস্ব প্রয়োজনে নাড়াচাড়া করতে পারে, ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু মানুষ যখন দেখে, প্রকৃতির এই যে শৃঙ্খলা সে অনুমান করেছিল, তার বাস্তব ভিত্তি খুঁজে পাওয়া ভার, এই শৃঙ্খলার অস্তিত্ব পুরোটাই কল্পনানির্ভর, তার আত্মবিশ্বাস যায় কমে। প্রকৃতির পেছনে যে সব অদৃশ্য মহাশক্তি রয়েছে, তার পায়ে সে তখন নিজেকে সঁপে দেয়। এইভাবে যাদুর স্থান গ্রহণ করে ধর্ম। কিন্তু এই ধর্ম দিয়েও যখন পারিপার্শ্বিক বিপদ-সমস্যার সমাধান হয় না, অন্যদিকে তার চৈতন্য এবং জ্ঞান বাড়তে থাকে, তখন সে আবার উপলব্ধি করে, না সত্যই প্রকৃতির এক শৃঙ্খলা আছে ; তাকে জানা যায়, ব্যবহার করা যায়। ফ্রেজার অবশ্য এখানেই থামেননি। আধুনিক বিজ্ঞানমনস্কতা এবং আধুনিক ইতিহাস-চেতনার নজির হিসাবে এও জুড়ে দিয়েছেন **স্বর্ণভুজ** বা **গোল্ডেন বাও** গ্রন্থের শেষে, ম্যাজিক আর বিজ্ঞানের মধ্যে অনেক তফাত আছে। ম্যাজিকের মূল কথা, কল্পনাপ্রসূত শৃঙ্খলার অস্তিত্ব, বিজ্ঞানের মূল কথা গভীর ও বিশদ পর্যবেক্ষণপ্রসূত শৃঙ্খলার অস্তিত্ব। ফ্রেজার এরপর সতর্কতাও দিয়ে রেখেছেন, যাদু→ধর্ম→বিজ্ঞান—এই যাত্রা থেকে এমন অবশ্য ভাবা উচিত নয়, পৃথিবী সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণাই চরম এবং সম্পূর্ণ। মানুষের মননের অগ্রগতি যদি কালো থেকে সাদা রঙের দিকে এক পরিবর্তন হয়, দেখা যাবে এই রঙবিন্যাসের মধ্যের ক্ষেত্রটা অনেকটা সাদা কালোয় মেশানো—নানা ঘনত্বে, নানাচ্ছটায় ; তারপর ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে সাদা রঙ বেড়েছে। কিন্তু এই মধ্যভূমি যেখানে সাদা কালো, আরও নানা রঙের মিশ্রিত আভাস, ফ্রেজারের ভাষায় সেটা ধর্ম ; আর চিন্তার বিকাশ বা অগ্রগতিতে সেই মধ্যক্ষেত্রটাই প্রবল, জটিল, চোখে পড়ার মতো। এবং আধুনিক যুগকেও তা প্রভাবান্বিত করে রেখেছে।১

বলা বাহুল্য, ফ্রেজারের এই বিবর্তনবাদী ধারণা আধুনিক ইতিহাসচেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ইতিহাসকে বহুক্ষেত্রে, বিশেষত ঔপনিবেশিক শাসনে দীর্ঘকাল পদানত জনসাধারণের ইতিহাসকে, নৃতাত্ত্বিক ও জাতিতত্ত্বসর্বস্ব কাহিনী দিয়ে দমিয়ে রেখেছে। ইতিহাসকে পরিণত করেছে এথনোগ্রাফিতে। যাদু, ধর্ম এবং বিজ্ঞান—এই তিনের কাঠামোতেই যে ক্ষমতার উপাদান নিহিত এবং এই তিনের ভিন্নতার মূলে যে ক্ষমতা সম্পর্কের ভিন্নতা রয়েছে, তা ফ্রেজারের কথায় বোঝা যাবে না। শুধু তাই নয়, এই তিনের পার্থক্য সম্পর্কে আমাদের মধ্যে যে ধারণা প্রচলিত রয়েছে, তার অনেকটাই কল্পনা বা অনুমানপ্রসূত, তা স্বীকার করা উচিত। বোঝা উচিত, জ্ঞান এবং যুক্তি-

ভিত্তিক জ্ঞানের সার্বভৌমত্ব বা সর্বশক্তিমান চরিত্রের উপর আস্থা রেখে আমরা এই যে সরলরৈখিক অগ্রগতির কথা ভেবে নিয়েছি, তা এক অর্থে জ্ঞানের বুর্জোয়া স্বত্ব এবং সংজ্ঞা নিরূপণকে মেনে নেয়। এইরকম ধারণা ঔপনিবেশিক শাসনে দীর্ঘকাল পদানত জনসাধারণের নিজস্ব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করে, যে অভিজ্ঞতায় যাদু-ধর্ম-বিজ্ঞান মিলে মিশে রয়েছে ; যে জনসাধারণের সংস্কৃতি শাসক-ক্ষমতার বিরুদ্ধে সক্রিয় থেকেছে যাদুধর্ম দিয়ে ; যে অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডলে আধুনিক জ্ঞানের যৌক্তিকতার বিরুদ্ধে অন্য এক যৌক্তিকতা মখোমুখি। এই ভিন্নতর, প্রতিবাদী, অন্যতর যৌক্তিকতাকে 'যাদু' বা 'ধর্ম' নাম দেওয়াও এক ধরনের চক্রান্ত। আধুনিক ইতিহাস থেকে এই অন্য ইতিহাসকে মুছে ফেলার এক প্রয়াস।

জঙ্গলমহলের সংস্কৃতির যে উপকথা এখানে লিখতে যাচ্ছি, এটা সেই অন্য ইতিহাসেরই একটা দিক। সংস্কৃতির কড়চা লেখা আমার সাধ্যের বাইরে, সে নিয়ে অনেকে লিখছেন, লিখেছেনও। সংস্কৃতির রাজনীতি আর রাজনীতির সংস্কৃতি লেখার এটা একটা চেষ্টা। জঙ্গলমহলের একটা নির্দিষ্ট যুগকে অবলম্বন করে, একটা নির্দিষ্ট মহালকে জড়িয়ে। ঔপনিবেশিক শাসনের কালে এই শতাব্দীতে জামবনি পরগনা—সে যুগের ভাষায় মহাল জামবুনি। সংস্কৃতির এই কাহিনী, আমি আগেই ইঙ্গিত করেছি, ফ্রেজার বর্ণিত মানবীয় চৈতন্যগতি সম্পর্কিত বক্তব্যের বিপরীতে যাবে। উপজাতি বা ট্রাইবদের ম্যাজিক ইত্যাদি নিয়ে গল্প এখানে নেই ; আছে 'যাদু'-'ধর্ম'-'বিজ্ঞান' ইত্যাদি অভিধা যে বিষয়গুলির ইঙ্গিতবাহী, তার এক মিশ্র জগত নিয়ে কথা—ক্ষমতার বিন্যাস যেখানে মূল উপজীব্য। আর আছে আধুনিক ইতিহাসচৈতন্য কিছু ভাবনা, যার সার কথা—এ কোন আধুনিকতা, কোন ঐতিহাসিক চৈতন্য যা সংস্কৃতির এই আলোচনাকে এথনোগ্রাফিতে ঠেলে দিয়েছে, ইতিহাসের আঙিনা থেকে বার করে দিয়েছে অন্য এক ইতিহাসের পৃথিবীতে ? এই নিয়ে লিখতে বসে একথাও মনে হয়েছে, আধুনিকতা যেভাবে ইতিহাসকে জড়িয়ে পেঁচিয়ে তার দমবন্ধ করার উপক্রম করেছে, তাতে ইতিহাস দিয়ে আচার, সংস্কৃতি, ক্ষমতার এই পরিমণ্ডলকে সামনে টেনে আনা কি আদৌ সম্ভব হবে ?

১

লিখছি যদিও সত্তর আশি থেকে একশ বছর আগের ব্যাপার নিয়ে, একেবারে হাল আমলের একটা ঘটনা দিয়েই শুরু করি। হাল আমল বলতে একেবারে হাল, এই গত বছর।

জামবনির 'রাজা' বা জমিদারের সদর কাছারি আর রাজবাড়ি ছিল চিলকিগড়ে। এখনও মূল বাড়িটি অক্ষুণ্ণ। কাছারিবাড়ি একেবারে ভেঙে গেছে। চিলকিগড়ের বিখ্যাত কনকদুর্গা মন্দিরের পাশে পুরনো মন্দিরটিও ধ্বংসপ্রাপ্ত। এই চিলকিগড়ে শিবের গাজনের সময় যে নাচ হয়, তা হল 'ছো'। 'ছো'র অর্থ সঙ। বিশেষ ঢঙে বা ভঙ্গিতে এই নাচের সময়ে চিলকিগড়ে কাঠের তৈরি মহড়া বা মুখোশ আর 'পরভা' ব্যবহৃত হয়।

চিলকিগড়ের ছো-এর এক বিশিষ্ট অঙ্গ হল 'পরভা'। একটা কাঠ থেকে তৈরি প্রায় প্রমাণ আকারের বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তিকে বলা হয় 'পরভা'।

চিলকিগড়ের ছো-এর কথা এই আখ্যানে পরে আসবে। আপাতত হাল আমলের ঘটনার কথা বলতে গিয়ে যেটুকু এখানে লেখা দরকার, সেটুকু বলি। এই ছো নাচে বারোটি পরভা থাকে। প্রত্যেকের দুটি করে বাহন। গৌরাঙ্গ আর পা-পিয়াদা বা অষ্টভুজা। পরভার নাচে ঢাক আর সানাই বাজে, শুধু দুটির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় ঢোল আর সানাই। এই ঘরানার নাচ কবে কোথায় শুরু হয়েছিল, আজও তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। অনেকের ধারণা, ধলভূমগড় থেকে রাজা মানগোবিন্দের আমলে ১৮৪০ নাগাদ এই নাচ জামবনিতে আসে। মানগোবিন্দের বাবা কমলাকান্ত দৌহিত্রসূত্রে ১৮২২-এ ইংরেজদের কাছ থেকে পাট্টা পেয়ে জঙ্গলমহলের বর্তমান জামবনির রাজা হন। কমলাকান্ত ধলভূমগড় রাজবংশের উত্তরাধিকারী, বিখ্যাত জগন্নাথ ধবলদেবের বংশধর। সুতরাং ধলভূমগড়ের সাথে এই ছো নাচের যোগসূত্র খুবই সম্ভব।

এই নাচের প্রকাশভঙ্গি সহজ সরল আর স্বচ্ছন্দ। এতে আছে তালের নানা রকমফের আর বহু ছন্দের বাজনা। একটি 'পরভার' সঙ্গে তার নাচ আর বাজনায় বৈচিত্র আছে। দেখেশুনে মনে হয়, নাচের অঙ্গ সঞ্চালনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং নাচের কথকতার বিষয় মাথায় রেখে বাজনার ধ্বনিকাঠামো রচিত হয়েছে। নাচের অঙ্গভঙ্গিতেও বিভিন্ন চরিত্রের অভিব্যক্তি ঘটে। সর্বজনীন অনুভূতি যেমন এই কথকতায় প্রকাশিত, তেমনই আছে দেবতা, মানুষ, পশুপাখি, নানা সামাজিক ক্রিয়াকলাপ। যাইহোক চিলকিগড় রাজবাড়ির পৃষ্ঠপোষকতায় গাজনের সময় শতাধিক বছর ধরে এই নাচ অনুষ্ঠিত হতো। রাজার বা জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতায়, উপস্থিতিতে, আশির্বাদে এবং আনুকূল্যে এবং প্রজাকুলের দর্শক হিসাবে আগমনে গাজনের এই উৎসব হতো। নাচের দল আর মহড়া তারপর একটা নির্দিষ্ট পথ ধরে গাঁয়ে গাঁয়ে যেত। গাজনের সমাপ্তিতে এই মহড়ারও সমাপ্তি হতো। তারপর জমিদারি উচ্ছেদ হল। ধীরে ধীরে পৃষ্ঠপোষকতায় টান পড়ল। অর্থনৈতিক অক্ষমতা, গাঁয়ের নতুন পয়সাওয়ালা লোকেদের উদাসীনতা, ভিডিও কালচারের অনুপ্রবেশ এবং সর্বজনীন নিষ্পৃহতায় এই ছো নাচ আশির দশকে প্রায় লুপ্ত হল।২

বোলগুলো হারিয়ে যেতে লাগল। সত্তরোর্ধ্ব কয়েকজন নৃত্যশিল্পী বেঁচে রইলেন, যাঁরা নাচের ছন্দ জানেন। উৎসাহ যদি বা থাকে, শেখানোর কেউ নেই ; শিক্ষক থাকে তো রেস্ত নেই। খালি পরভাগুলো টিকে রইল সুরক্ষিত অবস্থায় রাজবাড়ির এক ঘরে। রঙগুলো প্রায় অমলিন, একশ বছর আগে লেখা। তারপর এক-আধবার রঙের প্রলেপ তাতে চড়েছে। কিন্তু এখন এ মুখোশশিল্পীও আর নেই। এই সময় জমিদারবাড়ির আর বাইরের গুটিকতক লোকের শুভেচ্ছায় চিলকিগড়ে গঠিত হল 'লোকযানী'। উদ্দেশ্য সাধু, লুপ্তপ্রায় এই লোক-ঐতিহ্যকে বাঁচানো। এই উদ্দেশ্যের অংশরূপে ১৯৯১-এর ৪ আর ৫ নভেম্বর চিলকিগড়ে সাহায্য করতে এগিয়ে এল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

নৃত্য, নাটক, সংগীত ও দৃশ্যকলা আকাদেমি। তাদের উদ্দেশ্যও সমান সাধু। চিলকিগড়ের গৌরবমণ্ডিত ছো নাচের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হবে। অনুষ্ঠিত হল 'ছো' আর 'আদিবাসী' সংস্কৃতি নিয়ে কর্মশালা ও আলোচনাচক্র, পরিশেষে নৃত্যানুষ্ঠান। আমাদের অভিজ্ঞতার শুরু সেই উপলক্ষে।

অনুষ্ঠান আর আলোচনাচক্রের আমন্ত্রণ পেয়ে আমরা তিন বন্ধু গেছিলাম চিলকিগড়ে। গিয়ে দেখি উদ্যোক্তা হিসাবে আছেন জমিদারবাড়ির দুচারজন, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও একজন প্রাক্তন অধ্যাপক, একজন বর্তমান অধ্যাপক এবং আকাদেমির সম্পাদক। গিয়ে শুনি আকাদেমি যা টাকা দিয়েছেন, তাতে অনুষ্ঠানের ব্যয় বহন করা সম্ভব নয়, প্রবীণ ছো শিল্পী শশধর রায়, বালক দেহারি এবং অপেক্ষাকৃত কম বয়স্ক শিল্পীরা কোনও পারিশ্রমিক বা সাম্মানিক পাবেন না। শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত কিছু ক্ষত্রিয়, মাহাত এবং সাঁওতাল। জেনারেটর এসেছে, নানা প্রতিশ্রুতি সাড়ম্বর ঘোষিত হচ্ছে। শশধর, বালক দেহারি আর অন্যান্য শিল্পীরা মঞ্চে নেই, নিচে কাঠের চেয়ারের পেছনের সারিতে বা মাটিতে। মঞ্চ বলতে জমিদারবাড়ির উঁচু দালান, নিচে আমরা—শ্রোতা, দর্শকরা।

লোকসংস্কৃতি বাঁচানোর আর পুনরুদ্ধারের এই যজ্ঞের আচারগুলো আমাদের চোখে লাগল বা চোখে পড়ার মতো। আকাদেমির সচিব এগিয়ে এসে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আপনারা সব সমাজবিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্র থেকে এসেছেন, কিছু বলুন। আমরা বললাম, শুনতে এসেছি। এ নিয়ে কিছু জানি না। কিন্তু অনুরোধ উপরোধ চলতে লাগল। তারপর ভদ্রলোক নিজেই বলতে শুরু করলেন :

এই আনায় এখানে আসতে হচ্ছে, এত বলতে হচ্ছে ; এদের বাঁচাতে হবে তো! এই তো জলপাইগুড়ি গেলাম। ওখানেও একই সমস্যা। শিল্পীরা খেতে পাচ্ছে না। নাচবে গাইবে কি করে! ব্যবস্থা করে এসেছি। ব্যবস্থা করেছি ব্যাংকের সাথে। ওদের বাঁচিয়ে দিলাম।

এঁদের পারবেন ? আমাদের তির্যক প্রশ্ন।

এই তো, এবারে এসেছি, ধরেছি। এদেরও বাঁচিয়ে দেব। এই তো মিউজিয়ামের লোকজন এসেছে। ছবি তুলছে। সব রেকর্ডও করে নিচ্ছি। এদেরও ব্যবস্থা করে দেব। সচিব মশায়ের আত্মবিশ্বাস, ত্রাতার ভূমিকায় তার এই চেহারা আর দাপটে তখন আমরা আধুনিক পৃষ্ঠপোষকতার অন্য এক রূপ দেখতে শুরু করেছি। অবশ্য তখনও বুদ্ধিজীবি লোকসংস্কৃতির আধুনিক পৃষ্ঠপোষকতা দেখার এখনও বাকি আছে।

পরের দিন সকালে কর্মশালা শুরু। জীবন্ত বিবরণ দেওয়া শক্ত। তবু চেষ্টা করব। দালানে, যেটা এখন কর্মশালার প্রদর্শনীমঞ্চ, সেখানে দর্শকদের দিক থেকে দেখলে বাঁ দিকে টেবিল চেয়ার ফুল ইত্যাদি। এই চেয়ারে বিব্রত উপাচার্যমশাই, পাশে প্রাক্তন ও বর্তমান অধ্যাপকদ্বয়, তারপর সচিবমশাই। মাইকে শেষ জমিদার জগদীশচন্দ্র ধবলদেবের দুই ছেলে বিমলেশ এবং নির্মলেশ লোকশিল্পীদের ডাকছেন নাম ধরে আর

নিজেরাও বিস্মৃতপ্রায় গানের কলি, ঢাকের বোল, নাচের তাল ধরছেন। শিল্পীরা একের পর এক নাম ডাকায় উঠে আসছেন, নমুনার প্রদর্শনী হচ্ছে। একাধিক ক্যামেরার ফ্ল্যাশ, টেপের চাপা আওয়াজ আর লোকসংস্কৃতি উদ্ধারকর্তাদের তৎপরতা। এরই মাঝে সচিবমশায় নাচের মুখোশ উল্টো দিক থেকে ধরে একজন শিল্পীর যেই নাম ডেকেছেন, অমনি রাজবাড়ির একজনের সোচ্চার তিরস্কার,

ঠিক করে মুখোশ ধরতে জানেন না, লোকসংস্কৃতি বাঁচাবেন? এতে মুখোশ নষ্ট হয়ে যাবে!

কর্মশালায় অন্য একজনের বক্তৃতা, লোকশিল্পী আর মুখোশ কারিগরির অর্থনীতি। বলা বাহুল্য উপবিষ্ট সবাই হাঁ করে তাকিয়ে।

এরপর জোরকদমে নাম ডাকা শুরু হল। একজন নৃত্যশিল্পী এগিয়ে আসতে প্রশ্ন,

তোমার নাম কি?

আজ্ঞে, বিশু সাঁওতাল।

বয়স কত?

নীরবতা; তারপর, জানিনা।

তুমি নাচো কেন?

নীরবতা।

কি কর?

আজ্ঞে, জনমজুর আমি।

এইভাবে রোলকল চলছে। নমুনার প্রদর্শনী হচ্ছে। রেকর্ডিং, ছবি, সব উঠছে। মাঝে মাঝে কলকাতার কাগজগুলোর রিপোর্টারদেরও (সন্দেহ, কেউ কেউ র‍্যাডিকাল রিপোর্টার) নানা প্রশ্ন। আর মঞ্চে এসে দেখিয়ে নেমে যাচ্ছেন শিল্পীরা, বসে থেকেছেন নৃতাত্ত্বিক, অধ্যাপক, লোকসংস্কৃতি-প্রেমিক পৃষ্ঠপোষকেরা। এপাশে পেছনে চাপা গুঞ্জন। চা পাইনি, খাবার পাইনি। এত কম টাকায় সম্ভব নয়। নাচের শাড়িটাও দিয়ে দিল না। মজুরি পেলাম না। জানি না এই গুঞ্জনের জন্যই কিনা, সহসা নাটকীয়-ভাবে সচিবমশাই ঘোষণা করলেন, মাত্র ৮০০০ টাকায় এ কর্মশালা হয় না, তাঁরা জানেন। আরও বরাদ্দ তাঁরা মঞ্জুর করবেন। বলা বাহুল্য, এর অনেকটাই গোছিল পেট্রল আর খাওয়াদাওয়াতে।

পরেশ ধল জামবনির পুরনো লোক। এখন বয়স সাতাত্তর। স্মৃতি হাতড়ে জানালেন, বারোটি পরভা বারোটি দেবতার। গণেশ থেকে যম—সব আছে। মানগোবিন্দ চেয়েছিলেন, এ নাচে মতেই দেবতা-মানুষের মিলন হোক। তাই নাচে যদিও ঘুরে ফিরেই সারারাত ধরে এসেছে লোকজীবনের নানা সংগ্রামের কথা—জঙ্গল কেটে বসত করতে গিয়ে গ্রামবাসীকে সিংহ, বাঘ, ভালুক, অন্যান্য বন্যজন্তুর হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে হচ্ছে, একটি নারী (শক্তি) একাই একটা নেকড়ে নিধন করছে, ঝাঁটা দিয়ে একজন সকল অমঙ্গল দূর করছে, তাঁতি, জেলে, চাষি—সবাই এই সব নাচে কুশীলব হয়ে আসছে

—কিন্তু এই লোকজীবনে দেবতার আশির্বাদ থাকছেই, তাই জমিদার মানগোবিন্দ প্রবর্তিত-পরভা। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আশির্বাদ লোকসংস্কৃতির মাথায়। এমনকি সতীপালাও এসে গেছে ছো-এর কথকতায়।

পৃষ্ঠপোষকতা যিনি বা যাঁরা করছেন, আর যাদের সে অনুগ্রহ লাভ করতে হচ্ছে, চিলকিগড়ের ছো নাচের পালাকে ঘিরে তাদের ওঠা, বসা, দেখা ইত্যাদির যে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা বন্দোবস্ত, সেই বন্দোবস্ত বা প্রোটোকলের কোনও ভেদ পাইনি এ যুগের 'লোকসংস্কৃতি বাঁচাও' এর অনুষ্ঠানে। তাই মনে হয়েছিল ক্ষমতার যেমন কিছু আচার আছে, শাস্ত্রীয় ভাষায় তার কিছু ক্রিয়াকলাপ, তেমনই এই আচারেরও নিশ্চয়ই কিছু ক্ষমতা আছে। নতুবা এই ক্রিয়াকলাপের আবহমানতা থাকছে কী করে?

২

চিলকিগড়ের ছো নিয়ে অবশ্য খুব বেশি লেখালেখি হয়নি। এই রেওয়াজ প্রায় মরেই গেছিল। তারপরে পাকচক্রে সেই মৃত শিল্পকে বাঁচিয়ে তোলার উদযোগের সাক্ষী হয়ে গেলাম, সে কথা অন্যত্র লিখেছি। প্রশ্ন হল ছো নাচে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব এল কী করে? সরাইকেলা বা পুরুলিয়ায় এই পালায় চিরায়ত নৃত্যের যে প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়, এটা ঠিক যে চিলকিগড়ের সঙে তা নেই। গ্রাম্যজীবন ও লৌকিকতার ছাপ এখানে অনেক বেশি। বিমূর্তায়ন অনেক কম। কিন্তু অন্যদিকে রাজতন্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাবকে পালায় সরিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছে পুরুলিয়ায় বা সরাইকেলার ছো নাচে বিমূর্তায়ন। চিলকিগড়ে বিমূর্তায়ন কম, তাই ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাবও অধিক লক্ষণীয়।

বড় প্রশ্ন, ছো-এর মুখোশ এখানে পরভা হল কী করে? এক দিকে রয়েছে গণকঠাকুর, বুড়ি, ভালুক, কাক, কালিকা, বাঁদর, বাঘ, ভূত—এর একটা পরম্পরাও পালায় রয়েছে—একটা অর্ডার; আর এই শৃঙ্খলার প্রথমে বা শীর্ষে থাকছে দেবতার প্রভা। মেল আছে, জাগরণ আছে। সারারাত প্রজাদের জাগতে হবে দেবতা, মানুষ আর মানবেতর জীবের মিলনোৎসবে। রাজা দেখবেন। অন্তপুর থেকে দেখবেন রাজবাড়ির মেয়েরা-বউয়েরা। মাহাত বউ, সাঁওতালনি, বাগদি-বউ—এঁরাও দেখবেন। সীমানা থেকে। চৈত্র সংক্রান্তিতে ব্রাহ্মণপ্রধান, মনে রাখতে হবে উৎকলব্রাহ্মণ প্রধান, গ্রাম দুবড়া থেকে সঙ বেরুবে। বৈশাখে কেদুয়া, জ্যৈষ্ঠে চিলকিগড়। তারজন্য আখড়া বসবে আগে থেকে। আলমপুরের ঢাকি, দুবড়ার বাজনদার। শিবের এই জাগরণে মানত আছে, উপোসও আছে। রাজবাড়ির মাহুত ইন্দ্র নায়েক যাবেন আগে আগে। দীর্ঘদিন ধরে সানাইদার ছিলেন দুর্গা কালিন্দী, ঢুলিদার রাজবল্লভ কালিন্দী, নাচতেন নরেন রায়, তাঁর ছেলে শশধর রায়, বালক দেহরী, সমরেন্দ্র ধবলদেব। মূলত দণ্ডচ্ছত্র মাঝিদের অংশগ্রহণে এই নৃত্যানুষ্ঠানের মাঝে সাঁওতাল, বাউরি, মাহাত—এঁদের জায়গা হতো না। তাঁরা দর্শক। শিল্পীরা রাজবাড়ির একঅর্থে কর্মচারী। তাঁদের ক্ষেত্রে বাস্তুকর ছাড়, জঙ্গলকর ছাড়। ব্রত, পুজো, জন্মমৃত্যু, রানিমার ভোজন, গানবাজনা, স্ত্রীআচার, জাতবিচারসম্পন্ন

মেলামেশার কাঠামো, কাঙালিভোজন, ঝুমুর, নাচনিপ্রথা, টুসু—অনেক কিছুই ছিল জামবনিতে কিন্তু এর মধ্যমণি চিলকিগড়ের ছো। সংস্কৃতির গোটা ক্ষেত্রটা নিয়ে অনেক বলা যায়, অনেক বিশ্লেষণ হতে পারে; কিন্তু মনে দাগ কাটে, এক ঝলকে গোটা চেহারাটা তুলে ধরে এই মেলা আর সমাবেশ—যে চেহারার আসল কথা ক্ষমতা আর আচার। বার্থের ভাষায় প্রথমটা **স্টাডিয়াম,** পরেরটা **পাংকটাম**। প্রথমটার দাবি, পর্যবেক্ষণ, অভিনিবেশ, রচনা; পরেরটায় বৈশিষ্ট্য প্রতিক্রিয়া ঘটনার সূচীতীক্ষ্ণ ক্ষমতা, সহসা প্রভাববিস্তার করার ক্ষমতা, সংস্কৃতির বাকি ক্ষেত্রটায় আলোকসম্পাত করা তার কাজ। একটা পর্যবেক্ষণ করায়, অন্যটা ভেদ করে।[৪]

যাইহোক, এই পরভাগুলো ঠিক মুখোশ নয়। মুখোশ মানুষের, পরভা মানুষের চেয়ে বড়। অনেক বড়। ভারি। তাকে ধরে রাখতে হয়। সামনে নাচে মুখোশপরা একটি চরিত্র। মানুষ বা পশুরূপী। পরভার আড়ালে থাকে আরেকজন। পরভায় এই বিশাল মাত্রার সামনে হ্রস্ব আকারে নাচতে থাকে সহযোগী চরিত্রটি। বড় গাছের তলায় চারপাশে বেড়া দিয়ে থাকে নাচের আঙিনা। তারপর সামনের সারিতে প্রধান পৃষ্ঠপোষক, তারপর দশর্কেরা। মুখোশশিল্পী আর নৃত্যশিল্পীর মিলনে এই নাচ। মুখোশে রঙ আছে। কাঠখোদাই করে রঙ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, এই পরভার প্রচলন এতটাই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিনির্ভর ও রাজপ্রসাদপুষ্ট যে চিত্রেশ্বরের পর এই ধরনের কারুশিল্পীরাই নির্খোজ হয়ে গেছেন। আমি অনেক খোঁজ করেছি, এঁদের হদিশ পাইনি। উৎসবের চাহিদায় এই কারুশিল্প। মুখোশের যেমন আচারের দিক, তার অলংকার, সজ্জা বা কারুকার্যের দিকও রয়েছে। কিন্তু উৎসবের আচারের দিকটা যদি সীমাবদ্ধ হয়, তবে অলংকারের দিকটাও যায় কমে। আস্তে আস্তে সঙ-এর যাত্রাপথ বা রুটও ক্ষীণ হয়ে আসে। অলংকারের বিবর্তন যায় বন্ধ হয়ে। রঙ করার পদ্ধতিও পাল্টায় না। তাই পুনরুজ্জীবিত লোকসংস্কৃতির এহেন নমুনা দেখে সন্দেহ জাগে, পরভার ঢঙে মুখোশ কীসের মুখোশ? দেবতাকে ঢেকে রাখছে দেবেতর জীবের সামনে? নিশ্চল সংস্কৃতি, কৃষ্টি, আচারকে ঢাকতে চাইছে? মানুষের ওপর দেবতার প্রাধান্যকে? প্রজাকুলের উপর রাজা চিত্রেশ্বর ও পরবর্তী ধবলদেবদের প্রাধান্যকে? এও মনে হয়, কেন চার, পাতা, পাইক, ঝুমুর ইত্যাদি নাচ জনপ্রিয় হয়ে টিকে থাকল, আর চিলকিগড়ের ছো টিকলনা?

চিলকিগড়ের ছো-এর মুখোশ নিয়ে আরো কিছু কথা আছে। আমি আগেই বলেছি, এই নাচ আর মেলার একটা অর্ডার বা ক্রমানুক্রমিক শৃঙ্খলা আছে। দুবড়া থেকে পালা আসে চিলকিগড়ে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাবের নিদর্শন নিয়ে লিখতে গিয়ে আমি অন্যত্র রঙ্কিনী থেকে কনকদুর্গায় মাতৃদেবীর উত্তরণের কথা বলেছি। দুবড়া থেকে চিলকিগড়—এভাবে যে পালা রাজবাড়িতে পৌঁছায়, সম্ভবত তা এই অর্ডারেরই একটা চেহারা। চৈত্রের প্রথম সপ্তাহ থেকে চৈত্র সংক্রান্তি পর্যন্ত দুবড়ায় হতো মুখোশ নাচ—শিবদুর্গা নৃত্য, রাধাকৃষ্ণ নৃত্য, বাবু পালার নাচ। মহড়া মানে মুখোশ নাচ।

কিন্তু কার সাথে মহড়া? আলো হিসেবে জ্বলত মশাল। নাচের সঙ্গে ঘুরত মশাল। এখানেও দণ্ডছত্র মাঝি, সদগোপ, সামন্তরা নাচতেন। বাজনদার হতেন ডোমরা। চিলকিগড়, বেড়া, বেলিয়া, জামবনি, কেদুয়া, পালবাঁশি, নির্মডিহা, বনকাটি ইত্যাদি নানা গ্রাম থেকে লোক আসত দুবড়ায়। জমিদারও যেতেন। ধোপারা ধরতেন মশাল। এইখানে পালা শেষ হলে তারপর জামবনি হয়ে চিলকিগড়। মাঝে বেলিয়ার হাট। তারপর জ্যৈষ্ঠে সঙ পেঁৗছত চিলকিগড়ে।

'ছো' মানে সঙ সাজা, ঢঙ করা। কিন্তু 'ছো' মানে হেম বড়ুয়ার ভাষায় ছায়া, আকৃতি। অসমিয়া অভিধানের মতে দেবতা, জন্তু ইত্যাদির আকৃতি। তা হলে ঘুরে ফিরে প্রশ্ন থেকেই যায়; মহড়া কীসের? মহড়া মানে রিহার্সাল? যুদ্ধের প্রস্তুতি? নাচের প্রস্তুতি? প্রভা কীসের? মানুষের ওপর দেব-দেবীর? পরভার সামনে যে নাচে সে 'কনিয়া-ছো'। মানে 'কনে-ছো'? অর্থাৎ কনে সেজে চলেছে? অর্থাৎ ছোট ছো? প্রাধান্য মেনে নিয়েছে? কিন্তু, নাচের এই যদি এক শৃঙ্খলা হয়, অন্য একটি হল তার উদ্বোধন আর সমাপ্তির রুট। ব্রাহ্মণের আশির্বাদ পেয়ে তবেই আসবে রাজ আলয়ে। তার তৃতীয় শৃঙ্খলা হল পালার অনুষ্ঠানের ক্রমানুক্রম। এই শৃঙ্খলা দেখলেই বোঝা যায়, লোকায়ত এবং উচ্চমার্গের সাংস্কৃতিক উপাদান চিলকিগড়ের ছো-এ কেমন মিলে মিশে আছে। গাজনের সন্ন্যাসী হল ভক্তা। শিবের উৎসবে স্থানীয় ধর্মীয় লোকাচার পালিত হয়। ডুলুঙ-এ ভক্তরা স্নান করত। এখনও কেউ কেউ করে। তারপর ব্রাহ্মণ, ঢাক-ঢোল-সানাইবাদকের সামনে তাদের ভর হয়। সারা গায়ে সিঁদুরের দাগ মেখে কোমরে ঘুঙুর, পরনে ঘাঘরা—এইভাবে শিবের ভক্ত কাঁঠাল গাছের পাতা আর ফল কাটে। ফল গ্রামের লোকদের মাঝে বিলি হয়। সামনে ছাগল পড়লে ছাগলও বলি হয়ে যেত। এইভাবে শিবের 'পাঁতা'র সঙ্গে নাচত 'রঙ্কিনী পাঁতা', 'কালিকা পাঁতা', 'দুর্গা পাঁতা'। পেছনে যেত দর্শক ও ভক্তমণ্ডলী—গ্রামবাসী আর ব্রাহ্মণেরা। এইভাবে শিব, রঙ্কিনী, কালী এবং 'সংস্কৃত' রূপে মাতৃদেবী দুর্গার আরাধনার পর শুরু হতো ছো এর আসর। সঙ্গে থাকত ব্রাহ্মণের আশির্বাদ, জমিদারের প্রসাদ ও পৃষ্ঠপোষকতা। নাচের আসরে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর প্রভা, লোকায়ত জীবনের ছায়া সেই প্রভার আলোয় বা ছত্রছায়ায়। চিলকিগড়ের দুদিনব্যাপী রতি নাচের প্রথম রাত হতো 'সতীর-রাত', পরের রাত 'জাগরণ'। কিন্তু সতীপালা ঢুকল কী করে ছো এর আসরে? সতীঘাটা নামে মৌজা আছে।

ছো-এর আসরে সতীর অনুপ্রবেশ ঘটলেও তার ব্রাহ্মণ্য দিকটিই সব নয়। কারণ, শতাধিক বছরের বেশি চলে আসা এই পালায় 'মেল' বা সতী অনুষ্ঠানে, যেখানে মৃতদেহের প্রতীক হিসাবে আসরে একটা খাট চাদর চাপা দেওয়া থাকে, সেখানে সতী-প্রথার গৌরব প্রচার করার থেকেও করুণ সুর বেশি বাজতে থাকে। সতীপালায় লোকশিল্পী করুণ সুরে গান গাইতে থাকেন। সতী সাজেন সাধারণত একজন লালপাড় শাড়ি পরা পুরুষ। হাতে আমের পাতা। জলে চুবিয়ে সেই পাতায় জল ছিটানো

হয়, যেন পথ পবিত্র করে সতী চলেছে। সতীরাতের পরের দিন সকালে সতীকে নিয়ে গ্রামবাসী বেরিয়ে পড়েন, গ্রামের বাড়িগুলোয় যান। সঙ্গে ঢাক, ঢোল, সানাই, পতাকা। বউয়েরা সিঁদুরকৌটো বার করে সতীকে টিপ পরিয়ে দেয়। সতী এইভাবে গান গেয়ে এগিয়ে যায়। বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগৃহীত চিলকিগড়ের দুটি সতী গানের নমুনা দিতে পারি।[৫]

১

আমি কি করিব, কোথা যাব, বলো না গো দূতী,
আমার পরাণ মারিয়া সইলো, বাড়ালেন পিরিতি ॥

২

আমি নিরজনে শ্যামের সনে, গেঁথেছিলাম মালা,
আঁখি দুটি পালটিতে, ছেড়ে গেলেন কালা ॥

'ছো'-এ কী করে সতী এল, সতীগান চিলকিগড়ের কৃষক, খেতমজুর—এদের মধ্যে কীভাবে জনপ্রিয় হল, এ নিয়ে জামবনিতে আমার বারংবার ভ্রমণকালে নানা লোককে প্রশ্ন করেছি : সদুত্তর পাইনি। সতীদাহ এক-আধটা হতে পারে, কিন্তু তার জন্য ছো নাচে, গাজনে এই অন্তর্ভুক্তি কীভাবে সম্ভব হবে? হলফ করে বলতে পারি না, কিন্তু মনে হয় লোকজীবনের নানা দিক নিয়ে যেমন নাপিতের ছো, শিকারি ছো ইত্যাদি হয়েছে, করুণরসের অন্তর্ভুক্তি হয়েছে সতীপালা দিয়ে। উল্লেখ করা যেতে পারে, স্বামী-স্ত্রী-সন্তান নিয়েও একটি পালা আছে। নাম 'ছা-সোহাগি'। হয়ত, সতীগান সতী হবার গৌরবগাথা নয়, বরং লোকজীবনে নারীকে নিয়ে করুণরসের এক অভিব্যক্তি। এবং এও মনে রাখা দরকার, শুধু শাসকসংস্কৃতিই লোকসংস্কৃতিকেই নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে না, এই অন্তর্ভুক্তি ঘটে বিপরীত দিক থেকেও। লোকসংস্কৃতিতে লোকজীবনের নানা অনুভূতির অভিব্যক্তি ঘটে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রকাশগুলিকে অবলম্বন করে। সম্ভবত গ্রামসি কথিত 'আধিপত্য'-এর সাংস্কৃতিক প্রতিফলন ঘটে এভাবেই!

সাংস্কৃতিক অন্তর্ভুক্তির পারস্পরিক চরিত্রটি আরও ভাল করে বোঝা যায়, ছো এর পূর্বাপর শৃঙ্খলা লক্ষ করলে। লেভি স্ট্রাউস আমেরিকার উত্তর পশ্চিম সীমান্তের জনজাতিদের মুখোশ নিয়ে গবেষণাকালে দেখিয়েছিলেন কোয়াকিউটল জনজাতি এবং তাদের সালিশ প্রতিবেশীদের মধ্যে আদানপ্রদান ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সাক্ষ্য বহন করে কোয়াকিউটলদের মুখোশগুলি। লেভি স্ট্রাউসের মতে মুখোশ রহস্যময় মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে এই রহস্যের আঁধার ছিন্ন করা যায়। এবং আঁধার ভেদ করার চাবিকাঠি মুখোশের 'লুক্কায়িত চিহ্নগুলি'র মধ্যে রয়েছে।[৬]

জঙ্গলমহলের, বিশেষত জামবনির মুখোশনাচের 'লুক্কায়িত চিহ্নগুলি' আমি খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছি। মুখোশের গড়নে, রঙে, নমনীয়তায় এবং মুখোশগুলির পারস্পরিক সম্পর্কে এই লুক্কায়িত চিহ্নগুলি রয়েছে। কেন একটা সিরিজ বা ধরনের মুখোশের কাঠামোয় বৃহদাকৃতি, যা আধিপত্যের কথাই শুধু মনে করায়? কেন অন্য ধরন বা

সিরিজের মুখোশগুলি ছোট, রঙ অত সোচ্চার নয়, নমনীয়তার ভাব অনেক বেশি ? উড়িষ্যাগত ব্রাহ্মণকুল, সেই সব ষড়ঙ্গী, শতপথীরা, ক্ষত্রিয়সমাজ, যাদের কুলপতি সেই দেও ধবলদেবেরা, তারপর ভূমিজ, মাঝি, মাহাতকুল আর অন্তে সাঁওতাল, শবর, বাগদি, মালিরা—এই ক্রমোচ্চ ও ক্রমনিম্ন সম্পর্ক কাঠামো চিলকিগড়ের ছো আসরের শৃঙ্খলায় রয়েছে। এই আসরে সবাই অংশ নিচ্ছে—এক একজন এক-একভাবে। এই অংশগ্রহণের মধ্যে দুটি ভাবই নিহিত—সমবেত ভাব আর সম্মানের প্রকারভেদ।[৭]

আমি কালচারাল পেট্রনেজ বা সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষকতার কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম। সেই কথায় ফিরে আসা যাক। এই ছো আসরের স্মৃতিচারণ হলেই, আমি লক্ষ করেছি, জনমানসের স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে জাঁকজমক, সারারাতব্যাপী সমবেত অনুষ্ঠান, রাজবাড়ির উপস্থিতি, দাক্ষিণ্য আর বৃহদাকৃতি মুখোশ বা পরভার কথা। নাচিয়েরা কেমন নাচত, খোরপোষ পেত—সে সব কথা। এখানে অনুষ্ঠানের আচারের দিকটাই বড় হয়ে রয়ে গেছে। কালজয়ী হয়েছে। জঙ্গলমহলের জমিদারিপ্রথার রাজনীতি এখানে আচারকে ধরে টিকেছে এবং আচারই সময়ে সময়ে জমিদারদের কৃষক রাজনীতির মূলে অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজা প্রজারই, রাজা প্রজাদের সংস্কৃতিকে মান্য করে, সংস্কৃতির শিখরে রাজার পৃষ্ঠপোষকতার ছত্র, সমবেত শ্রোতৃ বা দর্শকমণ্ডলী হল জামবনির সমাজবদ্ধ জনতার, জঙ্গলমহলের এই পরগনা আর গোটা জঙ্গলমহল তার সংস্কৃতির গণ্ডী দিয়ে গাঙ্গেয় বাংলা বা উড়িষ্যা থেকে আলাদা—এই সত্তাবোধ বা পরিচিতিবোধ শতাধিক বছর ধরে চলে আসা ছো আসরকে জনমানসে এনে দিয়েছে। এর নাটকীয়তা, ভাষণিক রূপ, প্রদর্শনীর কাঠামোগত শৃঙ্খলা—সব মিলিয়ে জেমস স্কটের ভাষায় বলা যায় পাবলিক ট্রানসক্রিপ্ট অব দ্য ডমিন্যান্ট বা প্রাধান্যের প্রকাশ্য চিত্রনাট্য।[৮] এই চিত্রনাট্যের প্রকাশ্যতার মূলে বিষয় মর্যাদা, প্রভাব, নাটকীয়তা এবং সমবেত সংস্কৃতির এক অতিকথাময় রূপ।

৩

শ্বেতাঙ্গ নৃতত্ত্ববিদ্যার নজিররূপে ফ্রেজারের মতের উল্লেখ আগে করেছি। লেভি স্ট্রাউসের বক্তব্যের সারমর্ম অন্তত এক অর্থে এর থেকে খুব দূরে নয়। প্রকৃতির উপর সংস্কৃতির জয় প্রতিপন্ন করতে গিয়ে লেভি স্ট্রাউস দেখিয়েছেন মুখোশ কীভাবে পালটাচ্ছে। মহাজগতের দৈত্যদানবের ভয়াবহতা সরে যাচ্ছে মুখোশ থেকে ; সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রিত সম্পর্কবোধ স্থান গ্রহণ করেছে। সভ্যতার উদয় হচ্ছে। **মুখোশের নানা কণ্ঠস্বর বা নানান রকমফের** (ওয়ে অব দ্য মাস্কস)-এ লেভি স্ট্রাউসের এই হল সারকথা।

কিন্তু 'প্রকৃতি' আর 'সংস্কৃতি'—এই দ্বৈততা যদি স্বীকার না করি ? অথবা এই দ্বৈততা সত্ত্বেও যদি দেখি একটা আরেকটার উত্তরসূরী নয়, পরস্পরকে বরং জড়িয়ে আছে ? মধু থেকে মানুষ তামাকে যায়নি, মধু আর তামাক একসঙ্গেই রয়ে গেছে মানবজীবনে—যদি বরং এমন ভাবা যায় যে আচারের রাজনীতিই হল এই দ্বৈততার অবসান ঘটানো, তবে লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে এমন অতি সরল ধারণার সুযোগ কোথায় থাকে ?

চিলকিগড়ের ছো-এর প্রসঙ্গে সেইজন্য আরও কিছু বলার দরকার রয়ে গেছে।
ছো-এর নৃত্যরূপ সংস্কৃত। ব্রাহ্মণ্য ও পৌরাণিক দেবদেবী প্রকৃতির উপর জয় ঘোষণা করছে। পালাগুলোর কথকতায় জনজীবনের নানা দিকে প্রকৃতিবেশী হিংস্র পশু, দৈত্য ইত্যাদির ওপর নিয়ন্ত্রণ ঘোষিত হচ্ছে। কিন্তু সংস্কৃতির এই জয়ের পরও প্রকৃতি ফিরে আসছে!
ছো নাচের আসরে মুখোশ নাচের সঙ্গে চলতে থাকে পাইক আর চাঙ নাচ। দেহচর্চা আর শক্তিপ্রদর্শনী হতে থাকে যুদ্ধনৃত্যের মধ্যে। আর মাঝে মাঝে চাঙ নাচ আসে, যেখানে নাচের সঙ্গে বাজতে থাকে চাঙ বাদ্যযন্ত্র। যুবক মেয়ে সেজে ঘোমটা দিয়ে বাঁকি শিল্পীর সঙ্গে নাচে। বীরেশ্বরবাবুর সংগ্রহ থেকে এক-আধটা সে গানের নজির দেওয়া যেতে পারে :

১

সরস্বতী উড়িরে কাঁসাই নদীর কূলে,
ঝল করি বিজলী মারে,
বাঁকা শ্যামের তরে,
পানিকে যাবার বেলে।
ঝরণে পানিলো নানা ঝির ঝির বাঁহলা,
চেকা কাঠি বাঁধো দিনি তবু না রহিলা,
নানা ঝির ঝির বহিলা।

২

রাত্র ক'টি পুহাইল,
উদয় হেলা রে ভানু
রাধা ঘরে চোর লো পশিল
জাগরে সোহাগিয়া।
জানিলে সে জানান্ত রাধিকা
জানিলে সে জানান্ত ধূতিকা
তোদরে সজাতিয়া,
টানি ঝিঁকি বাঁধলো বেণী,
বাপবাড়ি যিবা বলি,
কাঁহে ছিল সান দেয়রা,
হস্তে ধরি কাঁদুছি,
কাঁহে ছিল যান ননদা,
হস্তে ধরি কাঁদুছি।

পাছে পাঠকেরা ভাবেন, ছো-এর আসরে নাচ সংস্কৃতি থেকে প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তন নয়, আসলে সেটাও অন্য এক সংস্কৃতি, আমি শ্যামল শতপথীর সংগ্রহ থেকে আরেকটি গানের উল্লেখ করতে পারি।[৯]

ছিড়া জালে মাছ ধরে ধলভূঁয়ানি।
চূণ-দক্তায় ভুলেই রাখে চিলাকিগড়্যানি ॥
ঘরে ভাত নাই পান খায় ঝাড়গড়্যানি।
উঁচকপালি সিঁদুর পরে বেল্যাবেড়ানি ॥

ধলভূম, চিলাকিগড়, ঝাড়গ্রাম আর বেলেবেড়া বা গোপীবল্লভপুরের প্রচলিত সংস্কৃতি আর আদবকায়দার বেশির ভাগই ফাঁকি। তাই জঙ্গলমহলের সংস্কৃত নৃত্যগীত ওখানের সমাজের শোভা পায়না। আত্মশ্লেষের এমন নজির কমই আছে। কিন্তু সংস্কৃতি থেকে প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তন গান বা নাচের বক্তব্যের চেয়েও আসরের আচারে অধিক পরিস্ফুট। তা হলে 'ভক্তা' বা পাঁতার রেওয়াজ কেন ?

ছো-এর অনুষ্ঠান কেন ঘোড়া নাচে শেষ হত ? রঙ্কিনী কি ঘোড়ায় চড়ে ? রাজবাড়ির প্রাঙ্গণ যেখানে ছো নাচ হত, সেখানে শিবের মন্দিরে গাজনের অন্য আচারটি সম্পূর্ণ হয়। শিবের সন্ন্যাসী যাঁরা হন, তাঁদের 'ভক্তা' বা 'পাঁতা' বলা হয়। একথা আগেই উল্লেখ করেছি। বীরেশ্বরবাবু দেখেছেন, গাজনের রাতে চিলাকিগড়ে যখন ঢাক সানাই বাজছে, রঙ্কিনীর 'পাঁতা' সেই অন্ধকার রাতে শালবন আর ঝোপজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এক হাতে তলোয়ার আর মাথায় একটা ডালা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। সেই ডালায় মানুষের তৈরি নরমুণ্ড। মনে হচ্ছে, রঙ্কিনীর থানে তার ভক্তা চলেছে। অর্থাৎ রঙ্কিনী নিজে। একটা বড় গাছের তলায় রঙ্কিনীর থান। গ্রামদেবীর পুজোর জায়গা। দুজন মশালধারী সঙ্গে। পুজারী ব্রাহ্মণও ছিলেন। ঢাক, ঢোল, সানাই, পতাকা নিয়ে গ্রামবাসীরাও পিছু পিছু গেছে। ব্রাহ্মণের পুজো সারা হল। মাটির মুণ্ড গাছতলায় রেখে দেওয়া হল। আরেকটা মুণ্ড নিয়ে এবার কালিকা থানের দিকে ভক্তা চলল। কালিকা থান জঙ্গলের ভেতরে। গ্রামের আচার, একমাত্র যিনি ভক্তা, তিনিই একা অন্ধকারে দেবীর থানে গিয়ে মুণ্ডটি রেখে আসবেন।

প্রশ্ন হল : শিব, গাজন, রঙ্কিনী, ছো, পাঁতা প্রথা আর চাঙ—কোন সূত্রে জামবনিতে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে ? আমি অন্য এক উপলক্ষে জঙ্গলমহলের কাল্পনিক বংশগাথার আলোচনাপ্রসঙ্গে দেখিয়েছি, রঙ্কিনী থেকে কনকদুর্গায় মাতৃদেবীর আরাধনার অগ্রগতি ওই অঞ্চলে কীভাবে সংস্কৃতায়নের এক সাংকেতিক বার্তা বহন করেছে। কিন্তু আমার পূর্বের সেই বক্তব্যের কিছু সংশোধন করে বলতে চাই, রঙ্কিনী মরেনি। রঙ্কিনীর থান গ্রামদেবীর পুজোর জায়গা। আবার এও লক্ষণীয়, গ্রাম দেবতা বা গরাম দেবীর থান, যা হল পুজা প্রাঙ্গণ, তাকে ঘিরে উড়িষ্যার সুরে চাঙ (বাদ্যযন্ত্র) হাতে ছেলেরা নাচত। জামবনির সংস্কৃতির এ এক মৌলিক দিক। কনকদুর্গা মেরেছে রঙ্কিনীকে সামনে দিয়ে—ক্ষমতার প্রক্রিয়ায়, রাজবাড়ির আরাধ্য মাতৃ-দেবীরূপে যে মর্যাদা প্রাপ্য, সেই মর্যাদার বলয়ে। কিন্তু রঙ্কিনী মরেনি। রঙ্কিনী ফেরত এসেছে, না কি বলব কখনও যায়নি। রয়ে গেছে, প্রকৃতি / সংস্কৃতির প্রবহমান যুদ্ধে, প্রজা / রাজার পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, টানাপোড়েনে, অন্তর্ভুক্তিতে।

অন্যভাবে বলা যায়, ছো-এর আসরে সতীপালা শুধু করুণরসের সংকেত নয়, এক শাক্ত রূপেরও ইঙ্গিত। ঋতুচক্রের আবর্তনান্তে দেবীর হাতে শুধু প্রেমিক / পুরুষ / রাজা নিধন হয়না, দেবী নিজেও মরেন। শস্যপ্রাণ বা শস্যদেবতার পায়ে নিজেকে সঁপে দেয় রঙ্কিনী। ভৈরবের সঙ্গে যুক্ত হয় অমর বন্ধনে। মানবী পূজারিণী, পূজারিণী সংশ্লিষ্ট ধর্মাচার, বৎসান্তে পুরুষনিধন, স্বেচ্ছামৃত্যু স্বীকারের মাধ্যমে ভৈরবের সঙ্গে অক্ষয় মিলন, ব্রতচারণের অধিকার—এই সবের তাৎপর্য আরও হৃদয়ঙ্গম করা যায় শিলদার 'ভৈরবরঙ্কিনী মাহাত্ম্য' পড়লে। রঙ্কিনী, কালী, সতী আর শিবের বন্দনা শেষ হয়েছে ছো-এর অনুষ্ঠানে ঘোড়া নাচে। শস্যের জন্মমৃত্যু, ঋতুচক্র, অশ্বমেধযজ্ঞ—এই সম্পর্ক নৃতত্ত্ব, ইতিহাসের সাক্ষ্য, প্রত্নতত্ত্ব, তিন দিক থেকেই জামবনিতে পেয়েছি।

আরেকটা দিক লক্ষ করুন। আমি এই ইঙ্গিত দিয়েছি, চিলকিগড়ের ছো সংস্কৃত ও লোকায়ত—দুই আচারের মিশ্রিত রূপ। শাসক ও শাসিত—দুই শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্র। এবং এই প্রক্রিয়া ও রসমঞ্চ সম্ভব হতো না, যদি না বাস্তবে জঙ্গলমহলের সমাজে এক মধ্যবর্তী ক্ষেত্র থাকত—ভূমিজ, মাঝি, মাহাত, মণ্ডলরা যার প্রতিনিধি সাঁওতাল, মুণ্ডা, এদের নাচে নারীদের অংশগ্রহণ থাকে—সবাই জানেন। চিলকিগড়ের ছো-এ এরা কখনও নাচত না। ওই ছো-এ নারীদের অংশগ্রহণও ছিল না। কিন্তু নারীর সাজে পুরুষেরা নাচত। কেন?

সঙ্ঘবদ্ধ জীবনযাপন উর্বরাশক্তির পূজা রিচুয়াল নৃত্য—এই সবের ক্ষেত্রে নারীর পোশাকে পুরুষের আবির্ভাব দেখলে বোঝা যায়, আদিতে নর্তকীরাই নাচত। মিতাক্ষরা/দায়ভাগের কাহিনী যাঁরা জানেন তাঁরা হলফ করতে পারবেন, নারী সম্পত্তি থেকে কীভাবে সরে এসেছে। জামবনিতে নারীকে ছলে বলে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। ধবলদেবের রাজবাড়ির সেই অন্তর্কলহ নিয়ে প্রায় একশ বছর আগে জামবনির সমাজে যথেষ্ট উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। পরিণামে সংঘর্ষও হয়। প্রকাশ্যতা থেকে অন্দরমহলে ঠেলে পাঠিয়ে দেওয়া, বাইর থেকে ঘরে—এ কাজটি শুধু গাঙ্গেয় বাংলা বা কলকাতাতেই সম্পন্ন হয়নি, জঙ্গলমহলেও এ চেষ্টা চলেছিল। সুরজিৎ সিংহ বরাভূম নিয়ে আলোচনাকালে দেখিয়েছিলেন, মাহাত-ভূমিজদের মধ্যে 'সভ্য' 'ভদ্র' হওয়ার চেষ্টার প্রথম প্রকোপ পড়ে নারীদের ওপর। আমি বন্ধু পশুপতি মাহাতর কাছে আজ থেকে সত্তর বছর আগে চেমাইজুড়িতে সাঁওতাল সমাজে ওইরকম এক হিন্দু হবার ঘোষণাপত্র দেখেছি—প্রায় দু'শ সাঁওতাল প্রধানের সই করা। সেখানেও প্রথম কথা সাঁওতালনিদের 'সভ্য' 'ভদ্র' হতে হবে। জামাকাপড় পরতে হবে। মদ্যপান চলবে না ইত্যাদি। মালদার জিতু সাঁওতালও চেয়েছিলেন। হিন্দু হতে। তানাভগত আন্দোলনেরও একটা দিক ছিল সনাতন ধর্মের মণ্ডলে আসা। কাজেই এ সবই যদিও অনেকটাই অনুমান হয়ত নারীর সামাজিক পালা অনুষ্ঠানে নারীর প্রকাশ্য অংশগ্রহণও বন্ধ হয়েছে।[১০] তা ছাড়া গোড়ায় দেবীর হাতে পুরুষ নিধন হলেও শেষে পুরুষ জয় করেছে দেবীকে—এও সত্য।

চারু সান্যাল জলপাইগুড়ি শহরের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে করলার জঙ্গলে চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি মানুষের মূর্তি বলি দেওয়ার কথা লিখেছেন।[১১] ডালটন লিখেছিলেন সেযুগে ধলভূমে রক্ষিকনীর মন্দিরে নরবলির কথা। বিনয় ঘোষ উল্লেখ করেছেন মেদিনীপুরের অন্যান্য মন্দিরের কথা ওই একই প্রসঙ্গে।

আমি প্রকৃতি / সংস্কৃতি দ্বৈততার তত্ত্ব স্বীকার করিনা। ছো-এর প্রসঙ্গে এই সব আচারের উল্লেখ করেছিলাম সংস্কৃতি থেকে প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তনের কথা বলতে নয় বরং দেখাতে এই দ্বৈততা নেই। যা আছে, তা হল লোকসংস্কৃতির সংস্কৃত রূপ এবং ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির লোকায়ত রূপ। সংস্কৃতির জগতে আচারের বৈভব এতটাই। আচারের রাজনীতি এতটাই শক্তিশালী।

৪

কিন্তু ঋতুচক্র বা শস্যচক্রের আবর্তনের দিক দিয়ে চৈত্র-বৈশাখের আগে পৌষ। মকর নতুন ফসল টুসু—এই সব। জঙ্গলমহলের অন্যান্য অঞ্চলের মতো জামবনিতেও টুসু খুব জনপ্রিয় পরব। জমিদারবাড়ির মহিলাদের স্মৃতিচারণে লক্ষ করেছি টুসু নিয়ে অনেক স্মৃতিরোমন্থন। টুসু মেয়েদের ব্রত—এই ব্রততে কোথাও থাকে সরা ধান কোথাও টুসুর ছোট মূর্তি। জামবনির মেয়েরা নানা আলাপে বারংবার এই ধর্মাচারের কথা বলেছে, এই আচারকে ঘিরে তাদের 'ঘরে বাইরে' অনেক সময় একাকার হয়ে গেছে। টুসু পরবে মাটির সরা ভুলুং-এর জলে ভাসে। 'সসার গার্ডেন' বা কৃত্রিম শস্যক্ষেত্র তৈরি করার মধ্যে নৃতত্ত্ববিদরা হয়ত যাদুক্রিয়া বা 'রিচুয়াল ম্যাজিক' দেখবেন। কিন্তু এই প্রজনন শক্তিভিত্তিক যাদুবিশ্বাসের থেকেও চোখে পড়ে, জঙ্গলমহলের জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিকগুলি—চাষ উদ্বৃত্ত, উৎপাদনের আকাঙ্ক্ষা, জঙ্গল, গোষ্ঠিপ্রথা, জমিদার-বাড়ির প্রভাব আর কৃষক / ভূস্বামীর পরস্পর নির্ভরশীলতা।

কোশাম্বি দেখিয়েছেন, লাঙলকেন্দ্রিক অর্থনীতিতে যে সব অঞ্চল পরে এসেছে, মাতৃ-প্রধান আচার বা প্রতিষ্ঠানগুলি সেখানে অনেকদিন টিকে গেছে।[১২] জঙ্গলমহলের অনেক স্থানেই জঙ্গল কেটে বা পতিত জমি উদ্ধার করে চাষবাস শুরু হয়েছে মাত্র দুশ-আড়াইশ বছর আগে। বসতি স্থাপন, জমি উদ্ধার, চাষবাস; মণ্ডলিপ্রথা, কৃষকের সঙ্গে অলিখিত এক সামাজিক চুক্তি বলে জমিদার বা রাজার এক সমাজরক্ষক বা কর্তারূপে আবির্ভাব—জঙ্গলমহলের সে কাহিনী বিশাল। অন্য সময় বলব। টুসু প্রসঙ্গে জামবনিতে দেখা যাবে লোকাচারের রাজনৈতিক শক্তি। এখন সেই প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে।

চিলকিগড়ে টুসু আর ভাদুগান একাকার হয়ে গেছে। জমিদারবাড়ির বয়স্ক মহিলা এবং অন্যান্য প্রবীণদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, সে যুগে ছো-এর পরই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় উৎসব হত টুসু। জঙ্গলমহলের এলাকাগত সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে টুসুগানে মানভূমের প্রভাব লক্ষ করলে। ন' মহলের মধ্যে আদান প্রদান তো ছিলই।

এছাড়া পুরুলিয়া বা বাঁকুড়ার বহু নরনারী দিনমজুর অথবা ধলভূমের খাদানে আসত কাজ করতে। কাজেই লোকসংস্কৃতির আদান প্রদান ঘটা বিচিত্র নয়। তাই মানভূমের নানা অঞ্চল যেমন কাশীপুর, বলরামপুর, বাঘমুণ্ডি—এই সব অঞ্চলের টুসুগানের প্রভাব জঙ্গলমহলের অন্যত্রও পড়েছিল। সুর, গান প্রায় এক। শ্যামলকান্তি শতপথীর সংগ্রহ থেকে এক-আধটা উদাহরণ দিতে পারি :

১

প্রণাম মাগো টুসু দেবী,
মোদের আর কত কাঁদাবি।
বছরে পৌষ মাসেতে তোমার গান করি,
করজোড়ে বন্দি চরণ, কাঁদি চরণ ধরি ॥

টুসু মানুষের আপনজন, বিশেষত মেয়েদের। যে অঞ্চলে গ্রামপত্তনের ইতিহাস দু'শ বছরের বেশি নয়, অবাক কী, সেখানে ইংরেজ আমলে জনসাধারণের একান্তও বস্তুগত আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হবে এমন এক 'সসার গার্ডেন'কে কেন্দ্র করে, মেলা হাট পার্বণ সঙ্গীত উৎসব গড়ে তুলে। অন্যত্র এ নিয়ে লিখেছি, কিন্তু বেশি লেখারই বা কী দরকার, এ গানটা শুনুন। এটিও বীরেশ্বরবাবুর আর শ্যামলবাবুর টুসু সঙ্গীত সংগ্রহ থেকে শোনাচ্ছি। চিলকিগড়ের টুসু। কিন্তু বলে না দিলে ধলভূম বা মানবাজারের মনে হতে পারত :

২

চল সজনী টাটানগরে,
তোকে রাখব ভাড়া ঘর করে।
আনন্দেতে থাকব মোরা
ইলেকটারি আলোতে,
দুইজনাই বেড়াব মোরা
ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে,
চেক্ শাড়ি ঝুলন সায়া,
কিনবো লো বেশী দরে,
চেক শাড়িটি আয়না দেখে
পরাব লো কুঁচি করে।
মকর কাটাব মোরা,
আমরা দুইজন গান করে,
সকালবেলা সবে মিলে যাব গো
ধনী বুড়ির ঘাটে,
চিঁড়া, মুড়ি, ডিম, পাঁঠা খাব মোরা
ঘরে ফিরে।

চিলকিগড়ের একাধিক টুসু গানে পরকুলের মেলার উল্লেখ আছে। পরকুল বাঁকুড়া জেলায়! অশোক মিত্র মশাই সম্পাদিত **পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও পূজাপার্বণ** গ্রন্থে জঙ্গলমহল অঞ্চলের যে সব মেলার উল্লেখ আছে, তাদের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা নিয়ে আরও গবেষণা হলে দেখা যাবে, এই সব কার্নিভালে খালি আপামর জনসাধারণের মেলামেশাই সে যুগে সম্ভব হয়নি, এক সাধারণ সংস্কৃতিও গড়ে উঠেছে। যার প্রধান বিষয় হল জঙ্গল কেটে বসত গড়া এই সব গ্রামের কৃষিজীবী মানুষের আকাঙ্ক্ষা, আর্তি। ধান না উঠলে সমবেত আচার হবে না, সমবেত আচার সম্ভব হলে তবেই শিবের আবাহন চৈত্র-বৈশাখে। টুসুতে রাজপ্রাসাদ বা রাজপৃষ্ঠপোষকতা নেই। সমষ্টি সদ্য তখন রূপ নিচ্ছে। শাস্ত্রীয় কৌলিন্য আসছে পরের ঋতুতে। আমি উল্লেখ করেছি, গাজনের সময় করুণরসের উদ্রেক হচ্ছে, 'ছো-তে' 'রঙ্কিনী পাঁতার' মাধ্যমে একই সঙ্গে রঙ্কিনীর শক্তিকেও স্মরণ করা হচ্ছে। টুসু মেয়ে। একা ছাড়তে ভয় হতে পারে। তাই তাকে ছেলে সাজতে হতে পারে কখনও কখনও। হাতে টাঙি থাকবে। এ যেন রঙ্কিনীরই অন্য এক রূপ। জঙ্গলমহলের মেয়েরা গোটা ঔপনিবেশিক যুগ ধরে (শুধু সে যুগে কেন, আজও) নানাভাবে যেরকম বহির্জগতে নেমেছে, তাতে টুসু আর রঙ্কিনী —এই দেবীরা যে ভালবাসার পাত্র হবেন, শক্তি জোগাবেন, তাতে আশ্চর্য কি! প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে টুসুর মতো ভাদু গানও চিলকিগড়ে জনপ্রিয় হয়েছিল পুরুলিয়া বাঁকুড়া থেকে। ভাদ্রমাসে কুমারী মেয়েদের উৎসব ভাদু। চিলকিগড়ের নিম্নোক্ত গানে ধলভূমের খনির উল্লেখ পাওয়া যায় :

মুশাবনি মুশাবনি হাটের বড় নাম শুনি
বড়বাবু চাল জুড়োনি,
ছোটবাবু লাপানি,
চল চল গাড়িতে,
টাকায় সিকি লাভ আছে,
হবে কথা কানের কাছে।

টুসু আর ভাদু যেভাবে সে যুগ থেকে এই অঞ্চলে জনপ্রিয় হল, ঋতুচক্রের আবর্তনকে কেন্দ্র করে নানা মেলা গড়ে উঠল, টাটানগর মুশাবনি, রাঁচি, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া —এই সব শহরকে ঘিরে গান তৈরি হল, তাতে বলা যায় জনসমাবেশ, সমবেত আচার-অনুষ্ঠান আর নানা সম্প্রদায়, নানা বসতি, নানা গ্রামকে মিলিয়ে এক সার্বিকতার গোড়াপত্তন সম্ভব হল। এ না হলে ১৯২৩-এর ব্যাপক জনসমাবেশ, বিক্ষোভ সম্ভব হতো না। তার আগে কৃষকরা জামবনিতে সামন্ততন্ত্র এবং ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে শুধুই মামলা মোকদ্দমা করেছে। কিন্তু সাঁওতাল পরগনার কৃষক বিদ্রোহের স্মৃতি, রাঁচির কৃষক বিদ্রোহের প্রভাব, শিলদায় সুবর্ণমনির বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত হল এই সব মেলার সমবেত ঐতিহ্য আর কার্নিভাল উপলক্ষে নিয়মিত প্রতিবছর নানা মানবীয় মূল্যবোধের রোমন্থন। ভাদু, টুসু, গাজন, ঝুমুর, কাঠি, পাতা—

এ সবের সাংস্কৃতিক অন্তর্বস্তু তো রয়েছেই ; লক্ষণীয় হল এই সব আচার অনুষ্ঠান জনমানসে তৈরি করত একধরনের 'হৃত সমৃদ্ধি আর বর্তমান দারিদ্রবোধের'। সৃষ্টি হতো সেই প্রক্রিয়া যাকে বলা যেতে পারে 'নৈতিক শৃঙ্খলা বা ব্যবস্থার বিপর্যয়।'

শ্যামলকান্তি শতপথী জামবনির লোক। তার সংগ্রহ থেকে কিছু গানের উল্লেখ করেছি। জামবনিতে প্রচলিত লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের আলোচনাক্রমে তিনি কাঠি, পাইক এবং সাঁওতাল নাচেরও উল্লেখ করেছেন। কাঠি নাচেও কয়েকজন ছেলে মেয়ে সাজে। রামায়ণের নানা কাহিনী নিয়ে এই নাচে মূলত অংশগ্রহণ করত মহাদণ্ড, দণ্ডছত্র মাঝিরা। পাঁতা নাচে মাদলের বাজনার সঙ্গে তালে পা ফেলে গোল হয়ে যে নাচ আর গান হতো, তাতে কখনও কখনও ঝুমুরও মিশে যেত। রদারমান্ড উল্লেখ করেছেন 'এনক্লেভ ইকনমি'র কথা।[১৪] বদ্ধ অর্থনীতি বলা হতো, কারণ গোটা জঙ্গলমহলের মানুষ থাকত জমিদার, ব্যবসাদার আর কুলি চালানদারদের কাছে বাঁধা। দারিদ্র, ক্রমাগত জমি থেকে উচ্ছেদ, দুর্ভিক্ষ যার উল্লেখ হান্টার, তার **স্ট্যাটিসটিকাল অ্যাকাউন্ট**-এ করেছিলেন ১৮৭৬-এ।[১৫] ক্রমবর্ধমান খাজনা এসবের-হাত থেকে সাঁওতাল, ভূমিজ, মাঝিরা পালাতে চাইত। পালাতে গিয়ে খপ্পরে পড়ত কুলি চালানদারদের। 'হৃত সমৃদ্ধি ও বর্তমান দারিদ্র বা নিঃস্ব দশা'র এই মানসিকতা যত না ইতিহাসচর্চা দিয়ে বোঝা যাবে, তার থেকে বেশি বোঝা যায় লোকমানসিকতাকে বোঝার চেষ্টার মধ্য দিয়ে। ইতিহাস আর এথনোগ্রাফি নিয়ে তর্ক এখানে অবান্তর। এই অসাধারণ গানটি শুনুন। এটা নাচা হত পাঁতা নাচে।

আসাম যাব চাকরি পাব, জোড়াপাখা টানাইব,
সাহেব দেখে উড়িল পরাণ হে বাঁকা শ্যাম,
ফাঁকি দিয়ে পালালে আসাম।

জামবনির পাশের থানা ঝাড়গ্রাম। ১৯২৫-এর আগে জামবনি ঝাড়গ্রাম একই থানার অধীন ছিল। ঝাড়গ্রামের পটুয়াদের গান জামবনির গ্রামে গ্রামে গীত হতো। সাঁওতাল গ্রামে সাঁওতালি পট, যমপট, বৈষ্ণবপ্রধান গ্রামে রাধাকৃষ্ণ পালা-এসব ছাড়াও স্বদেশী গানও পটুয়ারা গেয়েছে। ঝাড়গ্রামের নামকরা পটুয়া পবন চিত্রকরের উল্লেখ বীরেশ্বরবাবু করেছেন। স্বদেশীযুগে পুলিশ তাঁকে ধরে, কারণ ক্ষুদিরাম, গান্ধীজী—এঁদের কথা পবন পটে আঁকতেন, গাইতেন—এমনকি সাঁওতাল বিদ্রোহের কথাও। চুয়াড় বিদ্রোহও বাদ যায়নি পবন আর তার পুত্র ভগীরথ পটুয়ার বিষয়াদি থেকে। বীরেশ্বরবাবুর দুটি সংগ্রহের পুনরুল্লেখ করা যেতে পারে।

১

গ্রামে মহাজনে সুদে বাড়ায় টাকা,
কলসি ভরা টাকা খড় মাটি ঢাকা।
লুটে লয় থালা বাটি কাড়ে ঘর দোর,
দারোগার মদত পেয়ে বাড়ে যত জোর।

মাটি কাটিয়ে মহাজনে ছাড়ে না কড়ি,
চাইলে চাল তারা বাঁধত জোর করি।
বড় দুখ দিত সব হারামজাদা যত
মেয়েদের রেখে দিত কাঁদত তারা কত।
অনেক দুখে সাঁওতাল যত করেছিল পণ,
করবে লড়াই ধরবে টাঙ্গি আছে যত জন।
সাঁওতাল মেয়ে সেজে ছেলে ধরেছিল তীর,
তাদের কথা বই লিখা হয়না তারা কত বীর।
সিধু কানু প্রাণ দিল গ্রামের সবাই কাঁদে,
আজও আমরা পড়ি মহাজনের ফাঁদে ॥

২

এই মাটির চুয়াড় গোঁয়ার বীর,
তারা ধরিল টাঙ্গি ধনুক তীর।
রক্ত দিয়েছিল বুক পেতে তারা,
মানেনি ইংরাজের নূতন ধারা
সে দিনের যত ভদ্রবাবু উঁচু জাত,
তারাই কাড়ত মোদের পেটের ভাত।
কোম্পানীর হয়ে দালালী করত তারা,
কত মরেছিল চুয়াড়—বীর যারা ॥

এই আচার ও পর্বগুলোর রাজনৈতিক সম্ভাবনা বোঝা যায় ভাদু এবং টুসু গানের রাজনৈতিক ব্যবহার লক্ষ করলে। প্রসঙ্গত, এটাও লক্ষ করার মতো, যেমন দেশকে দেশমাতৃকা ভেবে, তাকে দেবীবন্দনা করে স্বদেশী আন্দোলন একসময় জোর পেয়েছিল, তেমনই টুসু, ভাদু—এই সব লোকায়তকন্যা বা দেবীর বন্দনা গেয়ে জঙ্গলমহলে লোকায়ত আন্দোলন গতি পেয়েছে। অনুমান হয়, দেশমাতৃকারূপে স্বদেশী বন্দনা লোকায়ত এই আচারেরই সংস্কৃত বা শাস্ত্রীয় রূপ। এখনও যাঁরা সেযুগের জঙ্গলমহল, যা আজকের যুগে বেশির ভাগই ঝাড়খণ্ড অঞ্চল—এই এলাকার রাজনৈতিক আন্দোলনের খবর রাখেন, তাঁরা জানবেন ঝুমুর, টুসু, ভাদু—লোকায়ত সংস্কৃতির নানান ধরন আর আচার কীভাবে 'ঝাড়খন্ডি' সংস্কৃতি ও পরিচিতি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। জাতি গড়ে ওঠার ইতিহাসে সংস্কৃতির সক্রিয় রাজনৈতিক ভূমিকা প্রসঙ্গে এ প্রায় এক অকাট্য নজির। নারী শক্তি দেবে, ভক্তি জাগাবে, প্রেম জোগাবে, প্রেম জাগাবে, ভয়ের সঞ্চার করবে, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মাঝে ঐক্য বা সংহতিবোধ আনবে, সম্প্রদায় বা সমাজের আন্দোলনে এ প্রায় আর্কিটাইপাল বা আদি মানসিকতা। ভাদুর গান গাইত এবং এখনও গায় বাগদি, বাউরিরা। ভাদুমূর্তির চারপাশে সমবেত মেয়েদের নাচগানের উৎস ওইরকমই এক সমবেত মানসিকতা থেকে। ভাদু

রাজার মেয়ে। সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর প্রচুর দরদ ছিল। গরিব দুঃখী ছিল তাঁর আপনজন। সাধারণ গ্রামবাসীর চিন্তায় রত এই ভাদুর মৃত্যু হয়েছিল তাঁর বিয়ের আগে। মানভূমের কাশীপুরের রাজকন্যা কি এই ভাদু? কোনও সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। যাইহোক, মানভূমের কিংবদন্তী অনুসারে কাশীপুরের রাজকন্যার মৃত্যুতে তাঁর শোকসন্তপ্ত পিতা কন্যার মাটির মূর্তি গড়িয়ে স্মরণোৎসবের আয়োজন করেন। বিভিন্ন সম্প্রদায় দেবীরূপে কল্পনা করে তাঁর মূর্তি গড়ে ভাদ্রমাসে উৎসবের দিনে গান গেয়ে ঘুরে বেড়ায়। সেই একই বৈশিষ্ট্যগুলি এখানেও লক্ষণীয় : নারীকে কেন্দ্র করে সমবেত আচার, প্রজাদরদীর প্রতি কৃষক জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের মধ্য দিয়ে ভূস্বামী-কৃষক পারস্পরিক নির্ভরশীলতার প্রকাশ, পৌরাণিক দেবদেবীকে পুজো করার পরিবর্তে স্থানীয় কোনও ঐতিহাসিক চরিত্র মারা যাবার পর তাঁর স্মৃতিকেই দেবগরিমায় ভূষিত করা এবং এই আচারাদির সঙ্গে শস্যচক্রের গভীর সম্পর্ক। আউস ধান কাটার আগে ভাদ্রমাসে পুজো করতে হবে।[১৬] পরিশেষে, এই বৈশিষ্ট্যও লক্ষ রাখার মতো যে, সমগ্র জঙ্গলমহল বা ন'মহল জুড়েই এই আচারাদি আছে। তাই মানভূম থেকে ভাদুর প্রভাব ধলভূম-জামবনি-ঝাড়গ্রাম পৌঁছতে সময় লাগেনি। মানভূমে অবশ্য টুসু এবং ভাদুর রাজনৈতিক প্রভাব পড়েছিল প্রত্যক্ষ। শুধু আধুনিক জনসমাবেশের ধারা সৃষ্টিতে এই পর্ব ও আচারগুলি উপযুক্ত মানসিকতা সৃষ্টি করেনি, আধুনিক গণআন্দোলনেও টুসু ও ভাদু গান ব্যবহৃত হতে থাকে। বীরেশ্বরবাবু পুরুলিয়ার রাঘবপুর গ্রামের কবি ঘাসিরাম মাহাতর রচিত স্বদেশীযুগের ভাদুগানের উল্লেখ করছেন :

১

উড়ছে নিশান, বাজিছে বিষাণ,
বিদেশী রাজত্বের আর প্রয়োজন নাই,
হিন্দু-মুসলমান সকলে ভাই,
থাকবেনা রাজা, হবো সকলে প্রজা,
থাকবেনা দুখের লেশ,
(ও ভাই) আমরা গড়বো সব সমানে দেশ।

দেবেন মাহাতর স্মৃতিকথার উল্লেখ করে মানভূমে স্বাধীনতা সংগ্রামে মাহাত জাগরণের যে তথ্যাদি পশুপতি মাহাত হাজির করেছেন, তাতে এই জনপ্রিয় আচারগুলি যে কার্যকর ভূমিকা নেয় সন্দেহ নেই। স্বদেশীযুগে ভাদু গানের এই রাজনৈতিক সম্ভাবনা ভাদু গানের ভাষাতেই প্রকাশ করা যায় :

২

ভাদুর গান গাইতে দেয়না গো,
বাধা দেয় ভাদুর গানে

জয়ঢাক বাজিয়ে দিলে,
থানার যত পুলিশগণে ॥
স্বাধীনতার গান গাইছে বলে গো,
ডাকলে অহিভূষণে।
বলে তুমি ভাদুর গানে,
এ সব প্রচার করছো কেনে ॥
সিন্দুর দিলে সাজে ভালো গো,
ভাদুর দুটি চরণে।
বাংলা দেশে আর কতদিন,
থাকবো ভাদু পরাধীনে।

এই গানের অহিভূষণ ছিলেন বীরভূমের দাশকল গ্রামের অহিভূষণ মন্ডল। স্বদেশী-যুগে ভাদু উৎসবের লোকপ্রিয়তার রাজনৈতিক ব্যবহারের নজির বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়াতে পাওয়া গেছে। জঙ্গলমহলের সংস্কৃতির এক অসাধারণ নিদর্শন রয়ে গেছে এই ভাদু গানে। স্মৃতিরক্ষার অনুষ্ঠান, 'প্রজাবৎসল' ভূস্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা, স্বদেশী সমাবেশ—এই সমস্ত দিক থেকেই ভাদুর উল্লেখ করতে হয় জঙ্গলমহল আর বিশেষ করে এখানে জামবনির কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে। ভাদুর প্রসঙ্গে টুসুর কথা আগেই বলেছি। এই বছরের গোড়ায় পুরুলিয়ায় অশীতিপর বৃদ্ধা মোহিনী দেবী (মাহাত)-র সঙ্গে দেখা করেছিলাম। স্বদেশীযুগে টুসুর ব্যবহারের কথা তাঁর স্পষ্ট মনে আছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রখ্যাত নেত্রী লাবণ্যপ্রভা দেবী, যিনি এই ৯৩ বছর বয়সে এখনও সক্রিয়, তাঁর পুত্র এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী অরুণ ঘোষ আমায় পঞ্চাশের দশকে পুরুলিয়ায় বঙ্গসংস্কৃতি আন্দোলনে টুসু গানের এক সংকলন উপহার দিয়েছেন। ন'মহলের এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পঞ্চাশের দশকেও বেঁচে ছিল। লোকসেবক সঙ্ঘের পতনের সঙ্গে সঙ্গে এই ঐতিহ্য হয়ত শুকিয়ে গেছে। জানিনা, আজকের ঝাড়খণ্ড সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক আন্দোলনে জঙ্গলমহলের সেই ঐতিহ্য পুনর্জন্ম পেয়েছে কিনা!
যাইহোক, অরুণবাবুর সংকলন থেকে একটা-দুটো নিদর্শন দিচ্ছি।[১৭]

১

আমার মনের মাধুরী
সেই বাংলা ভাষা করবি কে চুরি।
আকাশ জুড়ে বিষ্টি নামে
মেঠো সুরের কোন চুয়া
বাংলা গানের ছড়া কেটে
আষাঢ় মাসের ধান রুয়া ॥
মনসা গীতি বাংলা গানে
শ্রাবণে জাত-মঙ্গলে

চাঁদ বেহুলার কাহিনী গাই
চোখের জলে গান বলে ॥
বাংলা গানে করলো সই
ভাদু পরব ভাদরে
গরবিনীর দোলা সাজাই
ফুলে পাতায় আদরে ॥
বাংলা গানে টুসু আমার
মকর দিন সাঁকরাতে
টুসু ভাসান পরব টাড়ে
টুসুর গানে মন মাতে ॥

মানভূমের বাঁশাবুরুর মধুসূদন মাহাত আরেকটা এমনই গান রচনা করেছিলেন।

২

ধুয়া : মন মানে না হিন্দিরে সইতে
ভাষা মোদের হরে নিল হিন্দিতে ॥
মাতৃভাষা হরে যদি
আর কি মোদের থাকে রে।
(তাই) মধু বলে মাতৃভাষার
ধ্বজা হবে বহিতে ॥

পুরুলিয়ার কাঁঠাডির শিক্ষা সত্র ইস্কুলের মাস্টারমশাই চন্দ্রমোহন মাহাতর সঙ্গে জঙ্গলমহলের সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা নিয়ে কথা বলেছি। শিক্ষা সত্র ইস্কুলের সামনে একটা বিশাল শাল গাছ আছে। বেদী বাঁধানো। আমাকে চন্দ্রমোহনবাবু জানিয়েছিলেন, ওই বেদীতে বসে আশুতোষ ভট্টাচার্য মানভূম, ধলভূম, বরাহভূম, সিংভূম ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন চন্দ্রমোহনবাবু ও উপস্থিত অন্যান্যদের। তারপর খেদে মন্তব্য করেছিলেন চন্দ্রমোহনবাবু, আশুবাবু তাঁর লোকসাহিত্য গবেষণান্তে এঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেননি। তার চেয়েও বড় কথা, আশুবাবু এটাই বোঝেননি, করম, ঝুমুর, ছো, ভাদু, টুসু, পাইক ইত্যাদি গান আর নাচ শুধু লোকায়ত শিল্প-সংস্কৃতির নজির নয়, এটা একটা পৃথক জাতিসত্তার পরিচিতির ইঙ্গিতবাহী। পশুপতি মাহাত হয়ত আরেকটু এগিয়ে বলবেন, এটা একটা স্বতন্ত্রসভ্যতা—মিলনধর্মে বিশিষ্ট, গভীরভাবে শস্যচক্রের নিয়তির সঙ্গে যুক্ত ঝাড়খণ্ড এলাকার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যবোধসূচক এক 'ইকুইমেনিকাল' সভ্যতা—পশুপতির ভাষায় 'সোশ্যাল সিভিলাইজেশন' সমাজধর্মী সভ্যতা। চন্দ্রমোহনবাবু উপলব্ধির মানুষ, চিন্তাশীল ও হৃদয়বত্তায় পূর্ণ তো বটেই। ওঁর মতে, ন'মহলের সংস্কৃতিতে ভূস্বামীদের প্রভাব আছে ঠিকই, কিন্তু এই সংস্কৃতির আসল দিকটা হল ভূস্বামী প্রবর্তিত শাস্ত্রীয়করণ বা সংস্কৃতায়ন থেকে স্বতন্ত্র, বরং বলা চলে শাস্ত্রীয়করণের

অমোঘ প্রবণতার বিরুদ্ধে জঙ্গলমহলের সাংস্কৃতিক আত্মরক্ষা, জমিদারি ও ঔপনিবেশিক দাপটের বিরুদ্ধে স্বীয় পরিচিতি বা স্বাজাত্যবোধের রক্ষাকবচ।

চন্দ্রমোহনের সঙ্গে মাঘের শীতের ভোরে আমরা চলেছিলাম দশ কিলোমিটার দূরে সিন্ধুবালার বাড়ির দিকে। ঝাড়খন্ড বুদ্ধিজীবী মঞ্চের কারো সম্মেলনে সিন্ধুবালাকে দেখি—তাঁর গান আর নাচ। সিন্ধুবালা নাচনি। ঝুমুরের নাচনি সংস্করণেও শাস্ত্রীয়-করণ এসেছে। নাচনির ওস্তাদ লাগে, গুরু বা রসিক। সিন্ধুবালা বোকারো এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, জামবনির চিলকিগড় রাজবাড়িতে যৌবনে গেছেন, নেচেছেন। সে যুগের আলোচনাপ্রসঙ্গে জামবনির ঝুমুর গানের চলের উল্লেখ হওয়ায় ভেবেছিলাম দেখি, যদি জামবনি-ঝাড়গ্রামের তদানীন্তন ঝুমুর সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছু জানা যায় সিন্ধুবালার কাছে। যাইহোক, সে কথায় পরে আসব।

সিন্ধুবালার গ্রাম থেকে ফেরার পথে একটা ছোট গ্রামের চায়ের দোকানের সামনে খাটে বসে চন্দ্রমোহনবাবু বলছিলেন যাওয়ার সময় কথাবার্তার রেশ ধরে, ঝাড়খণ্ডের রাজনীতি নানা সময়ের বাঁকে নানা দিকে মোড় নিয়েছে। আর এখন তো সঙ্কুল অবস্থা। মাঘের শীতেও মানভূম গরম। আজ ঝাড়খণ্ডদের 'অত্যাচারের' বিরুদ্ধে বামফ্রন্টের 'বন্ধ' কাল সি পি এমের 'জুলুমবাজির' বিরুদ্ধে ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার হরতাল। সুদূর প্রত্যন্ত সাঁওতাল বা মাহাত গ্রামের দেওয়ালে ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার আর বামফ্রন্টের স্লোগান, ঘন ঘন টাঙি হাতে লোকেদের যাওয়া আসা। কিন্তু রাজনীতি আর রাষ্ট্রিক গোলযোগের তলায় বা তাকে উপেক্ষা করে ন'মহল, দশ মহলের সংস্কৃতি প্রহমান। এতে বিচ্ছেদ ঘটেনি। প্রবহমানতা অক্ষুণ্ণ থেকে গেছে। বাপেরবাড়ি যাওয়ার সময় করম গাইছে মেয়েরা, পৌষ সংক্রান্তিতে টুসু নামছে। 'জাগরণ' হচ্ছে। ভাদ্রমাসে চাষবাসের পর দাঁড় নাচছে ছেলেরা, মেয়েদের করমের পাশাপাশি। ভিডিও গ্রামে এসেছে ঠিকই, শাস্ত্রীয়-করণও হচ্ছে। সরহেকেলা, ময়ূরভঞ্জে তো রাজপৃষ্ঠপোষকতায় ছো-এর বিরাট সংস্কৃতায়ন ঘটে গেছে। কিন্তু মূল সাংস্কৃতিক ধারাটি অক্ষুণ্ণ।

চন্দ্রমোহনবাবুর রসোপলব্ধিতে ভাল লেগেছিল, কিন্তু আশ্বস্ত হতে পারেনি। তার কারণ, মুঘল যুগের শেষদিকে, জঙ্গলমহলের গোড়াপত্তনের কালে, পরবর্তী দীর্ঘ ঔপনিবেশিক সময়ে, ভূমিজ রাজাদের ক্ষত্রিয়করণ্য ভবনের প্রভাবে এই সংস্কৃতি মানবীয় রূপ গ্রহণ করেছিল, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আজকের এই খরা বন্যার রাজনীতিতে, বাংলার বাঙালিভবনের দাপটের, বামফ্রন্টের সার্বিক আধিপত্যের তলায় ব্যাংক-ত্রাণ-আই আর ডি পি-উপজাতি উন্নয়ন প্রকল্প-সাক্ষরতা অভিযান-ঠিকেদার-আমলা-পার্টিবাবুদের যুগে সেই সাংস্কৃতিক ধারা কীভাবে অক্ষুণ্ণ থাকা সম্ভব ? জাতীয় সংস্কৃতি বলতে আজ আমরা যা বুঝি যেমন খাদি, স্বদেশী কাপড়, নারীমর্যাদা, দলিতউন্নয়ন, শিক্ষার মূল্য, নিজস্ব ভাষা ইত্যাদি ইত্যাদি—অর্থাৎ এক আধিপত্যমূলক মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি যা 'জাতীয়' সংস্কৃতিরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে তা বাস্তবায়িত হয়েছিল জাতীয়তাবাদের মধ্য দিয়ে, জাতীয় আন্দোলনের মূর্তরূপের মাঝে। ঠিক তেমনই জঙ্গলমহল/ঝাড়-

খণ্ডের জাতিসত্তার আদর্শ আর আন্দোলনের মাঝেই এই লোকায়ত সংস্কৃতি পুনর্জীবন পাবে। অন্য নিয়তিটি হল আশু ভট্টাচার্যের 'ওলড কিউরিওসিটি শপ'-এ এই আচারগুলির স্থান গ্রহণ।

সিন্ধুবালার কথায় ফিরে আসি। চন্দ্রমোহনবাবু পুরুলিয়া থেকে প্রকাশিত করমতীর্থ নামে একটি সাময়িক পত্রের 'সহায় বাঁধনা' উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যাটি (১৯৯০) হাতে দিয়েছিলেন। সিন্ধুবালার দেখা পাইনি সেবার। কোনও এক বিয়ে উপলক্ষে সিন্ধুবালা ওস্তাদ গৌর কুইরিকে নিয়ে দূরে চলে গিয়েছিলেন। যাইহোক গৌর কুইরির বাড়ির অত্যুৎসাহী ছেলেরা সিন্ধুবালার পাওয়া নানা মানপত্র, নানা কাগজে প্রকাশিত তার সম্পর্কের খবর দেখায়। কাগজের কথা বাদ দিলাম। দারিদ্র, একসময়ে যৌবনের সম্ভোগ-নাচ-গান, মূল রসিক প্রয়াত মহেশ্বর, ডাকনামে চেপা মাহাত আর সিন্ধুবালার প্রণয়োপাখ্যান, সঙ্গীতনৃত্য কেন্দ্রিক সম্পর্ক, কাশীপুর রাজবাড়িতে নাচ—এই সব মিলিয়ে একটা স্টিরিওটাইপ আছে যা কাগজে থাকবেই। শুনেছি, এক প্রখ্যাত সাপ্তাহিকে নাকি টানা গল্পও লেখা হয়েছে—উপন্যাসসম। কিন্তু মানপত্র দেখে অবাক না হয়ে পারিনি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকসংস্কৃতি উৎসবে অংশগ্রহণের জন্য মাননীয় তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের দেওয়া মানপত্র যাতে সম্মান জানানো হয়েছে কিন্তু জ্ঞান দিতেও ভোলা হয়নি যে এই বৃদ্ধা আজীবন যেন লোকসংস্কৃতির সেবা করে যান! লোকসংস্কৃতির স্রষ্টা লোকজীবন। লোকসংস্কৃতি সৃষ্টি করছেন তো এঁরাই! আর 'সেবা' যদি কারুর করার থাকে, তা আমাদের সর্বোপরি মহামান্য সরকারবাহাদুরের!

যাইহোক, **করমতীর্থের** ওই সংখ্যায় সিন্ধুবালা আর ঝুমুরের বিষয়ে এক দরদী লেখা রয়েছে। লেখাটির নাম, 'মহেশ্বর ওরফে চেপা মাহাত রসিকনাগরের মধুমক্ষিরানি ঝুমুর নৃত্যকলা শিল্পী সিন্ধুবালা দেবী এবং তাঁর পথিকৃত্য কলা সংস্কৃতি ধারার গতি প্রজন্মর—পর্য্যালোচনা।' লেখক বি. সি. কৈড়য়ার। সিন্ধুবালার কথা বলছি এই জন্য যে জামবনিতেও আমি সে যুগের ঝুমুর আর ঝুমুর গায়ক-গায়িকাদের খোঁজ করে চলেছি, সামান্য আলোও দেখা দিয়েছে, সে সন্ধানে। সে কথায় পরে আসব। সিন্ধুবালার জন্ম ১৯১২-তে এ বান্দোয়ান থানার মেঘলা গ্রামে। মনসামঙ্গলের নাচনি বেহুলা সুন্দরীর কথা মনে আছে? সেই বেহুলার কায়দায় সিন্ধুবালা গ্রামে নাচতে থাকেন। বেহালাবাদক গৌর কুইরি, তবলচি দুখভঞ্জন মহান্তি, বংশীবাদক গুহিরাম মোদক, হারমোনিয়াম বাদক গোলকবিহারী রায় আর সুপ্রসিদ্ধ মাদলবাদক রসিক মহেশ্বর মাহাত-এঁদের কাছে সিন্ধুবালার শিক্ষা হয়। দরবারি, ভাদরিয়া, একঢালিয়া কীর্তনিয়া, খেমটা, দাঁড়, পাতা, ঝুমুট ইত্যাদিতে পারদর্শী সিন্ধুবালা ঘুরে বেড়িয়েছিলেন সমগ্র জঙ্গলমহল।[১৮] হাজারিবাগ, ধলভূমগড়, ঝাড়গ্রাম, বারিপদা, জামবনি—ইত্যাদি স্থানে তিনি গিয়ে এবং এই সব পরগনায় আরও অনেক মহিলারাই সেযুগে সিন্ধুবালার মতো নাচতেন, গাইতেন—যাঁদের নাম আজ হারিয়ে গেছে। বাঙালি মেয়ের অন্দরমহল ছেড়ে বাইরে বেরুনো চাকরি-বাকরি শিক্ষা-শিক্ষকতা আর

নানা পারফর্মিং আর্টস ধরে—জাতীয়তাবাদের এই অভিব্যক্তি একেবারেই মধ্যশ্রেণী-কেন্দ্রিক। তার কারণ, গ্রামেগঞ্জে বাংলা, শাস্ত্রীয়, সংস্কৃত বাংলার বাইরে সীমান্ত অঞ্চলে মেয়েদের প্রকাশ্য ও গণসাংস্কৃতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ আগেই ছিল। হয়ত, এখন কমে আসছে। এবং যে সমাজে নারীর অন্তর্জগতের ব্যথা-বেদনা, আনন্দ ও অন্যান্য অনুভূতি আধুনিক বুর্জোয়া অর্থে কখনওই 'প্রাইভেট' হয়ে থাকেনি, সমবেত আচারে সর্বদাই প্রকাশিত হয়েছে, নারী বেঁচেছে সম্প্রদায় বা সমাজের সবাইকে নিয়ে, সেখানে ঘরে / বাইরে, গোপন / প্রকাশ্য, অভ্যন্তরীণ / বহির্জাগতিক—এই ধরনে মৌলবাদী দ্বৈততা বা 'এসেনসিয়ালিজম্' অচল, পাবলিক / প্রাইভেটের চালু কিসসাকে সেখানে ত্যাগ করতে হবে। সুজাতা মাহাত 'করম গীতে ঝাড়খণ্ডী বধূর জীবনচিত্র' নামে একটি লেখায় দেখিয়েছেন, ঝাড়খণ্ডের নারীর জীবনের প্রতিটি পর্যায়ের অনুভূতি প্রকাশ্য আচারে বিধৃত।[১৯] একটা-দুটো নজির দিতে পারি :

১

কা কা করলে কাওয়া
বসলে তমাল ডালে রে
সত্যি করে কহরে কাওয়া
মাই কেমন আহো রে

২

পাণি লায়ে গেরহেঁ ঘেইলা ভাঙি গেইলগো
ওগো শ্বাশে ননদে পাড়ই গ্যাইল গো।

৩

ঝাঁটাই পেঁটাই ফেলব দুই হাতেক শাঁখা রে,
লাথি মারি খেদব রায়বাঘিনী দুই সইতিনী রে।

করম, ঝুমুর—এ শুধু গান নয়, একটা সভ্যতার বা সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ।

৫

তবু প্রশ্ন থেকে যায়, যে সংস্কৃতি সে যুগে এত সাঙ্গীতিক ছিল, যে সংস্কৃতি বহির্জগত অন্তর্জগতকে এত মেলাতে পেরেছিল, কৃষিউৎপাদনের সঙ্গে যার এত অচ্ছেদ্য বন্ধন, সেই সংস্কৃতির ধারায় কেন ভাঙন এল? জামবনিতে সিন্ধুবালাকে খুঁজতে কেন এত বেগ পেতে হয়? লোকসংস্কৃতির ইতিহাস খোঁজা জামবনিতে কেন এত দুরূহ মনে হয়েছে? লোকসংস্কৃতির ইতিহাস হয় না, তার নৃতত্ত্ব / জাতিতত্ত্বমূলক কাহিনী হয়—এই কি উত্তর? না কি ফ্রেজারের উত্তর, ম্যাজিকের দিন শেষ, ধর্মেরও দিন প্রায় গত, এখন দিন র‍্যাশনালিটির? না কি বলব, ভূস্বামীদের প্রবর্তিত শাস্ত্রীয়করণ এর মূলে? এর আরও এক কারণ হতে পারে। হয়ত স্মৃতিবিলোপ ঘটেছে, 'সাংস্কৃতিক নীরবতা' বা 'কালচারাল সাইলেনস'?

আমার নিজের কিছু অভিজ্ঞতা আগে বলি।

জামবনিতে জমিদারবাড়ির লোকজনকে, বিশেষত সবচেয়ে শিল্পপ্রবণ মন নির্মলেশ-বাবুকে যতবার প্রশ্ন করেছি, 'ছো', 'টুসু', 'ইঁদপুজো'—এ সবের বাইরে লোকায়ত সঙ্গীত নৃত্যের আর কি ছিল, সঠিক বা নিশ্চিত হদিস পাইনি। সাঁওতালদের সমবেত নৃত্যের কথা বাদ দিলাম, কিন্তু অন্য কোন ধরনের প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে মেয়েরা অংশ নিতেন? তার উত্তরও পেয়েছি অনিশ্চিত। শিল্পের শাস্ত্রীয়করণ সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা কেউ দিতে পারেননি। জমিদারবাড়ির অন্তঃপুরের মেয়েদের জবানিতে সে যুগের যে স্মৃতি, সে হল অন্দরমহলে আবদ্ধ এক অনুভূতিপ্রবণ নারীর স্মৃতিচারণ, যে স্মৃতিপটে অন্দরমহলটাই 'বাহির' হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ তো দেবী দাসীদের কথা, মেঝানদের কথা নয়।

কিন্তু হাল ছাড়িনি আমি। মানভূমের সংস্কৃতি নিয়ে অন্যান্যদের গবেষণা এবং আমার স্বীয় অভিজ্ঞতা আমার মনকে বলছিল, জঙ্গলমহলের একাংশের প্রভাব কি অন্যত্র থাকবে না? বঙ্কিম মাহাত যাকে বলছেন 'লোকভাবনা', 'ঝাড়খণ্ডের লোকভাবনা'—তার চিহ্ন ধরে এগোলে কি লোকসংস্কৃতির ইতিহাস পাওয়া যাবে না, যা শুদ্ধ নিছক ফোকলোরের এথনোগ্রাফি হবে না? এই অনুসন্ধান এখনও পূর্ণ হয়নি। তাই খাপছাড়া কয়েকটা নজির দেব।

করম, টুসু, ভাদু—এগুলো আনুষ্ঠানিক গীত। বিশেষ সময়ের, উপলক্ষের, পর্বের এবং আচারের। মেয়েদের অংশগ্রহণ এখানে বিশেষ উপলক্ষের অনুমোদন বা লেজিটিম্যাসি পেয়েছিল। জামবনির উচ্চবর্গীয়রা এগুলো মেনেও নিতেন। কিন্তু ঝুমুর হল সবসময়ের যে কোনও সমবেত আনন্দের। এগুলোয় মহিলাদের অংশগ্রহণকে উচ্চবর্গীয় সংস্কৃতি অনুমোদন করেননি। তাই জামবনি কেন, ময়ূরভঞ্জ, ঝাড়গ্রাম, ধলভূম, মানভূম ও ছোটনাগপুরের অন্যান্য অঞ্চলের ঝুমুর গায়িকারা ইতিহাসে হারিয়ে গেছে। ঝাড়খণ্ডের জাতীয় ইতিহাস লেখার রাজনৈতিক তাগিদ না বাড়া পর্যন্ত বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া এই সব শিল্পীদের নাম পুনরুদ্ধার হবে বলে মনে হয় না।

খোঁজ করতে করতে জেনেছি, ঝাড়গ্রাম-জামবনিতে কুসমি নামে এক ঝুমুর গায়িকা ছিলেন। নিবাস, টেঙা গ্রাম। করমঠাকুরের পরবে কার্তিক মাসে কুসমি বেরোতেন নাচ গানে। ইঁদের সময় রাজবাড়িতে নাচনিরা আসত, খেমটি নাচ হত, এ কথা প্রথম জানতে পারিনি। শাস্ত্রীয়করণের গৌরবময় ঐতিহ্যের তলায় এ সব কথা চাপা ছিল। যাইহোক, পরে এক মজলিশি আসরে জানলাম কুসমির কথা। কুসমি রাজবাড়িতেও এসেছিল। নিমাই রায়, পূর্ণ খামরাই, দেবেন বাউরি—এরা সব বেরুত বাদ্যযন্ত্র নিয়ে পানুবাবুর সঙ্গে। পানু নারায়ণ দেও রাজকর্মচারী। কিন্তু রসিক লোক। দেবেনও গাইত। দেবেন পালকির বেহারা, হৃষিকেশ, প্রাণকেশ, মুক্তকেশ—তিন ভাই-ই ঝুমুরের ওস্তাদ। প্রাণকেশ বা পানুবাবুর আরেক দোসর বাবুলাল হাড়ি। সেও

রসিক। ঋষিবাবু বা হৃষিকেশ, প্রাণকেশ—এঁরা চিলকিগড়ের। পানুবাবুর ভাইপো কিরীটি আজও বেঁচে। বৃদ্ধ। ঝুমুর, পাতা, কীর্তন—এইসব গানে জামবনি মেতে উঠত। কুসুমি থাকত পানুবাবুর সঙ্গে। লক্ষণীয়, যে ঝুমুর ছিল সমবেত আনন্দের আচার, ঔপনিবেশিক কালে সামন্ততান্ত্রিক প্রভাবে, তার নাচনিরূপ এল। পেশাদারি গায়িকার চল হল। রাজার নিয়ন্ত্রণে বা অন্য ভূস্বামীদের পেট্রনেজের প্রভাবে ঝুমুরের পরিবর্তন এল—ফল ভাল হল কিনা বলা সন্দেহ। একদিকে যেমন, এই ঝুমুর গায়িকারা এক নতুন ধরনের পাবলিক কালচারের প্রতীক, তেমনই জঙ্গলমহলে নারীর প্রতি যে বৈষম্য হতো, তারও এক ইঙ্গিত। নাচনির সন্তান সম্পত্তির অধিকার পেত না, রসিকের সঙ্গে থাকলেও, তার সহধর্মিনীর মর্যাদা পেত না, রসিকের স্ত্রীর সঙ্গে থাকতে হত। কিন্তু এটা ঠিকই, সঙ্গীতনৃত্যকলা শিল্পীর মর্যাদা তাঁরা এই বৈষম্য সত্ত্বেও জঙ্গলমহলের সমাজে পেয়েছেন। সম্পত্তিচ্যুত, বাপ মা হারা, দারিদ্রগ্রস্ত মেয়েরা নাচনির জীবন বেছে নিয়েছে। আবার অনেকে স্বেচ্ছায় শিল্পীর জীবন, বিনোদিনীর জীবন গ্রহণ করেছে।

জামবনিতে পেশাদার মহিলা শিল্পী আজ নেই বললেই চলে। মানভূমে এখনও আছে, যদিও দ্রুত কমে যাচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে জামবনি তথা সমগ্র জঙ্গলমহলের সংস্কৃতির একটা পুরনো দিক।

আমি আগেই বলেছি, এটা হল দাসীদের দিক। দেবীদের স্মৃতিতে এটা নেই, তাই স্মৃতিচারণেও এই উপকথা অনুপস্থিত। ঊষাপ্রভা দেবী জগদীশ চন্দ্র দেও ধবলদেবের কন্যা। তাঁর এবং তাঁর বোনের স্মৃতিতে রয়েছে ইঁদপুজোর আচার। ইঁদ করমের পুজো—লোকায়ত সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ হল 'গার্ডেনস অব আদোনিস' এবং তারই এক সংস্করণ। বৃক্ষপুজোর এক নজির। সকালবেলা খেতে সারের গর্তে শালের ডাল পোঁতা হতো। চিত্র-বিচিত্র আলপনায় ভরে যেত জমিদারবাড়ির অন্দরমহল। দেওয়ালের গায়ে সিঁদুরও লেপা হতো। বিভিন্ন শস্যের চারা নেওয়া হতো ডালিতে। মাঝিবউ, মাহাতবউরা তখন ঢুকত মেয়েমহলে। যে ডাল পোঁতা হতো, তাকে বলা হতো 'ইঁদ ডাঙ' বা 'ইঁদ খুটা'। গান গেয়ে মেয়েরা যেত প্রাঙ্গণে বা মাঠে যেখানে ডাল পোঁতা হবে।

ঊষাপ্রভার উল্লেখ করলাম এই জন্য নয় যে ইঁদপুজো উচ্চবর্গীয়দের। এই পুজো সেই অঞ্চলের সর্বসাধারণের। কিন্তু শাস্ত্রীয়করণের দিকটি ও অন্য কিছু দিকের প্রতি নজর ঘোরাতে চাই।

ঊষাপ্রভা ও তাঁর আত্মীয় পরিজনের স্মৃতিচারণের কাঠামোয় বোঝা যায়, ভূস্বামী / কৃষক ব্যবধানকে ছাপিয়ে নারীমনের এক জগত ছিল, যেখানে ঊষাপ্রভাদের স্মৃতি থমকে আছে। রানিমার বনভোজন, মেয়েদের মেলামেশা, দুর্গত কৃষকের হয়ে কৃষকরমণী এসে জমিদারবাড়ির বউদের বিশেষত রানিমার হস্তক্ষেপ চাইছে 'রাজার' কাছে খাজনা মকুবের আবেদন পেশ করার জন্য—তার স্মৃতি, ইঁদপুজোর আচার, বারো মাসে বারো

পার্বণ শস্যচক্রকে ঘিরে, গৃহকর্তা জমিদারের স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তন আর পর্দার আড়াল থেকে রাজবাড়ির বিশাল মাঠে গাজনের উৎসব দেখা—এ প্রায় এক অন্য জগত, যেখানে জঙ্গলমহল থেকেও নেই, আঞ্চলিক সংস্কৃতি থেকেও নেই, শাস্ত্রীয়করণ পুরুষতন্ত্র, স্ত্রীআচার, লোকায়ত মানস—সব মিলে মিশে আছে।

আমি প্রশ্ন করেছিলাম, 'ইঁদ' কথাটির অর্থ কি? সহজ প্রত্যয়ী উত্তর পেয়েছিলাম, কেন, ইঁদ হল ইন্দ্র, ইঁদপুজো মানে ইন্দ্রপূজা। তাহলে ইঁদপুজোয় শস্যাচার কেন? সদুত্তর পাইনি। বঙ্কিম মাহাতর মতে, 'ইঁদে'র অর্থ 'ইন্দ্র' করা সংস্কৃতায়নের একটি দৃষ্টান্ত। বঙ্কিমবাবুর ভাষায় 'আদিবাসীদের পৌরহিত্য করতে গেলে সমাজে ব্রাত্য হতে হবে, তাই আদিবাসী রাজাদের ক্ষত্রিয়ত্ব না দিয়ে ব্রাহ্মণদের উপায় ছিল না; ঠিক একইভাব পরবর্তীকালে কোনও কোনও আদিবাসী গোষ্ঠীকে ভুজুং ভাজুং দিয়ে হিন্দু গোষ্ঠীতে নিয়ে এসেছিলেন এবং কোনও কোনও গোষ্ঠীকে ক্ষত্রিয়ত্বের আন্দোলনে উৎসাহও দিয়েছিলেন। এই সব গোষ্ঠীর মধ্যে কুরমি মাহাত এবং ভূমিজ সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঠিক এইভাবে ঝাড়খণ্ডের অরণ্যমণ্ডলের একটি জনপ্রিয় উৎসবে পৌরহিত্য করতে হলে ধর্মনির দিক দিয়ে কাছাকাছি ইন্দ্রদেবকে টেনে আনা একান্ত প্রয়োজন ছিল।'[২০] বঙ্কিম মাহাত দেখিয়েছেন যে ইঁদপুজো হল বৃক্ষপুজো এক শ্রেণীর গাছের নামবহ। গ্রামের নাম হতে পারে ইঁদবনি, ইঁদভাঙা, ইঁদরাবনি ইত্যাদি। এবং 'বনি' শব্দের পূর্বপদ হিসাবে থাকে কোনও গাছ বা ফলের নাম। তাতে গ্রাম বা অঞ্চলের নাম হয় জামবনি, তুলসিবনি, পলাশবনি, আসনবনি ইত্যাদি। বৃষ্টিকামনা, ফসলকামনা, যৌনমিলনকামনা—এরসঙ্গে ইন্দ্রের সম্পর্ক কোথায়?

সংস্কৃতায়নের মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক নীরবতা মেনে আসার আরেক অভিজ্ঞতা শুনুন। গিধনি রেলস্টেশনের কাছে সে যুগে বীরেন শাসমলমশাই এসে সাঁওতালদের 'ভদ্র' 'হিন্দু' হবার শিক্ষা দিয়েছিলেন। পুরুলিয়ায় এ জিনিস ঘটেছিল আরও লক্ষণীয়ভাবে। মুক্তির সম্পাদক অরুণ ঘোষ, যাঁর কথা আগে উল্লেখ করেছি, আমায় নিবারণচন্দ্রের একটা জীবনীও উপহার দেন। মানভূমে স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারের কালে পুরুলিয়ারই আরেক স্বাধীনতা সংগ্রামী বিভূতি দাশগুপ্তের প্রকাশিত **নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্তের জীবনকথা**। রচনাকাল ১৯৩৯। জঙ্গলমহলের জনসমাজের মধ্যে সংস্কৃতায়ন ঘটানো হতো কীভাবে তার বিবরণ পাওয়া যাবে নিবারণচন্দ্রের জীবনীতে।[২১] আমি বীরেন শাসমলের কথা বা নিবারণচন্দ্রের কথা জানতাম। তাই জামবনিতে যে অভিজ্ঞতা হল, তাতো আশ্চর্য হইনি।

আগে নিবারণচন্দ্রের কথা বলি। তবে বুঝতে সুবিধে হবে। ১৮৭৬-এ ঢাকা জেলায় জন্ম নিবারণচন্দ্রের। কর্মসূত্রে আসেন পুরুলিয়ায়। স্বদেশী আন্দোলন, সত্যাগ্রহ, জাতীয় শিক্ষা, স্বদেশী শিল্পাশ্রম, সনাতন ধর্ম, 'সাধারণের মধ্যে নীতি বিস্তার', 'ধর্ম বিষয়ক বক্তৃতা দান,' 'চরিত্র গঠন'—এইসবের মধ্যে দিয়ে মহাত্মা নিবারণের জীবন

কেটেছিল।

তাঁর অন্যতম জীবনীকার দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তিনি 'লোক শিক্ষা ও লোকসেবার ক্ষেত্রে লোকাচার দেশাচার মানিতেন না।' 'তিনি ছিলেন আচারপূত নৈষ্ঠিক হিন্দু। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ব্যতীত কাহারও রান্না খাইতেন না। ত্রিসন্ধ্যা করিতেন। গীতা ও উপনিষদের কথা প্রায় বলিতেন। কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রকে সম্যক মান্য এবং যথাসম্ভব অনুসরণ করিতেন। হিন্দু শাস্ত্রের সর্বত্র সামঞ্জস্য দেখিতে পাইতেন।' 'রাঁচিতে তানাভগতদের মধ্যে তাঁহার অসীম প্রতিপত্তি ছিল ও খেড়িয়া, হরিজন কর্ম্মীগণ তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিল।' 'কর্ম্মজীবনে···নিজের আর্য্য আচার ষোল আনা বজায় রাখিয়া চলিয়াছেন। এ জন্য প্রায়ই নিজেকে রাঁধিয়া খাইতে হইত।' এটা সেইসময়, যখন মাহাত এবং ভূমিজদের মধ্যে হিন্দুয়ানির প্রবণতা প্রবল হয়ে ওঠে। তানাভগত আন্দোলনে একটা 'হিন্দুয়ানি' বোধ তো ছিলই।[২২] মালদায় জিতু সাঁওতালের নেতৃত্বাধীন সাঁওতাল সমাজেও এই বোধ জেগে ওঠে। তনিকা সরকার জিতুর বিষয়ে লিখলেও সংস্কৃতায়নের এই প্রবণতার কোনও বিশ্লেষণ করেননি।[২৩] স্বরাজ্য দলের নেতারা তো বটেই, সব ধরনের জাতীয়তাবাদী নেতারাই বর্ণ এবং উপজাতি দলিতদের এই সময়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে টেনে আনার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন—আর এই কর্মসূচিরই একটি অঙ্গ ছিল তাদের 'হিন্দু', 'সনাতনী', 'ভদ্র,' 'মার্জিত', শিক্ষিত করা। মাহাতদের শেখানো হয় কুরমি ক্ষত্রিয় মহাসভায় যোগ দিতে। সাঁওতাল-মাহাত ঐক্য ১৯৩১-এর জনগণনার পর ভেঙে যায়। তানাভগত আন্দোলনে হিন্দুয়ানি তো ছিলই, তার সঙ্গে যুক্ত হয় সাঁওতালদের মধ্যেও 'ভদ্র' হয়ে ওঠার চেষ্টা। চেমাইজুড়ি ঘোষণার কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। মেয়েদের ব্লাউজ পরতে হবে, মদ খাওয়া চলবে না, পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা চলবে না, তুলসিতলায় সন্ধ্যাবেলা যেতে হবে, ছোট করে শাড়ি পরা যাবে না—এই রকম নানা নিয়ন্ত্রণ চাপানো হয় মেয়েদের ওপর।

সংস্কৃতায়নের এই রাজনীতি লক্ষ করার মতো। ভাষার দিক দিয়ে জঙ্গলমহলের জনসাধারণের উপর শাস্ত্রীয় ভাষার প্রাধান্য চাপিয়ে দেওয়া হয়—ওড়িয়া, বাংলা, হিন্দি। শাস্ত্রীয় আচারের প্রবর্তন হয়। জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রসার ঘটে। সাম্প্রদায়িক পরিচিতিমূলক সংগঠন বাড়তে থাকে। জঙ্গলমহলের সংস্কৃতির উপর কয়েক দশকের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয় এক জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতি বা শাস্ত্রীয় কৃষ্টি। সমাজে নারীর ভূমিকা সঙ্কুচিত হতে থাকে। সাংস্কৃতিক নীরবতা নেমে আসে মধ্যশ্রেণীর জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শের প্রেক্ষাপটে।

তাই জামবনিতে আচারের ইতিহাস খুঁজতে বেগ পেতে হয়েছিল। বৈশাখের এক খর দুপুরে গিয়েছিলাম চিলকিগড় থেকে দশ কিলোমিটার দূরে কানিমৌলি গ্রামে। কানিমৌলি হল কানামহুল গ্রাম। এই গ্রামের সীমানা নিয়ে এই শতাব্দীর গোড়ায় জরিপ-বন্দোবস্তের সময় অনেক বিবাদের উদ্রেক হয়েছিল। কানুনগো মৌলভি

এক্রামুদ্দিনের বয়ানে তা ধরা আছে। কানিমৌলিতে থাকতেন সে যুগের এক অবাধ্য প্রজা যাদু মাহাত। নাম ছিল নাকি আসলে যদু। দাপট, সাহস, প্রতিপত্তির জন্য লোকে ডাকত যাদু। যাদু মাহাতর স্মৃতির সন্ধানে গিয়ে বিগত যুগের এক বিদ্রোহী প্রজা, এবং একজন সম্ভ্রান্ত প্রজার হদিশ তো পেলামই, আরও পেলাম সংস্কৃতায়নের এক ছবি। জরিপ-বন্দোবস্তের আর এক্রামুদ্দিনের রিপোর্টের কথা জানতাম, সে নিয়ে অন্য সময় লিখব। যাদু মাহাতর কথা জেনেছিলাম জরিপ বন্দোবস্ত সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলা সালিশির কাগজপত্রের ভেতর থেকে। বিস্মৃতির তলে ডুবে যাওয়া এক বিদ্রোহী চরিত্র —একশ বছর আগের, যার পারিবারিক ইতিহাস মাহাতদের মধ্যে সংস্কৃতায়নেরও ইতিহাস।

কানিমৌলি গ্রাম শালজঙ্গলের আস্তরণে ঢাকা। সম্পন্ন গ্রাম। মাহাতরা চল্লিশ ঘর, সম্পন্ন চাষি কেউ কেউ। সাঁওতালপাড়াও আছে। গ্রামের বাইরে এক বড় বিল আর পাশে বালি আর ঘাসের শক্ত মাঠ। শক্তিশালী চাষিদের বাড়ির উঁচু মাটির দেওয়াল, বড় বড়, অর্ধেক মাটির অর্ধেক পাকা বাড়ি। বড় গরুর গাড়ির চাকা, লাঙল—দেখলে বোঝা যায়, এ হল তাদের গ্রাম, যাদের বলা চলে 'মেন অব সাবসটানস'। লাঠি, টাঙি, তীরের জোরে জমি রেখেছে একসময়। প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল যাদু মাহাতর গোটা এলাকার ওপর।

এই কানিমৌলিতে যাদুরা আসে একশ বছরেরও আগে কুমরি গ্রাম থেকে। ওটাও জামবনি পরগনারই। কুমরি থেকে কানিমৌলিতে এসে বসত করে জমিজমা সামলাতে। যাদু ছিলেন 'পাইওনিয়ার ফার্মার'। জঙ্গল কেটে চাষাবাদ করানোর জন্য ধলভূম থেকে মজুর আনিয়েছিলেন। সেই এলাকার স্বত্ব নিয়ে বিবাদ শুরু হয় জামবনির জমিদার রাজা জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে। ধবলদেব জমিদারবাড়ির সম্পত্তি সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ বিবাদে জমিদারির দাবিদার ছিলেন রানি পার্বতীকুমারী। পার্বতীকুমারীকে সমর্থন করেন যাদু। যাদু হন পার্বতীকুমারীর নায়েব। প্রজারা যাদুর ডাকে ঋণ দিতে অস্বীকার করে জগদীশচন্দ্রকে। জগদীশচন্দ্রের মূল সমর্থক উড়িষ্যাগত ব্রাহ্মণেরা—শতপথী, কর, হোতারা। বিশ্বনাথ শতপথী ছিলেন জগদীশচন্দ্রের নায়েব। পার্বতীকুমারী মামলায় হেরে যান, নিঃস্ব হয়ে বিধবা পার্বতীকে বিস্মৃতিতে তলিয়ে যেতে হয়। দেওয়ান বিশ্বনাথের সঙ্গে যাদুর লড়াই সে যুগের জঙ্গল জমি সংক্রান্ত একাধিক মামলায় বিবৃত, যার কথা অন্যত্র বলেছি। যাইহোক যাদু হয়ে ওঠেন বিদ্রোহী, বাগী। যাদুরা তিন ভাই—রূপচাঁদ, যাদু, বাহাদুর। নিরঞ্জন মাহাত রূপচাঁদের পৌত্র, মথুরামোহনের ছেলে। আমরা কথা বলেছিলাম নিরঞ্জনের সঙ্গে। বয়স তার তখন সত্তরের ঘরে। নিরঞ্জন শৈশবে যাদুকে দেখেছিলেন। যাদু কানিমৌলিতে 'লেজেন্ড' হয়ে গেছেন। নিরঞ্জনের দেওয়া স্মারণিক ইতিহাস আমাদের জন্য ভাষণিক ইতিহাসের চেয়ে কম অর্থবহ হয়নি। নিরঞ্জন বললেন, সে যুগে প্রবাদ চালু ছিল, 'বাঁশবনের যদু, শিলদার মধু'। যাদুর সঙ্গে বারবার জেলে যেতে হয়েছিল ছেলে হরিশচন্দ্র, ধরণীধর

আর শ্রীনিবাসকে। ধরণীধরের ছেলে ধীরেন্দ্রনাথও জড়িয়ে পড়েন কৃষক প্রজা রাজনীতিতে। যাদু মারা যান ১৯২৮-এ বৃদ্ধ বয়সে। তার আগে দাপিয়ে প্রজা রাজনীতি করেছেন। শুনেছি, জমিদারবাড়ির কাছারিতে পিছমোড়া করে বেঁধে তাঁকে মারা হয়েছিল একবার। জল চাইলে পেয়েছিল জলতর জিনিস। যাদু মামলায় সর্বস্বান্ত হন। তবে সে সময় ঋণসালিশি বোর্ডের সদস্য হন, ইউনিয়ন বোর্ড ইলেকশনে জেতেন। সুভাষ বসু কংগ্রেসের হয়ে ঝাড়গ্রামে জনসভা করেন ১৯২৮-এ। মাহাতরা তখন দল বেঁধে নেমে পড়েছে কংগ্রেসের ডাকে স্বদেশী রাজনীতিতে। ঝাড়গ্রামে মাহাতরা গেছিল দল বেঁধে মিটিং শুনতে। শতপথীরা আপত্তি জানায়। পথে এবং ঝাড়গ্রাম শহরে তৃষ্ণার্ত সভাগত কৃষকদের জল দেওয়া মানা ছিল। ক্রোধে মাহাতরা জলের হাঁড়ি ফাটিয়ে দেয়। যাদু আর রূপচাঁদের ছেলেরা ছিল মাহাতদের নেতা।

মাহাতদের নেতৃত্বে প্রজা আন্দোলন তীব্রতা লাভ করেছিল। নিবারণের মনে আছে। রাস্তায় হঠাৎ-হঠাৎ লোক উধাও হয়ে যেত। পরে শোনা যেত, মুশাবনির খনি, ডুয়ার্সের চা-বাগানে নয়ত আসামে 'ডিপুঘর' (কুঠিঘর) হয়ে চালান গেছে। জামবনিতে আরও আগে নীলকুঠি ছিল। এই সব কুঠির মালিক মেদিনীপুর জমিদারি কোম্পানি ছিল লোক চালানের পাণ্ডা। যাদু ইস্কুলও করেছিলেন—কুমুদকুমারী বিদ্যালয়। যাদুর কথা—ওরাও রাজা, আমিও রাজা।

এইসব গল্প শুনতে শুনতে নিরঞ্জনকে প্রশ্ন করেছিলাম, এত বিদ্রোহী ধারা যে বংশে, রক্ত যাদের এত গরম, তারা হঠাৎ হিন্দু হতে চাইল কেন? হঠাৎ ধর্ম, আচার ইত্যাদি নিয়ে কেন সেই বিদ্রোহী পরিবার চিন্তান্বিত হল? নিরঞ্জনবাবুর জবানিতেই বলা ভাল। আজ ন-দশ বছর যখন মাত্র বাকি এই শতাব্দী শেষ হতে, সেই অতি-আধুনিক-কালে একটু বিব্রত মনে হয়েছিল নিরঞ্জনবাবুকে পারিবারিক ইতিহাসের এই দিকটা নিয়ে স্মৃতি রোমন্থন করতে বলায়। অবশ্য সেটা ক্ষণিকের। প্রত্যয় ফিরতে কণ্ঠস্বরে সময় লাগেনি।

নিরঞ্জনবাবুর জবানিতে : 'জেল খেটেছি। কংগ্রেসের ডাকে কর বন্ধ করেছি। হাটকর দিইনি। পড়িহাটি হাটে যাদু খুনোখুনিও করেছেন। জঙ্গল কাটা আর বাঁধ লুঠও হয়েছে। বিশ্বাস করেছি, **লাঠি যার মাটি তার**। প্রচুর ক্ষতিপূরণও দিয়েছে আমাদের পরিবার। কিন্তু দেখলাম, ইংরেজ আর জমিদারদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে **মর্যাদাও** লাগবে। আমাদের বাড়িতে যতগুলো ছেলে, ততগুলো বন্দুক ছিল। তিন-চারটে ঘোড়া, পালকি, তলোয়ার-ঢালও ছিল। চল্লিশ ঘর আর তিনশ লোকের গ্রাম কানিমৌলির, দেখলাম, সম্মানও দরকার। শিবমন্দির হল। মাহাতদের মর্যাদা বাড়াতে সারা ভারত কুরমি ক্ষত্রিয় মহাসভার প্রচার এ অঞ্চলে আমরাই করেছি। যাদু নিজে হলেন মাহাত প্রচারক। নিরঞ্জন মাহাত, মহেন্দ্র মাহাত, সুশীল মাহাত—এঁরা সব আসতেন আমাদের বাড়িতে। ইন্দোর গোয়ালিয়র থেকেও লোক আসত। সিংহদেব, রায়—এদের সঙ্গে বিয়ে হত। প্রাইমারি স্কুল বড় হল, জুনিয়ার হাই হল। সাঁওতাল,

মুণ্ডা, লোধা, মাঝি যারা আমাদের প্রজা, বেগার দিত, তাদের বিবাদের সালিশি করতাম। রাজার বিরুদ্ধে তারা আমাদের দিকেই সায় দিত, কারণ আমরা তাদের দেখতাম। মর্যাদা বাড়াতে ধর্মসংস্কারও হল। পৈতে হল। বৈষ্ণব হল অনেকে। মেয়েদের হাটবাজার যাওয়া হবে না—ঠিক হল। মুর্গি মদ মানা হল। এ পাশে রানিও মারা গেলেন বিষপ্রয়োগে। তবে আমরা জানতাম, শিবাজী, প্রতাপ সিংহ—এরাও কুরমি ক্ষত্রিয়—আমরা এঁদের বংশধর। মেয়েরা লেখাপড়া শিখতে শুরু করল, তবে, ঘরে মাস্টার রেখে। চেষ্টা হত নারীশিক্ষক পাবার।' শতাব্দীর গোড়ায় জঙ্গলমহলে প্রজা রাজনীতি যা ছিল, এইভাবে স্বদেশী আন্দোলনের ঘূর্ণিতে তার রূপান্তর হল। সংস্কৃতির শাস্ত্রীয়করণ ঘটল। মর্যাদা এসবের ফলে বাড়ল কিনা জানিনা, কিন্তু আচারের রাজনীতি যে এক গুরুত্বপূর্ণ বাঁক নিল, হলফ করে বলা যায়।

কাজেই শাস্ত্রীয়করণের উৎসটা শুধু জঙ্গলমহলের জমিদারবর্গের মধ্যে বা উড়িষ্যাগত ব্রাহ্মণদের মধ্যে খুঁজলে হবে না, ভূস্বামিত্বের কাঠামো এবং কৃষকদের মধ্যে স্তরায়নের ভেতরেও এই উৎস রয়েছে। আধুনিক প্রতিযোগিতামূলক রাজনীতি যা উপনিবেশবাদ এ দেশে নিয়ে এল তা আন্তরসম্প্রদায় সম্পর্ককে যেভাবে পাল্টালো, তার মধ্যেও এই উৎস নিহিত। জামবনিতে শাস্ত্রীয়করণ শুধু চিলকিগড় বা দুবড়া থেকে প্রবর্তিত হল না, হল কানিমোলি থেকেও।

তবে, 'ভদ্র' 'সভ্য' 'মার্জিত' হওয়ার চেষ্টা রাজবাড়ি থেকে যেভাবে শুরু হল, দেখার মতো। চিন্তেশ্বর থেকে পূর্ণচন্দ্র পর্যন্ত—ওটা আরেক শতাব্দী। অনেকটা ওয়াইলড ওয়েস্ট-এর মতো। ঈশ্বরচন্দ্র, তারপর জগদীশ—সভ্য, সংস্কৃত-কৃষ্টি প্রবর্তিত হল জোরকদমে। কাপগেড়িয়ায় স্বদেশী আশ্রমের জন্য জমি দান হল ; রাজা জগদীশ স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তন করলেন ; সব জাতের এক পঙক্তিতে ভোজনের অনুষ্ঠান চালু হল ; রাজা ধর্ম, তন্ত্র—এ সবের অনেক বই কিনলেন—সংগ্রহ করলেন ; মন্দির সংস্কার শুরু হল জোরকদমে ; আধুনিক নাটক লেখার চেষ্টা করলেন, গীতিকবিতায় হাত দিলেন, ভক্তিগীতিও রচনা করলেন। জামবনিতে আধুনিকতা ঢুকল রাজা জগদীশচন্দ্রের আমলে।

জগদীশ বিরচিত কবিতার ভাষাও সংস্কৃত। ঝুমুর আর অন্যান্য জঙ্গলমহলের গানের ভাষা কুরমালি, নয়ত সে ভাষা একেবারেই লৌকিক। তার কিছু উদাহরণ দিয়েছি। জগদীশের ভাষা সীমান্ত বাংলায় নয়, গাঙেয় বাংলার। জগদীশ লেখাপড়াও করেছিলেন কলকাতায়। তার গীতিকবিতায় লৌকিক কৃষ্টির সে ইন্দ্রিয়মন অনুভূতি নেই, আছে ব্রাহ্মণ্য কৃষ্টির ভক্তিভাব। নির্মলেশ আমায় বহু পুরনো কিছু হলুদ কাগজ দিয়েছেন, তার থেকে বলছি।

১

হাম্বীর—মধ্যমান

দিবানিশি বল হরিনাম, পুরাও মনস্কাম

ফুরায়েছে ভবের খেলা, বলে মোরে এই বেলা
অন্তিমে কে শোনাবে রে সুধামাখা হরিনাম ॥
নিজ কর্ম্ম ফলে তুমি, হয়ে আছ মোহে ঢাকা
ডাকিলে না নিরঞ্জনে, ঘুচাবে কে তোমার ব্যথা ;
বুঝিয়ে বুঝ না হায়
কালস্রোত বহে যায়
এখন ডাকরে তাঁরে পাবে অন্ত মুক্তিধাম ॥

২

ছায়ানট—কাওয়ালী

তারা জগৎ জীব তাপহারিণী জননী
দুঃখ হরা দেবী অভয়দায়িনী ॥
পাপে তাপিত তনু
সহিতে পারিনা আর,
ক্ষম মা অপরাধ কলুষনাশিনী ॥
কোলে নে এ সন্তানে
মুছাইয়ে পাপরাশি,
অধমতারিণী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী ॥
তুমি মা বিশ্বজননী
অজ্ঞানে জ্ঞানদায়িনী,
ফেলোনা সন্তানে মাগো মহেশঘরণী ॥

জগদীশচন্দ্র এইসব ভক্তিগীতি ছাড়া কিন্তু হালকা শ্লেষের কবিতাও রচনা করেন। মাহাতদের চলন বলন নিয়ে ঠাট্টা করা কিছু কবিতা দেখেছিলাম পুরনো কাগজ-পত্রের মধ্যে, কিন্তু সেগুলো পরে আর খুঁজে পাইনি, তবে শ্লেষাত্মক কবিতাগুলোয় হালফ্যাশনের প্রতি বিদ্রূপ আছে। আমাদের দেশে আধুনিকতা আর রক্ষণশীলতা বরাবরই হাত ধরে এসেছে। কাজেই জগদীশ জঙ্গলমহলের প্রবহমান সংস্কৃতি থেকে সরে এসে যেমন শাস্ত্রীয় কৃষ্টির পথে সংগীত রচনা করেন তেমনই শহুরে আধুনিকতাকে বিদ্রূপ করে নানা পদও রচনা করেছেন। তারও এক-আধটা উদাহরণ দিই। এগুলোও নির্মলেশবাবুর সৌজন্যে দেখতে পেয়েছি। রচনা সাল তিরিশের দশক।

৩

ও ভেনভেঁন রাই
গুরুর কিরা তিন চড় লাগাব,
কুচি কুচি করে তোর নাকটা কেটে দেব ॥

ক্যা পরওয়া জান্টুমান হ্যায় যা খুসী তাই করব।
তোদের মত অসভ্য নই গটমট করে চলব ॥
তোদের মত (কি) পান্ত খেয়ে ডিস্ খেঁকশিয়ায় মরব
চা বিস্‌ফট্ পেটে পুরে হাতীর মত হব ॥
হাতে বাঁধব রিষ্টির ঘড়ি দুবেলা যে কামাব
সাফ হতে ডেলি দুবার, ডালি সাবান খাব ॥
রেসেন মাখব পাউডার ঘঁসব আর ভুরুটাকে আঁকব
টোস্ খাব রোস্ খাব আর লেবেনচুস চুষব ॥
কুঁড়্যা পাড়ুয়া বুড়াটাকে কিসের তরে পুষব
বুড়িটাও লক্ষীছাড়ি এবার ঝাঁটা মেরে খেদব ॥
সামাল বেটি রম্ভা চাঁটি দিয়ে নেড়া করব
বড় খেঁচাস, দাঁড়া মাগী, দাঁতগুলো তোর ভাঙ্গব ॥

৪

জংলা-খেমটা

মজেছ খুলে প্রাণ আর কেন জ্বালাও
খুব হয়েছে ভালবাসা, ওহে লম্পটবর ;
তুমি নতুন ফুলে যাও ॥
এখন ওহে মনচোর ভ্রমর হয়ে
পাবে বঁধু নতুন মধু
দাও হে বিদায় ;
শেষের দেখা দেখে যাই প্রাণ,
বারেক দাঁড়াও
নইলে আমার মাথা খাও ॥

৫

বেশী করে বল কি ফল ফলিবে পাউডার
মুখে ঘঁসিয়া
জাপানের সনে চা খড়ি মিশালে কালই
উঠে গো ফুটিয়া ॥
মাথাটি খাইলে রুজ লেপিলে
পরম যতন করিয়া
কথা না শুনিল বেয়াড়া গাহিল
গাল দুটি গেল ঢুকিয়া ॥
আমি বলি শুন আনি গো গাউন
শাড়িটা দাওনা ফেলিয়া

সোনালী করিয়া চুলগুলো দাও
ঘাড়ের কাছেতে ছাঁটিয়া ॥
ধর কাঁটা ছুরি উড়ন চণ্ডীশ্বরী
দরকারী হাত ত্যাজিয়া
নিজে খোঁচা খাও আমারে বাঁচাও
চোখটা দিওনা ফুঁড়িয়া ॥
কিনিনু বিস্তর মার্গেসাঁ আতর
সাঁওতাল মার্কা দেখিয়া
পুরিবে গো আশ বোঁটকা সুবাস
উঠিবে দেহটা ভরিয়া ॥
প্রেম ভিখারী ওগো প্রাণেশ্বরী
দেব ফটোখানি তুলিয়া
এনলার্জ করে সদরে ঝুলাব
রেশমের ডোরে বাঁধিয়া ॥

এতো গেল জগদীশ রচিত কবিতার কথা। যে ভাদুগান নিয়ে আগে আলোচনা হল, সেই গানেরও শাস্ত্রীয়করণ হয়েছিল। তারও উদাহরণ পেয়েছি। বীরেশ্বরবাবু কাশীপুর রাজবাড়ির ভাদুগানের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। পঞ্চকোট রাজপরিবারের কুমার ধ্রুবেশ্বরলাল সিংহদেও যে গান বাঁধতেন, তার রাগ, তাল, ঠাট শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ব্যাকরণে বাঁধা।

১

পিলু-দাদরা

হায় ভাদরে ভাদু বিনা।
কিছুই ভাল লাগে না ॥
যত মনে অন্য ভাবি।
মন কিছুতেই মানে না ॥
বিনা সেই ভাদু শশী।
শূন্য হেরি দশ দিশী ॥
একলা ঘরে রই উদাসী,
মনের আশা মিটে না।
আশা মিটে না,
আশা মিটে না ॥

এই সব গান রাজবাড়ির বাইরেও ছড়িয়েছিল এবং 'দরবারি ভাদু' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

এই শাস্ত্রীয়করণের একটা দিক ছিল শাস্ত্রীয় ভাষার আধিপত্য। জামবনিতে রাজা জগদীশ স্কুল খুললেন, সাধু বাংলার আধিপত্য শুরু হল। মুখে মুখে কথা, প্রবচন, গান—সবই ছিল কুরমালি ধরনের; কথ্য বাংলা, ওড়িয়া, হিন্দি, মাদরি ও মুন্ডারি শব্দের মিশ্রন। নতুন ভাষার আধিপত্যে আর দাপটে লোকস্মৃতি হারিয়ে যেতে লাগল। সাংস্কৃতিক নীরবতার অন্যতম কারণ এখানে নিহিত।

ফলে যে লোকভাবনার উল্লেখ আগে করেছি, সেই 'আদি', 'অকৃত্রিম' লোকভাবনা বলে জঙ্গলমহলে কিছু থাকেনি। বঙ্কিম মাহাত বৃষ্টিভাবনা, কৃষিভাবনা, বৃক্ষভাবনা, প্রাণীভাবনা, সর্পভাবনা, প্রকৃতিভাবনা, অগ্নিভাবনা, উপকরণভাবনা, জন্মভাবনা, বিবাহ-ভাবনা, মৃত্যুভাবনা, রোগারোগ্য ভাবনা, শুভাশুভ ভাবনা, কুনজর ভাবনা, ভূতপ্রেত ভাবনা এবং ব্ল্যাক ম্যাজিক বা কালোজাদু ভাবনার কথা বলেছেন। অনেক তথ্যের উল্লেখ থাকলেও বঙ্কিমবাবুর পুরো লেখার আদল উইলিয়াম ক্রুকের **উত্তর ভারতের ধর্ম ও লোককথা** বা **রিলিজিয়ন অ্যান্ড ফোকলোর অব নর্দার্ন ইন্ডিয়া**। টাইলরের **রিলিজিয়ন ইন প্রিমিটিভ কালচার** ইত্যাকার বইগুলি ফ্রেজারের মূল বক্তব্যের অনুসারী। বঙ্কিমবাবু নিজেই স্বীকার করেছেন, এগুলি তাকে অনুপ্রাণিত করেছে। ফলে বৌদ্ধিক শোষণ ও আধিপত্যের উল্লেখ করলেও জঙ্গলমহলের লোকভাবনার কাঠামো কীভাবে লোকায়ত ও উচ্চমার্গীয় উপাদানের সংমিশ্রণে তৈরি হয়েছে, তার গভীরে যাননি। বঙ্কিমবাবু এও বলেছেন, '...আমি আমার রচনায় ঝাড়খণ্ডের বিশিষ্ট অঞ্চল বা জনগোষ্ঠীর নাম আর উচ্চারণ করিনি, কারণ একই সংস্কৃতির ঝাড়খণ্ডি জনপদবর্গকে বিশেষ-বিশেষ জনগোষ্ঠীর ছত্রতলে পৃথকভাবে স্থাপন করে বহুধাবিচ্ছিন্ন রূপে দেখানো হয়ে আসছিল এযাবত, যেখানে সংহতি নিয়ে আসাটাই আমার কাছে একমাত্র লক্ষ্য ছিল।'

বঙ্কিমবাবু এক্ষেত্রেও যে বৌদ্ধিক শোষণের বা আধিপত্যের কথা বলেছেন, সেই আধিপত্যের শিকার হয়েছেন। জঙ্গলমহলে জনগোষ্ঠীর কর্তৃত্ব ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্রকে স্বীকার করলে আঞ্চলিক পরিচিতি বা সাংস্কৃতিক পরিচয় মানতে অসুবিধে কেন হবে? সাঁওতাল, মুন্ডা, ভূমিজ; মাহাত, পাহাড়িয়া ইত্যাদি জনগোষ্ঠীসমূহের কিছু স্বকীয়তা তো আছেই; ধলভূম আর মানভূমের মধ্যেও তো কিছু পার্থক্য আছে; ভূমিব্যবস্থার কারণেও স্তরায়ন এসেছে; কাজেই কৃত্রিমভাবে এক জাতিসত্তাগত 'হোমোজেনাস' সংস্কৃতি তুলে ধরার অর্থ ঘুরে ফিরে স্বদেশী রাজনীতির মধ্যবিত্তকেন্দ্রিক 'সাংস্কৃতিক রাজনীতির' পথ ধরা, যে পথে মনে হয়, গোটা দেশের সাংস্কৃতিক চেহারা এক ও অভিন্ন। এই বিষয়ে আরও কিছু আলোচনায় আবার ফিরতে হবে।

৬

শাস্ত্রীয়করণের প্রসঙ্গ উঠলে মন্দিরের কথা আসবে। জামবনিতে ঘুরতে ঘুরতে একাধিক মন্দির দেখেছি। মন্দিরের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে জঙ্গলমহলের সংস্কৃতির

একটি দিক। জঙ্গলমহলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লৌকিক ধর্মভাবনার মধ্যে মন্দিরের স্থান নেই বললেই চলে। তাহলে মন্দির এল কী করে? কী করেই বা রাজানুকূল্যে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হল, নির্দিষ্ট বিগ্রহ এল, নির্দিষ্ট আচারাদি স্থির হল, জনপ্রিয় হল এবং মন্দির হয়ে রইল জঙ্গলমহলের ভূস্বামী কৃষক সম্পর্ক ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার এক আগ্রহোদ্দীপক নিদর্শন?

মন্দির নিয়ে কিছু আলোচনা আমি অন্যত্র করেছি, তাই তার পুনরুক্তি করব না। তার সারাংশের উল্লেখ করে আচারের রাজনীতি প্রসঙ্গে মন্দিরের আলোচনায় যেতে চাই। জামবনির কাল্পনিক বংশগাথার দুটি নিদর্শন কিছু বছর আগে পেয়েছিলাম। এই কাল্পনিক কুলজির মধ্যে দেখানোর চেষ্টা ছিল, কীভাবে দেবীর আশির্বাদ ধবলদেবদের উপর সদা বর্ষিত হয়েছে। জঙ্গলমহলে দুর্গা মাতৃদেবীরূপে এলেন কীভাবে তাহও এক ব্যাখ্যা আছে। যে অঞ্চলে রঙ্কিনী ছিলেন মাতৃদেবী, যার জনগোষ্ঠীপ্রধান উৎস জামবনি-ঝাড়গ্রাম-শিলদা-বরাভূম—সর্বত্র পাওয়া যাবে, তাকে দুর্গা স্থানান্তরিত করলেন কীভাবে? নরবলিপ্রথা ধবলদেবরা কীভাবে তুলে দিলেন এবং বংশসমৃদ্ধির প্রতীক রঙ্কিনীকে নিয়ে এলেন ধলভূম থেকে জামবনিতে, তারপর তার পরিবর্তে সাদরে আনলেন দুর্গাকে—এই সব আলোচনা করে আমি দেখাতে চেয়েছিলাম, রঙ্কিনী থেকে দুর্গায় যাওয়া—নিছক এক কাল্পনিক কুলপঞ্জী বিবরণ নয়, জঙ্গলমহলের সমাজে সংস্কৃতায়নের এক ইতিহাস।

বছর তিন-চার আগে জামবনি পুলিশ থানায় ঢুকি দারোগার পুরনো ভিলেজ ক্রাইম নোটবুক দেখতে। এই ক্রাইম নোটবুকের একটা দিক হতো বিভিন্ন গ্রাম সম্পর্কে দারোগাদের ডাইরি করা মন্তব্য। লক্ষ করেছিলাম, এই শতাব্দীর গোড়ায় দারোগারা কনকদুর্গা মন্দির নিয়ে কিছু লিখে যাননি, কিন্তু পাঁচের দশকে মন্দিরের নাম হয়েছে, মেষ বলি হয়, অষ্টমীতে বলির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, বিভিন্ন জনজাতির লোকেরা দলে দলে আসে মা কনকদুর্গাকে দেখতে, প্রণাম করতে, মন্দিরে প্রণামী বিস্তর বেড়ে ওঠে জমিদাররা মন্দির বসিয়েছেন, মন্দিরের সংস্কার করেছেন ১৯২৫-এ, বিগ্রহ চুরি যাওয়ায় নতুন বিগ্রহ স্থাপন করেছেন, কনকদুর্গা মন্দিরকে পরিণত করেছেন চিলকিগড়ের এক নম্বর ট্যুরিস্ট স্পটে। তাই স্বাধীনতার পর এক দারোগার বিস্ময়সূচক মন্তব্য, ডুলুঙ-এর ওপর এই মন্দিরের এত খ্যাতি কীভাবে সম্ভব হল? জামবনিতে বহিরাগত কেউ এলে চিলকিগড় বাদ দেয় না, রাজবাড়ি দেখুক না দেখুক কনকদুর্গা মন্দির দেখতেই হবে। রঙ্কিনীর থান হয়ে গেছে ইতিমধ্যে হেলায় পরিত্যক্ত, অখ্যাত।

সোনার বরণী মা। কনকদুর্গা। রাজবাড়ির প্রতিপত্তি গৌরবের প্রতীক। রাজার সঙ্গে প্রজার সামাজিক চুক্তির এক নিদর্শন, জনজাতিগত কৃষকদের উপর রাজার প্রভাবের এক প্রক্রিয়া। দুর্গা আর সোনায় মোড়ানো নেই ঠিকই—কিন্তু মা ধবলদেবদের দিয়েছেন অনেক, নিশ্চয়ই রাজবাড়ির কারুর কোনও ক্ষোভ এ বিষয়ে নেই, তা আজ চিলকিগড়ের রাজবাড়ি যতই তেলেনাপোতার সেই রহস্যময় পরিত্যক্ত প্রাসাদ মনে হোক

না কেন। ডুলুঙের পাড়ে ঘন জঙ্গলের মধ্যে মন্দির। এই জঙ্গলের জরিপ নিয়ে এক সময় অনেক অশান্তি গেছে। মন্দির তখন সার্ভেয়ারদের কাছে জঙ্গল মাপার এক বড় চিহ্ন। দুবড়ার ষড়ঙ্গীরা এই মন্দিরের পুরোহিত থেকেছেন প্রায় এক শতাব্দী ধরে। দেওয়ান বিশ্বনাথ শতপথী আর শম্ভু ষড়ঙ্গীর বাবা একই সময়ের মানুষ। শম্ভু ষড়ঙ্গীর বয়স যখন নব্বই এর কোঠায়, তার সঙ্গে আমার দেখা হয়। বলেছিলেন, দুপুরুষ আগে এসেছিলেন উড়িষ্যা থেকে গোপীবল্লভপুর পেরিয়ে গত শতাব্দীর গোড়ায়। শম্ভু ষড়ঙ্গী নিজে ছিলেন মন্দিরের পুরোহিত। চিলকিগড় থেকে দুবড়া প্রায় ছ' কিলোমিটার, দারোগার ডাইরিতে দুবড়া নিয়ে নানা মন্তব্য বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। দুবড়া সম্পর্কে দারোগা লিখেছে, দুবড়া উড়ে বামুনদের গ্রাম। কলহপ্রিয় এরা। প্রতিপত্তিশালী, দলবাজি করে। শম্ভু ষড়ঙ্গীর লেখা রাজবাড়ির বংশগাথায় কীভাবে দুবড়ার ব্রাহ্মণদের আশির্বাদে চিলকিগড়ের মল্লক্ষত্রিয় জমিদারদের শ্রীবৃদ্ধি হল, তার সবিস্তার বিবরণ আছে। এইসব বিচার থেকে মনে হয় কনকদুর্গা মন্দির শুধু রাজা-প্রজার সম্পর্কের প্রতীক নয়, যোদ্ধা এবং পুরোহিতের সম্পর্কেরও।

ধবলদেবদের সম্পত্তি এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে ধলভূমের সম্পত্তি পেয়ে বিশাল হয়ে ওঠে। গোটা জামবনি আর ধলভূমগড় একই জমিদারির তলায় আসে। মা কনকদুর্গার আশির্বাদ ছাড়া এ অসম্ভব ছিল—শম্ভু ষড়ঙ্গীর এই হল সাক্ষ্য। মহিলাদের হাতে জামবনি জমিদারি আর ঘাটশীলার জমিদার শত্রুঘ্ন ধবলদেবের মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারের মহিলাদের হাতে ধলভূমের সম্পত্তি যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে এই ধলভূম জমিদারিকে জামবনির সঙ্গে যুক্ত করা—এ সবই হয় দেওয়ান বিশ্বনাথ শতপথীর তত্ত্বাবধানে, কেননা রাজা জগদীশ তখনও নাবালক। বিশ্বনাথ শতপথী নিজে একটা মন্দির করান দুবড়ায়। এপাশে কনকদুর্গার হাল ধরলেন ষড়ঙ্গীরা। সমৃদ্ধি আসার সুবাদে ক্রমে ক্রমে রাজপ্রাঙ্গণেই তৈরি হল আরও তিনটি মন্দির—একটি সাক্ষাত উড়িষ্যা-শৈলীতে—শিব, রাধাকৃষ্ণ আর এক নবরত্ন মন্দির বলরাম।

মন্দিরের রাজনীতি শুরু হল এবার অন্তঃসলিলা কিন্তু দারুণ ফলবতীভাবে। উড়িষ্যা ব্রাহ্মণেরা রাজবাড়ির মন্দিরগুলোরও হাল ধরলেন। দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর জমিও কম পেলেন না, যার নিদর্শন আমি অন্যত্র দিয়েছি। মাহাত, সাঁওতাল, মাঝি, মুন্ডা, ডোম, কাহার, ভূমিজ—এই প্রজাবর্গের এক সংস্কৃতি; ব্রাহ্মণ, মল্লক্ষত্রিয়, কায়স্থ—এদের আরেক। এই দুই সংস্কৃতির চেহারা ভিন্ন। কিন্তু খুব বিবাদ হল না। কারণ, মন্দির দেখেনি যে সাঁওতাল, সে এবার মন্দিরে গেল। ছো, টুসু, ভাদু, ঝুমুর, যাদুনৃত্য—এ সবের ধার দিয়েও যার যাওয়ার কথা নয়, সেই রাজা আর তার লোকেরা এ সবের চর্চা শুরু করল, অবশ্যই নিজেদের মতো করে, শাস্ত্রীয় উপাদানে অন্বিত করে। তাই দুবড়া থেকে কেন গাজন পর্ব শুরু, বোঝা যায়। মা কনকদুর্গার মন্দির এই গাজনের মিছিলের রুটের প্রায় মাঝে।

কনকদুর্গার নতুন মন্দির বসল যে জায়গায়, ডুলুঙের ধারে জঙ্গলের মাঝে, সেখানেই

নাকি জগন্নাথ ধবলদেব বসিয়েছিলেন পুরনো দুর্গা মন্দির। মা ভক্ত পূজারী চেয়েছিলেন, নরবলি চাননি। এটা প্রায় দুশো বছর আগের কথা বলছি। মন্দিরের ওই জায়গায় ধবলদেবের আগে এক পূজারী রাজত্ব করত, জনশ্রুতি রয়েছে। তার প্রাসাদ মন্দিরের পাশে টিবির তলায়, রাজবাড়ির লোকজনের কাছে এও শুনেছি। পুরনো আর নতুন মন্দিরের বৈপরীত্য চোখে পড়ার মতো; তার চেয়েও বড় কথা, পুরনো মন্দিরের গায়ে এক অত্যাশ্চর্য রিলিফ—একটি লোক তার জননাঙ্গ ধরে কারুর দিকে তাক করে দাঁড়িয়ে আছে!

নির্মলেশবাবুর কাছে জেনেছি, এক সময় পুরনো মন্দিরের চূড়োর কাছে গোটা দেওয়াল জুড়ে আর নিচেও ওইরকম মৈথুনমূর্তি ছিল। এখন মন্দিরের গায়ের পলেস্তারা স্থানে-স্থানে খসানো, মূর্তিগুলো চেঁচে তুলে দেওয়া হয়েছে। কী কারণে, ওই একটা রসাত্মক মূর্তি রয়ে গেছে। দুর্গা মন্দিরের গায়ে ওইসব মূর্তি দুশো বছর আগে আঁকা। দেখে ফের মনে হয়েছে জঙ্গলমহলের 'ওয়াইলড ওয়েস্ট' অতীতের কথা। কিন্তু মূর্তিগুলো খসালো কে? শুনেছি, ১৯২৩-২৫-এর ব্রাহ্মণ্য প্রতিক্রিয়ায় এই কাণ্ড ঘটেছে।

জামবনির ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় মোর্চায় চিড় ধরে এই শতাব্দীর বিশের দশকের গোড়ায়। জেমসন সাহেব নির্দেশিত জরিপ বন্দোবস্ত অভিযান শেষ হবার পর জামবনিতে সামাজিক অসন্তোষের পালা শুরু হয়। ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর জমি কোথাও-কোথাও জমিদার ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করে। কিছু নিষ্কর জমিতে রাজা নিজে চাষাবাদের চেষ্টা শুরু করে। আসনবনির হোতাদের সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমা শুরু হয়। তারপর ১৯২৩-এ ব্যাপক প্রজা আন্দোলন শুরু হলে, দেখা গেল ব্রাহ্মণরা রাজার পক্ষে না গিয়ে মণ্ডলদের পক্ষ ধরেছে। এ নিয়ে বিশদ আলোচনা অন্যত্র করেছি। কৃষি ব্যবস্থায় খাজনা-সঙ্কট, খাস জমি বাড়ানোর চেষ্টা, নিষ্কর জমির পরিবর্তন, মণ্ডলদের ভূমিকা—এই সব। যাই হোক, জমি বন্দোবস্ত, খাজনা-সঙ্কট হয়ত একটা বড় কারণ ছিল। শম্ভু ষড়ঙ্গী মারা গেছেন। শম্ভুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে কিছু কিছু জেনেছিলাম। ভবানী রাণা নামে চিলকিগড়ের এক পুরনো সেরেস্তা কর্মচারীর কাছেও একই ভাষ্য পেয়েছি।

এদের জবানি অনুযায়ী, দুবড়ার ব্রাহ্মণেরা এই সময় নাগাদ কনকদুর্গা মন্দিরের পুরুতগিরি আর চালাতে অস্বীকার করে, বা রাজা জগদীশই তা বন্ধ করে দেন। দুবড়ায় পালটা দুর্গা মন্দির স্থাপিত হয়। শম্ভু ষড়ঙ্গী নিজে তার অন্যতম উদ্যোক্তা। জামবনির মুসলমান দারোগা দুবড়ার এই উদ্যোগকে মদত দেন। তার উপস্থিতিতে যে বয়ান ভিত্তিপত্রে লেখা হয়, তা এখন ফটো করে শম্ভুর বাড়িতে রাখা। আমি দেখেছি।

ব্রাহ্মণরা এই সময় নাগাদ রাজা জগদীশের স্থাপিত স্কুলে সংস্কৃত, বাংলা লেখাপড়া, শাস্ত্রীয় ভজন, ধর্মশিক্ষা—এ সবের ওপর জোর দিয়েছিল। আমি আগে উল্লেখ করেছি, বীরেন শাসমলমশাই এই সময় নাগাদ গিধনিতে সাঁওতালদের 'হিন্দু' হতে, 'ভদ্র', 'সংস্কৃত' হতে ধর্মসভা করেছিলেন। মাহাত আর ভূমিজদের সংস্কার আন্দোলনও শুরু

হয় বিশের দশকের গোড়ায়। সব দেখে মনে হয়, রাজা জগদীশ হয়ত ব্রাহ্মণদের তুষ্ট করতে মন্দিরকে 'পবিত্র', 'পরিষ্কার' করার ব্যবস্থা করেন এই সময় নাগাদ। তবে এ সবই জল্পনা। হলফ করে কিছু বলা যায় না। পুরনো মন্দির এর পরই ধীরে-ধীরে অবহেলিত হতে লাগল। উত্তরভারত থেকে কারিগর ওস্তাদ এল নতুন মন্দিরের নকশা নিয়ে। রাজবাড়িতেও বহির্ভবনের রূপে নতুন সংযোজন হল। নতুন তিনটে মন্দির বসল। দুবড়ার পুরোহিতরা ফিরে এল স্বমহিমায়, সগৌরবে। বলা চলে জামবনির ইতিহাসে মডার্নিটি নিশ্চিতভাবেই এসে গেল দুইয়ের দশকে।

রাজা জগদীশের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারেও তন্ত্র, গীতা, উপনিষদ, বিভিন্ন ভাষ্য ইত্যাদি যে সব বই দেখেছি, তার অধিকাংশের তারিখ দুইয়ের দশকের। একটা খাতাও দেখেছি— জগদীশের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের খাতা। তাতে দেখেছি, গ্রন্থাগারের বই নিচ্ছেনও জামবনির শিক্ষিতসমাজ দুই-তিন দশকে। অর্ধেক পোকায় খাওয়া বলে এই খাতায় সব বইয়ের হদিশ পাইনি। তবে যেটুকু দেখেছি, তাতে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে, 'আধুনিক', 'হিন্দু', 'সভ্য' ও 'শিক্ষিত' হবার পথে জামবনির ইতিহাসে দুইয়ের দশক একটা মাইলস্টোন।

মন্দিরের কথায় ফিরে আসি। দারোগা যেমন জামবনিতে কনকদুর্গা মন্দিরের জনপ্রিয়তায় বিস্মিত, তেমনই বিস্ময়ের ব্যাপার অশোক মিত্র সম্পাদিত 'পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও পূজাপার্বণ (৫ খণ্ড)'-এ এই মন্দির, তাকে ঘিরে জনসমাগমের উল্লেখ নেই। তেমনই ১৯৬১-র ম্যাককাচিয়নের মেদিনীপুরের মন্দির সম্পর্কে প্রতিবেদন, **নোটস অন সাম রিপ্রেজেনটেটিভ টেমপলস অব মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট**-এ কনকদুর্গা মন্দিরের উল্লেখ অনুপস্থিত। বিনয় ঘোষমশাইয়ের অনুমান ছিল, কনকদুর্গা মেদিনীপুরের, এমনকি জঙ্গলমহলেরও, কোনও অভিজাত মন্দির নয়। পুরনো পঞ্চরত্ন মন্দিরের পাশে নতুন নাটমন্দিরসহ এই মন্দিরের কনকদুর্গা আসলে কোনও বনদেবী বা বনদুর্গার কনকমণ্ডিত সংস্করণ। অর্থব্যয়ের পরিচয় থাকলেও, নতুন মন্দিরে শিল্পরুচির পরিচয় নেই।

বিনয় ঘোষের এই অনুমানের স্বপক্ষে কোনও জোরালো প্রমাণ নেই। তবে হরপার্বতী, শিবদুর্গা—এ থেকে মনে হয় ভৈরব-ভৈরবী হতে পারে ; দুর্গা তো ভৈরবীও। ভৈরবপূজা একসময় জামবনির কাছে শিলদায় খুব প্রচলিত ছিল। তার থেকে ভৈরবী, বনদুর্গা, জমিদারের কল্যাণে কনকদুর্গা। **ভৈরবরঙ্কিনীমাহাত্ম্যে** বলা আছে :

ভৈরব ভৈরবী স্থানে দেখ একই পর্ব।
লুপ্ত হয় ক্রমে ক্রমে দেব কীর্তি সর্ব ॥
একই সাম্রাজ্যভুক্তা ছিলা ঘাটশীলা।
শিলদা সাঁতভূম কালে পৃথক হইলা ॥
ঘাটশীলা শিলাস্তরে উৎপত্তি শিলদার।
সাঁতভূম শ্রীকৈলাসে বসতি বাবার ॥

কনকদুর্গা এলেন বনদুর্গা থেকে—আক্ষরিক অর্থেই জঙ্গল এখানে ছিল সোনা। কিন্তু একটা বাড়তি অনুমানও করি। চিল্কিগড়, জামবনি, দুবড়া, চিচঁড়া, গিধনি—এত জায়গা থাকতে, ডুলুঙের ধারে অত গহন অরণ্যে মন্দির কেন? পুরনো পঞ্চরত্ন মন্দির কি সত্যিই কোনও বনদেবীর ছিল? বিগ্রহ চুরি গেছে দুইয়ের দশকে, কোনও ছবি নেই, বিগ্রহের কোনও বিবরণ জামবনিতে পাওয়া পুরনো পুঁথিতে পাইনি। কাজেই আদিতে কনকদুর্গা কোন কল্পে রচিত হয়েছিলেন, তার স্থাপত্য ও প্রত্নতত্ত্বগত নিদর্শন দিতে পারব না। তবে ভৈরব, রঙ্কিনী, ধর্মঠাকুরের কামিন্যামূর্তি, প্রেতিনী, বনদুর্গা—এ সবই এক এক এলাকায় অরণ্যপ্রধান বসতির জনসাধারণের পূজ্য দেব-দেবী। ক্রমে স্থানীয় সামন্তরাজাদের পোষকতায় এক-একজন এক-এক অঞ্চলের অধিষ্ঠাতা ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও দেবীরূপে গণ্য হয়েছেন। কল্পনাস্ফীত কিংবদন্তীর মাঝে রয়ে গেছে দুশো তিনশো বছরের সাংস্কৃতিক যোগসূত্র।

দুটো মন্দিরের সম্পর্কেই আরও একটা-দুটো কথা বলা যায়, জামবনির সংস্কৃতির কাঠামো আরও ভাল করে বোঝার জন্য। কনকদুর্গা আর বলরাম মন্দির। হিতেশ সান্যাল মন্দির প্রসঙ্গে এনেছিলেন সামাজিক গতিশীলতা বা 'সোশ্যাল মবিলিটি'র কথা। এই সামাজিক গতিশীলতা জামবনির সাংস্কৃতিক চালচিত্রে আচারাদি বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা দেখিয়েছি। যে দুটো মন্দিরের কথা বললাম, তাতে এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট।

প্রত্নতাত্ত্বিকরা জানেন, বাংলাদেশে বিষ্ণুপুজোর চল ছিল। তাই বিষ্ণুপুজো জনপ্রিয় হবার পরও, এই বিষ্ণু বৈদিক 'আদিত্য-বিষ্ণু' থাকেননি, পৌরাণিক বিষ্ণু বাসুদেব, নারায়ণ ও বৈদিক বিষ্ণুর সংমিশ্রণ হয়ে উঠেছেন। পালরাজাদের সময়ের বহু বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কৃত হওয়ার পর দেখা গেছে বলরামেরও পৃথক পুজো হয়েছে। কেননা, এই বিষ্ণু চতুর্মূর্তি—কৃষ্ণের অগ্রজ বলরাম, পুত্র ও পৌত্র প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এবং বিষ্ণু নিজে। আমার প্রথমে প্রশ্ন জেগেছিল, মেদিনীপুরের দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তে একই সঙ্গে শিবপুজো আর বলরামপুজোর নিদর্শন দেখি কীভাবে? পৌরাণিক যুগে শিব সংহারক হলেও প্রাক-পৌরাণিককালে তিনি জগতস্রষ্টা; লিঙ্গ এই স্রষ্টাভূমিকা ও দেবতার পিতৃত্বের পরিচায়ক। তাই বিষ্ণু ও এক/চতুর্মুখলিঙ্গের সহাবস্থানে পরে আর বিস্মিত হইনি। ধবলদেবদের এমন কোনও লেখা পাইনি, যেখানে বলা আছে, কেন এই মন্দিরগুলি বসল। শিবমন্দির আর বলরামমন্দির দেখে এই ধারণা দৃঢ় হয়েছে, জঙ্গলমহলের মল্লক্ষত্রিয় জমিদাররা যতই সংস্কৃত ও শাস্ত্রীয় হয়ে ওঠার চেষ্টা করুন না কেন, উৎপত্তির টান এড়াতে পারেননি। অ-শাস্ত্রীয় সংস্কৃতি এবং লোকায়ত সংস্কৃতি প্রতিপদে ভূস্বামীদের রাজনৈতিক আধিপত্যকে রোধ করতে উদ্যত হয়েছে স্বীয় সাংস্কৃতিক শক্তি দিয়ে। ছো নাচের আচারেও আমরা দেখেছি এক মিশ্র সংস্কৃতির জগত, মন্দির গঠনেও এই মিশ্র সংস্কৃতি তার আভাস রেখে গেছে।

জামবনিতে পথে ঘুরতে ঘুরতে গাছের তলায় মৃৎশিল্পের যে নিদর্শন দেখা যায়,

সর্পরূপী মনসা, ধর্মঠাকুর, হাতি, ঘোড়া, অন্য বন্যজন্তু—এই সব, জামবনির মন্দিরের সম্পূর্ণ বৈপরীত্যে স্থাপন করা তাই মনে হয় অনৈতিহাসিক হবে। গাছের তলায়, রোদে, বৃষ্টিতে পড়ে থাকা আরাধ্য দেবতা থেকে মন্দিরের আলয়ে স্থান পাওয়া দেব-দেবী—জামবনিতে ধর্মাচারের এই বিন্যাসে যেমন লোকধর্ম আর শিল্পকলা জড়িয়ে আছে, তেমনই এই বিন্যাসে কৃষক-ভূস্বামী আন্তঃসম্পর্ক, অরণ্যময় প্রকৃতি এবং জঙ্গল পরিষ্কার করে আবাদের সম্পর্কও প্রতীয়মান।

কনকদুর্গা মন্দির পোড়ামাটির। এ প্রশ্নও জাগে, পাথুরে এলাকা হওয়া সত্ত্বেও গাঙ্গেয় বাংলার মন্দিরের স্থাপত্যরীতির প্রভাব এখানে কী করে পড়ল? সুন্দর অলংকারবহুল পোড়ামাটির প্রতিকৃতি, চিত্রফলক রয়েছে কনকদুর্গা মন্দিরে। একই উৎকৃতি জমিদারবাড়ির মন্দিরগুলোতেও। উড়িষ্যার প্রভাবে কনকদুর্গা মন্দির হয়েছে পঞ্চরত্ন, বলরাম নবরত্ন। সবদিক থেকে মনে হয়, এ সত্যই সীমান্ত সংস্কৃতি, ধর্মমানস, লোকাচার। সরসী সরস্বতী একসময় মন্তব্য করেছিলেন, বাংলাদেশের স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাস রচনায় কাজ হবে অত্যন্ত দুরূহ। যেটুকু তথ্য পাওয়া, সবই ধর্ম-সম্পৃক্ত। বাংলাদেশের স্থাপত্যশিল্পের এই অর্ধ-অন্ধকার চেহারা জঙ্গলমহলের অন্ধকারে আরও অজানা থেকে গেছে।

এই কারুশিল্পীরা এসেছিল কোথা থেকে? ঝাড়গ্রাম, গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম, জামবনি, বীনপুর—এ সব অঞ্চলে কোনও সংখ্যাবহুল কারুজীবী সম্প্রদায়ের কথা জানি না। কাঁথি-তমলুক-মহিষাদল অঞ্চলের মতো এ অঞ্চল মন্দিরপ্রধানও নয়। তবে কি এসেছিল বাঁকুড়া থেকে? বাঁকুড়া জামবনির লাগোয়া। বৈবাহিক, বাণিজ্যিক, কুলগত সম্পর্কাদি মল্লভূম ও ধলভূমে ছিলই। বাঁকুড়ার মন্দির ভাস্কর্য আলোচনা প্রসঙ্গে অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়মশাই উল্লেখ করেছেন মন্দির অলংকরণের ক্ষেত্রে ঈষদন্নত 'রিলিফ' প্রকরণের কথা। এই 'রা-রিলিফ' বা bas-relief পুরনো কনকদুর্গা মন্দিরেও রয়েছে।

ধলভূমের রাজনীতি, আচার, সংস্কৃতির আলোচনা করতে গেলে অবশ্য মল্লভূমের কথা আরও বেশি মনে পড়া স্বাভাবিক। মল্লরাজবংশের উৎপত্তি-ইতিহাস সংক্রান্ত অতিকথা এবং ধলভূমের কুলজী ইতিহাসের মাঝে বিস্তর মিল। সিংহভূম, মানভূম, বরাভূম—এই অঞ্চলের মাঝে রাঢ় সংস্কৃতি, সীমান্ত সংস্কৃতি, কৌম সাংস্কৃতিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্যও ন্যালে সাহেব তাঁর **বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট-গেজেটিয়ারে** স্বীকার করেছিলেন। হান্টারের **গ্রামবাংলার ইতিকথা** বা **অ্যানালস অব রুর‍্যাল বেংগল** ও বিষ্ণুপুর রাজবংশের যে কিংবদন্তী-আশ্রিত উৎপত্তি ইতিহাস পাই, তাতে স্থানীয় সামন্ত নৃপতিদের জনজাতিগত আদিকথার উল্লেখ আছে। একইভাবে ওলডহ্যামের **সাম্ হিসটরিক্যাল অ্যান্ড এথনিক্যাল আস-পেক্টস অব দ্য বার্ডেয়ান ডিস্ট্রিক্ট**-এ মল্লদের সম্পর্কে বলা আছে, এঁরা মাল উপজাতির। লোকায়ত ও শাস্ত্রীয় আচার সমন্বয় চিহ্ন বাঁকুড়াতেও স্পষ্ট। সোনামুখি, পাঁচমুড়ার মৃৎশিল্পীরা যেভাবে মনসাচালি আর মনসাঘট তৈরি করেছেন, তাতে মনে হয় এই সহস্র

সহস্র মূর্তির প্রভাব জামবনিতে পড়তে পারে। বাঁকুড়ার এক বড় অঞ্চল ছিল পুরনো জঙ্গলমহলের একাংশ। কাজেই গোষ্ঠীপ্রতীক বা টোটেম রূপে নানা জন্তুজানোয়ারের মূর্তির ব্যবহার, ছো নাচে বিভিন্ন পশুকে নিয়ে পালা, মন্দিরের দেওয়ালে উৎকীর্ণ এই সব পশুপাখির মূর্তি—এগুলো বাঁকুড়ায় যেমন জনপ্রিয়, তেমনই জামবনিতে। চড়ক সংক্রান্তি এবং শিবের গাজনের জনপ্রিয়তা এই লেখার প্রথমেই এনেছিলাম। অশোক মিত্রমশাই ১৯৫১-তে যে বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট হ্যান্ডবুক সম্পাদনা করেন, তাতে ২০১টি উৎসবের মধ্যে ১১৬টিই হয় চড়ক নয় গাজন। সংক্ষেপে বলা চলে জঙ্গলমহলের সাংস্কৃতিক পটে আমি জামবনি-চিলকিগড়কে বোঝার চেষ্টা করেছি। তাই মল্লভূম, মানভূম, বরাভূম, সিংভূম, ধলভূম—এই নামগুলো ওলটপালট হয়ে গেছে। একটা লিখতে গিয়ে নিজের অজান্তে এসে গেছে অন্যটির কথা। একসময়ের জঙ্গলমহল, আজকে ঝাড়খণ্ডের ক্রমবিস্তৃত ছায়া যেমন জামবনির ইতিহাসকে ঢেকে ফেলেছে (না কী বলব, তৈরী করেছে), তেমন এই লেখায় সেই ছায়াতেই জামবনির আচারের ইতিহাস বিধৃত।

আচারের সমগ্র ইতিহাসকে এক ভাষাণিক ধারা বা ডিসকোর্স হিসাবে দেখলে তাই মনে হয়, জঙ্গলমহলের সংস্কৃতির বিবরণ শুধু সাংস্কৃতিক জাতিকথাবিবরণ বা কালচারাল এথনোগ্রাফি হয়ে থাকবে না, তার ইতিহাসও রচনা করা যাবে। এলাকাগত ইতিহাস, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাঝে এবং জঙ্গলমহলের বিভিন্ন অংশের মাঝে যোগাযোগ, কৃষ্টি, ধর্ম, স্থাপত্য—এই সব মিলিয়ে তৈরী আচারমণ্ডলীর যে ভাষাণিক ধারা, তাকে পাওয়া যাবে। অন্ধকার অনেকটাই কাটবে। **সাংস্কৃতিক নীরবতার** উল্টোদিকে **সাংস্কৃতিক সাক্ষরতা বা বাঙ্ময়তাও** যে বিদ্যমান, তা' আমরা বুঝতে পারব। এই **বাঙ্ময়তাই** হল এক-একটি জনমণ্ডলীর জাতীয় ইতিহাস গড়ে ওঠার উপাদান—ইতিহাসচর্চাগত দ্যোতক।

৭

আচারাদির মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক বাঙ্ময়তা প্রকাশ পায়, বলেছি। তাই জামবনির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আচারাদির কোনও লিখিত ইতিহাস না থাকলেও, শাস্ত্রীয়-করণের প্রভাব আপাত / সার্বভৌম মনে হলেও জামবনির জনসাধারণের সাংস্কৃতিক আখ্যান লিখতে দমে যাওয়া উচিত নয়। তার কারণ, লোকায়ত সংস্কৃতি শুধু শাসক সংস্কৃতির আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্র নয়, শাসক আধিপত্য রোধেরও ক্ষেত্র। কিন্তু এর অর্থ দাঁড়ায় না যে শাসক সংস্কৃতির বিপরীত, বিচ্ছিন্নতায় এবং স্বাতন্ত্রে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকায়ত সংস্কৃতি। লোকায়ত সংস্কৃতি **লোকায়ত** হয়ে উঠছে এবং লোকভাবনা **সাংস্কৃতিক রূপ** পরিগ্রহ করছে শাসক সংস্কৃতির সংপর্শে, দুই পরিমণ্ডলের অন্তর্ভেদনে, মুখোমুখি হবার অভিজ্ঞতায়, পারস্পরিক যোগাযোগে। তাই খানিকটা নিশ্চিত হয়েই বলা যায়, শাসক সংস্কৃতির সম্মুখীন হওয়ার অভিজ্ঞতা ব্যতীত কোনও লোকায়ত সংস্কৃতি গড়ে ওঠে না! লোকায়ত সংস্কৃতির তেমন কোনও পবিত্র, নিখাদ, আদিকল্প নেই!

জামবনির সংস্কৃতির কাঠামোগত এই রূপটি দেখতে পাব, ভাষণিক ধারার রূপটি লক্ষ করলে। জামবনি, শিলদা, বরাভূম, মল্লভূম—সর্বত্র যে রাজবংশোৎপত্তিগত কল্পকথা পাই, তাতে দেখা যায় **ঐতিহাসিক চরিত্রের জীবনী** প্রায় **ধর্মীয় জীবনী** হয়ে উঠেছে এবং **ধর্মীয়** হয়ে উঠেছে নৈর্ব্যক্তিকতাকে অবলম্বন করে। শিলদার **ভৈরবরাম্বিকনীমাহাত্ম্যের** উল্লেখ করেছি। **জামবনিকুলবিবরণ** নিয়ে এখানে কিছু মন্তব্য করব। এ নিয়ে বিশদ আলোচনা অন্যত্র করেছি। এখানে যা বলব, তা শুধু জীবনী হিসাবে এই বিবরণের ভাষণিক কাঠামো নিয়ে। **জামবনিকুলবিবরণের** সমস্যা হল, দুশো বছরের আগের এক চরিত্রকে ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, কিন্তু নিছক ঐতিহাসিক চরিত্র হলে মর্যাদা থাকে না, তাই এই চরিত্রতে ধর্মীয়তা আরোপ করা চাই। আলবার্ট সোয়েৎজার লিখেছিলেন **ঐতিহাসিক যীশুর সন্ধানে—ইন সার্চ অব দ্য হিস্টরিকাল যেসাস**। অমূল্য সেন অনুরূপ এক ঐতিহাসিক চরিত্রকে ফিরে পেতে চেয়েছিলেন অতিকথার আবরণ ভেদ করে—**ইতিহাসের শ্রীচৈতন্য**। কিন্তু তা তো আধুনিক যুক্তিবাদী মনের কথা। জামবনির জীবনীকারের সমস্যা ঠিক এর বিপরীত। ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত যে সামন্তবংশ, তার আদিপুরুষের ঐতিহাসিকতাকে কী করে লীন করে দেওয়া যায়—চরিত্রটিকে নৈর্ব্যক্তিক করে, ধর্মীয়তায় ঢেকে দিয়ে। তাই পুরী যাত্রা, দেবীর লীলা, স্বপ্নাদেশ, রাজাপত্তন, অঞ্চলের লোকেদের ধর্মমতে প্রজাপালন—ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু জগন্নাথ ধবলদেবকে তো নিছক ধর্মীয় চরিত্র করলে চলবে না। তাকে ন্যায়পরায়ণ, ক্ষমতাশালী রাজা রূপে দেখাতে হবে। তার প্রায় দেড়শ' বছর পরের জগদীশ ধবলদেব তো আরও, রক্তমাংসের মানুষ। কাজেই ধর্মীয়তা আরোপের সীমা আছে। এই সমস্যা বা দ্বান্দ্বিকতার টানাপোড়েনে পড়ে জঙ্গলমহলের রূপকাশ্রিত বংশকাহিনীগুলো **সময়ের** দুই চেতনার মাঝে দোলায়মান। একদিকে জীবনী লিখতে গিয়ে হাজির করতে হচ্ছে **ঐতিহাসিক** সময়, প্রকৃত সময়। অন্যদিকে ধর্মীয়তার খাতিরে **অতিকথাময়** সময়, **লীলান্বিত** সময়। জঙ্গলমহলের রাজক্ষমতা ঐতিহাসিক এবং দৈবীও। যতক্ষণ একটি জনমণ্ডলীর প্রতিভূ হলেন রাজা / জমিদার, ততক্ষণ জীবনীকারের এই রণনীতি সফল। কিন্তু যেই এই সামাজিকমণ্ডলী অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ হয়ে পড়ছে—রাজা-প্রজায় দ্বন্দ্ব, মণ্ডলীর নানা স্তরের মাঝে দ্বন্দ্ব, জমিদার-কৃষক দ্বন্দ্ব, সোজা কথায় কৃষক-বিদ্রোহ যখন ঐতিহাসিক বাস্তবতারূপে আবির্ভূত হচ্ছে, তখন জীবনীকারের জীবনী রচনার এই রণনীতি ব্যর্থ। তার কারণ, তখন দেখাতে হবে কৃষক / প্রজা / জনসাধারণ অধার্মিক, অকৃতজ্ঞ। কিন্তু তা দেখালেও কিন্তু অনুচ্চারিতভাবে হলেও ধরে নেওয়া হয়েছে, সেই সামাজিক চুক্তির ন্যায্যতা বা কর্মকারিতা আর থাকছে না। রাজশাসন / জমিদারশাসনের দুটি স্তম্ভের একটি থাকলেও অপরটি মরে যাচ্ছে—ঐতিহাসিক ক্ষমতা উপস্থিত কিন্তু নীতিগত যৌক্তিকতা গত। জঙ্গলমহলের ঝাড়খণ্ডরূপে পুনর্জন্মে তাই পুরনোদিনের কুলজীকাহিনীগুলোর উপযোগিতা শেষ হয়ে যাচ্ছে।

অনুরূপ লোকায়ত কাহিনীগুলোরও একটা ভাষণিক কাঠামো আছে। ছো, টুসু,

ভাদু এবং বিশেষত ঝুমুরের কথকতার কিছু উল্লেখ করেছি। দেখা যাবে, জামবনির এই লোকসঙ্গীত ও লোককাহিনীতে যে ভাষণিক বা **ওরাল** ধারা পাওয়া যায়, তাতে দুটি অভিজ্ঞতা পাশাপাশি বিধৃত—সর্বজনীন বা যৌথ অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিগত অনুভূতি ও প্রকাশ। দুটি সময়ও পাশাপাশি বিধৃত। একটি হল নির্দিষ্ট সময়—সেই কাল যখন জঙ্গল কেটে আবাদ হচ্ছে, বসত হচ্ছে, রাজা আসছে, কুঠিয়াল আছে, আসামে চালান যেতে হচ্ছে, অরণ্যকে ঘিরে নানা উৎসবের গোড়াপত্তন ; অন্যটি হল নির্দিষ্ট কালাতিক্রমকারী কাল, যখন মনে হয় এই অভিজ্ঞতা চিরন্তন। বিধৃত রয়েছে কথক ও শ্রোতার দুটি শক্তিও। ছো প্রসঙ্গে দেখিয়েছি 'জাগরণের' গুরুত্ব। শিবের জন্য জাগতে হবে। কৃষকরা জেগে রইবে। কিন্তু জাগিয়ে রাখবে কে ? কে নাচবে, গল্প বলবে এই নাচের সময় ? ভূমিজ, মাঝি, ডোমেরা। ভূমিজরা এই এলাকার উদ্যমী কৃষক। দণ্ডচ্ছত্র মাঝিরাও তাই। ডোমেরা ভূমিহীন, অস্পৃশ্য, বাজনদার। এই বৈততায় সম্প্রদায় বিন্যাস আছে কিন্তু উচ্চনিচ ক্রমপর্যায়ের নয়। সবশেষে বিধৃত আছে নৈতিকতা সংক্রান্ত দুটি শক্তিও—শুভ, অশুভ। অকরুণ প্রকৃতি আছে, মন্বন্তর-আকাল আছে, নিষ্ঠুর শাশুড়ি আছে, বন্য হিংস্র প্রাণী আছে, কুঠিয়াল আছে, শয়তান আছে, দৈত্য দানব দানব, ডাইন-ডাইনি। বিপরীত সহৃদয় প্রকৃতি, পৌষপার্বণ, গোলায় ওঠা ধান, অভাগিনী নারী, আবাদ করা সাহসী কৃষক এবং মণ্ডলীর সমবেত সত্তা। এই কথকতায় গাঙ্গেয় বাংলার মতো রাজপুত্রের কাহিনী নেই, আত্মসচেতনতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা উদ্যত নয়। এই নৈতিকতায় ব্যক্তিগত ভক্তিও কম। টুসু, ভাদু—এরা উপলক্ষ মাত্র ; যদিও মনে হতে পারে এই কথকতার ভিত্তি দেবী আর মানুষের মাঝে সংলাপ—'তুমি' আর 'আমি'—কিন্তু দৈবী শক্তির সাথে মানবী অস্তিত্বের সম্পর্ক আর বিষয় নয়। এই দৈবী শক্তিরা অনেকটা সূত্রধরের মতো। ভাদু কথা ধরিয়ে দেবেন—তারপর সংলাপ মূলত সমাজগত, আত্মগত। দৈবী অস্তিত্ব শুধু 'সাউণ্ডিং বোর্ড'।

জামবনির রাজবংশকথা ও লোকায়ত কথার দুটি ক্ষেত্রেই দেখা যাবে কমিউনিটি বা **সমাজ** কীভাবে প্রতীকী পথে গঠিত হচ্ছে। অ্যানিথনি কোহেন এর নাম দিয়েছেন, **দা সিমবলিক কন্সট্রাকশন অব কমিউনিটি**। এই গঠনে অতীত প্রতীকরূপে বিধৃত। আচারাদিই হল সেই প্রতীক। এতে সমাজ বা কমিউনিটির পরিচয় স্থাপনের চেষ্টা আছে। এবং এতে এই সমাজের সীমানাও নির্ণীত হয়েছে—নানা সীমানা। ক্ষমতার সীমানা, এলাকাগত সীমানা, সম্প্রদায়গুলির সীমানা, লোকভাবনার সীমানা।

তার চেয়েও বড় কথা, এই প্রতীকী গঠনের মধ্যে রয়েছে আচার, রজনীতি এবং ক্ষমতার আন্তঃসম্পর্কের ছাপ। এই আন্তঃসম্পর্কই জামবনির বিভিন্ন ভাষণিক ধারাকে বিশিষ্ট করেছে। আচার বলতে এই লেখায় আমি শুধু কিছু ক্রিয়াকর্মাদি বোঝাইনি, সমগ্র প্রতীকী প্রক্রিয়াকে বোঝাতে চেয়েছি। সমাজতত্ত্ববিদদের সাক্ষ্য মানতে পারি, ডুর্কহাইম আচার সম্পর্কিত ব্যবহারকে অতিপ্রাকৃত জগতের সাথে যুক্ত করেছিলেন, যদিও এ ব্যাখ্যাও সঠিক যে ডুর্কহাইমের কাছে দেবতার আরাধনা হল সেই মাধ্যম যার

স্বারা মানুষ নিজের সমাজকেই আরাধনা করে, নিজেদের পারম্পরিক নির্ভরশীলতাকে। ডুর্কহাইমের কাছে আচারাদি ছিল দু রকমের—পবিত্র এবং পার্থিব বা নৈমিত্তিক, সাধারণ। স্যাক্রেড আর প্রফেন। কিন্তু জঙ্গলমহলের, বিশেষত জামবনির আচারাদির মধ্যে এই ভাবনার সমর্থন পাওয়া দুষ্কর। কেননা আচারাদি এখানে একই সঙ্গে পবিত্র এবং পার্থিব, বিশেষ এবং সাধারণ, ঋতু / সময় বিশেষ এবং নৈমিত্তিক। আচারাদির বারোমাস্যা জড়িত রয়েছে ক্ষমতার কাঠামোর সঙ্গে, রাজনীতির সঙ্গে।

ক্ষমতার কাঠামো যেমন আচার সৃষ্টি করে, আচারাদিও ক্ষমতার শক্তিবৃদ্ধি ঘটায়। ন্যায্যতা এনে এবং অপার্থিবকরণ সৃষ্টি করে তা রহস্যময়তা যোগ করে এবং এইভাবে আচারাদি ক্ষমতাকে দৃঢ় করে। এই কাজ আরও সম্ভব হয় তার কারণ আচারের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে অস্পষ্টতা বা **অ্যামবিগুইটি**। রাজনৈতিক বাস্তবতার আচার-কেন্দ্রিক গঠনও সম্ভব হয়ে হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে আচার নিজেই হয়ে ওঠে ক্ষমতা বা শক্তি। সংঘর্ষ বা সংকটের ক্ষেত্রটি লোকমানসে বা সমাজমানসে কী রূপ পরিগ্রহ করবে, তা নির্ভর করতে থাকে আচারাদির অন্তর্নিহিত ক্ষমতার মধ্যে। ছো, লোকগীতি, পর্ব, কথকতা, ধর্মচরণ—জামবনির সংস্কৃতির আলোচনায় এগুলোর উল্লেখের মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছি যে, রাজনীতি এবং ক্ষমতার প্রসঙ্গ ব্যতীত আচারের জগত বোঝা যাবে না। ফ্রেজার এখানে অচল : সম্ভবত অচল লেভিস্ত্রাউসও। অচল 'তপ্ত সমাজ' ও 'শীতল সমাজের, হট সোসাইটি, কোল্ড সোসাইটি'র কল্পকাহিনী।

৮

সংস্কৃতির ইতিহাস আছে বলে তাই থামা যাবে না। সংস্কৃতি ইতিহাস সৃষ্টিও করে। এই দ্বান্দ্বিকতার দিকে কিছুটা নজর ফেলে লেখার ইতি টানব।

একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। জামবনিতে প্রথম বার তিনেক আমাদের যাত্রায় ব্যাঘাত ঘটত ঝাড়খণ্ড আন্দোলন সম্পর্কিত আইন শৃঙ্খলা সমস্যায়। একবার ঝাড়গ্রাম থেকে ওঁদিকে আর রেল যাচ্ছে না ; আরেকবার চিলকিগড়ে এদিক- ওদিক ঘুরতে মানা হল, কারণ, কাল সি পি এম ঝাড়খণ্ডির হাতে মার খেয়েছে, আজ ঝাড়খণ্ডি খুন হয়েছে—অন্তহীন শোধ-প্রতিশোধের আবর্ত—এই আর কি ; আরও এক বার পুলিশের গাড়িতে 'সভ্যতায়' ফেরত এলাম ; মনে পড়ছে এমনই ঘরবন্দী হয়ে গিয়েছি ওই একই কাজে পুরুলিয়ায় গিয়ে। ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা আর বামফ্রন্টের পালা করে পর পর ডাকা পুরুলিয়ায় হরতাল চলেছে। সবচেয়ে বেশি মনে আছে, জামবনি থানায় ঢুকেছি পুরনো ভিলেজ নোটবুক দেখতে। দারোগাবাবুর ঘরের দেওয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো কাঁচে ঢাকা ছবি—**ম্যাপ অব জামবনি, ঝাড়খণ্ডি ইনফেস্টেড ভিলেজেস**। এই যেমন বলি ডাকাত অধ্যুষিত, সন্ত্রাসবাদী অধ্যুষিত, তেমনই ঝাড়খণ্ডি অধ্যুষিত। এক কথায় বলা যায়, ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের ছায়ায় আমার অনুসন্ধান, মেলামেশা চলেছিল। কাজেই সংস্কৃতির ইতিহাস রচনার কথাটা এসে পড়েছে স্বাভাবিকভাবে, পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে।

আমি উল্লেখ করেছি, জামবনির কথা লিখতে গিয়ে বারবার জঙ্গলমহলের কথা এসে পড়েছে। জঙ্গলমহলের কথা বলতে গিয়ে ঝাড়খণ্ডের কথা। সময় এবং এলাকার সীমানা দুরতিক্রম্য হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ত্রিকালজ্ঞ বোধের প্রভাবে এই অবস্থা! কিন্তু আমাদের মেতে হবে 'জাতীয় মানসিকতা' বা ন্যাশনাল আইডেনটিটি গড়ে ওঠার কথায়; তার কারণ যে এলাকার কথা আমাদের আলোচনার বিষয়, সেই এলাকার কথা তার বহুতর যোগাযোগ সম্পর্কাদি ব্যতীত অর্থবহ হয়ে ওঠে না। আমি দেখিয়েছি, জামবনির সংস্কৃতি এবং আচারের ধরনটি কীভাবে ন'মহলের অন্যত্রও পাওয়া যাবে এবং অন্য এলাকার উল্লেখের পরিপ্রেক্ষিতেই ফিরে আসা যাবে জামবনির সাংস্কৃতিক ইতিহাসের রহস্যোন্মচনের কাজে। এই সব সাংস্কৃতিক আচারাদি কোন জাতির / জাতীয় ইতিহাস রচনা করছে? নিষ্ঠাবান গান্ধীবাদীর মতো হিতেশ সান্যাল হয়ত বলতেন, এটা রাঢ় বাংলার প্রভাব, রাঢ় বাংলার কথা। ঐতিহাসিক বলে বিনোদশংকর দাশ লিখেছেন, এটা সীমান্ত বাংলার কথা, দঃ পশ্চিম সীমান্ত। পাক্কা সাহেবরা আলাদা এক প্রশাসনিক অস্তিত্বই এনেছিল কিছু বছরের জন্য হলেও—বলেছিল, এটা জঙ্গলমহল। এগুলো ঠিক একই অঞ্চল নয়, যদিও একটা ধারাবাহিকতা রয়ে গছে। তাই আজ একই বই নতুন নতুন পাঠে নতুন নতুন অর্থ এনে দেয়। একই ছবি ভিন্ন সময়ে মানসপটে ভিন্ন স্মৃতি বহন করে। একই এলাকার ভিন্ন ভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন পরিচিতি। তাই আজ ঝাড়খণ্ডেরর জাতীয় পরিচিতি পাবার আন্দোলনের কালে, এই অঞ্চলের জনসাধারণ দাবি করবে এটা ঝাড়খণ্ড গড়ে ওঠার সাংস্কৃতিক ইতিহাস। ঝাড়খণ্ড বলে যে সব অঞ্চলকে একই সত্তার অন্তর্গত বলে দাবি করা হচ্ছে, সেই অঞ্চলগুলির সাংস্কৃতিক উপাদানের সমপ্রকৃতি এই দাবির এক বড় ভিত্তি। আমি নিজে সাক্ষী আছি, ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায়, এক গায়ক উঠে ঘোষণা করলেন, আমরা 'ঝুমুর দেশের' লোক। এই গায়ক ময়ূরভঞ্জের। এইভাবে স্বদেশীযুগে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ বাঙালি বলত, আমরা রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের বাংলার মানুষ।

ইতিহাস এক সক্রিয় বিদ্যা হয়ে উঠেছে জাতীয়তাবাদের যুগে। ভারতের জাতীয়তাবাদী বিকাশে ভারত ইতিহাসচর্চা ওইরকম এক ভূমিকা নিয়েছিল। একইভাবে ঝাড়খণ্ডের জাতিসত্তাগত / জাতীয় চেতনার বিকাশের প্রক্রিয়ায় এই সাংস্কৃতিক ইতিহাস এক সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করছে। বলা যায়, সংস্কৃতি ইতিহাসের উপাদান, ইতিহাসচর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতিসত্তাগত চেতনা বাড়ার সাথে সাথে জামবনির কৃষ্টির অখ্যাত রূপকাররা পাদপ্রদীপের সামনে আসবেন। ছো নাচিয়ে, ঝুমুর গাইয়ে, নাচনি, মাহাত সমাজ সংস্কারক, মন্দিরের নকশাবিদ, কথক, পালাকার, মুখোশশিল্পী কারিগর, মানভূম ধলভূমের গাঁয়ের কবিরাল—অতীতের বিস্মৃতপ্রায় এই মানুষেরা হবেন এই নতুন ইতিহাসের সাংস্কৃতিক রূপকার।

জাতীয়তাবাদ এবং জাতিসত্তাগত চৈতন্য বিকাশের ধাক্কায় অহল্যার শাপমুক্তি হবে।

জাতিকথা বা নৃকথার অধীনতা থেকে ইতিহাসের মুক্তি ঘটবে। লোকসংস্কৃতির উত্তরণ ঘটবে এথনোগ্রাফি থেকে ইতিহাসে। আচারের আলোচনায় রাজনীতির প্রসঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ। তার কারণ জাতিসত্তার বা জাতির রাজনৈতিক আন্দোলনের চাপেই সংস্কৃতি রাজনীতির বিষয় হয়ে উঠেছে। শাসক অর্থনীতি, রাজনীতি ও কৃষ্টির বিরোধিতা করে যে রাজনৈতিক চৈতন্যের অগ্রগতি, সেই চৈতন্যই স্থির করে দিচ্ছে লোকায়ত কৃষ্টিকে কোন এক জাতীয়-গণতান্ত্রিক ইতিহাসের উপাদান হয়ে উঠতে হবে ॥ □

আমি এই লেখার জন্য নির্মলেশ ধবলদেবের কাছে ঋণী। সুরজিৎ সিংহ, পশুপতি মাহাত, নিরঞ্জন মাহাত এবং চন্দ্রমোহন মাহাতর সঙ্গে আলোচনা ব্যতীত এই লেখা সম্ভব হতো না। —লেখক।

এই নিবন্ধটিতে পাদটীকা-দ্যোতক সংখ্যা অগ্রাহ্য করুন। —সম্পাদক।

পরিশিষ্ট—১

জামবনি এস্টেট থেকে শিক্ষায় মাসিক সাহায্য ও বেতন (১৩৪১-৪২)

১।	সিদ্ধেশ্বর মিত্র	৩২ টাকা ছ আনা
২।	ধড়ষা স্কুলের সাহায্য	২ টাকা
৩।	বনসারা ,, ,,	২ টাকা
৪।	ঘাটখুড়া ,, ,,	২ টাকা
৫।	রামচন্দ্রপুর ,,	২ টাকা
৬।	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যায়তন, চিলকিগড়	৫৪ টাকা আট আনা
		৯৪ টাকা চোদ্দ আনা

পরিশিষ্ট—২

জামবনি এস্টেটের থেকে মাসিক দেবসেবা বাবদ বেতন (১৩৪১-৪২)

১।	শ্রীশ্রী শিবজিউ ঠাকুরের পূজারী কৃত্তিবাস আচার্য্য	২ টাকা	
২।	কৃত্তিবাস আচার্য্য পূজক	১১ টাকা ছ আনা	
৩।	উজলা বেওয়া	২ টাকা	ইহার নামে ২ টাকা হাওলাত আছে। মাসিক আট আনা আদায় হয়।
৪।	রাজেন্দ্র শতপথী	১৬ টাকা চোদ্দ আনা	
৫।	বালক বাগাল	১ টাকা	
৬।	বিহারী মাঝি	১ টাকা	
৭।	কৈলাস মাঝি	১ টাকা	
৮।	কুসুম বেওয়া	১ টাকা	
		৩৬ টাকা চার আনা	

"আগুন আমাদের ভাই
নদী আমাদের বোন
সেই তাপ সেই জল থেকে
আমরা নিংড়ে নিয়েছি বিদ্যুৎ
সেই আমরা....."

(আগুনের নদী ঃ অমিতাভ দাশগুপ্ত)

ঃ প্রগতির প্রতীক ঃ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

With best compliments of :

Shaw Wallace & Company Limited

4, BANKSHALL STREET,

CALCUTTA-700 001

কৃষি ও কৃষকের সেবায়

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম লিমিটেড

উন্নতমানের সারটিফায়েড পাট, ধান, গম, ডালশস্য ও তৈলবীজের উৎপাদন ও সরবরাহের একমাত্র নির্ভরযোগ্য সরকারী প্রতিষ্ঠান।

রাজ্য বীজ নিগমের বীজই বাজারের সেরা বীজ

ব্যবহার করুন ☐ ফসল বাড়ান ☐ লাভ বাড়ান

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগমের জেলা দপ্তরে যোগাযোগ করুন।

পশ্চিম দিনাজপুর : উকিলপাড়া, রায়গঞ্জ। মালদা : অভিরামপুর, পোঃ— মকদমপুর। মুর্শিদাবাদ : পঞ্চাননতলা, বহরমপুর। নদীয়া : ১২, ডি. এন. রায় রোড, কৃষ্ণনগর। বর্ধমান : বর্ধমান, কানাইনাট্ সাল। বীরভূম : বড়বাগান, সিউরি। বাঁকুড়া : চাঁদমারীডাঙ্গা। মেদিনীপুর : সিপাইবাজার চক্। উত্তর ২৪ পরগণা : ২৯ নং কে. এন. সি. রোড, বারাসাত। হুগলী : পিপুলপাতি, হুগলী। কোচবিহার : রাজমাতা স্ট্রিট।

☐ সদর দপ্তর ☐

৪, গঙ্গাধর বাবু লেন, ষষ্ঠতল,
কলিকাতা-৭০০ ০১২

☐

□

অন্য চলচ্চিত্র অন্য থিয়েটার

পাখিরা

চলচ্চিত্র আর থিয়েটার এই তথ্যচিত্রে একাকার

পরিচালনা □ **শিবানন্দ মুখোপাধ্যায়, দেবাশিস চক্রবর্তী, অসীম চৌধুরী**

আপনার ব্যক্তিগত ভি ডি ও ক্যাসেট সংগ্রহ 'পাখিরা' ছাড়া অসম্পূর্ণ।

□

A

WELL

WISHER

□

RAKSHIT CHEMICALS

MANUFACTURER ☐ IMPORTER ☐ EXPORTER

Communication Centre :
4, SYNAGOGUE STREET
9TH FLOOR, ROOM NO, 921
CALCUTTA-700 001
WEST BENGAL (INDIA)
Phone : 25-8276, 25-6194
Gram : RAKSALUM
Post Box No. : 2157
Factory :
KALUPUKUR ROAD, CHANDANNAGAR
HOOGHLY, WEST BENGAL (INDIA)
Phone : 95046, 96304
(Code No. 03168)

☐

Multiwyn Industrial Corporation

3-B, CAMAC STREET
CALCUTTA-700 016
Phone : 29-9543, 29-7525
Telex : 021 5796 JJCO IN
Gram : 'ERECT'

☐

PLAZA TOWER COMPLEX

8, NAYAPATTY ROAD (DUM DUM)
CALCUTTA-700 055
Phone No. : 51-5162

HEAD OFFICE :
ESAAR INDIA PVT. LTD.
4A, COUNCIL HOUSE STREET
CALCUTTA-700 001
Phone No. : 28-8348

AMSAM ENGINEERING WORKS

SPECIALIST IN MANUFACTURING
RUBBER MACHINERIES
104, CHRISTOPHER ROAD
CALCUTTA-700 046
Telephone : 44-0017

Skycare Aviation Pvt. Ltd.

BB 36, SALT LAKE
CALCUTTA-700 064

□

Sur Industrial Corporation Engineers

60, ANANDA PALIT ROAD
CALCUTTA-700 014
Phone : 44-6655, 44-5755

Manufacturers of
R.C.C. SPUN PIPES and
ALLIED CONCRETE PRODUCT.

Works :
DOLTALA, P.O. GANGANAGAR,
MADHYAMGRAM, 24-PARGANAS

□

Hotel Jupiter

SIBALOY ROAD, DIGHA,

Post. : DIGHA, Dist. : MIDNAPUR (W.B.)

□

VENUS INDUSTRIES

GARIA GARDEN
GARIA, CALCUTTA-700 084

Manufacturer of Steel Furniture
(Hospital and Office)

M/s. NEW BHARAT REFRACTORIES LTD.

EXPORTERS OF READYMADE GARMENTS

ALPINE COMMERCIAL CO. LTD.

7G, CLIVE ROW,
CALCUTTA-700 001

R. K. ENGINEERING COMPANY

59, BIPLABI ANUKUL CHANDRA STREET
CALCUTTA-700 072

Manufacturers of CYCLONE FANS

With best compliments from :

Asea Brown Boveri Limited

Bangalore, Baroda, Bhubaneswar, Bombay, Calcutta, Chandigarh, Cochin, Durgapur, Faridabad, Hyderabad, Jabalpur, Jaipur, Lucknow, Madras, Mysore, New Delhi.

মঞ্চ-বেতার-দূরদর্শনে অভিনীত

নক্ষত্র

নিবেদিত অসামান্য ধ্রুপদী নাট্য প্রয়াস

সোক্রাতেস

নাটক / মোহিত চট্টোপাধ্যায়

প্রস্তুতির পথে পরবর্তী দু'টি প্রযোজনা

মুন্নার দিনরাত

নাটক / উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়

শত্রু সম্পত্তি

নাটক / নভেন্দু সেন

প্রয়োগ প্রধান / শ্যামল ঘোষ

যোগাযোগ ঃ

নক্ষত্র

৩৫সি রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা ৫

দূরভাষ ঃ ৩৩ ৬৪৭৭

With best compliments of :

M/s. MISHRA BUILDERS & SUPPLIERS

P.O. & VILL. : SONARPUR

DIST. : 24 PARGANAS (SOUTH)

Space donated by :

L. K. SARKAR

Capitol Plastic

42/B, Shib Narayan Das Lane
Calcutta-700 006
Phone 32-1136, 32-5104

Plastic goods Manufacturers.

□

একটি ব্যতিক্রমী তথ্যচিত্র

"শাকিলা"

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ॥ শঙ্খ ঘোষ

[দক্ষিণ ২৪ পরগণার এক অবহেলিত গ্রামের যে মহিলাটি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই কোলাজ শিল্পে তাঁর আসন স্থায়ী করে নিতে পেরেছেন তাঁকে নিয়েই ছবি]

প্রদর্শনের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা :

৯০-এ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা-৭০০ ০২৬

□

যার নেই কোনও গতি
সে করে হোমিওপ্যাথি

সঞ্জীব গঙ্গোপাধ্যায়

২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

□

সূচনা

একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
নাট্যাভিনয় ● লোকসংস্কৃতি চর্চা
কর্মশালা আমাদের কর্মধারা

আগামী প্রযোজনা : দুটি নাটক : জ' ককতো অবলম্বনে 'প্রতীক্ষা' ও রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রমোদভ্রমণ'

৩, অনরেট ফার্স্ট লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৪

□

□

সিনেম্যানের প্রথম তথ্যচিত্র **"লিভিং অন দি জাংক"** গত বছর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে **ইন্ডিয়ান প্যানোরামা** '৯২-এ নন-ফিচার বিভাগে নির্বাচিত এবং রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত তথ্যচিত্র।

সিনেম্যান-এর দ্বিতীয় প্রয়াস আর একটি ভিন্নধর্মী তথ্যচিত্র

"জীবনের ভাস্কর্য"

জীবন দলুই-এর শিল্প ও সংগ্রামকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এই ছবি।

পরিচালনা, চিত্রনাট্য : **গোপাল বসু** চিত্রগ্রহণ : **অমিত সেন**
সম্পাদনা : **রথীন বসু** সংগীত পরিচালনা : **এস. ব্যানার্জী**
সহ-পরিচালনা : **সুজিত চ্যাটার্জী**

যোগাযোগ :—

সিনেম্যান
৩০/৪৩, নয়াপট্টি রোড, দমদম, কলিকাতা-৭০০ ০৫৫,
দূরভাষ : ৫১-৪৪৫০

□

লক্ষ্মীন্দ্রকুমার সরকারের
পুরুলিয়ার ডাইনী বিরোধী আন্দোলন □ **৫০ টাকা**

প্রচ্ছদ : দেবব্রত ঘোষ

সাঁওতালী ভাষা, লিপি ও সাহিত্যচর্চার ইতিবৃত্ত □ **৩০ টাকা**
[২য় সংস্করণ, পরিবর্ধিত]

আর. বি. সরকার প্রকাশনী

১৯/৭এ, পটারী রোড, কলকাতা-১৫

□

ACHIN MANUSH

THE UNKNOWN

A DOCUMENTARY ON WOMEN BAUL OF BENGAL

Producer & Research Work : LINA CHAKI

Direction, Screenplay : SIVANANDA MUKHERJEE

Camera : SUBHASHIS BANERJEE

Editing : SUDIPTA BHOWMIK & SUMIT GHOSH

Sound : RANJAN PANDEY

Asst. Direction : DEBASISH CHAKRABORTY & KORAK GHOSH

Language : BENGALI / 35 mm. / Colour / 40 minutes

Enquiries : SAYANTANI PRODUCTION
BLOCK-B, P 85
LAKE TOWN, CALCUTTA-700 089
Phone : 34-2174

Proposed OLD-AGE HOME
at Champahati, 24 Pgs, (South)
opened on 27 September, 1992

The Ramkrishna Society
Anath Bhandar

17, MAHENDRA SARKAR STREET
CALCUTTA-700 012
Phone : 26-8615

Rauniyaar Vidya Niketan

Junior High School

113/1 'B' ROAD,

BAMANGACHI, HOWRAH-6

For admission and other details contact :
D. C. Gupta.

Thermal Consultants and Services

114, HARISH MUKHARJEE ROAD,

CALCUTTA

Phone : 48-5292, 22-2215

STAR TEA COMPANY

[SINCE 1940]

RETAILER, WHOLESELLER & EXPORTER

8/1, LALBAZAR STREET
CALCUTTA-700 001
Office : 20 0559, 20 5710
Shop : 28 2630

BRANCH :
23, R. G. KAR ROAD
CALCUTTA-700 004
Phone : 55 6599
Cable : HINDCHA
Telex : 212352 STAR IN

Declaration No. : 25 / 92 ☐ Oct-Dec 1992 ☐ Rs. 20

SEARLE AGROCHEMICALS

WE ARE COMMITTED
WE ARE THE WINNERS

PRODUCTS :

Fenval 20% EC	Fenval 0.4% DP
Trapp 50% EC	Trapp 5% GR
Patap SP	Patap GR
Warrant 1 OCG	Arrest 50 WP
Croton 36 SL	Champ 30 EC

কুন্তল রায় কর্তৃক ইমপ্রিন্টা, ২৪৩/২বি, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত এবং টি জি ২/২৯ তেঘরিয়া, হাতিয়ারা, কলকাতা ৭০০ ০৫৯ থেকে প্রকাশিত।